শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নবম সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ষষ্ঠ মুদ্রণ

মুদ্রক : ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
অবলা প্রেস
১/এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

শেষ প্রশ্ন	...	১
স্বামী	...	২৫৯
একাদশী বৈরাগী	...	৩০৩
নারীর মূল্য	...	৩১৭
অপ্রকাশিত রচনাবলী	...	৩৬৯
ক্ষুদ্রের গৌরব	...	৩৭১
সত্য ও মিথ্যা	...	৩৭৬
রস-সেবায়েত	...	৩৮১
আসার আশায়	...	৩৮৪
রসচক্র	...	৩৮৭

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষ প্রশ্ন

শেষ প্রশ্ন

১

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া অনেকগুলি বাঙালীপরিবার পশ্চিমের বহুখ্যাত আগ্রা সহরে বসবাস করিয়াছিলেন। কেহ-বা কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, কেহ-বা এখনও বাসাড়ে। বসন্তের মহামারী ও প্লেগের তাড়াহুড়া ছাড়া ইঁহাদের অতিশয় নির্বিঘ্ন জীবন। বাদশাহী আমলের কেল্লা ও ইমারৎ দেখা ইঁহাদের সমাপ্ত হইয়াছে, আমীর-ওমরাহগণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙা ও আ-ভাঙা যেখানে যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে, এমন যে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল, তাহাতেও নূতনত্ব আর নাই। সন্ধ্যায় উদাস সজল চক্ষু মেলিয়া, জ্যোৎস্নায় অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্ধকারে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া যমুনার এপার হইতে ওপার হইতে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার যত প্রকারের প্রচলিত প্রবাদ ও ফন্দি আছে তাঁহারা নিঙড়াইয়া শেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কোন্ বড়লোক কবে কি বলিয়াছে, কে কে কবিতা লিখিয়াছে, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কে সুমুখে দাঁড়াইয়া গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছে—ইঁহারা সব জানেন। ইতিবৃত্তের দিক দিয়াও লেশমাত্র ত্রুটি নাই। ইঁহাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত শিখিয়াছে কোন্ বেগমের কোথায় আঁতুড়-ঘর ছিল, কোন জাঠসর্দ্দার কোথায় ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছে, সে কালীর দাগ কত প্রাচীন—কোন দস্যু কত হীরা-মাণিক্য লুণ্ঠন করিয়াছে, এবং তাহার আনুমানিক মূল্য কত, কিছুই আর কাহারও অবিদিত নাই।

এই জ্ঞান ও পরম নিশ্চিন্ততার মাঝখানে হঠাৎ একদিন বাঙালী-সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রত্যহ মুসাফিরের দল যায় আসে, আমেরিকান টুরিস্ট হইতে শ্রীবৃন্দাবন ফেরত বৈষ্ণবদের পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে ভিড় হয়—কাহারও কোন ঔৎসুক্য নাই, দিনের কাজে দিন শেষ হয়, এমনি সময়ে একজন প্রৌঢ়-বয়সী ভদ্র বাঙালী-সাহেব তাঁহার শিক্ষিতা, সুরূপা ও পূর্ণ-যৌবনা কন্যাকে লইয়া স্বাস্থ্য-উদ্ধারের অজুহাতে সহরের একপ্রান্তে মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া বসিলেন। সঙ্গে তাঁহার বেহারা, বাবুর্চ্চি, দরওয়ান আসিল; ঝি, চাকর, পাচক-ব্রাহ্মণ আসিল; গাড়ি, ঘোড়া, মোটর, শোফার, সহিস, কোচম্যানে এতকালের এত বড় ফাঁকা-বাড়ির সমস্ত অন্ধ্র-রন্ধ্র যেন যাদুবিদ্যায়

রাতারাতি ভরিয়া উঠিল। ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ গুপ্ত, কন্যার নাম মনোরমা। অত্যন্ত সহজেই বুঝা গেল ইঁহারা বড়লোক। কিন্তু উপরে যে চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছি, সে ইঁহাদের বিত্ত ও সম্পদের পরিমাণ কল্পনা করিয়া নয়, মনোরমার শিক্ষা ও রূপের খ্যাতি বিস্তারেও তত নয়, যত হইল আশুবাবুর নিরভিমান সহজ ভদ্র আচরণে। তিনি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া নিজে খোঁজ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন, তিনি পীড়িত লোক, তাঁহাদের অতিথি, সুতরাং নিজ গুণে দয়া করিয়া যদি না তাঁহারা এই প্রবাসীদের দলে টানিয়া লয়েন ত এই নির্ব্বাসনে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব। মনোরমা বাড়ির ভিতরে গিয়া মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া আসিল, সেও অসুস্থ পিতার হইয়া সবিনয় নিবেদন জানাইল যে, তাঁহারা যেন তাঁহাকে পর করিয়া না রাখেন। এমনি আরও সব রুচিকর মিষ্ট কথা।

শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন। তখন হইতে আশুবাবুর গাড়ি এবং মোটর যখন-তখন, যাহার-তাহার গৃহে আনা-গোনা করিয়া মেয়ে এবং পুরুষদের আনিতে লাগিল, পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল, আলাপ-আপ্যায়ন গান-বাজনা এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ পরিদর্শনের হৃদ্যতা এমনি জমাট বাঁধিয়া উঠিল যে, ইহারা যে বিদেশী কিংবা অত্যন্ত বড়লোক এ-কথা ভুলিতে কাহারও সপ্তাহ-খানেকের অধিক সময় লাগিল না। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় কতকটা সঙ্কোচ এবং কতকটা বাহুল্য বলিয়াই কেহ স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই। ইঁহারা হিন্দু বা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। বিদেশে প্রয়োজনও বড় হয় না। তবে আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া যতটা বুঝা যায়, সকলেই একপ্রকার বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে ইঁহারা যে সমাজভুক্তই হউন, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ভদ্র বাঙালী পরিবারের মত খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে অন্ততঃ বাচবিচার করিয়া চলেন না। বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চ্চি থাকার ব্যাপারটা সকলে না জানিলেও এ কথাটা সবাই জানিত যে, এতখানি বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে অবিবাহিত রাখিয়া যিনি কলেজে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন তিনি মূলতঃ যে সমাজেরই অন্তর্গত হোন, বহুবিধ সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

অবিনাশ মুখুয্যে কলেজের প্রফেসার। বহুদিন হইতে স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই। ঘরে বছর-দশেকের একটি ছেলে; অবিনাশ কলেজে পড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধব লইয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। অবস্থা স্বচ্ছল—নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন। বছর-দুই পূর্ব্বে বিধবা শ্যালিকা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ভগিনীপতির কাছে আসেন। জ্বর ছাড়িল, কিন্তু ভগিনীপতি

ছাড়িলেন না। সম্প্রতি গৃহে তিনি কর্ত্রী। ছেলে মানুষ করেন, ঘর-সংসার দেখেন, বন্ধুরা সম্পর্ক আলোচনা করিয়া পরিহাস করে। অবিনাশ হাসে—বলে, ভাই, বৃথা লজ্জা দিয়ে আর দগ্ধ ক'রো না—কপাল। নইলে চেষ্টার ত্রুটি নেই। এখন ভাবি, ধন অপবাদে ডাকাতে মারে সেও আমার ভাল।

অবিনাশ স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বাটীর সর্ব্বত্র তাঁহার ফটোগ্রাফ নানা আকারের নানা ভঙ্গীর। শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একখানা বড় ছবি। অয়েল পেন্টিং মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো। অবিনাশ প্রতি বুধবারের সকালে তাহাতে মালা ঝুলাইয়া দেয়। এইদিনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অবিনাশ সদানন্দ গোছের মানুষ। তাস-পাশায় তাহার অত্যধিক আসক্তি। তাই ছুটির দিনে প্রায়ই তাহার গৃহে লোকসমাগম ঘটে। আজ কি-একটা পর্ব্বোপলক্ষে কলেজ কাছারি বন্ধ ছিল। আহারাদির পরে প্রফেসর-মহল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জন-দুই নীচের ঢালা বিছানার উপরে দাবার ছক পাতিয়া বসিয়া এবং জন-দুই উপুড় হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, বাকী সকলে ডেপুটি ও মুন্সেফের বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার অনুপাতে মোটা মাহিনার বহর মাপিয়া উচ্চ কোলাহলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি রাইচ্যাস ইনডিগনেশন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। এমন সময় মস্ত একটা ভারী মোটর আসিয়া সদর দরজায় থামিল। পরক্ষণে আশুবাবু তাঁহার কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিতেই সকলেই সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাইচ্যাস ইনডিগনেশন জল হইয়া গেল, ও-দিকের খেলাটা উপস্থিত-মত স্থগিত রহিল, অবিনাশ সবিনয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের পদধূলি আমার গৃহে পড়লো, কিন্তু হঠাৎ এমন অসময়ে যে? বলিয়া তিনি মনোরমাকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিলেন।

আশুবাবু সন্নিকটবর্ত্তি আরাম-কেদারার উপর দেহের সুবিপুল ভার ন্যস্ত করিয়া অকারণ উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিয়া কহিলেন, আশু বদ্যির অসময়? এতবড় দুর্নাম যে আমার ছোটখুড়োও দিতে পারেন না অবিনাশবাবু?

মনোরমা হাসিমুখে নতকণ্ঠে কহিল, কি বলচ বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, তবে থাক ছোটখুড়োর কথা। কন্যার আপত্তি, কিন্তু এর চেয়ে একটা ভাল উদাহরণ মা-ঠাকরুণের বাপের সাধ্যি নেই যে দেয়। এই বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দোচ্ছ্বাসে পুনরায় ঘর ভাঙিবার উপক্রম করিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, কিন্তু কি বলব মশাই, বাতে পঙ্গু। নইলে যে পায়ের ধূলোর এত গৌরব বাড়ালেন, আশু গুপ্তর সেই পায়ের ধূলো ঝাট দেবার জন্যেই আপনাকে একটা চাকর রাখতে হ'ত অবিনাশবাবু। কিন্তু আজ আর বসবার জো নেই, এখুনি উঠতে হবে।

এই অনবসরের হেতুর জন্য সকলেই তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আশুবাবু বলিলেন, একটা আবেদন আছে। মঞ্জুরির জন্য মাকে পর্য্যন্ত টেনে এনেচি। কালও ছুটির দিন, সন্ধ্যার পর বাসায় একটুখানি গান-বাজনার আয়োজন করেচি—সপরিবারে যেতে হবে। তারপর একটু মিষ্টি-মুখ।

মেয়েকে কহিলেন, মণি, বাড়ির মধ্যে গিয়ে একবার হুকুমটা নিয়ে এসো মা। দেরি করলে হবে না। আর একটা কথা, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস, মেয়েদের জন্য না হোক, আমাদের পুরুষদের জন্য দুরকম খাবার ব্যবস্থাই—অর্থাৎ কি না—প্রেজুডিস যদি না থাকে ত—বুঝলেন না?

বুঝিলেন সকলেই এবং একবাক্যে প্রকাশ করিলেন সকলেই যে, তাঁহাদের প্রেজুডিস নাই।

আশুবাবু খুশী হইয়া কহিলেন, না থাকারই কথা? মেয়েকে বলিলেন, মণি, খাবার সম্বন্ধে মা-লক্ষ্মীদেরও একটা মতামত নেওয়া চাই, সে যেন ভুলো না। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে তাঁদের অভিরুচি এবং আদেশ নিয়ে বাসায় ফিরতে আজ বোধ করি আমাদের সন্ধ্যে হয়ে যাবে। একটু শীঘ্র করে কাজটা সেরে এস মা।

মনোরমা ভিতরে যাইবার জন্য উঠিতেছিল, অবিনাশ কহিলেন, আমার ত বহুদিন যাবৎ গৃহ শূন্য। শ্যালিকা আছেন, কিন্তু বিধবা। গান শোনবার সখ প্রচুর, অতএব যাবেন নিশ্চিত। কিন্তু খাওয়া—

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, তারও অভাব হবে না অবিনাশবাবু আমার মণি রয়েছে যে। মাছ-মাংস পিয়াজ-রসুন ও ত স্পর্শ করে না।

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি মাছ-মাংস খান না?

আশুবাবু বলিলেন, খেতেন সবই, কিন্তু বাবাজীর ভারি অনিচ্ছে, সে হ'লো আবার সন্ন্যাসী-গোছের মানুষ—

চক্ষের পলকে মনোরমার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; পিতার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানেই বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি সমস্ত বলে যাচ্ছ বাবা!

পিতা থতমত খাইয়া গেলেন এবং কন্যার কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক মৃদুতা তাহার ভিতরের তিক্ততা আবৃত করিতে পারিল না।

ইহার পরে বাক্যালাপ আর জমিল না এবং আরও দুই-চারি মিনিট যাহা ইহারা বসিয়া রহিলেন, আশুবাবু কথা কহিলেও মনোরমা কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল এবং উভয়ে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য সকলেরই মনের উপর যেন একটা অনাকাঙ্খিত বিষণ্ণতার ভার চাপিয়া রহিল।

বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া কিছু কহিল না, কিন্তু সবাই ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ এই বাবাজীটি আসিল আবার কোথা হইতে? আশুবাবুর পুত্র নাই,

মনোরমাই একমাত্র সন্তান তাহা সকলেই জানিত; নিজে আজও সে অনূঢ়া—আয়তির কোন চিহ্ন তাহাতে বিদ্যমান নাই। কথাটা সোজা-সুজি প্রশ্ন করিয়া কেহ জানিয়া লয় নাই বটে, কিন্তু এ-সম্বন্ধে সংশয়ের বাষ্পও ত কাহারো মনে উদয় হয় নাই। তবে?

অথচ এই সন্ন্যাসী-গোছের বাবাজী যেই হোন, অথবা যেখানেই থাকুন, তিনি সহজ ব্যক্তি নহেন। কারণ তাহার নিষেধ নহে, কেবলমাত্র অনিচ্ছার চাপেই এত-বড় একটা বিলাসী ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির একমাত্র শিক্ষিতা কন্যার মাছ-মাংস রশুন-পিঁয়াজের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এবং লজ্জা পাইবার, গোপন করিবারই বা আছে কি? পিতা সঙ্কোচে জড়-সড় হইয়া গেলেন, কন্যা আরক্ত-মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সকলের মনে একটা অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর রহস্যের মত বিঁধিল এবং আগন্তুক পরিবারের সহিত মিলা-মিশার যে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ধারা প্রথম হইতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন তাহাতে একটা বাধা আসিয়া পড়িল।

২

মনে হইয়াছিল আশুবাবু সহরের কাহাকেও বোধ হয় বাদ দিবেন না। কিন্তু দেখা গেল বাঙালীদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁহারা শুধু তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রফেসরমহল দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইলেন, বাড়ির মেয়েদের মোটর পাঠাইয়া পূর্ব্বে আনা হইয়াছিল।

একটা বড় ঘরের মেঝের উপর মূল্যবান প্রকাণ্ড কার্পেট পাতিয়া স্থান করা হইয়াছে। তাহাতে জন-দুই দেশীয় ওস্তাদ যন্ত্র বাঁধিতে নিযুক্ত। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। গৃহস্বামী অন্য কোথাও ছিলেন, খবর পাইয়া হাঁস-ফাঁস করিতে করিতে হাজির হইলেন, দুই হাত থিয়েটারি ভঙ্গিতে উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিলেন, স্বাগত ভদ্রমণ্ডলি! মোস্ট ওয়েলক্যাম।

ওস্তাদজীদের ইঙ্গিতে দেখাইয়া গলা খাটো করিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন, ভয় পাবেন না যেন! কেবল এদের ম্যাও ম্যাও শোনাবার জন্যই আহ্বান করে আনিনি। শোনাবো, শোনাবো এমন গান আজ শোনাবো, যে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে তবে ঘরে ফিরবেন।

শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন। সদা-প্রসন্ন অবিনাশবাবু আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলেন কি আশুবাবু? এ দুর্ভাগা দেশের যে সবাইকে চিনি, হঠাৎ এ রত্ন পেলেন কোথায়?

আবিষ্কার করেচি মশাই, আবিষ্কার করেচি। আপনারাও যে একেবারে না চেনেন তা নয়, সম্প্রতি হয়ত ভুলে গেছেন। চলুন দেখাই। বলিয়া তিনি সকলকে একপ্রকার ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ করিলেন।

লোকটি ঈষৎ শ্যামবর্ণ, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অবয়বের নিখুঁত সুন্দর গঠন। নাক, চোখ, ভ্রূ, ললাট, অধরের বাঁকা রেখাটি পর্য্যন্ত—একটিমাত্র নরদেহ এমন করিয়া সুবিন্যস্ত হইলে যে কি বিস্ময়ের বস্তু হয় তাহা এই মানুষটিকে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। চাহিলে হঠাৎ চমক্ লাগে। বয়স বোধ করি বত্রিশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু প্রথমে আরও কম মনে হয়। সুমুখের সোফায় বসিয়া মনোরমার সহিত গল্প করিতেছিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, আসুন।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুক অতিথিদের নমস্কার করিল। কিন্তু প্রতি-নমস্কারের কথা কাহারও মনেও হইল না, সকলে অকস্মাৎ এমনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশবাবু বয়সেও বড়, কলেজের দিক দিয়া পদগৌরবেও সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আগ্রায় কবে ফিরে এলেন শিবনাথবাবু? বেশ যা হোক। কই, আমরা ত কেউ খবর পাইনি?

শিবনাথ কহিল, পাননি বুঝি? আশ্চর্য্য! তাহার পরে হাসিমুখে বলিলেন, বুঝতে পারিনি অবিনাশবাবু, আমার আসার পথ চেয়ে আপনারা এতখানি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

উত্তর শুনিয়া অবিনাশবাবু যদিচ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহ-যোগিগণের মুখ ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল। যে কারণেই হোক, ইঁহারা যে পূর্ব্ব হইতেই এই প্রিয়দর্শন গুণী ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা আভাসে জানা থাকিলেও একের এই বক্রোক্তির অন্তরালে ও অন্য সকলের কঠিন মুখচ্ছবির ব্যঞ্জনায় এই বিরুদ্ধতা এমনি একটু রূঢ় এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কেবলমাত্র মনোরমা ও তাহার পিতাই নয়, সদানন্দ-প্রকৃতি অবিনাশ পর্য্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াইতে পাইল না, আপাততঃ এইখানেই বন্ধ হইল।

পাশের ঘর হইতে ওস্তাদজীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই বাড়ির সরকার আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, সমস্ত প্রস্তুত, শুধু আপনাদের অপেক্ষাতেই গান-বাজনা শুরু হইতে পারিতেছে না।

পেশাদার ওস্তাদি সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে এ-ক্ষেত্রেও তেমনিই হইল—বিশেষত্ব-বর্জ্জিত মামুলি ব্যাপার, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষুদ্রপরিসর এই সঙ্গীতের আসরে, স্বল্প কয়টি শ্রোতার মাঝখানে শিবনাথের গান সত্যসত্যই একেবারে অপূর্ব্ব শুনাইল। শুধু তাহার অতুলিত অনবদ্য কণ্ঠস্বরে নহে, এই বিদ্যায় সে অসাধারণ সুশিক্ষিত ও তাহাতে পারদর্শী। তাহার গাহিবার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গি, সুরের স্বচ্ছন্দ সরল গতি, মুখের অদৃষ্টপূর্ব ভাবের ছায়া, চোখের অভিভূত উদাস দৃষ্টি, সমস্ত একই সময়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া, সেই সর্ব্বাঙ্গীণ তান-লয় পরিশুদ্ধ সঙ্গীত যখন শেষ হইল তখন মনে হইল শ্বেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্ব্বাদ উজাড় করিয়া এই সাধকের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই বাক্যহীন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শুধু বৃদ্ধ আমির খাঁ ধীরে ধীরে কহিলেন, অ্যাসা কভি নহি শুনা।

মনোরমা শিশুকাল হইতে গান-বাজনার চর্চ্চা করিয়াছে, সঙ্গীতে সে অপটু নহে, তার সামান্য জীবনে সে অনেক কিছুই শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারে ইহাও যে আছে, এমন করিয়াও যে সমস্ত বুকের মধ্যেটা সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে টন টন করিতে থাকে তাহা সে জানিত না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল এবং ইহাই গোপন করিতে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

অবিনাশ বলিলেন, শিবনাথ সহজে গাইতে চায় না, কিন্তু ওর গান আমরা আগেও শুনেচি। তুলনাই হয় না। এই বছর-খানেকের মধ্যে যেন ও ইনফিনিট্‌লি ইমপ্রুভ করেচে।

হরেন কহিলেন, হাঁ।

অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক। কঠিন সাচ্চা লোক বলিয়া বন্ধু মহলে খ্যাতি আছে। গান-বাজনা ভাল লাগাটা তাঁহার মতে চিত্তের দুর্ব্বলতা। নিষ্কলঙ্ক, সাধু ব্যক্তি। তাই শুধু নিজের নয়, পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শিবনাথের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনে সহরের আবহাওয়া পুনশ্চ কলুষিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার গভীর শান্তি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, পর্দ্দার আড়াল হইতে গান শুনিয়া ও চেহারা দেখিয়া ইহাদের ভাল লাগার সম্ভাবনায় মন তাঁহার অতিশয় খারাপ হইয়া উঠিল; বলিলেন, গান শুনেছিলুম বটে মধুবাবুর। এ গান আপনাদের যত মিষ্টি লেগে থাক্, এতে প্রাণ নেই।

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ, প্রথমতঃ অপরিজ্ঞাত মধুবাবুর গান কাহারও শোনা ছিল না এবং দ্বিতীয়তঃ গানের প্রাণ না থাকার সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা অক্ষয়ের ন্যায় আর কাহারও স্পষ্ট নয়। গুণমুগ্ধ আশুবাবু উত্তেজনা-বশে তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অবিনাশ চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কবে কে কোথায় কিরূপ শুনিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে খবর আসিল, মেয়েদের খাওয়া শেষ হইয়াছে এবং তাঁহাদের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন এবং অজীর্ণ রোগগ্রস্ত মুন্সেফবাবু জল ও পান মাত্র মুখে দিয়াই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রহিলেন শুধু প্রফেসর মহল। ক্রমশঃ তাঁহাদেরও আহারের ডাক পড়িল। উপরের একটা খোলা বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে, আশুবাবু নিজেও সঙ্গে বসিয়া গেলেন। মনোরমা মেয়েদের দিক হইতে ছুটি পাইয়া তত্ত্বাবধানের জন্য আসিয়া হাজির হইল।

শিবনাথের ক্ষুধা যতই থাক্ আহারের রুচি ছিল না, সে না খাইয়াই বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মনোরমা কোনোমতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, পীড়াপীড়ি করিয়া সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিল। আয়োজন বড়লোকের মতই হইয়াছিল। টুনড্‌লা হইতে আসিবার পথে ট্রেনে কি করিয়া শিবনাথের সহিত আশুবাবুর পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং মাত্র দুই-তিন দিনের আলাপেই কি করিয়া সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তিনি নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতে কহিলেন, আর সবচেয়ে বাহাদুরি হচ্ছে আমার কানের। ওর গলার অস্ফুট সামান্য একটু গুঞ্জন ধ্বনি থেকেই আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলাম উনি গুণী, উনি অসাধারণ ব্যক্তি। এই বলিয়া কন্যাকে সাক্ষ্যরূপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কেমন মা, বলিনি তোমাকে শিবনাথবাবু মস্ত লোক? বলিনি যে, মণি এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা জীবনে একটা ভাগ্যের কথা?

কন্যা আনন্দে মুখ প্রদীপ্ত করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে। তুমি গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে জানিয়েছিলে যে—

কিন্তু দেখুন আশুবাবু।

বক্তা অক্ষয়। সকলেই চকিত হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, আহা, থাক্ না আজ ও-সব আলোচনা—

অক্ষয় চোখ বুজিয়া চক্ষু-লজ্জার দায় এড়াইয়া বার-কয়েক মাথা নাড়িলেন; কহিলেন, না অবিনাশবাবু, চাপলে চলবে না। শিবনাথবাবুর সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। উনি—

আহা হা, কর কি অক্ষয়! কর্ত্তব্য-জ্ঞান ত আমাদেরও আছে হে, হবে এখন আর একদিন। বলিয়া অবিনাশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া থামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না। ধাক্কায় অক্ষয়ের দেহ টলিল, কিন্তু কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা টলিল না। বলিলেন, আপনারা জানেন বৃথা সঙ্কোচ আমার নেই। দুর্নীতির প্রশ্রয় আমি দিতেই পারিনে।

অসহিষ্ণু হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, সে কি আমরাই দিতে চাই না কি? কিন্তু তার কি স্থান-কাল নেই?

অক্ষয় কহিলেন, না। উনি এ সহরে যদি আর না আসতেন, যদি ভদ্র-পরিবারে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা না করতেন, বিশেষতঃ কুমারী মনোরমা যদি না সংশ্লিষ্ট থাকতেন—

উদ্বেগে আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং অজনা শঙ্কায় মনোরমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

হরেন্দ্র কহিল, it is too much!

অক্ষয় সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, no, it is not.

অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, আহা হা—করচ কি তোমরা?

অক্ষয় কোন কথাই কানে তুলিলেন না, বলিলেন, আগ্রায় উনিও একদিন প্রফেসর ছিলেন। ওঁর বলা উচিত ছিল আশুবাবুকে কি করে সে চাকরি গেল।

হরেন্দ্র কহিল, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। পাথরের ব্যবসা করবার জন্য।

অক্ষয় প্রতিবাদ করিলেন, মিছে কথা।

শিবনাথ নিঃশব্দে আহার করিতেছিল, যেন এইসকল বাদ-বিতণ্ডার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। এখন মুখ তুলিয়া চাহিল এবং অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, মিছে কথাই ত! কারণ প্রফেসারি নিজের ইচ্ছেয় না ছাড়লে পরের অর্থাৎ আপনাদের ইচ্ছেয় ছাড়তে হ'তো। আর তাই ত হ'লো।

আশুবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন?

শিবনাথ কহিল, মদ খাবার জন্য।

অক্ষয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন, না, মদ খাবার অপরাধে নয়, মাতাল হবার অপরাধে।

শিবনাথ কহিল, যে মদ খায় সে-ই কখনো না কখনো মাতাল হয়। যে হয় না, হয় সে মিছে কথা বলে, না হয় সে মদের বদলে জল খায়। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, নির্লজ্জের মত আপনি হয়ত হাসতে পারেন, কিন্তু এ অপবাদে আমরা ক্ষমা করতে পারিনে।

শিবনাথ কহিল, পারেন, এ অপবাদ ত আমি দিইনি! আমাকে স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করার জন্য আপনারা স্বেচ্ছায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন এ-সত্য আমি স্বীকার করি।

অক্ষয় কহিলেন, তা হলে আশা করি আরও একটা সত্য এখনি স্বীকার করবেন। আপনি হয়ত জানেন না যে, আপনার অনেক খবরই আমি জানি।

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, জানিনে। তবে এ জানি, অপরের সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল যেমন অপরিসীম, খবর সংগ্রহ করবার অধ্যবসায়ও তেমনি বিপুল। কি স্বীকার করতে হবে আদেশ করুন।

অক্ষয় কহিলেন, আপনার স্ত্রী বিদ্যমান। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি আবার বিবাহ করেচেন সত্য কি না।

আশুবাবু সহসা চটিয়া উঠিলেন—আপনি কি-সব বলচেন অক্ষয়বাবু? একি কখনো হয়, না হতে পারে?

শিবনাথ নিজেই বাধা দিল, বলিল, কিন্তু তাই হয়েচে আশুবাবু? তাঁকে ত্যাগ করে আমি আবার বিবাহ করেচি।

বলেন কি? কি ঘটেছিল?

শিবনাথ কহিল, বিশেষ কিছু না। স্ত্রী চিররুগ্ন। বয়সও ত্রিশ হতে চললো—মেয়েমানুষের পক্ষে এই ত যথেষ্ট। তাতে ক্রমাগত রোগ ভোগ করে দাঁত পড়ে চুল পেকে একেবারে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। এই জন্যই ত্যাগ করে আবার একটা বিয়ে করতে হ'লো।

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—অ্যাঁ! শুধু এর জন্য? তাঁর আর কোন অপরাধ নেই?

শিবনাথ কহিল, না, মিথ্যে একটা অপবাদ দিয়ে লাভ কি আশুবাবু?

তাহার এই নির্ম্মল সত্যবাদিতায় অবিনাশ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—লাভ কি আশুবাবু! পাষণ্ড! তোমার লাভ-লোকসান চুলোয় যাক, একবার মিথ্যে করেই বল যে, সে গভীর অপরাধ করেছিল তাই তাকে ত্যাগ করেচ। একটা মিথ্যেতে আর তোমার পাপ বাড়বে না।

শিবনাথ রাগ করিল না, শুধু কহিল, কিন্তু এরকম অযথা কথা আমি বলতে পারিনে।

হরেন্দ্র সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, বিবেক বলে কি আপনার কোথাও কিছু নেই শিবনাথবাবু?

শিবনাথ ইহাতেও রাগ করিল না; শান্তভাবে কহিল, এ বিবেক অর্থহীন। একটা মিথ্যে বিবেকের শিকল পায়ে জড়িয়ে নিজেকে পঙ্গু করে তোলার আমি পক্ষপাতী নই। চিরদিন দুঃখ ভোগ করে যাওয়াটাই জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য নয়।

আশুবাবু গভীর ব্যথায় আহত হইয়া কহিলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর দুঃখটা একবার ভেবে দেখুন। তাঁর রুগ্ন হয়ে পড়াটা পরিতাপের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাই বলে, অসুখ ত অপরাধ নয় শিবনাথবাবু? বিনা দোষে—

বিনা দোষে আমিই বা আজীবন দুঃখ সইব কেন? একজনের দুঃখ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই যে সুবিচার হয় সে বিশ্বাস আমার নেই।

আশুবাবু আর তর্ক করিলেন না। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ বিবাহ হ'লো কোথায়?

গ্রামেই।

সতীনের উপর মেয়ে দিলে—এর বোধ হয় বাপ-মা নেই!

শিবনাথ কহিল, না। আমাদেরই ঝির বিধবা মেয়ে।

বাড়ির ঝির মেয়ে! চমৎকার! কি জাত?

ঠিক জানিনে। তাঁতি-টাঁতি হবে বোধ হয়।

অক্ষয় বহুক্ষণ কথা কহে নাই, এখন জিজ্ঞাসা করিল, এটির অক্ষর-পরিচয়টুকুও নেই বোধ হয়?

শিবনাথ কহিল, অক্ষর-পরিচয়ের লোভে ত বিবাহ করিনি, করেচি রূপের জন্য। এ বস্তুটির বোধ হয় তাতে অভাব নেই।

এই উক্তির পরে মনোরমা আর একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও তাহার দুই পা পাথরের ন্যায় ভারী হইয়া রহিল। কৌতূহল ও উত্তেজনার বশে কেহই তাহার প্রতি চাহে নাই। চাহিলে হয়ত ভয় পাইত।

হরেন্দ্র কহিল, তা হলে এটা বোধ হয় সিভিল বিবাহ-ই হ'লো?

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না—বিবাহ হ'লো শৈব-মতে।

অবিনাশ কহিলেন, অর্থাৎ ফাঁকির রাস্তাটুকু যেন দশদিক দিয়েই খোলা থাকে, না শিবনাথ?

শিবনাথ সহাস্যে কহিল, এটা ক্রোধের কথা অবিনাশবাবু! নইলে বাবা দাঁড়িয়ে থেকে যে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ত ফাঁক ছিল না, অথচ ফাঁকি যথেষ্ট ছিল। সেটা বার করার চোখ থাকা চাই।

অবিনাশ উত্তর দিতে পারিল না, শুধু সমস্ত মুখ তাঁহার ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল।

আশুবাবু নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইল! এ কি হইল!

মিনিট দুই-তিন কাহারও মুখে কথা নাই, নিরানন্দ ও কলহের অবরুদ্ধ বাতাসে ঘর ভরিয়া গেছে—বাহিরের একটা দমকা হাওয়া না পাইলেই নয়, ঠিক এমনি মনোভাব লইয়া অবিনাশবাবু অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, যাক, যাক, যাক—যাক, এ-সব কথা শিবনাথ, তা হলে সেই পাথরের কারবারটা করচ? না?

শিবনাথ বলিল, হাঁ।

তোমার বন্ধুর নাবালক ছেলে-মেয়েদের ব্যবস্থা ত তোমাকেই করতে হ'ল? তাদের মা আছেন, না? অবস্থা কেমন? তেমন ভাল নয় বোধ হয়?

না, খুব খারাপ।

অবিনাশ কহিলেন, আহা! হঠাৎ মারা গেলেন, আমরা ভেবেছিলাম টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন। কিন্তু তোমার বন্ধু ছিলেন বটে! অকৃত্রিম সুহৃদ!

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমরা পাঠশালা থেকে একসঙ্গে পড়েছিলাম।

অবিনাশ বলিলেন, তাই তোমার এতখানি সে-সময় তিনি করতে পেরেছিলেন। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, কিন্তু সে যাই হোক শিবনাথ, এখন একাকী তোমাকেই যখন সমস্ত কারবার দেখতে হবে একটা অংশের দাবী করলে না কেন? মাইনের মত—

শিবনাথ কথাটা শেষ করতে দিল না, কহিল, অংশ কিসের? কারবার ত একলা আমার।

প্রফেসারের দল যেন আকাশ হইতে পড়িল। অক্ষয় কহিলেন, পাথরের কারবারটা হঠাৎ আপনার হয়ে গেল কি-রকম শিবনাথবাবু?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া শুধু জবাব দিল, আমার বৈ কি!

অক্ষয় বলিলেন, কখ্খনো না। আমরা সবাই জানি যোগীনবাবুর।

শিবনাথ জবাব দিল, জানেন ত আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলেন না কেন? কোন ডকুমেণ্ট ছিল? শুনেছিলেন?

অবিনাশ চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, না শুনিনি কিছুই। কিন্তু এ কি আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল নাকি?

শিবনাথ কহিল, হাঁ। যোগীনের সম্বন্ধী নালিশ করেছিলেন। ডিক্রী আমিই পেয়েচি।

অবিনাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বেশ হয়েচে। তা হলে শেষ পর্য্যন্ত বিধবাদের দিতে কিছুই হ'ল না।

শিবনাথ বলিল, না। খালিম, চপ-টা খাসা রেঁধেচে হে! আর দু-একটা আন ত?

আশুবাবু অভিভূতের ন্যায় বসিয়া ছিলেন, চমকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, কই আপনারা ত কিছুই খাচ্ছেন না?

আহারের রুচি ও ক্ষুধা সকলেরই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, মনোরমা নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল, শিবনাথ ডাকিয়া কহিল, কি রকম! আমাদের খাওয়া শেষ না হতেই যে বড় চলে যাচ্ছেন?

মনোরমা এ-কথার উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না; ঘৃণায় তাহার সর্ব্বদেহ কাঁটা দিয়া উঠিল।

৩

উপরোক্ত ঘটনার পরে সপ্তাহকাল গত হইয়াছে। দিন-দুই হইতে অসময়ে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজও সকাল হইতে মাঝে মাঝে জল পড়িয়া মধ্যাহ্নে খানিকক্ষণ বন্ধ ছিল, কিন্তু মেঘ কাটে নাই। যে কোন সময়েই পুনরায় শুরু হইয়া যাইতে পারে, এমনি যখন আকাশের অবস্থা, মনোরমা ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পিতার ঘরে দেখা দিল। আশুবাবু মোটারকমের একটা বালাপোষ গায়ে দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে একখানা বই। মেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই বাবা, তুমি এখনও তৈরী হয়ে নাওনি, আজ যে আমাদের এতবারী খাঁর কবর দেখতে যাবার কথা।

কথা ত ছিল মা, কিন্তু আজ আমার সেই কোমরের বাতটা—.

তা হলে মোটরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে দি। কাল না হয় যাওয়া যাবে, কি বল বাবা?

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, না-না, না বেড়ালে তোর আবার মাথা ধরে। তুই না হয় একটু ঘুরে আয় গে মা, আমি ততক্ষণ এই মাসিক পত্রটায় চোখ বুলিয়ে নিই। গল্পটা লিখেচে ভাল।

আচ্ছা চললুম। কিন্তু ফিরতে আমার দেরি হবে না। এসে তোমার কাছে গল্পটা শুনব তা বলে যাচ্ছি, বলিয়াই সে একাকীই বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই মনোরমা বাড়ি ফিরিয়া পিতার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রশ্ন করিল, কেমন গল্প বাবা? শেষ হ'ল? কি লিখেচে?

কিন্তু কথা উচ্চারণ করিয়াই সে চমকিয়া দেখিল তাহার পিতা একা নহেন, সম্মুখে শিবনাথ বসিয়া।

শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, কতদূর বেড়িয়ে এলেন?

মনোরমা উত্তর দিল না, শুধু নমস্কারের পরিবর্ত্তে মাথাটা একটুখানি হেলাইয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে কহিল, পড়া শেষ হয়ে গেল বাবা? কেমন লাগল?

আশুবাবু শুধু বলিলেন, না।

কন্যা কহিল, তা হলে আমি নিয়ে যাই, পড়ে এখ্খুনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। বলিয়া সে কাগজখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিজের শয়ন-কক্ষে আসিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। তাহার কাপড়-ছাড়া, হাত-মুখ ধোয়া পড়িয়া

রহিল, কাগজ-খানা একবার খুলিয়াও দেখিল না, কোন গল্প, কে লিখিয়াছে কিংবা কেমন লিখিয়াছে।

এইভাবে বসিয়া সে যে কি ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই; এই সময়ে চাকরটাকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওরে, বাবার ঘর থেকে লোকটি চলে গেছে?

বেহারা বলিল; হাঁ।

কখন গেল?

বৃষ্টি পড়বার আগেই।

মনোরমা জানালার পর্দ্দা সরাইয়া দেখিল, কথা ঠিক, পুনরায় বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কিন্তু বেশী নয়। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্তে মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, রাত্রে মুষলধারায় বারি-পতনের সূচনা হইয়াছে। কাগজখানা হাতে করিয়া পিতার বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বইটা তাঁহার কেদারার হাতলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া কহিল, বাবা, তুমি জান এ-সব আমি ভালবাসিনে। এই বলিয়া সে পার্শ্বের চৌকিটায় বসিয়া পড়িল।

আশুবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি-সব মা?

মনোরমা বলিল, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেচ কি আমি বলচি। গুণীর আদর করতে আমিও কম জানিনে বাবা, কিন্তু তাই বলে শিবনাথবাবুর মত একজন দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র মাতালকে কি বলে আবার প্রশ্রয় দিচ্ছ?

আশুবাবু লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে যেন পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপর বহুসংখ্যক পুস্তক স্তূপীকৃত করিয়া রাখা ছিল, মনোরমা সময়াভাববশতঃ এখনো তাহাদের যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। সেইদিকে চক্ষু নির্দ্দেশ করিয়া শুধু কেবল বলিতে পারিলেন, ওই যে উনি—

মনোরমা সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, শিবনাথ টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া একখানা বই খুঁজিতেছে। বেহারা তাহাকে ভুল সংবাদ দিয়াছিল। মনোরমা লজ্জায় মাটির সহিত যেন মিশিয়া গেল। শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। শিবনাথ কহিল, বইটা খুঁজে পেলাম না, আশুবাবু। এখন তা হলে চললাম।

আশুবাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন, বাইরে বৃষ্টি পড়চে যে?

শিবনাথ কহিল, তা হোক। ও বেশি নয়। এই বলিয়া সে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি দৈবাৎ যা শুনে ফেলেচি সে আমার দুর্ভাগ্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে। সেজন্য

আপনি লজ্জিত হবেন না। ও আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। তবু এও আমি নিশ্চয় জানি, কথাগুলো আমার সম্বন্ধে বলা হলেও আমাকে শুনিয়ে বলেননি। অত নির্দ্দয় আপনি কিছুতে নন।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু আমার অন্য নালিশ আছে। সেদিন অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকের দল আমার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি যেন একটা মতলব নিয়ে এ-বাড়িতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করচি। সকল মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা এক নয়—এও একটা কথা, এবং বাইরে থেকে কোন একটা ঘটনা যা চোখে পড়ে, সেও তার সবটুকু নয়—এও আর একটা কথা। কিন্তু যাই হোক, আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করার কোন গূঢ় অভিসন্ধি সেদিনও আমার ছিল না, আজও নেই। সহসা আশুবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, আমার গান শুনতে আপনি ভালবাসেন, বাসা ত আমার বেশী দূরে নয়, যদি কোনদিন সে খেয়াল হয় পায়ের ধুলো দেবেন, আমি খুশীই হব। এই বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া শিবনাথ বাহির হইয়া গেল। পিতা বা কন্যা উভয়ের কেহই একটা কথারও জবাব দিতে পারিলেন না। আশুবাবুর বুকের মধ্যে অনেক কথাই একসঙ্গে ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু প্রকাশ পাইল না। বাহিরে বৃষ্টি তখন চাপিয়া পড়িতেছিল; এমন কথাও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, শিবনাথবাবু, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া যান।

ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা কি এখানেই তৈরী করে দেব বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, না, আমার জন্য নয়, শিবনাথ একটুখানি চা খাবেন বলেছিলেন।

মনোরমা ভৃত্যকে চা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। মনের চাঞ্চল্য-বশতঃ আশুবাবু কোমরে ব্যথা সত্ত্বেও চৌকি হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হঠাৎ জানালার কাছে থামিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ না? যেতে পারেনি, ভিজচে।

পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, সঙ্গে কে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। বাঙালী মেয়েদের মত কাপড়-পরা—ও বেচারা বোধ হয় যেন আরও ভিজেচে।

এই বলিয়া তিনি বেহারাকে ডাক দিয়া বলিলেন, যদু, দেখে আয় ত রে, গেটের কাছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজচে কে? যে-বাবুটি এইমাত্র গেলেন তিনিই কি না? কিন্তু দাঁড়া দাঁড়া—

কথা তাঁহার মাঝখানেই থামিয়া গেল, অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল, মেয়েটি শিবনাথের স্ত্রী নহে ত?

মনোরমা কহিল, দাঁড়াবে কেন বাবা, গিয়ে শিবনাথবাবুকে ডেকেই আনুক না। এই বলিয়া সে উঠিয়া খোলা জানালার ধারে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি চা খেতে চেয়েছিলেন জানলে আমি কিছুতেই যেতে দিতুম না।

মেয়ের কথার উত্তরে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, তা বটে মণি, কিন্তু আমার ভয় হচ্চে ঐ স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ওঁর সেই স্ত্রী। সাহস করে এ-বাড়িতে আনতে পারেননি। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

কথা শুনিয়া মনোরমার নিশ্চয় মনে হইল এ সে-ই। একবার তাহার দ্বিধা জাগিল, এ-বাটীতে উহাকে কোন অজুহাতেই আহ্বান করিয়া আনা চলে কি না, কিন্তু পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া এ সঙ্কোচ সে ত্যাগ করিল। বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, যদু ওঁদের দু'জনকেই তুমি ডেকে নিয়ে এস। শিবনাথবাবু যদি জিজ্ঞেসা করেন, কে ডাকচে, আমার নাম ক'রো।

বেহারা চলিয়া গেল। আশুবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মণি, কাজটা হয়ত ঠিক হ'ল্ না।

কেন বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, শিবনাথ যাই হোক, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক—তার কথা আলাদা। কিন্তু সেই সূত্র ধরে কি এই মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় করা চলে? জাতের উঁচু-নীচু আমরা হয়ত তেমন মানিনে, কিন্তু বিভেদ ত একটা কিছুই আছেই। ঝি-চাকরের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা যায় না মা।

মনোরমা কহিল, বন্ধুত্ব করার ত প্রয়োজন নেই বাবা। বিপদের মুখে পথের পথিককেও ঘণ্টা-কয়েকের জন্য আশ্রয় দেওয়া যায়। আমরা তাই শুধু করব।

আশুবাবুর মন হইতে দ্বিধা ঘুচিল না। বার-কয়েক মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, ঠিক তাই নয়। মেয়েটি এসে পড়লে ওর সঙ্গে যে তুমি কি ব্যবহার করবে আমি তাই শুধু ভেবে পাচ্ছিনে।

মনোরমা কহিল, আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই বাবা?

আশুবাবু একটুখানি শুষ্ক হাস্য করিলেন, বলিলেন, তা আছে। তবুও জিনিসটা ঠিক ঠাউরে পাচ্ছিনে। তোমরা যাঁরা সম-শ্রেণীর লোক তাঁদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় সে তুমি জান। কম মেয়েই এতখানি জানে। দাসী-চাকরের প্রতি আচরণও তোমার নির্দ্দোষ, কিন্তু এ হ'ল—কি জান মা, শিবনাথ মানুষটিকে আমি স্নেহ করি, আমি তার গুণের অনুরাগী - দৈব-বিড়ম্বনায় আজ অকারণে সে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে গেছে, আবার ঘরে ডেকে এনে তাঁকে ব্যথা দিতে আমি চাইনে।

মনোরমা বুঝিল এ তাহারই প্রতি অনুযোগ, কহিল, আচ্ছা, বাবা, তাই হবে।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, হওয়াটাই কি সহজ মা? কারণ, কি যে হওয়া

উচিত সে ধারণা আমারও বেশ স্পষ্ট জানা নেই, কেবল এই কথাটাই মনে হচ্ছে, শিবনাথ যেন না আমাদের গৃহে দুঃখ পায়।

মনোরমা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ চকিত হইয়া কহিল, এই যে এঁরা আসচেন।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বাইরে আসিলেন—বেশ যা হোক শিবনাথবাবু, ভিজে যে একেবারে—

শিবনাথ কহিলেন, হাঁ, হঠাৎ জলটা একেবারে চেপে এল, তা আমার চেয়ে ইনিই ভিজেচেন ঢের বেশি। এই বলিয়া সঙ্গের মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়েটি যে কে এ পরিচয় তিনিও স্পষ্ট করিয়া দিলেন না, ইহারাও সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বস্তুতঃ মেয়েটির সমস্ত দেহে শুষ্ক বলিয়া আর কোন কিছু ছিল না। জামা-কাপড় ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে, মাথার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি হইতে জল-ধারা গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে—পিতা ও কন্যা এই নবাগতা রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু নিজে কবি নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমেই মনে হইল এই নারী-রূপকেই বোধ হয় পূর্ব্বকালের কবিরা শিশির-ধোয়া পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন এবং জগতে এত বড় সত্য তুলনাও হয়ত আর নাই। সেদিন অক্ষয়ের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ উত্যক্ত হইয়া যে জবাব দিয়াছিলেন, তিনি লেখা-পড়া জানার জন্য বিবাহ করেন নাই, করিয়াছেন রূপের জন্য, কথাটা যে কি পরিমাণে সত্য তখন তাহাতে কেহ কোন কান দেয় নাই, এখন স্তব্ধ হইয়া আশুবাবু শিবনাথের সেই কথাটাই বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, বাস্তবিক, জীবন-যাত্রার প্রণালী ইহাদের ভদ্র ও নীতি-সম্মত নাই হোক, পতী-পত্নী সম্বন্ধের পবিত্রতা ইহাদের মধ্যে না-ই থাকুক, কিন্তু এই নশ্বর জগতে তেমনি নশ্বর এই দুটি নর-নারীর দেহ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কি অবিনশ্বর সত্যই না ফুটিয়াছে। আর পরমাশ্চর্য্য এই, যেদেশে রূপ বাছিয়া লইবার কোন বিশিষ্ট পন্থা নাই, যেদেশে নিজের চক্ষুকে রুদ্ধ রাখিয়া অপরের চক্ষুকেই নির্ভর করিতে হয়, সে অন্ধকারে ইহারা পরস্পরের সংবাদ পাইল কি করিয়া? কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতে তাঁহার মুহূর্ত্তকালের অধিক সময় লাগিল না। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, শিবনাথবাবু, ভিজে কাপড়-জামাটা ছেড়ে ফেলুন। যদু, আমার বাথরুমে বাবুকে নিয়ে যা।

বেহারার সঙ্গে শিবনাথ চলিয়া গেল, বিপদে পড়িল এইবার মনোরমা। মেয়েটি তাহার প্রায় সমবয়সী এবং সিক্ত-বস্ত্র পরিবর্ত্তনের ইহারও অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আভিজাত্যের যে পরিচয় সেদিন শিবনাথের নিজের মুখে শুনিয়াছে তাহাতে কি

বলিয়া যে ইহাকে সম্বোধন করিবে ভাবিয়া পাইল না। রূপ ইহার যত বড়ই হোক, শিক্ষাসংস্কারহীন নীচ-জাতীয়া এই দাসী কন্যাটিকে এস বলিয়া ডাকিতেও পিতার সমক্ষে তাহার বাধ বাধ ঠেকিল, আসুন বলিয়া সসম্মানে আহ্বান করিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেও তাহার তেমনি ঘৃণা বোধ হইল। কিন্তু সহসা এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল মেয়েটি নিজে। মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, আমারও সমস্ত ভিজে গেছে, আমাকেও একখানা কাপড় আনিয়ে দিতে হবে।

দিচ্ছি। বলিয়া মনোরমা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল এবং ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে ইহাকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত দিতে।

মেয়েটি মনোরমার আপাদ-মস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আমাকে একখানা ফর্সা ধোপার বাড়ির কাপড় দিতে বলে দিন।

মনোরমা কহিল, তাই দেবে।

মেয়েটি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, ও ঘরে সাবান আছে ত?

ঝি কহিল, আছে।

আমি কিন্তু কারো মাথা-সাবান গায়ে মাখিনে ঝি।

এই অপরিচিত মেয়েটির মন্তব্য শুনিয়া ঝি প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে কহিল, সেখানে একবাক্স নতুন সাবান আছে। কিন্তু শুনচেন, দিদিমণির স্নানের ঘর! তাঁর সাবান ব্যবহার করলে দোষ কি?

মেয়েটি ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না, সে আমি পারিনে, আমার ভারি ঘৃণা করে। তা ছাড়া যার-তার গায়ের সাবান গায়ে দিলে ব্যামো হয়।

মনোরমার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই নির্মল হাসির ছটায় তাহার দুই চক্ষু ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর হইতে যেন একটা মেঘ কাটিয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা তুমি শিখলে কার কাছে?

মেয়েটি বলিল, কার কাছে শিখব? আমি নিজেই সব জানি।

মনোরমা কহিল, সত্যি? তা হলে দিয়ো ত আমাদের এই ঝিকে কতকগুলো ভাল কথা শিখিয়ে। ওটা একেবারে নেহাৎ মুখ্যু। বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল।

ঝিও হাসিল, কহিল, চল ঠাকুরুণ, সাবান-টাবান মেখে আগে তৈরী হয়ে নাও, তার পর তোমার কাছে বসে অনেক ভাল ভাল কথা শিখে নেব! দিদিমণি, কে ইনি?

মনোরমা হাসি চাপিতে অন্যদিকে মুখ না ফিরাইলে, হয়ত সে এই অপরিচিত অশিক্ষিত মেয়েটির মুখের পরে কৌতুক ও প্রচ্ছন্ন উপহাসের আভাস লক্ষ্য করিত।

৪

মনোরমা আশুবাবুর শুধু কন্যাই নয়; তাঁহার সঙ্গী, সাথী, মন্ত্রী, বন্ধু—একাধারে সমস্তই ছিল এই মেয়েটি। তাই পিতার মর্য্যাদা রক্ষার্থে যে সসঙ্কোচ দূরত্ব সন্তানের অবশ্য পালনীয় বলিয়া বাঙালী সমাজে চলিয়া আসিতেছে, অধিকাংশ স্থলেই তাহা রক্ষিত হইয়া উঠিত না। মাঝে মাঝে এমন সব আলোচনাও উভয়ের মধ্যে উঠিয়া পড়িত যাহা অনেক পিতার কানেই অত্যন্ত অসঙ্গত ঠেকিবে, কিন্তু ইহাদের ঠেকিত না। মেয়েকে আশুবাবু যে কত ভালবাসিতেন তাহার সীমা ছিল না; স্ত্রী বিয়োগের পর আর যে বিবাহের প্রস্তাব মনে ঠাঁই দিতেও পারেন নাই হয়ত তাহারও একটি কারণ এই মেয়েটি। অথচ বন্ধুমহলে কথা উঠিলে নিজের সাড়ে তিন মন ওজনের দেহ ও সেই দেহ বাতে পঙ্গুত্ব-প্রাপ্তির অজুহাত দিয়া সখেদে কহিতেন, আর কেন আবার একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করা ভাই, যে দুঃখ মাথায় নিয়ে মণির মা স্বর্গে গেছেন সে ত জানি, সে-ই আশু বদ্যির যথেষ্ট।

মনোরমা এ-কথা শুনিলে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিত, বাবা, তোমার এ-কথা আমার সয় না। এখানে তাজমহল দেখে লোকের কত-কি মনে হয়, আমার মনে হয় শুধু তোমাকে আর মাকে। আমার মা গেছেন স্বর্গে দুঃখ সয়ে?

আশুবাবু বলিতেন, তুই ত তখন সবে দশ-বার বছরের মেয়ে, জানিস্ ত সব। কার গলায় যে কিসের মালা পরার গল্প আছে সে কেবল আমিই জানি রে মণি, আমিই জানি। বলিতে বলিতে তাঁহার দু'চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিত।

আগ্রায় আসিয়া তিনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা হৃদ্যতা জন্মেছিল অবিনাশবাবুর সহিত। অবিনাশ সহিষ্ণু ও সংযত প্রকৃতির মানুষ। তাহার চিত্তের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক শান্তি ও প্রসন্নতা ছিল যে সে সহজেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু আশুবাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন আরও একটা কারণে। তাঁহারই মত সে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করে নাই এবং পত্নী-প্রেমের নিদর্শনস্বরূপে গৃহের সর্ব্বত্র মৃত স্ত্রীর ছবি রাখিয়াছিল। আশুবাবু তাহাকে বলিতেন, অবিনাশবাবু, লোকে আমাদের প্রশংসা করে, ভাবে আমাদের কি আত্মসংযম, যেন কত বড় কঠিন কাজই না আমরা করেচি। অথচ আমি ভাবি এ প্রশ্ন ওঠে কি করে? যারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তারা পারে বলেই করে। তাদের দোষ দিইনে, ছোটও মনে করিনে। শুধু ভাবি আমি পারিনে। শুধু জানি, মণির মায়ের জায়গায় আর একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে

কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব। কিন্তু এ-খবর কি তারা জানে? জানে না। এই না অবিনাশবাবু? নিজের মনটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন দিকি ঠিক কথাটি বলচি কি না?

অবিনাশ হাসিত, বলিত, আমি কিন্তু জোটাতে পারিনি আশুবাবু। মাস্টারি করে খাই, সময়ও পাইনে, বয়সও হয়েচে, মেয়ে দেবে কে?

আশুবাবু খুশী হইয়া কহিতেন, ঠিক তাই অবিনাশবাবু, ঠিক তাই। আমিও সকলকে বলে বেড়িয়েচি, দেহের ওজন সাড়ে তিন মন, বাতে পঙ্গু, কখন্ চলতে চলতে হার্ট ফেল করে তার ঠিকানা নেই, মেয়ে দেবে কে? কিন্তু জানি, মেয়ে দেবার লোকের অভাব নেই, কেবল নেবার মানুষটাই মরেচে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— মরেচে অবিনাশ, মরেচে আশু বদ্যি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এই বলিয়া সুউচ্চ হাসির শব্দে ঘরের দ্বার জানালা খড়খড়ি শার্শি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিলেন।

প্রত্যহ বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া আশুবাবু অবিনাশের বাটীর সম্মুখে নামিয়া পড়িতেন, বলিতেন, মণি, সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর লাগাবো না মা, তুমি বরঞ্চ ফেরবার মুখে আমাকে তুলে নিয়ো।

মনোরমা সহাস্যে কহিত, ঠাণ্ডা কোথায় বাবা, হাওয়াটা যে আজ বেশ গরম ঠেকচে!

বাবা বলিতেন, সেও ত ভাল নয় মা, বুড়োদের স্বাস্থ্যের পক্ষে গরম বাতাসটা হানিকর। তুমি একটু ঘুরে এস, আমরা দুই বুড়োতে মিলে ততক্ষণ দুটো কথা কই।

মনোরমা হাসিয়া বলিত, কথা তোমরা দুটোর জায়গায় দুশোটা বল আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের কেউ এখনো বুড়ো হওনি তা মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বলিয়া সে চলিয়া যাইত।

বাতের জন্য যেদিন একটুও আশুবাবু পারিয়া উঠিতেন না সেদিন অবিনাশকে যাইতে হইত। গাড়ি পাঠাইয়া, লোক পাঠাইয়া, চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া, যেমন করিয়াই হোক, আশু বদ্যির নির্ব্বন্ধাতিশয় তাঁহার এড়াইবার জো ছিল না। উভয়ে একত্র হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শিবনাথের কথাটাও প্রায় উঠিত। সেই যে তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সবাই মিলিয়া অপমান করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল, ইহার বেদনা আশুবাবুর মন হইতে ঘুচে নাই। শিবনাথ পণ্ডিত, শিবনাথ গুণী, তাহার সর্ব্বদেহ যৌবনে, স্বাস্থ্যে ও রূপে পরিপূর্ণ—এ-সকল কি কিছুই নয়? তবে কিসের জন্য এত সম্পদ তাহাকে দুই হাত ভরিয়া দান করিয়াছেন? সে কি মানুষের সমাজ হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার জন্য? মাতাল হইয়াছে? তা কি হইয়াছে? মদ খাইয়া মাতাল এমন ত কত লোকেই হয়। যৌবনে এ অপরাধ তিনি নিজেও ত করিয়াছেন, তাই বলিয়া কে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে? মানুষের

ক্রটি, মানুষের অপরাধ গ্রহণ করার অপেক্ষা মার্জ্জনা করিবার দিকেই হৃদয়ের অত্যধিক প্রবণতা ছিল বলিয়া তিনি নিজের সঙ্গে এবং অবিনাশের সঙ্গে এই বলিয়া প্রায়ই তর্ক করিতেন। প্রকাশ্যে তাহাকে আর বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিতেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার শিবনাথের সঙ্গ নিরন্তর কামনা করিয়া ফিরিত। কেবল একটা কথার তিনি কিছুতেই জবাব দিতে পারিতেন না, অবিনাশ যখন কহিত, এই যে পীড়িত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক গ্রহণ করা, এটা কি?

আশুবাবু লজ্জিত হইয়া কহিতেন, তাই ত ভাবি শিবনাথের মত লোকে এ-কাজ করলে কি করে? কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত ভিতরে কি একটা রহস্য আছে—হয়ত—কিন্তু সবাই কি সব কথা সকলের কাছে বলতে পারে, না বলা উচিত?

অবিনাশ কহিত, কিন্তু তার স্ত্রী যে নির্দোষ এ-কথা ত নিজের মুখেই স্বীকার করেচে?

আশুবাবু পরাস্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, তা করেচে বটে!

অবিনাশ বলিত, আর এই যে মৃত বন্ধুর বিধবাকে সমস্ত ফাঁকি দেওয়া, সমস্ত ব্যবসাটাকে নিজের বলে দখল করা এটাই বা কি?

আশুবাবু লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। যেন তিনি নিজে এ দুষ্কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পরে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিতেন, কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত কি একটা রহস্য—আচ্ছা, আদালতই বা তাঁকে ডিক্রী দিলে কি করে? তারা কিছুই বিচার করে দেখেনি?

অবিনাশ কহিত, ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশুবাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল কবে জয়ী হয়েছে আমাকে বলতে পারেন?

আশুবাবু কহিতেন, না না, সে-কথা ঠিক নয়, সে কথা ঠিক নয়, তবে আপনার কথাও যে অসত্য তাও বলতে পারিনে। কিন্তু কি জানেন—

মনোরমা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে হাসিয়া বলিত, জানেন সবাই। বাবা, তুমি নিজেই মনে মনে জান অবিনাশবাবু মিছে তর্ক করচেন না।

ইহার পরে আশুবাবুর মুখে আর কথা জোগাইত না।

শিবনাথের সম্বন্ধে মনোরমার বিমুখতাই ছিল যেন সবচেয়ে বেশি! মুখে সে বিশেষ কিছু বলিত না, কিন্তু পিতা কন্যাকে ভয় করিতেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যেদিন সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী জলে ভিজিয়া এ-বাড়িতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার দিন-দুই পর্য্যন্ত আশুবাবু বাতের প্রকোপে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে নড়িতে পারেন নাই, অবিনাশও কাজের

তাড়ায় আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। কিন্তু আসিবামাত্রই আশুবাবু বাতের ভীষণ যাতনা ভুলিয়া আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, ওহে অবিনাশবাবু, শিবনাথের স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন রূপ কখনো দেখিনি! মনে হ'ল এদের দু'জনকে ভগবান কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিয়েচেন।

বলেন কি?

হাঁ তাই। দুজনকে পাশাপাশি রাখলে চেয়ে থাকতে হবে। চোখ ফেরাতে পারবেন না, তা বলে রাখলাম্ অবিনাশবাবু।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন প্রশংসা শুরু করেন তখন তার আর মাত্রা থাকে না।

আশুবাবু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ও দোষ আমার আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারলে এ-ক্ষেত্রেও যেতাম, কিন্তু শক্তি নেই। যাই কেন না এঁর সম্বন্ধে বলি মাত্রার বাঁ দিকেই থাকবে, ডান দিকে পৌঁছবে না।

অবিনাশ সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু পূর্ব্বের পরিহাসের ভঙ্গিও আর রহিল না। বলিলেন, সেদিন শিবনাথ তা' হলে অকারণ দম্ভ করেনি বলুন? পরিচয় হ'ল কি করে?

আশুবাবু বলিলেন, নিতান্তই দৈবের ঘটনা। শিবনাথের প্রয়োজন ছিল আমার কাছে। স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু বাড়িতে আনতে সাহস করেননি, বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বিধি বক্র হলে মানুষের কৌশল খাটে না, অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হয়ে পড়ে। হলও তাই। এই বলিয়া তিনি সেদিনের ঝড়-বাদলের ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, আমাদের মণি কিন্তু খুশী হতে পারেনি। ওরই সমবয়সী, হয়ত কিছু বড় হতেও পারে, কিন্তু মণি বলে, শিবনাথবাবু সেদিন সত্য কথাই বলেছিলেন, মেয়েটি যথার্থ-ই অশিক্ষিত কোন এক দাসী-কন্যা। অন্ততঃ সে যে আমাদের ভদ্র-সমাজের নয়, তাতে তার সন্দেহ নাই।

অবিনাশ কৌতুহলী হইয়া উঠিলেন, কি করে বোঝা গেল?

আশুবাবু বলিলেন, মেয়েটি নাকি ভিজে কাপড়ের পরিবর্ত্তে একখানি ফর্সা কাপড় চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনি কারও ব্যবহার-করা সাবান ব্যবহার করতে পারেন না, ঘৃণা বোধ হয়।

অবিনাশ বুঝিতে পারিলেন না ইহার মধ্যে ভদ্র-সমাজের বহির্ভূত প্রার্থনা কি আছে।

আশুবাবুও ঠিক তাহাই কহিলেন, বলিলেন, এর মধ্যে অসঙ্গত যে কি আছে

আমি আজও ভেবে পাইনি। কিন্তু মণি বলে, কথার মধ্যে নয় বাবা, সেই বলার ভঙ্গির মধ্যে যে কি ছিল সে কানে না শুনলে বোঝা যায় না। তা ছাড়া, মেয়েদের চোখ-কানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমাদের ঝিটির পর্য্যন্ত বুঝতে নাকি বাকী ছিল না যে, মেয়েটি তাদেরই একজন, তার মনিবদের কেউ নয়। খুব নীচু থেকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে দিলে যা হয়, এরও হয়েচে ঠিক তাই।

অবিনাশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দুঃখের কথা। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কিভাবে? আপনার সঙ্গে কি কথা কইলে না-কি?

আশুবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। ভিজে কাপড় ছেড়ে সোজা আমার ঘরে এসে বসলেন। কুণ্ঠার বালাই নেই, আমার স্বাস্থ্য কেমন, কি খাই, কি চিকিৎসা চলচে, জায়গাটা ভাল লাগচে কি না—প্রশ্ন করবার কি সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব। বরঞ্চ শিবনাথ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর ত জড়তার চিহ্নমাত্র দেখলাম না। না কথায়, না আচরণে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা তখন বুঝি ছিলেন না।

না। তার কি যে অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে তা বলবার নয়। তারা চলে গেলে বললাম, মণি, ওঁদের বিদায় দিতেও একবার এলে না? মণি বললে, আর যা বল বাবা পারি, কিন্তু বাড়ির দাসী-চাকরকে বসুন বলে অভ্যর্থনা করতেও পারব না, আসুন বলে বিদায় দিতেও পারব না। নিজের বাড়িতে হলেও না। এর পরে আর বলবার আছে কি!

বলিবার কি আছে অবিনাশ নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না, শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, বলা কঠিন আশুবাবু। কিন্তু মনে হয় যেন মনোরমা ঠিক কথাই বলেচেন। এই সব স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের আলাপ পরিচয় না থাকাই ভাল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অবিনাশ বলিতে লাগিলেন, শিবনাথের সঙ্কোচের কারণও বোধ করি এই। সে ত জানে সবই, তার ভয় ছিল পাছে কোন বিশ্রী কদর্য্য বাক্য তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়।

আশুবাবু হাসিলেন, হতেও পারে।

অবিনাশ কহিলেন, নিশ্চয় এই।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন না, শুধু কহিলেন, মেয়েটি কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমা। এই বলিয়া ছোট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া শুইলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অবিনাশ কহিলেন, আমার কথায় কি আপনি ক্ষুণ্ণ হলেন?

আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন না, তেমনি অর্দ্ধশায়িতভাবে থাকিয়াই ধীরে ধীরে

বলিলেন, ক্ষুণ্ণ নয় অবিনাশবাবু, কিন্তু কেমন একটা ব্যথার মত লেগেচে। তাই ত আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এমন ছটফট করছিলাম। কি মিষ্টি কথা মেয়েটির—শুধু রূপই নয়।

অবিনাশ সহাস্যে উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি ত তাঁর রূপও দেখিনি, কথাও শুনিনি আশুবাবু!

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে সুযোগ যদি কখনো হয় ত তাদের ত্যাগ করার অবিচারটা বুঝবেন। আর কেউ না বুঝুক আপনি বুঝতে পারবেন এ আমি নিশ্চয় জানি। যাবার সময় মেয়েটি আমাকে বললে, আপনি আমার স্বামীর গান শুনতে ভালবাসেন, কেন তাকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান না? আমি যে কেউ আছি এ-কথা না-ই বা মনে করলেন। আমি ত আপনাদের মধ্যে আসবার দাবী করিনে।

অবিনাশ কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন, এ ত খুব অশিক্ষিতের মত কথা নয় আশুবাবু? শুনলে মনে হয় তার নিজের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই আমরা করি, স্বামীটিকে সে ভদ্র-সমাজে চালিয়ে দিতে চায়।

আশুবাবু বলিলেন, বস্তুতঃ তার কথা শুনে মনে হ'ল সে সব জানে। আমরা যে সেদিন তার স্বামীকে অপমান করে বিদায় করেছিলাম এ ঘটনা শিবনাথ তার কাছে গোপন করেনি। খুব গোপন করে চলবার লোকও শিবনাথ নয়।

অবিনাশ স্বীকার করিয়া কহিলেন, স্বভাবতঃ সে তাই বটে! কিন্তু একটা জিনিস সে নিশ্চয়ই গোপন করেচে। এই মেয়েটি যেই হোক একে ত সত্যিই বিবাহ করেনি।

আশুবাবু কহিলেন, শিবনাথ বলেন, মেয়েটি তার স্ত্রী, মেয়েটি পরিচয় দিলেন তাকে স্বামী বলে।

অবিনাশ কহিলেন, দিন পরিচয়। কিন্তু এ সত্য নয়। এর মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে, অক্ষয়বাবু সন্ধান নিয়ে একদিন তা উদ্ঘাটিত করবেনই করবেন।

আশুবাবু বলিলেন, তাতে আমারও সন্দেহ নেই, কারণ অক্ষয়বাবু শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু এদের পরস্পরের স্বীকারোক্তির মধ্যে সত্য নেই, সত্য আছে যে রহস্য গোপনে আছে তাকেই বিশ্বের সুমুখে অনাবৃত করায়। অবিনাশবাবু, আপনি ত অক্ষয় নন, এ ত আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করিনে।

অবিনাশ লজ্জা পাইয়াও কহিলেন, কিন্তু সমাজ ত আছে। তার কল্যাণের জন্য ত—

কিন্তু বক্তব্য তাঁর শেষ হইতে পাইল না, পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া মনোরমা প্রবেশ করিল। অবিনাশকে নমস্কার করিয়া কহিল, বাবা, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, তুমি বোধ হয় বার হতে পারবে না?

না মা, তুমি যাও।

অবিনাশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমারও কাজ আছে। বাজারের কাছে একবার নামিয়ে দিতে পারবে না মনোরমা?

নিশ্চয় পারব, চলুন।

যাইবার সময় অবিনাশ বলিয়া গেলেন যে অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কালই দিল্লী যাইতে হইবে এবং বোধ হয় এক সপ্তাহের পূর্ব্বে আর ফিরিতে পারিবেন না।

৫

দিন-দশেক পরে অবিনাশ দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বছর-দশেকের ছেলে জগৎ আসিয়া হাতে একখানি ছোট পত্র দিল। মাত্র একটি ছত্র লেখা—বৈকালে নিশ্চয় আসবেন।—আশু বদ্যি।

জগতের বিধবা মাসি দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় মুখখানি বাহির করিয়া কহিল, আশু বদ্যিরা কি রাস্তায় চোখ পেতে বসেছিল না কি—আসতে না আসতেই জরুরি তলব পাঠিয়েচে, যেতে হবে?

অবিনাশ কহিলেন, বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন না ছাই। তারা কি মুখুয্যেমশাইকে গিলে খেতে চায় নাকি?

অবিনাশ তাঁহার ছোট শালিকে আদর করিয়া কখনো ছোটগিন্নী, কখনো বা তাহার নাম নীলিমা বলিয়া ডাকিতেন। হাসিয়া বলিলেন, ছোটগিন্নী, অমৃত ফল অনাদরে গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখলে বাইরের লোকের একটু লোভ হয় বই কি?

নীলিমা হাসিল, কহিল, তা হলে সেটা যে মাকাল ফল, অমৃত ফল নয়, তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

অবিনাশ বলিলেন, দিয়ো। কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে না—লোভ আরও বেড়ে যাবে। হাত বাড়াতে ছাড়বে না।

নীলিমা বলিল, তাতে লাভ হবে না মুখুয্যেমশাই। নাগালের বাইরে এবার শক্ত করে বেড়া বাঁধিয়ে রাখবো। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া পর্দ্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অবিনাশ আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন পৌঁছিলেন তখনও বেলা আছে। গৃহস্বামী অত্যন্ত সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে কহিলেন, আপনি অধার্ম্মিক। বিদেশে বন্ধুকে ফেলে রেখে দশদিন অনুপস্থিত—ইতিমধ্যে অধীনের দশ দশা সমুপস্থিত।

অবিনাশ চমকিয়া কহিলেন, একবারে দশ দশটা দশা? প্রথমটা বলুন?

বলি। প্রথম দশায় ঠ্যাং দুটো শুধু তাজা হয়েচে তাই নয়, অতি দ্রুতবেগে নীচে হতে উপর এবং উপর হতে নীচে গমনাগমন শুরু করেছে।

অত্যন্ত ভয়ের কথা। দ্বিতীয়টা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় এই যে, আজ কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুস্থানী নারীকুল যমুনা-কূলে সমবেত হয়েচেন এবং হরেন্দ্র-অক্ষয় প্রভৃতি পণ্ডিত-সমাজ নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার-চিত্তে তথায় এইমাত্র অভিযান-করেচেন।

ভাল কথা। তৃতীয় দশা বিবৃত করুন।

দর্শনেচ্ছু আশু 'বদ্যি অতি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অবিনাশের অপেক্ষা করচেন, প্রার্থনা, তিনি যেন অস্বীকার না করেন।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এবার চতুর্থ দশার বিবরণ দিন।

আশুবাবু বলিলেন, এইটে একটু গুরুতর। বাবাজী বিলাত থেকে ভারতে পদার্পন করে প্রথমে কাশী এবং পরে এই আগ্রায় এসে পরশু উপস্থিত হয়েচেন। সম্প্রতি মোটরের কল বিগড়েচে, বাবাজী স্বয়ং মেরামত-কার্য্যে নিযুক্ত। মেরামত সমাপ্তপ্রায় এবং তিনি এলেন বলে। অভিলাষ, প্রথম জ্যোৎস্নায় সবাই একসঙ্গে মিলে আজ তাজমহল নিরীক্ষণ করা।

অবিনাশের হাসিমুখ গম্ভীর হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাবাজীটি কে আশুবাবু? এঁর কথাই কি একদিন বলতে গিয়ে হঠাৎ চেপে গিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। কিন্তু আজ আর বলতে অন্ততঃ আপনাকে বাধা নেই। অজিতকুমার আমার ভাবী জামাই, মণির বর। এই দুজনের ভালবাসা পৃথিবীর একটা অপূর্ব্ব বস্তু। ছেলেটি রত্ন।

অবিনাশ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন; আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের নই, হিন্দু। সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম হিন্দুমতেই হয়। যথাসময়ে, অর্থাৎ বছর-চারেক পূর্ব্বেই এদের বিবাহ হয়ে যাবার কথা ছিল, হ'তোও তাই, কিন্তু হ'ল না। যেমন করে এদের পরিচয় ঘটে, সেও এক বিচিত্র ব্যাপার—বিধিলিপি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্।

অবিনাশ তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; আশুবাবু বলিলেন, মণির গায়ে-হলুদ হয়ে

গেল, রাত্রির গাড়িতে কাশী থেকে ছোটখুড়ো এসে উপস্থিত হলেন। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি বাড়ির কর্ত্তা, ছেলে-পুলে নেই, খুড়িমাকে নিয়ে বহুদিন যাবৎ কাশীবাসী। জ্যোতিষে অখণ্ড বিশ্বাস, এসে বললেন, এ বিবাহ এখন হতেই পারে না। তিনি নিজে এবং অন্যান্য পণ্ডিতকে দিয়ে নির্ভুল গণনা করিয়ে দেখেছেন যে, এখন বিবাহ হলে তিন বৎসর তিন মাসের মধ্যেই মণি বিধবা হবে।

একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল, সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু খুড়োকে আমি চিনতাম, বুঝলাম এর আর নড়চড় নেই। অজিত নিজেও মস্ত বড় লোকের ছেলে, তার এক বিধবা খুড়ি ছাড়া সংসারে কেউ ছিল না, তিনি ভয়ানক রাগ করলেন, অজিত দুঃখে অভিমানে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ার নাম করে বিলেত চলে গেল, সবাই জানলে এ-বিবাহ চিরকালের মতই ভেঙে গেল।

অবিনাশ নিরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পরে?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই হতাশ হলাম, হ'ল না শুধু মণি নিজে। আমাকে এসে বললে, বাবা, এমন কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটেচে যার জন্যে তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলে? তিন বছর এমনই কি বেশি সময়?

তার যে কি ব্যথা লেগেছিল সে ত জানি। বললাম, মা, তোর কথাই যেন সার্থক হয়, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে তিন বছর কেন, তিনটে দিনের বাধাও যে মারাত্মক।

মণি হেসে বললে, তোমার ভয় নেই বাবা, তাঁকে চিনি।

অজিত চিরদিনই একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, ভগবানে তার অচল বিশ্বাস, যাবার সময় মণিকে ছোট একখানি চিঠি লিখে চলে গেল। এই চার বৎসরের মধ্যে আর কোনদিন সে দ্বিতীয় পত্র লেখেনি। না লিখুক, কিন্তু মনে মনে মণি সমস্তই জানতো এবং তখন থেকে সেই যে ব্রহ্মচারিণী জীবন গ্রহণ করলে একটা দিনের জন্যও তা থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার জো নেই অবিনাশবাবু।

অবিনাশ শ্রদ্ধায় বিগলিত-চিত্তে কহিলেন, বাস্তবিকই বোঝবার জো নেই। কিন্তু আমি আশীর্ব্বাদ করি, ওরা জীবনে যেন সুখী হয়।

আশুবাবু কন্যার হইয়াই যেন মাথা অবনত করিলেন, কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবে না। অজিত সর্ব্বাগ্রেই খুড়োমশায়ের কাছে গিয়েছিল। তিনি অনুমতি দিয়েচেন। না হলে এখানে বোধ করি সে আসতো না।

অতঃপর উভয়েই ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, অজিত বিলেত চলে গেল, বছর-দুই পর্য্যন্ত তার কোন সংবাদ না পেয়ে আমি ভিতরে ভিতরে পাত্রের সন্ধান যে করিনি তা নয়। কিন্তু মণি জানতে পেরে আমাকে নিষেধ করে দিয়ে বললে, বাবা, এ চেষ্টা তুমি ক'রো না। আমাকে তুমি প্রকাশ্যেই সম্প্রদান

কখনি, কিন্তু মনে মনে ত করেছিলে। আমি বললাম, এমন কত ক্ষেত্রেই ত হয় মা। কিন্তু মেয়ের দু'চক্ষে যেন জল ভরে এলো। বললে, হয় না বাবা। শুধু কথা-বার্ত্তাই হয়, কিন্তু তার বেশ—না বাবা, আমার অদৃষ্টে ভগবান যা লিখেছেন তাই যেন সইতে পারি, আমাকে আর কোন আদেশ তুমি ক'রো না। দু'জনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, মুছে ফেলে বললাম, অপরাধ করেচি মা, তোর অবুঝ বুড়ো ছেলেকে তুমি ক্ষমা কর।

অকস্মাৎ পূর্ব্ব-স্মৃতির আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অবিনাশ নিজেও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, আশুবাবু, কত ভুলই না আমরা সংসারে করি এবং কত অন্যায় ধারণা না জীবনে আমরা পোষণ করি।

আশুবাবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন, কিসের?

এই যেমন আমরা অনেকেই মনে করি, মেয়েরা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে মেমসাহেব বনে যায়, হিন্দুর প্রাচীন মধুর সংস্কার আর তার হৃদয়ে স্থান পায় না। কত বড় ভ্রম বলুন ত?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভ্রম অনেক স্থলেই হয় বটে। কিন্তু জানেন অবিনাশবাবু, শিক্ষাই বা কি, আর অশিক্ষাই বা কি, আসল বস্তু পাওয়া। এই পাওয়া না-পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। নইলে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করলেই গোল বাধে!—এই যে অজিত! মণি কই?

বছর-ত্রিশ বয়সের একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার কাপড়-জামায় কালির দাগ। কহিল, মণি আমাকেই এতক্ষণ সাহায্য করছিলেন, তাঁর কাপড়েও কালি লেগেচে, তাই বদলে ফেলতে গেছেন। মোটরটা ঠিক হয়ে গেছে, সোফারকে সামনে আনতে বলে দিলাম।

আশুবাবু কহিলেন, অজিত, ইনি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। এখানকার কলেজের অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম কর।

আগন্তুক যুবক অবিনাশকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশুবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, মণির আসতে মিনিট-পাঁচেকের বেশী লাগবে না। কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন। দেরি হলে সব দেখার সময় পাওয়া যাবে না। লোকে বলে তাজমহল দেখে আর সাধ মেটে না।

আশুবাবু কহিলেন, সাধ না মেটবারই যে জিনিস বাবা। কিন্তু আমরা ত প্রস্তুত হয়ে আছি। বরঞ্চ তোমারই দেরি, এখনো তোমারই কাপড় ছাড়তে বাকী।

ছেলেটি নিজের পোষাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমার আর বদলাতে হবে না, এতেই চলে যাবে।

এই কালি-সুদ্ধ ?

ছেলেটি হাসিয়া কহিল, তা হোক। এই আমাদের পেশা। কাপড়ে কালি লাগায় আমাদের অগৌরব হয় না।

কথা শুনিয়া আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অবিনাশও যুবকের বিনম্র সরলতায় মুগ্ধ হইলেন।

মণি আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহার প্রতি চাহিয়া অবিনাশ যেন চমকিয়া গেলেন। কিছুদিন তাহাকে দেখেন নাই, ইতিমধ্যে এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার পিতার নিকট হইতে এইমাত্র যে-সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন মনোরমার মুখের উপর আজ হয়ত এমন কিছু একটা দেখিতে পাইবেন যাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহা জীবনে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু কিছুই ত নয়। নিতান্তই সাধা-সিধা পোষাক। গোপন আনন্দের প্রচ্ছন্ন আড়ম্বর কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই, সুগভীর প্রসন্নতার শান্ত দীপ্তি মুখের কোনখানে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ কেমন যেন একটা ক্লান্তির ছায়া চোখের দৃষ্টিকে ম্লান করিয়াছে। অবিনাশের মনে হইল, পিতৃ-স্নেহবশে হয় তিনি নিজের কন্যাকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় একদিন যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

অনতিকাল পরে প্রকাণ্ড মোটর-যানে সকলেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্য-লুব্ধ নারী ও রূপ-লুব্ধ পুরুষের ভিড় বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুন্দর সুদীর্ঘ পথের সর্ব্বত্রই তাহাদের সাজ-সজ্জা ও বিচিত্র পরিধেয় অস্তমান রবিকর অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিশ্ব-খ্যাত অনন্ত সৌন্দর্য্যময় তাজের সিংহদ্বারের সন্মুখে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন হেমন্তের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগ অবসানের দিকে আসিতেছে।

যমুনা-কূলে যাহা-কিছু দেখিবার দেখা সমাপ্ত করিয়া অক্ষয়ের দলবল ইতিপূর্ব্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাজ তাহারা অনেকবার দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, তাই উপরে না উঠিয়া নীচে বাগানের একাংশে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া উচ্চ কোলাহলে সংবর্দ্ধনা করিলেন। বাত-ব্যাধি-পীড়িত আশুবাবু অতিগুরুভার দেহখানি ঘাসের উপর বিনস্ত করিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচা গেল! এখন যার যত ইচ্ছে মমতাজ বেগমের কবর দেখে আনন্দলাভ কর গে বাবা, আশু বদ্যি এইখান থেকেই বেগমসাহেবাকে কুর্নিশ জানাচ্চেন। এর অধিক আর তাকে দিয়ে হবে না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, সে হবে না বাবা। তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমরা কেউ যেতে পারব না।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই মা, তোমার বুড়ো বাপকে কেউ চুরি করবে না।

অবিনাশ কহিলেন, না, সে আশঙ্কা নেই। রীতিমত কপিকল লোহার চেন ইত্যাদি সংগ্রহ করে না আনলে তুলতে পারবে কেন?

মনোরমা কহিল, আমার বাবাকে আপনারা খুঁড়বেন না। আপনাদের নজরে নজরে বাবা এখানে এসে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

অবিনাশ কহিল, তা যদি হয়ে থাকেন ত আমাদের অন্যায় হয়েচে, এ-কথা মানতেই হবে। কারণ, দ্রষ্টব্য হিসাবে সে-বস্তুর মর্য্যাদা তাজমহলের চেয়ে কম হ'তো না।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন; মনোরমা বলিল, তা হবে না বাবা, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে! তোমার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে, এর অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়ে থাকবে। যিনি যত খবর দিন, তোমার চেয়ে আসল খবরটি কিন্তু কেউ বেশী জানে না।

ইহার অর্থ যে কি তাহা অবিনাশ ভিন্ন আর কেহ জানিত না, তিনিও এই অনুরোধ করিতে যাইতেছিলেন, সহসা সকলেরই চোখ পড়িয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি। তাজের পূর্ব্বদিক ঘুরিয়া অকস্মাৎ শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া পড়িল। শিবনাথ না-দেখার ভান করিয়া আর একদিকে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তাহার স্ত্রী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুশী হইয়া উঠিল, আশুবাবু ও তাঁর মেয়ে এসেচেন যে।

আশুবাবু উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা কখন এলেন শিবনাথ-বাবু? এদিকে আসুন!

সস্ত্রীক শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, শিবনাথের স্ত্রী। আপনার নামটি কিন্তু এখনো জানিনে।

মেয়েটি কহিল, আমার নাম কমল। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, বলা উচিতও নয়। কমল এঁরা আমার বন্ধু, তোমার স্বামীর পরিচিত। ব'সো।

কমল অজিতকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, কিন্তু এঁর পরিচয় ত দিলেন না।

আশুবাবু বলিলেন, ক্রমশঃ দেব বইকি। উনি আমার—উনি আমার পরমাত্মীয়। নাম অজিতকুমার রায়। দিন কয়েক হ'ল বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের দেখতে এসেচেন। কমল, তুমি কি আজ এই প্রথম তাজমহল দেখলে?

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

আশুবাবু বলিলেন, তা হলে তুমি ভাগ্যবতী। কিন্তু অজিত তোমার চেয়েও

ভাগ্যবান, কেন-না এই পরম বিস্ময়ের জিনিসটি সে কখনো দেখিনি, এইবার দেখবে। কিন্তু আলো কমে আসচে, আর ত দেরি করলে চলবে না অজিত।

মনোরমা বলিল—দেরি ত শুধু তোমার জন্যই বাবা! ওঠো।

ওঠা ত সহজ ব্যাপার নয় মা, তার জন্য যে আয়োজন করতে হয়।

তা হলে সেই আয়োজন কর বাবা!

করি। আচ্ছা কমল, দেখে কি-রকম মনে হ'ল?

কমল কহিল, বিস্ময়ের বস্তু বলেই মনে হ'ল।

মনোরমা ইহার সহিত কথা কহে নাই, এমন কি পরিচয় আছে এ পরিচয়টুকুও তাহার আচরণে প্রকাশ পাইল না। পিতাকে তাগিদ দিয়া কহিল, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, ওঠো এইবার।

উঠি মা। বলিয়া আশুবাবু উঠিবার কিছুমাত্র উদ্যম না করিয়াই বসিয়া রহিলেন। কমল একটুখানি হাসিল, মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, ওঁর শরীরও ভাল নয়, ওঠা-নামা করাও সহজ নয়! তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা এইখানে বসে গল্প করি আপনারা দেখে আসুন।

মনোরমা এ-প্রস্তাবের জবাবও দিল না, শুধু পিতাকেই জিদ করিয়া পুনরায় কহিল, না বাবা, সে হবে না। ওঠো তুমি এইবার।

কিন্তু দেখা গেল উঠিবার চেষ্টা প্রায় কাহারও নাই। যে জীবন্ত বিস্ময় এই অপরিচিত রমণীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্ম্মরের অব্যক্ত বিস্ময় যেন এক মুহূর্ত্তেই ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে।

অবিনাশের চমক ভাঙিল। বলিলেন, উনি না গেলে হবে না। মনোরমার বিশ্বাস, ওঁর বাবার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে তাজের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যই উপলব্ধি করা যাবে না।

কমল সরল চোখ দুটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আশুবাবুকে কহিল, আপনি বুঝি এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লোক। এবং সমস্ত তত্ত্ব জানেন বুঝি।

মনোরমা মনে মনে বিস্মিত হইল! কথাগুলো ঠিক অশিক্ষিত দাসীকন্যার মত নয়।

আশুবাবু পুলকিত হইয়া কহিলেন, কিছুই জানিনে। বিশেষজ্ঞ ত নয়ই—সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের গোড়ার কথাটুকুও জানিনে। সেদিক দিয়ে আমি একে দেখিওনে কমল। আমি দেখি সম্রাট সাজাহানকে। আমি দেখি তাঁর অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখান। আমি দেখি তাঁর একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম, যা এই মর্ম্মর কাব্যের সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তাঁকে বিশ্বের কাছে অমর করেচে।

কমল অত্যন্ত সহজকণ্ঠে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু তাঁর ত শুনেচি

আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত কিছু বেশী হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাঁকে বলা যায় না আশুবাবু। সে তাঁর ছিল না!

এই অপ্রচলিত ভয়ানক মন্তব্যে সকলে চমকিয়া গেলেন। আশুবাবু কিংবা কেহই ইহার হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কমল কহিল, সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন; তাঁর শক্তি, সম্পদ এবং ধৈর্য্য দিয়ে এতবড় একটা বিরাট সৌন্দর্য্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ। নইলে এমনি সুন্দর সৌধ তিনি যে-কোন ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র-লক্ষ মানুষ বধ করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হলেও এমনি চলে যেতো। এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের অক্ষয় দান। এই ত আমাদের কাছে যথেষ্ট।

আশুবাবু মনের মধ্যে যেন আঘাত পাইলেন। বার বার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, যথেষ্ট নয় কমল, কিছুতেই যথেষ্ট নয়। তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসা যদি না-ই থেকে থাকে ত এই বিপুল স্মৃতি-সৌধের কোন অর্থই থাকে না। তিনি যত বড় সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করুন না, মানুষের অন্তরে সে-শ্রদ্ধার আসন আর থাকে না!

কমল বলিল, যদি না থাকে ত সে মানুষের মূঢ়তা। নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলিনি, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোক তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেচি কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্ত্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয় সুন্দরও নয়।

শুনিয়া মনোরমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহাকে মূর্খ দাসী-কন্যা বলিয়া অবহেলা করা কঠিন, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সম্মুখে তাহারই মত একজন নারীর মুখ দিয়া এই লজ্জাহীন উক্তি তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, অনুচ্চ কঠিন-কণ্ঠে কহিল, এ মনোবৃত্তি আর কারও না হোক, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু অপরের পক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।

আশুবাবু মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, ছি মা!

কমল রাগ করিল না, বরঞ্চ একটু হাসিল। কহিল, অনেক দিনের দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষে হঠাৎ সইতে পারে না। আপনি সত্যই বলেচেন, আমার কাছে এ-বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানব প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তন শক্তি নেই, সেদিন বুঝব এর শেষ হয়েচে—এ মরেচে। এই বলিয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে

পাইল অজিতের দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি জানি সে দৃষ্টি মনোরমার চোখে পড়িল কি না, কিন্তু সে কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা, বেলা আর নেই, আমি যা পারি অজিতবাবুকে ততক্ষণ একটুখানি দেখিয়ে নিয়ে আসি ?

অজিতের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, চল, আমরা দেখে আসি গে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, তাই যাও মা, আমরা এইখানেই বসে আছি, কিন্তু একটুখানি শীঘ্র করে ফিরে এসো, না হয় কাল আবার একটু বেলা থাকতে আসা যাবে।

৬

অজিত ও মনোরমা তাজ দেখিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু আলো শেষ হয় নাই। সকলে বেশ তাল পাকাইয়া বসিয়াছেন, তর্ক ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। তাজের কথা, বাসায় ফিরিবার কথা, এমন কি অজিত-মনোরমার কথা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে নাই। অক্ষয় নীরবে ফুলিতেছেন, দেখিয়া সন্দেহ হয়, রব তিনি ইতিপূর্ব্বে যথেষ্টই করিয়াছেন, এখন দম লইতেছেন। আশুবাবু দেহের অধোভাগ চক্রের বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া ঊর্দ্ধভাগ দুই হাতের উপর ন্যস্ত করিয়া গুরুভার বহন করিবার একটা উপায় করিয়া লইয়া অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতেছেন। অবিনাশ সম্মুখের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়া খরদৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া আছেন। বুঝা গেল সম্প্রতি সওয়াল জবাব এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সকলেই আগন্তুকদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেহ ঘাড়টা একটু নাড়িয়া, কেহ সেটুকু করিবারও ফুরসৎ পাইলেন না। কমল ও শিবনাথ, ইহারাও মুখ তুলিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, একজনের চোখের দৃষ্টি কেমন শিখার মত জ্বলিতেছে, অপরের চোখের দৃষ্টি তেমনিই ক্লান্ত ও মলিন ; সে যেন কিছুই দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না। এই দলের মধ্যে থাকিয়াও শিবনাথ কোথায় কত দূরেই যেন চলিয়া গেছে।

আশুবাবু শুধু বলিলেন, ব'সো। কিন্তু তাহারা কোথায় বসিল, কিংবা বসিল কি না সে দেখিবার সময় পাইলেন না।

অবিনাশ বোধ করি অক্ষয়ের যুক্তিমালার ছিন্ন সূত্রটাই হাতে জড়াইয়া

লইয়াছিলেন ; বলিলেন, সম্রাট সাজাহানের প্রসঙ্গ এখন থাক্, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবার হেতু আছে স্বীকার করি, প্রশ্নটা একটু জটিল। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ঐ সুমুখের মার্ব্বেলের মত সাদা, জলের ন্যায় তরল, সূর্য্যের আলোর মত স্বচ্ছ এবং সোজা—এই যেমন আমাদের আশুবাবুর জীবন—কোনদিকে অভাব কিছু ছিল না, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না—জানি ত সব, কিন্তু একথা উনি ভাবতে পারলেন না তাঁর মৃত স্ত্রীর জায়গায় আর কাউকে এনে বসানো যায় কিরূপে! এ বস্তু তাঁর কল্পনারও অতীত। বল ত, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে এ কতবড় আদর্শ! কত উঁচুতে এর স্থান!

কমল কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পিছনের দিকে একটা মৃদু-স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল। শিবনাথ কহিলেন, এখন এ আলোচনা থাক্।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

শিবনাথ উত্তরে শুধু বলিল, এমনিই বলছিলাম। এই বলিয়া চুপ করিল। তাহার কথায় বিশেষ কেহ মনোযোগ করিল না—সেই উদাস অন্যমনস্ক চোখের অন্তরালে কি কথা যে চাপা রহিল কেহ তাহা জানিল না, জানিবার চেষ্টাও করিল না।

কমল কহিল, ও—এমনিই। তোমার বাড়ি যাবার তাড়া পড়েছে বুঝি? কিন্তু বাড়িটি ত সঙ্গেই আছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

আশুবাবু লজ্জা পাইলেন, হরেন্দ্র-অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সেই শিবনাথের আশ্চর্য্য সুন্দর মুখের উপরে একটি রেখারও পরিবর্ত্তন হইল না—সে যেন একেবারে পাথরে গড়া, যেন দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না।

অবিনাশের দেরি সহিতেছিল না, বলিলেন, আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কমল কহিল, কিন্তু স্বামীর নিষেধ যে! তাঁর অবাধ্য হওয়া কি উচিত? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। অবিনাশ নিজেও না হাসিয়া পারিলেন না, কহিলেন, এ-ক্ষেত্রে অপরাধ হবে না। আমরা এতগুলি লোকে মিলে তোমাকে অনুরোধ করচি তুমি বল।

কমল বলিল, আশুবাবুকে আজ নিয়ে শুধু দুটি দিন দেখতে পেয়েচি, কিন্তু এর মধ্যেই মনে মনে ওঁকে আমি ভালবেসেচি। এই বলিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এখন বুঝতে পারচি উনি কেন আমাকে বলতে নিষেধ করেছিলেন।

আশুবাবু নিজেই তাহাতে বাধা দিলেন, বলিলেন, কিন্তু আমার দিক থেকে তোমার কুণ্ঠা বোধ করবার কোন কারণ নেই। বুড়ো আশু বদ্যি বড্ড নিরীহ মানুষ কমল, তাকে মাত্র দুটি দিন দেখেই অনেকটা ঠাওর করেচ, আরও দিন-দুই দেখলেই বুঝবে তাকে ভয় করার মত ভুল আর সংসারে নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বল, এসব কথা শুনতে আমার সত্যিই আনন্দ হয়।

কমল কহিল, কিন্তু ঠিক এইজন্যই ত উনি বারণ করেছিলেন, আর এইজন্যই অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে এখন আমার বলতে বাধচে যে, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে একে আমি বড় বলেও মনে করিনে, আদর্শ বলেও মানিনে।

অক্ষয় কথা কহিল। তাহার প্রশ্নের ভঙ্গিতে শ্লেষ ছিল, বলিল, খুব সম্ভব আপনারা মানেন না, কিন্তু কি মানেন একটু শুনতে পাই কি?

কমল তাহার প্রতি চাহিল, কিন্তু তাহাকেই যে উত্তর দিল তাহা নয়। বলিল, একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে সুখী করাও যায় না, দুঃখ দেওয়ায় যায় না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ পালন ক'রে, বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতটাকে ধ্রুব জ্ঞানে জ'বন-যাপন করায় মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।

কমলের মুখের এই কথাটায় আশুবাবু পুনরায় আঘাত পাইলেন। বলিলেন, কমল, কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের হাতে ত শুধু এই জিনিসটিই থাকে চরম সম্বল। স্বামী যায়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিয়েই ত বৈধব্য-জীবনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। কি, তুমি মানো না?

কমল বলিল, না। একটি বড় নাম দিলেই ত কোন জিনিস সংসারে সত্যিই বড় হয়ে যায় না। বরঞ্চ বলুন এইভাবে এদেশের বৈধব্য-জীবন কাটানই বিধি, বলুন একটা মিথ্যেকে সত্যের গৌরব দিয়ে লোকে তাদের ঠকিয়ে আসচে—আমি অস্বীকার করব না।

অবিনাশ বলিলেন, তাও যদি হয়, মানুষে যদি তাদের ঠকিয়েও এসে থাকে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে—না থাক্, ব্রহ্মচর্য্যের কথা আর তুলব না, কিন্তু তার আমরণ সংযত জীবন-যাত্রাকে কি বিরাট পতিব্রতার মর্য্যাদাটাও দেব না?

কমল হাসিল, কহিল, অবিনাশবাবু, এও আর একটা ঐ শব্দের মোহ। 'সংযম' বাক্যটা বহুদিন ধরে মর্য্যাদা পেয়ে পেয়ে এমনি স্ফীত হয়ে উঠেচে যে, তার আর স্থান কাল কারণ অকারণ নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভ্রমে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে এও যে একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশী নয় এমন কথাটা উচ্চারণ করতেও সাধারণ লোকের যদি বা ভয় হয়, আমার হয় না। আমি সে দলের নই। অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসচে বলেই আমি মেনে নিইনে। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত এমন স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ না করে দিলে স্বীকার করতে বাধে।

অবিনাশ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি বল কি ?

অক্ষয় কহিল, দুয়ে দুয়ে চার হয় এও বোধ করি আপনাকে প্রমাণ করে না দিলে স্বীকার করবেন না ?

কমল জবাবও দিল না, রাগও করিল না, শুধু হাসিল।

আর একটি লোক রাগ করিলেন না, তিনি আশুবাবু। অথচ কমলের কথায় আহত হইয়াছিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশি।

অক্ষয় পুনশ্চ কহিল, আপনার এ সব কদর্য্য ধারণা আমাদের ভদ্র-সমাজের নয়। সেখানে এ অচল।

কমল তেমনি হাসিমুখেই উত্তর দিল, ভদ্র-সমাজে অচল হয়েই ত আছে। এ আমি জানি।

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কমল, পবিত্রতা অপবিত্রতার জন্য বলচিনে, কিন্তু স্বভাবতঃ যে অন্য কিছু ভাবে না—এই যেমন আমি। মণির স্বর্গীয়া জননীর স্থানে আর কাউকে বসাবার কথা আমি যে কখনো কল্পনা করতেও পারিনে।

কমল কহিল, আপনি যে বুড়ো হয়ে গেছেন আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, আজ বুড়ো হয়েচি মানি কিন্তু সেদিন ত বুড়ো ছিলাম না। কিন্তু তখনো ত এ-কথা ভাবতে পারিনি ?

কমল কহিল, সেদিনও এমনি বুড়োই ছিলেন। দেহে নয়, মনে। এক এক জন থাকে যারা বুড়ো মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। সেই বুড়ো শাসনের নীচে তাহাদের শীর্ণ বিকৃত যৌবন চিরদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। বুড়ো মন খুশী হয়ে বলে, আহা! এই ত বেশ! হাঙ্গামা নেই মাতামাতি নেই—এই ত শান্তি, এই ত মানুষের চরম তত্ত্বকথা। তার কত রকমের কত ভাল ভাল বিশেষণ, কত বাহবার ঘটা। দুই কান পূর্ণ করে তার খ্যাতির বাদ্য বাজে, কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাদ্য নয়, আনন্দলোকের বিসর্জ্জনের বাজনা এ কথা সে জানতেও পারে না।

সকলেই মনে মনে চাহিলেন ইহার একটা বড় রকমের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন—মেয়েমানুষের মুখ দিয়া এই উন্মাদযৌবনের এই নির্লজ্জ স্তব-গানে সকলের কানের মধ্যেই জ্বালা করিতে লাগিল; কিন্তু জবাব দিবার মত কথাও কেহ খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন আশুবাবু মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো মন তুমি কাকে বল ? দেখি নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে এ সত্যিই কি না।

কমল কহিল, মনের বার্দ্ধক্য আমি ত তাকেই বলি আশুবাবু, যে মন সুমুখের দিকে

চাইতে পারে না, যার অবসন্ন জরা-গ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবারই দাবী নেই—বর্ত্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্ব্বস্ব। তার আনন্দ, তার বেদনা—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙিয়ে খেয়ে সে জীবনের বাকী দিন-কটা টিকে থাকতে চায়। দেখুন ত আশুবাবু, নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে।

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, সময়মত একবার দেখব বই কি।

অজিতকুমার এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও বলে নাই, শুধু নিষ্পলক চক্ষে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, সহসা কি যে তাহার হইল, সে আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আমার একটা প্রশ্ন—দেখুন মিসেস্—

কমল সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, মিসেস কিসের জন্য? আমাকে আপনি কমল বলেই ডাকুন না?

অজিত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল—না না, সে কি, সে কেমনধারা যেন—

কমল কহিল, কিছুই কেমনধারা নয়। বাপ-মা আমার নাম রেখেচেন আমাকে ডাকবার জন্যই ত। ওতে আমি রাগ করিনে। অকস্মাৎ মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার নাম মনোরমা, তাই বলে যদি আমি ডাকি আপনি রাগ করেন নাকি?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ করি।

এ উত্তর তার কাছে কেহই প্রত্যাশা করে নাই, আশুবাবু কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়িলেন।

শুধু কুণ্ঠিত হইল না কমল নিজে। কহিল, নাম ত আর কিছুই নয়, কেবল একটা শব্দ। যা দিয়ে বোঝা যায়, বহুর মধ্যে একজন আর একজনকে আহ্বান করচে। তবে অনেক লোকের অভ্যাসে বাধে এ-কথা সত্যি। তারা এই শব্দটাকে নানারূপে অলঙ্কৃত করে শুনতে চায়। দেখেন না রাজারা তাঁদের নামের আগে পিছে কতকগুলো নিরর্থক বাক্য নিয়ে, কতকগুলো শ্রী জুড়ে তবে অপরকে উচ্চারণ করতে দেয়? নইলে তাঁদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিলেন, যেমন ইনি। কখনও কমল বলতে পারেন না, বলেন, শিবানী। অজিতবাবু, আপনি বরঞ্চ আমাকে মিসেস্ শিবনাথ না বলে শিবানী বলেই ডাকুন। কথাটাও ছোট, বুঝবেও সবাই। অন্ততঃ আমি ত বুঝবই।

কিন্তু কি যে হইল, এমন সুস্পষ্ট আদেশ লাভ করিয়াও অজিত কথা কহিতে পারিল না, প্রশ্ন তাহার মুখে বাধিয়াই রহিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া অঘ্রানের বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে,

সেইদিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মনোরমা বলিল, বাবা হিম পড়তে শুরু হয়েছে, আর না। এবার ওঠো।

আশুবাবু বলিলেন এই যে উঠি মা।

অবিনাশ বলিলেন, শিবানী নামটি বেশ। শিবনাথ গুণী লোক, তাই নামটিও দিয়েচেন মিষ্টি, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়েচেনও চমৎকার।

আশুবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, শিবনাথ নয় হে অবিনাশ, উপরের—উনি। এই বলিয়া তিনি একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আদ্যিকালের ঐ বুড়ো ঘটকটি এদের সব দিক দিয়ে মিল করবার জন্য যেন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে লেগেছিলেন। বেঁচে থাকো।

অকস্মাৎ অক্ষয় সোজা হইয়া মাথা বার দুই-তিন নাড়িয়া ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় যথাশক্তি বিস্ফারিত করিয়া কহিল. আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

কমল কহিল, কি প্রশ্ন?

অক্ষয় বলিল, আপনার সঙ্কোচের বালাই ত নেই তাই জিজ্ঞেসা করি, শিবানী নামটি ত বেশ, কিন্তু শিবনাথবাবুর সঙ্গে কি আপনার সত্যই বিবাহ হয়েছিল?

আশুবাবু মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিলেন, বলেন কি অক্ষয়বাবু?

অবিনাশ বলিলেন, তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট!

অক্ষয় কহিল, জানেন ত আমার মিথ্যে চক্ষুলজ্জা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, মিথ্যে সত্যি কোনটাই নেই। কিন্তু আমাদের ত আছে। কমল কিন্তু হাসিতে লাগিল। যেন কত তামাসার কথাই না ইহার মধ্যে আছে। কহিল, এতে রাগ করবার কি আছে হরেন্দ্রবাবু? আমি বলচি অক্ষয়বাবু। একেবারে কিছুই হয়নি তা নয়। বিয়ের মত কি একটা হয়েছিল। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগলেন, বললেন, এ বিবাহই নয়—ফাঁকি! ওকে জিজ্ঞেসা করতে বললেন, বিবাহ হ'ল শৈব মতে। আমি বললাম, সেই ভাল। শিবের সঙ্গে যদি শৈব মতেই বিয়ে হয়ে থাকে ত ভাববার কি আছে!

অবিনাশ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, কিন্তু শৈব বিবাহ ত এখন আর আমাদের সমাজে চলে না কি না, তাই কোনদিন যদি উনি হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে চান ত সত্যি বলে প্রমাণ করবার তোমার কিছুই নেই কমল।

কমল শিবনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এইরকম কোনদিন?

শিবনাথ কোন উত্তরই দিল না, তেমনি উদার গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিল। তখন কমল হাসির ছলে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট? উনি যাবেন হয়নি

বর্গে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তাই হয়েচে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবে না কি?

অবিনাশ বলিলেন, জুটতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা ত পাপ।

কমল বলিল, পাপ না ছাই। কিন্তু সে হবে না। আমি আত্মহত্যা করতে যাব এ-কথা আমার বিধাতাপুরুষও ভাবতে পারেন না।

আশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, এই ত মানুষের মত কথা কমল।

কমল তাঁহার দিকে চাহিয়া নালিশ করার ভঙ্গিতে বলিল, দেখুন ত অবিনাশবাবুর অন্যায়। শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাব তাই ঘাড় ধরে ওঁকে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে, আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখব বেঁধে? আমি? আমি করব এই কাজ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, শিবানী, সংসারে সত্য যে বড় এ আমরা সবাই মানি, কিন্তু অনুষ্ঠানও মিথ্যে নয়!

কমল বলিল, মিথ্যে ত বলিনে। এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য, কিন্তু প্রাণ যখন যায়?

মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, বাবা, ভারি হিম পড়বে, এখন না উঠলেই যে নয়।

এই যে মা উঠি!

শিবনাথ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, শিবানী, আর দেরি ক'রো না, চল।

কমল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; সকলকে নমস্কার করিল, বলিল, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল যেন কেবল তর্ক করার জন্যই। কিছু মনে করবেন না।

শিবনাথ এতক্ষণ পরে একবার হাসিলেন, বলিলেন, তর্কই শুধু করলে শিবানী, শিখলে না কিছুই।

কমল বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল, না। কিন্তু শেখবার কোথায় কি ছিল আমার মনে পড়চে না ত।

শিবনাথ কহিলেন, পড়বার কথাও নয়, সে এমনি আড়ালেই রইল। পার যদি আশুবাবুর জরাগ্রস্ত বুড়ো মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শিখো। তার বড় আর শেখবার কিছু নেই।

কমল সবিস্ময়ে কহিল, এ তুমি বলচ কি আজ?

শিবনাথ জবাব দিল না, পুনরায় সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল, চল।

আশুবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, আশ্চর্য্য?

৭

আশ্চর্য্যই বটে। এ-ছাড়া মনের কথা ব্যক্ত করিবার আর শব্দ ছিল কি? বস্তুতঃ উহারা চলিয়া গেল যেন এক অত্যাশ্চর্য্য নাটকের মধ্য-অঙ্কেই যবনিকা টানিয়া দিয়া—পর্দার ও-পিঠে না জানি কত বিস্ময়ের ব্যাপারই অগোচর রহিল। সকলেরই মনের মধ্যে এই একটা কথাই তোলপাড় করিতে লাগিল এবং সকলেরই মনে হইল, যেন এইজন্যেই এখানে শুধু তাহারা আসিয়াছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, হেমন্তর শিশির-সিক্ত মন্দ-জ্যোৎস্নায় অদূরে তাজের শ্বেত-মর্ম্মর মায়াপুরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি আর কাহারও চোখ নাই।

মনোরমা বলিল, এবার না উঠলে তোমার সত্যিই অসুখ করবে বাবা।

অবিনাশ কহিলেন; হিম পড়চে, উঠুন।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফটকের বাহিরে আশুবাবুর প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া, কিন্তু অক্ষয়-হরেন্দ্রর টাঙ্গা-ওয়ালার খোঁজ পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে বেশি ভাড়ায় সওয়ারি পাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। অতএব কোনমতে ঠেসাঠেসি করিয়া সকলকে মোটরেই উঠিতে হইল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই চুপ করিয়াছিলেন, কথা কহিলেন প্রথমে অবিনাশ; কহিলেন, শিবনাথ মিছে কথা বলেছিল। কমল কিছুতেই একজন দাসীর মেয়ে হতে পারে না। অসম্ভব! এই বলিয়া তিনি মনোরমার মুখের দিকে চাহিলেন।

মনোরমার মনের মধ্যেও ঠিক এই প্রশ্নই জাগিতেছিল, কিন্তু সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অক্ষয় কহিল, মিছে কথা বলবার হেতু? নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এত গৌরবের পরিচয় নয় অবিনাশবাবু।

অবিনাশ বলিলেন, সেই কথাই ত ভাবচি।

অক্ষয় বলিলেন, আপনারা আশ্চর্য্য হয়ে গেচেন, কিন্তু আমি হইনি। এ সমস্তই শিবনাথের প্রতিধ্বনি। তাই কথার মধ্যে bravado আছে প্রচুর, কিন্তু বস্তু নেই। আসল নকল বুঝতে পারি। অত সহজে আমাকে ঠকানো যায় না।

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে! আপনাকে ঠকানো! একেবারে monopolyতে হস্তক্ষেপ?

অক্ষয় তাহার প্রতি একটা ক্রূর কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, এর ভদ্র-ঘরের culture সিকি পয়সার নেই। মেয়েদের মুখ থেকে এ-সমস্ত শুধু immoral নয়, অশ্লীল।

অবিনাশ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাঁর সব কথা মেয়েদের মুখ থেকে ঠিক শোভন না হতে পারে, কিন্তু তাকে অশ্লীল বলা যায় না অক্ষয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, ও দু-ই এক অবিনাশবাবু। দেখলেন না, বিবাহ জিনিসটা এর কাছে তামাসার ব্যাপার। যখন সবাই এসে বললে, এ বিবাহই নয়, ফাঁকি, উনি শুধু হেসে বললেন, তাই নাকি? Absolute indifference আপনারা কি নোটিশ করেননি? এ কি কখনও ভদ্র-কন্যার সাজে, না সম্ভবপর?

কথাটা অক্ষয়ের সত্য, তাই সবাই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই। সবই তাঁহার কানে যাইতেছিল, কিন্তু নিজের খেয়ালেই ছিলেন। হঠাৎ এই অবস্থায় তাঁহার ধ্যান ভাঙিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বিবাহটা নয়, এর formটার প্রতিই বোধ হয় কমলের তেমন আস্থা নেই। অনুষ্ঠান যা হোক কিছু একটা হলেই ওর হ'লো। স্বামীকে বললে, ওরা যে বলে বিয়েটা হ'লো ফাঁকি। স্বামী বলিলেন, বিবাহ হ'লো আমাদের শৈব মতে। কমল তাই শুনে খুশী হয়ে বললে, শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে, আমার শৈব মতে-ত সেই ভাল। কথাটি আমার কি যে মিষ্টি লাগলো অবিনাশবাবু!

ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটিও ছিল ঠিক এই সুরে বাঁধা, কহিলেন, আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করা—হাঁ গা, করবে না কি তুমি এইরকম? দেবে না কি আমাকে ফাঁকি? কত কথাই ত তার পরে হয়ে গেল আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কানের মধ্যে এখনও বাজচে।

প্রত্যুত্তরে আশুবাবু হাসিয়া একটু মাথা নাড়িলেন।

অবিনাশ বলিলেন, আর ওই শিবানী নামটুকু? এই কি কম মিষ্টি আশুবাবু?

অক্ষয় আর যেন সহিতে পারিলেন না, বলিলেন, আপনারা অবাক্ করলেন অবিনাশবাবু। তাদের যা-কিছু সমস্তই মিষ্টি মধুর। এমন কি শিবনাথের নিজের নামের সঙ্গে একটা 'নী' যোগ করাতেও মধু ঝরে পড়লো?

হরেন্দ্র কহিল, শুধু 'নী' যোগ করাতেই হয় না অক্ষয়বাবু। আপনার স্ত্রীকে অক্ষয়নী বলে ডাকলেই কি মধু ঝরবে?

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। এমন কি মনোরমাও পথের একধারে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, হরেনবাবু, don't you go too far. কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এ-সকল স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে তুলনা করাকেও আমি অত্যন্ত অপমানকর মনে করি, আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তর্ক করাও তাহার স্বভাব নয়, নিজের কথা যুক্তি দিয়ে সপ্রমাণ করাও তাহার অভ্যাস নয়। মাঝে হইতে হঠাৎ কিছু একটা বলিয়াই এমনি

নীরব হইয়া থাকে যে, সহস্র খোঁচাখুঁচিতেও মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির করা যায় না। হইলও তাই। অক্ষয় বাকী পথটা শিবানীকে ছাড়িয়া হরেন্দ্রকে লইয়া পড়িল। সে যে ভদ্রমহিলাকে ভদ্রতাহীন কদর্য্য পরিহাস করিয়াছে এবং শিবনাথের শৈব-মতে বিবাহ-করা স্ত্রীর বাক্যে ও ব্যবহারে যে আভিজাত্যের বাষ্পও নাই, বরঞ্চ তাহার শিক্ষা ও সংস্কার জঘন্য হীনতারই পরিচায়ক, ইহাই অত্যন্ত রূঢ়তার সহিত বারংবার প্রতিপন্ন করিতে করিতে গাড়ি আশুবাবুর দরজায় আসিয়া থামিল। অবিনাশ ও অন্যান্য সকলে নামিয়া গেল, হরেন্দ্র-অক্ষয়কে পেঁছাইয়া দিতে গাড়ি চলিয়া গেল।

আশুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, গাড়ির মধ্যে এঁরা মারামারি না করেন।

অবিনাশ বলিলেন, সে ভয় নেই। এ প্রতিদিনের ব্যাপার, কিন্তু তাতে ওঁদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

ঘরের মধ্যে চা খাইতে বসিয়া আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, অক্ষয়বাবুর প্রকৃতটা বড় কঠিন। ইহার চেয়ে কঠিন কথা তাঁহার মুখে আসিত না। সহসা মেয়ের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মণি, কমলের সম্বন্ধে তোমার পূর্ব্বের ধারণা কি আজ বদলায়নি?

কিসের ধারণা বাবা?

এই যেমন—এই যেমন—

কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে তোমাদের কি হবে বাবা?

পিতা দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি জানিতেন এই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনোরমার চিত্ত অতিশয় বিমুখ। ইহা তাঁহাকে পীড়া দিত, কিন্তু এ লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়া যেমন অপ্রীতিকর তেমনি নিষ্ফল।

অকস্মাৎ অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আপনারা বোধ হয় তেমন কান দেননি। সে শিবনাথের শেষ কথাটা। কমলের সবটুকুই যদি অপরের প্রতি-ধ্বনিমাত্রই হ'তো ত একথা শিবনাথের বলার প্রয়োজন হ'তো না যে, সে যেন আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই বলিয়া সে নিজেও গভীর শ্রদ্ধাভরে আশুবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাস্তবিক, বলতে কি, আপনার মত ভক্তির পাত্রই বা সংসারে ক'জন আছে? এতটুকু সামান্য পরিচয়েই যে শিবনাথ এতবড় সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেচে, কেবল এরই জন্য আমি তার বহু অপরাধ ক্ষমা করতে পারি আশুবাবু।

শুনিয়া আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপুল কলেবর লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মনোরমা কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু পূর্ণ করিয়া বক্তার মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিল, অবিনাশবাবু, এইখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সত্যকার প্রভেদ। আমি জানি, সেদিন কাপড় এবং সাবান চাওয়ার ছলে এই মেয়েটি আমাকে শুধু

উপহাস করেই গিয়েছিল—তার সেইদিনকার অভিনয় আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু সমস্ত ছলাকলা সমস্ত বিদ্রূপই ব্যর্থ বাবা, তোমাকে যদি না সে আজ সকলের বড় বলে চিনতে পেরে থাকে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—কি যে তোরা সব বলিস্ মা?

অবিনাশ কহিলেন, অতিশয়োক্তি এর মধ্যে কোথাও নেই আশুবাবু। যাবার সময়ে শিবনাথ এই কথাই তার স্ত্রীকে বলবার চেষ্টা করেছিল। আজ কথা সে কয়নি, কিন্তু তার ঐ একটি কথাতেই আমার মনে হয়েচে ওদের পরস্পরের মধ্যে এখানেই মস্ত মতভেদ আছে।

আশুবাবু বলিলেন, সে যদি থাকে ত শিবনাথেরই দোষ, কমলের নয়।

মনোরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি কি চোখে যে তাকে দেখচো সে তুমিই জান বাবা। কিন্তু তোমার মত মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতে পারে না তাকে কি কখনো ক্ষমা করা যায়!

আশুবাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন মা? আমাকে অশ্রদ্ধা করার ভাব ত তার একটা আচরণেও প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু শ্রদ্ধাও ত প্রকাশ পায়নি।

আশুবাবু কহিলেন, পাবার কথাও নয় মণি। বরঞ্চ পেলেই তার মিথ্যাচার হ'তো। আমার মধ্যে যে বস্তুটাকে তোমরা শক্তির প্রাচুর্য্য মনে করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হও, ওর কাছে সেটা নিছক শক্তির অভাব। দুর্ব্বল মানুষকে স্নেহের প্রশ্রয়ে ভালবাসা যায়, এই কথাই আমাকে সে বলেচে, কিন্তু আমার যে মূল্য তার কাছে নেই, জবরদস্তি তাই দিতে গিয়ে সে আমাকেও খেলো করেনি, নিজেকেও অপমান করেনি। এই ত ঠিক, এতে ব্যথা পাবার ত কিছুই নেই মণি।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অজিত অন্যমনস্কের ন্যায় ছিল, এই কথায় সে চাহিয়া দেখিল। সে কিছুই জানিত না, জানিয়া লইবার অবকাশও হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে ঝাপ্সা—এখন আশুবাবু যাহা বলিলেন তাহাতেও পরিষ্কার কিছুই হইল না, তবুও মন যেন তাহার জাগিয়া উঠিল।

মনোরমা নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু অবিনাশবাবু উত্তেজনার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে স্বার্থত্যাগের মূল্য নেই বলুন?

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, প্রশ্ন ঠিক অধ্যাপকের মত হ'ল না। যাই হোক তার কাছে নেই।

তা হলে আত্ম-সংযমেরও দাম নেই?

তার কাছে নেই। সংযম যেখানে অর্থহীন সে শুধু নিষ্ফল আত্ম-পীড়ন। আর তাই নিয়ে নিজেকে বড় মনে করা কেবল আপনাকে ঠকান নয়, পৃথিবীকে ঠকান!

তার মুখ থেকে শুনে মনে হ'লো কমল এই কথাটাই কেবল বলতে চায়। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি জানি সে কোথা থেকে এ ধারণা পেলে, কিন্তু হঠাৎ শুনলে ভারী বিস্ময় লাগে।

মনোরমা বলিয়া উঠিল, বিস্ময় লাগে! সর্ব্বশরীরে জ্বালা ধরে না? বাবা, কখনো কোনো কথাই কি তুমি জোর করে বলতে পারবে না? যে যা বলবে তাতেই হাঁ দেবে?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ ত দিইনি মা। কিন্তু বিরাগ-বিদ্বেষ নিয়ে বিচার করতে গেলে কেবল এক পক্ষই ঠকে না, অন্য পক্ষও ঠকে। যে-সব কথা তার মুখে আমরা গুঁজে দিতে চাই, ঠিক সেই কথা কমল বলেনি। সে যা বললে তার মোট কথাটা বোধ হয় এই যে, সুদীর্ঘদিন সংসারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্যে সত্য বলে পেয়েচি, সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক। অপর দিকও আছে। কেবল চোখ বুজে মাথা নাড়ালেই হবে কেন মণি?

মনোরমা বলিল, বাবা ভারতবর্ষে এতকাল ধরে কি সে দিকটা দেখবার লোক ছিল না?

তাঁহার পিতা একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ অত্যন্ত রাগের কথা মা। নইলে এ তুমি নিজেই ভাল করে জান যে, শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, কোনো দেশেই মানুষের পূর্ব্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তা হলে সৃষ্টি থেমে যেত। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতো না।

হঠাৎ তাঁহার চোখ পড়িল অজিত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। বলিলেন, তুমি বোধ করি কিছু বুঝতে পারচো না, না?

অজিত ঘাড় নাড়িল। আশুবাবু ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া কহিলেন, অক্ষয় কি যে পবিত্র হোম-কুণ্ডের আগুন জ্বেলে দিলেন, লোক চেয়ে দেখবে কি, ধুঁয়ার জ্বালায় চোখ তুলতেই পারলে না। অথচ মজা হল এই যে, আমাদের মামলা হ'লো শিবনাথের বিরুদ্ধে, আর দণ্ড দিলাম কমলকে। তিনি ছিলেন এখানকার একজন অধ্যাপক, মদ খাবার অপরাধে গেল তার চাকরি, রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ করে ঘরে আনলেন কমলকে। বললেন, বিবাহ হয়েছে শৈব-মতে—অক্ষয়বাবু ভিতরে ভিতরে সংবাদ আনিয়ে জানলেন, সব ফাঁকি। জিজ্ঞেসা করা হ'লো, মেয়েটি কি ভদ্র-ঘরের? শিবনাথ বললেন, সে তাঁদের বাড়ির দাসী-কন্যা। প্রশ্ন করা হ'লো মেয়েটি কি শিক্ষিত? শিবনাথ জবাব দিলেন, শিক্ষার জন্য বিবাহ করেননি, করেচেন রূপের জন্য। শোন কথা। কমলের অপরাধ আমি কোথাও খুঁজে পাইনি, অথচ তাকেই দূর করে দিলাম আমরা সকল সংসর্গ থেকে। আমাদের ঘৃণাটা পড়লো গিয়ে তার পরেই সব চেয়ে বেশি। আর এই হ'লো সমাজের সুবিচার।

মনোরমা কহিল, তাকে কি সমাজের মধ্যে ডেকে আনতে চাও বাবা ?

আশুবাবু বলিলেন, আমি চাইলেই হবে কেন মা? সমাজে অক্ষয়বাবুরাওত আছেন, তাঁরাই ত প্রবল পক্ষ ?

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একলা হলে ডেকে আনতে বোধ হয় ?

পিতা তাহার স্পষ্ট জবাব দিলেন না, কহিলেন, ডাকতে গেলেই কি সবাই আসে মা ?

অজিত বলিল, আশ্চর্য্য এই যে, আপনার মতের সঙ্গেই তাঁর সব চেয়ে বিরোধ, অথচ আপনারি স্নেহ পেয়েচেন তিনি সবচেয়ে বেশী।

অবিনাশ বলিলেন, তার কারণ আছে অজিতবাবু। কমলের আমরা কিছুই জানিনে, জানি শুধু তার বিপ্লবের মতটাকে। আর জানি তার অখণ্ড মন্দ দিকটাকে। তাই তার কথা শুনলে আমাদের ভয়ও হয়, রাগও হয়। ভাবি, এইবার গেল বুঝি সব।

আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ওঁর নিষ্পাপ দেহ, নিষ্কলুষ মন, সন্দেহের ছায়াও পড়ে না, ভয়েরও দাগ লাগে না। মহাদেবের ভাগ্যে বিষই বা কি, আর অমৃতই বা কি, গলাতেই আটকাবে, উদরস্থ হবে না। দেবতার দলই আসুক আর দৈত্যদানাতেই ঘিরে ধরুক, নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার চিত্ত, শুধু বাতে কাবু না করলেই উনি খুশী। কিন্তু আমাদের ত—

কথা শেষ হইল না, আশুবাবু অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করবেন না অবিনাশবাবু আপনার পায়ে পড়ি। নিরবচ্ছিন্ন একটি যুগ বিলেতে কাটিয়ে এসেচি, সেখানে কি করেচি, না করেচি নিজেরই মনে নেই, অক্ষয়ের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। একেবারে নাড়ী-নক্ষত্র টেনে বার করে আনবে। তখন ?

অবিনাশ সবিস্ময়ে কহিলেন, আপনি কি বিলেতে গিয়েছিলেন নাকি ?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ, সে দুষ্কার্য্য হয়ে গেছে।

মনোরমা কহিল, ছেলেবেলা থেকে বাবার সমস্ত এডুকেশনটাই হয়েছে ইয়োরোপে। বাবা ব্যারিস্টার। বাবা ডক্টর।

অবিনাশ কহিলেন বলেন কি ?

আশুবাবু তেমনিভাবেই বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই, ভয় নেই প্রফেসর, সমস্ত ভুলে গেছি। দীর্ঘকাল যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করে মেয়ে নিয়ে এখানে সেখানে টোল ফেলে বেড়াই, ঐ যা বললেন সমস্ত চিত্ততলটা একেবারে ধুয়ে-মুছে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে গেছে। ছাপ-ছোপ কোথাও কিছু বাকী নেই। সে যাই হোক, দয়া করে ব্যাপারটা যেন আর অক্ষয়বাবুর গোচর করবেন না।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন, অক্ষয়কে আপনার ভারী ভয় ?

আশুবাবু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, হাঁ। একে বাতের জ্বালায় বাঁচিনে, তাতে ওঁর কৌতূহল জাগ্রত হলে একেবারে মারা যাব।

মনোরমা রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা, এ তোমার বড় অন্যায়।

আশুবাবু বলিলেন, অন্যায় হোক মা, আত্মরক্ষায় সকলেরই অধিকার আছে।

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল; মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, মানুষের সমাজে অক্ষয়বাবুর মত লোকের কি প্রয়োজন নেই তুমি মনে কর ?

আশুবাবু বলিলেন, তোমার ঐ প্রয়োজন শব্দটাই যে সংসারে সবচেয়ে গোল-মেলে বস্তু মা। আগে ওর নিষ্পত্তি হোক, তবে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাবে। কিন্তু সে ত হবার নয়, তাই চিরকালই এই নিয়ে তর্ক চলেচে, মীমাংসা আর হ'ল না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি সব কথার জবাবই এমনি এড়িয়ে চলে যাও বাবা, কখনও স্পষ্ট করে কিছু বল না। এ তোমার বড় অন্যায়।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, স্পষ্ট করে বলবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি তোর বাপের নেই মণি, সে তোর কপাল। এখন খামোকা আমার ওপর রাগ করলে চলবে কেন বলত।

অজিত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাথাটা একটু ধরেচে, বাইরে খানিক ঘুরে আসি গে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথার অপরাধ নেই বাবা, কিন্তু এই হিমে, এই অন্ধকারে ?

দক্ষিণের একটা খোলা জানালা দিয়া অনেকখানি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নীচের কার্পেটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অজিত সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, হিম হয়ত একটু পড়চে, কিন্তু অন্ধকার নেই ? যাই একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু হেঁটে বেড়িয়ো না।

না, গাড়িতেই যাবো।

গাড়ীর ঢাকনা তুলে দিও অজিত, যেন হিম লাগে না।

অজিত সম্মত হইল। আশুবাবু বলিলেন, তা হলে অবিনাশবাবুকেও অমনি পৌঁছে দিয়ে যেয়ো। কিন্তু ফিরতে যেন দেরি না হয়।

আচ্ছা, বলিয়া অজিত অবিনাশবাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলে আশুবাবু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, এ ছেলের মোটোরে ঘোরা বাতিক দেখচি এখনো যায়নি। এ ঠাণ্ডায় চললো বেড়াতে।

৮

দিন-পনেরো পরের কথা। সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই, অজিত আশুবাবু ও মনোরমাকে অবিনাশবাবুর বাটীতে নামাইয়া দিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এমন সে প্রায়ই করিত। যে পথটা সহরের উত্তর হইতে আসিয়া কলেজের সম্মুখ দিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়া সোজা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে তাহারই একটা নিরালা জায়গায় সহসা উচ্চ নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনিয়া অজিত চমকিয়া গাড়ি থামাইয়া দেখিল শিবনাথের স্ত্রী কমল। পথের ধারে ভাঙা-চোরা পুরাতনকালের একটা দ্বিতল বাড়ি, সুমুখে একটুখানি তেমনি শ্রীহীন ফুলের বাগান, তাহারই একধারে দাঁড়াইয়া কমল হাত তুলিয়া ডাকিতেছে। মোটর থামিলে সে কাছে আসিল, কহিল, আর একদিন আপনি এমনি একলা যাচ্ছিলেন, আমি কত ডাকলুম, কিন্তু শুনতে পেলেন না। পাবেন কি করে? বাপ্‌ রে বাপ্‌! যে জোরে যান, দেখলে মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার ভয় করে না?

অজিত গাড়ি হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি একলা যে? শিবনাথবাবু কই?

কমল কহিল, তিনি বাড়ি নেই? কিন্তু আপনিই বা একাকী বেরিয়েচেন কেন? সেদিনও দেখেছিলাম সঙ্গে কেউ ছিল না।

অজিত কহিল, না। এ কয়দিন আশুবাবুর শরীর ভাল ছিল না। তাই তাঁরা কেউ বার হননি। আজ তাঁদের অবিনাশবাবুর ওখানে নামিয়ে দিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়েচি। সন্ধ্যাবেলা কিছুতেই আমি ঘরে থাকতে পারিনে।

কমল কহিল, আমিও না। কিন্তু পারিনে বললেই ত হয় না—গরীবদের অনেক কিছুই সংসারে পারতে হয়। এই বলিয়া সে অজিতের মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নেবেন আমাকে সঙ্গে করে? একটুখানি ঘুরে আসবো।

অজিত মুস্কিলে পড়িল। সঙ্গে আজ সোফার পর্য্যন্ত ছিল না, শিবনাথবাবুও গৃহে নাই তাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিতেও বাধিল। একটুখানি দ্বিধা করিয়া কহিল, এখানে আপনার সঙ্গী-সাথী বুঝি কেউ নেই?

কমল কহিল, শোন কথা! সঙ্গী-সাথী পাব কোথায়? দেখুন না চেয়ে একবার পল্লীর দশা। সহরের বাইরে বললেই হয়—সাহগঞ্জ না কি নাম, কোথাও কাছাকাছি বোধ করি একটা চামড়ার কারখানা আছে—আমার প্রতিবেশী শুধু মুচিরা। কারখানায় যায় আসে, মদ খায়, সারা রাত হল্লা করে—এই ত আমার পাড়া।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে ভদ্রলোক বুঝি নেই?

কমল বলিল, বোধ হয় না। আর থাকলেই বা কি—আমাকে তারা বাড়িতে যেতে দেবে কেন? তা হলে ত মাঝে মাঝে যখন বড্ড একলা মনে হয়, তখন আপনাদের ওখানে যেতে পারতুম। বলিতে বলিতে সে গাড়িতে খোলা দরজা দিয়া নিজেই ভিতরে গিয়া বসিল, কহিল, আসুন, আমি অনেকদিন মোটরে চড়িনি। কিন্তু আজ আমাকে অনেকদূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আনতে হবে।

কি করা উচিত অজিত ভাবিয়া পাইল না, সঙ্কোচের সহিত কহিল, বেশী দূরে গেলে রাত্রি হয়ে যেতে পারে। শিবনাথবাবু বাড়ি ফিরে আপনাকে দেখতে না পেলে হয়ত কিছু মনে করবেন।

কমল বলিল, নাঃ—মনে করবার কিছু নেই।

অজিত কহিল, তা হলে ড্রাইভারের পাশে না বসে ভেতরে বসুন না।

কমল বলিল, ড্রাইভার ত আপনি নিজে। কাছে না বসলে গল্প করব কি করে? অতদূরে পিছনে বসে মুখ বুজে যাওয়া যায়? আপনি উঠুন, আর দেরি করবেন না।

অজিত উঠিয়া বসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পথ সুন্দর এবং নির্জ্জন, কদাচিৎ এক-আধজনের দেখা পাওয়া যায়—এইমাত্র। গাড়ির দ্রুতবেগ ক্রমশঃ দ্রুততর হইয়া উঠিল। কমল কহিল, আপনি জোরে চালাইতেই ভালবাসেন, না?

অজিত বলিল, হাঁ।

ভয় করে না?

না। আমার অভ্যাস আছে।

অভ্যাসই সব। এই বলিয়া কমল একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার ত অভ্যাস নেই, তবু এই আমার ভাল লাগচে। বোধ হয় স্বভাব, না?

অজিত কহিল, তা হতে পারে।

কমল কহিল, নিশ্চয়। অথচ এর বিপদ আছে। যারা চড়ে তাদেরও, আর যারা চাপা পড়ে তাদেরও না?

অজিত কহিল, না, চাপা পড়বে কেন?

কমল কহিল, পড়লেই বা অজিতবাবু। দ্রুতবেগের ভারী একটা আনন্দ আছে! গাড়িরই বা কি, আর এই জীবনেরই বা কি। কিন্তু যারা ভীতু লোক তারা পারে না। সাবধানে ধীরে ধীরে চলে। ভাবে পথ হাঁটার দুঃখটা যে বাঁচলো এই তাদের ঢের। পথটাকে ফাঁকি দিয়েই তারা খুশী, নিজেদের ফাঁকিটা টেরও পায় না। ঠিক না অজিতবাবু?

কথাটা অজিত বুঝিতে পারিল না, বলিল, এর মানে?

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। ক্ষনেক পরে মাথা নাড়িয়া বলিল, মানে নেই, এমনি।

কথাটা সে যে বুঝাইয়া বলিতে চাহে না, এইটুকু বুঝা গেল, আর কিছু না।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। অজিত ফিরিতে চাহিল, কমল কহিল, এরই মধ্যে? চলুন আর একটু যাই।

অজিত কহিল, অনেকদূরে এসে পড়েচি, ফিরতে রাত হবে।

কমল বলিল, হ'লই বা।

কিন্তু শিবনাথবাবু হয়ত বিরক্ত হবেন।

কমল জবাব দিল, হলেনই বা।

অজিত মনে মনে বিস্মিত হইয়া বলিল, কিন্তু আশুবাবুদের গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিলম্ব হলে ভাল হবে না।

কমল প্রত্যুত্তরে কহিল, আগ্রা সহরে ত গাড়ির অভাব নেই, তাঁরা অনায়াসে যেতে পারেন। চলুন আরো একটু। এমনি করিয়া কমল যেন তাহাকে জোর করিয়াই নিরন্তর সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ লোকবিরল পথ একান্ত জনহীন ও রাত্রির অন্ধকার প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, চারিদিকের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর নিরতিশয় স্তব্ধ। অজিত হঠাৎ একসময়ে উদ্বিগ্ন-চিত্তে গাড়ির গতি রোধ করিয়া বলিল, আর না, ফিরে চলুন।

কমল কহিল, চলুন।

ফিরিবার পথে সে ধীরে ধীরে বলিল, ভাবছিলাম মিথ্যার সঙ্গে রফা করতে গিয়ে জীবনের কত অমূল্য সম্পদ না মানুষ নষ্ট করে। আমাকে একলা নিয়ে যেতে আপনার কত সঙ্কোচই না হয়েছিল, আমিও যদি সেই ভয়েই পেছিয়ে যেতাম এমন আনন্দটি ত অদৃষ্টে ঘটত না।

অজিত কহিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না দেখে নিশ্চয় করে ত কিছুই বলা যায় না। ফিরে গিয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দও ত অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে!

কমল কহিল, এই অন্ধকার নির্জন পথে একলা আপনার পাশে বসে উর্দ্ধশ্বাসে কত দূরেই না বেড়িয়ে এলাম? আজ আমার কি ভাল যে লাগচে তা আর বলতে পারিনে।

অজিত বুঝিল কমল তাহার কথায় কান দেয় নাই।—সে যেন নিজের কথা নিজেকেই বলিয়া চলিয়াছে। শুনিয়া লজ্জা পাইবার মত হয়ত সত্যই ইহাতে কিছুই নাই, তবু প্রথমটা সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ওই মেয়েটির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কল্পনা ও অশুভ জনশ্রুতির অতিরিক্ত বোধ হয় কেহই কিছু জানে না—যাহা জানে তাহারও হয়ত অনেকখানি মিথ্যা, এবং সত্য যাহা আছে তাহাতেও হয়ত অসত্যের

ছায়া এমনি ঘোরালো হইয়া পড়িয়াছে যে, চিনিয়া লইবার পথ নাই। ইচ্ছা করিলে যাচাই করিয়া যাহারা দিতে পারে, তাহারা দেয় না, যেন সমস্তটাই তাঁহাদের কাছে একেবারে নিছক অর্থহীন।

অজিত চুপ করিয়া আছে, ইহাতেই কমলের যেন চেতনা হইল। কহিল, ভাল কথা, কি বলছিলেন ফিরে গিয়ে আনন্দের বদলে নিরানন্দ অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে? পারে বই কি!

অজিত কহিল, তা হলে?

কমল বলিল, তা হলেও এ প্রমাণ হয় না, যে-আনন্দ আজ পেলাম তা পাইনি!

এবার অজিত হাসিল। বলিল, সে প্রমাণ হয় না, কিন্তু এ প্রমাণ হয় যে আপনি তার্কিক কম নয়। আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার।

অর্থাৎ যাকে বলে কূট-তার্কিক তাই আমি?

অজিত কহিল, না তা নয়, কিন্তু শেষ ফল যার দুঃখেই শেষ হয় তার গোড়ার দিকে যত আনন্দই থাক্, তাকে সত্যিকার আনন্দ-ভোগ বলা চলে না। এ ত আপনি নিশ্চয়ই মানেন?

কমল বলিল, না, আমি মানিনে। আমি মানি, যখন যেটুকু পাই তাকেই যেন সত্যি বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত-সুখের শিশিরবিন্দু-গুলিকে শুষে ফেলতে না পারে। সে যত অল্পই হোক, পরিণাম তার যত তুচ্ছই সংসারে গণ্য হোক তবুও যেন না তাকে অস্বীকার করি। একদিনের আনন্দ যেন না আর একদিনের নিরানন্দের কাছে লজ্জাবোধ করে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, এ-জীবনে সুখ-দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই ত সত্যিকারের পাওয়া। এই কি ঠিক নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর অজিত দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল অন্ধকারেও অপরের দুই চক্ষু একান্ত আগ্রহে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে যেন নিশ্চিত কিছু একটা শুনিতে চায়?

কৈ জবাব দিলেন না?

আপনার কথাগুলো বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না।

পারলেন না?

না।

একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। তাহার পরে কমল ধীরে ধীরে বলিল, তার মানে স্পষ্ট বোঝবার এখনো আপনার সময় আসেনি। যদি কখনো আসে আমাকে কিন্তু মনে করবেন। করবেন ত?

অজিত কহিল, করব।

গাড়ি আসিয়া সেই ভাঙা ফুল-বাগানের সম্মুখে থামিল। অজিত দ্বার খুলিয়া নিজের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, বাটীর দিকে চাহিয়া কহিল, কোথাও একটু আলো নেই, সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েচে।

কমল নামিতে নামিতে কহিল, বোধ হয়।

অজিত কহিল, দেখুন ত আপনার অন্যায়। কাউকে জানিয়ে গেলেন না, শিবনাথবাবু না জানি কত দুর্ভাবনাই ভোগ করেচেন।

কমল কহিল, হাঁ। দুর্ভাবনার ভারে ঘুমিয়ে পড়েচেন।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এই অন্ধকারে যাবেন কি করে? গাড়িতে একটা হাতলণ্ঠন আছে সেটা জ্বেলে নিয়ে সঙ্গে যাবো?

কমল অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিল, তা হলে ত বাঁচি অজিতবাবু? আসুন আসুন, আপনাকে একটুখানি চা খাইয়ে দিই।

অজিত অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, আর যা হুকুম করুন পালন করব, কিন্তু এত রাত্রে চা খাবার আদেশ করবেন না। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসচি।

সদর দরজায় হাত দিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরের বারান্দায় একজন হিন্দুস্থানী দাসী ঘুমাইতেছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া উঠিয়া বসিল। বাড়িটি দ্বিতল। উপরে ছোট ছোট গুটি-দুই ঘর। অতিশয় সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির নীচে মিট্ মিট্ করিয়া একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেইটি হাতে করিয়া কমল তাহাকে উপরে আহ্বান করিতে অজিত সঙ্কোচ-ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, এখন যাই। অনেক রাত হ'লো।

কমল জিদ্ করিয়া কহিল, সে হবে না, আসুন।

অজিত তথাপি দ্বিধা করিতেছে দেখিয়া সে বলিল, আপনি ভাবছেন এলে শিবনাথবাবুর কাছে ভারি লজ্জার কথা হবে। কিন্তু না এলে যে আমার লজ্জা আরও ঢের বেশি এ ভাবচেন না কেন? আসুন। নীচে থেকে এমন অনাদরে আপনাকে যেতে দিলে রাত্রে আমি ঘুমুতে পারবো না।

অজিত উঠিয়া আসিয়া দেখিল ঘরে আসবাব নাই বলিলেই হয়। একখানি অল্প মূল্যের আরাম কেদারা, একটি ছোট টেবিল, একটি টুল, গোটা-তিনেক তোরঙ্গ, একধারে একখানি পুরানো লোহার খাটের উপর বিছানা-বালিশ গাদা করিয়া রাখা —যেন সাধারণতঃ তাহাদের প্রয়োজন নাই এমনি একটা লক্ষ্মীছাড়া ভাব। ঘর শূন্য—শিবনাথবাবু নাই।

অজিত বিস্মিত হইল, কিন্তু মনে মনে ভারি একটা স্বস্তি বোধ করিয়া কহিল, কই তিনি ত এখনো আসেননি?

কমল কহিল, না।

অজিত বলিল, আজ বোধ হয় আমাদের ওখানে তাঁর গান-বাজনা খুব জোরেই চলচে!

কি করে জানলেন?

কাল-পরশু দু'দিন যাননি। আজ হাতে পেয়ে আশুবাবু হয়ত সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে নিচ্চেন।

কমল প্রশ্ন করিল, রোজ যান, এ দু'দিন যাননি কেন?

অজিত কহিল, সে খবর আমাদের চেয়ে আপনি বেশি জানেন। সম্ভবতঃ আপনি ছেড়ে দেননি বলেই তিনি যেতে পারেন নি। নইলে স্বেচ্ছায় গর হাজির হয়েচেন এ ত তাঁকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না।

কমল কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল। কহিল, কে জানে তিনি ওখানে যান গান-বাজনা করতে! বাস্তবিক, মানুষকে জবরদস্তি ধরে রাখা বড় অন্যায়, না?

অজিত বলিল, নিশ্চয়।

কমল কহিল, উনি ভাল লোক তাই। আচ্ছা, আপনাকে যদি কেউ ধরে রাখতো থাকতেন?

অজিত বলিল, না। তা ছাড়া আমাকে ধরে রাখবার ত কেউ নেই।

কমল হাসিমুখে বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া বলিল, ঐ ত মুস্কিল। ধরে রাখবার কে যে কোথায় লুকিয়ে থাকে জানাবার জো নেই। এই যে আমি সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ধরে রেখেচি তা টেরও পাননি। থাক্ থাক্ সব কথায় তর্ক করেই বা হবে কি? কিন্তু কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে, যাই আমি ও-ঘর থেকে চা তৈরি করে আনি।

আর একলাটি আমি চুপ করে বসে থাকবো? সে হবে না।

হবার দরকার কি, এই বলিয়া কমল সঙ্গে করিয়া তাহাকে পাশের ঘরে আনিয়া একখানি নূতন আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। কিন্তু বিচিত্র এই দুনিয়ার ব্যাপার অজিতবাবু। সেদিন এই আসনখানি পছন্দ করে কেনবার সময় ভেবেছিলাম একজনকে বসতে দিয়ে বলবো—কিন্তু সে ত আর একজনকে বলা যায় না অজিতবাবু, তবুও আপনাকে বসতে দিলুম। অথচ কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান!

ইহার অর্থ যে কি ভাবিয়া পাওয়া দায়। হয়ত অতিশয় সহজ, হয়ত ততোধিক দুরূহ। তথাপি অজিত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। বলিতে গিয়া তাহার মুখে বাধিল, তবুও কহিল, তাঁকেই বা বসতে দেননি কেন?

কমল কহিল, এই ত মানুষের মস্ত ভুল। ভাবে সবই বুঝি তাঁদের নিজের হাতে,

কিন্তু কোথায় বসে যে কে সমস্ত হিসেব ওলট-পালট করে দেয় কেউ তার সন্ধান পায় না। আপনার চায়ে কি বেশি চিনি দেব?

অজিত কহিল, দিন। চিনি আর দুধের লোভেই আমি চা খাই, নইলে ওতে আমার কোন স্পৃহা নেই।

কমল কহিল, আমিও ঠিক তাই। কেন যে মানুষে এগুলো খায় আমি ত ভেবেই পাইনে। অথচ এর দেশেই আমার জন্ম।

আপনার জন্মভূমি তা হলে আসামে?

শুধু আসাম নয়, একেবারে চা-বাগানের মধ্যে।

তবুও চায়ে আপনার রুচি নেই?

একেবারে না। লোকে দিলে খাই শুধু ভদ্রতার জন্য।

অজিত চায়ের বাটি হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কহিল, এইটি বুঝি আপনার রান্নাঘর?

কমল, বলিল হাঁ।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেই রাঁধেন বুঝি? কিন্তু কই, আজকে রাঁধার ত সময় পাননি?

কমল কহিল, না।

অজিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, এবার জিজ্ঞাসা করুন—তা হলে আপনি খাবেন কি? তার জবাবে আমি বলব, রাত্রে আমি খাইনে। সমস্তদিন কেবল একটিবার মাত্র খাই।

কেবল একটিবার মাত্র?

কমল কহিল, হাঁ। কিন্তু এর পরেই আপনার মনে হওয়া উচিত, তাই যদি হ'লো তবে শিবনাথবাবু বাড়ি এসে খাবেন কি? তাঁর খাওয়া ত দেখেচি—সে ত আর এক-আধবারের ব্যাপার নয়? তবে? এর উত্তরে আমি বলব, তিনি ত আপনাদের বাড়িতেই খেয়ে আসেন, তাঁর ভাবনা কি? আপনি বলবেন, তা বটে, কিন্তু সে ত প্রত্যহ নয়। শুনে আমি ভাববো এ-কথার জবাব পরকে দিয়ে লাভ কি? কিন্তু তাতেও আপনাকে নিরস্ত করা যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে বলতেই হবে অজিতবাবু, আপনাদের ভয় নেই, তিনি এখানে আর আসেন না। শৈব-বিবাহের শিবানীর মোহ বোধ হয় তাঁর কেটেচে?

অজিত সত্যসত্যই এ-কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে? আপনি কি রাগ করে বলচেন?

কমল কহিল, না, রাগ করে নয়। রাগ করবার বোধ হয় আজ আমার জোর

নেই। আমি জানতুম পাথর কিনতে তিনি জয়পুরে গেছেন, আপনার কাছেই প্রথম খবর পেলাম আগ্রা ছেড়ে আজও তিনি যাননি। চলুন ও-ঘরে গিয়ে বসি গে।

এ-ঘরে আসিয়া কমল বলিল, এই আমাদের শোবার ঘর। তখনও এর বেশি একটা জিনিসও এখানে ছিল না—আজও তাই আছে। কিন্তু সেদিন এদের চেহারা দেখে থাকলে আজ আমাকে বলতেও হতো না যে আমি রাগ করিনি। কিন্তু আপনার যে ভয়ানক রাত হয়ে যাচ্ছে অজিতবাবু? আর ত দেরি করা চলে না।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, আজ তা হলে আমি যাই।

কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত কহিল, যদি অনুমতি করেন ত কাল আসি।

হাঁ, আসবেন। বলিয়া সে পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিল।

অজিত বার কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, যদি অপরাধ না নেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাই। শিবনাথবাবু কতদিন হ'ল আসেননি?

হ'ল অনেকদিন। বলিয়া সে হাসিল। অজিত তাহার লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এ হাসির জাতই আলাদা। তাহার পূর্ব্বেকার হাসির সহিত কোথাও ইহার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই।

৯

অজিত যখন বাড়ি ফিরিল তখন গভীর রাত্রি। পথ নীরব, দোকান-পাট বন্ধ, কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল তাহা দমের অভাবে আটটা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে। এখন হয়ত একটা, না-হয় ত দুইটা—ঠিক যে কত কোন আন্দাজ করিতে পারিল না। আশুবাবুর গৃহে এতক্ষণ যে একটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপার চলিতেছে তাহা নিশ্চিত; শোওয়ার কথা দূরে থাক্, হয়ত খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। ফিরিয়া সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্য ঘটনা বলা যায় না। কেন যায় না সে তর্ক নিষ্ফল, কিন্তু যায় না। বরঞ্চ মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু মিথ্যা বলার অভ্যাস তাহার ছিল না, না হইলে মোটরে একাকী বাহির হইয়া বিলম্বের কারণ উদ্ভাবন করিতে ভাবনা হয় না।

গেট খোলা ছিল। দরওয়ান সেলাম করিয়া জানাইল যে সোফার নাই, সেই

তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। গাড়ি আস্তাবলে রাখিয়া অজিত আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি তখনও শুইতে যান নাই, অসুস্থ দেহ লইয়াও একাকী অপেক্ষা করিয়া আছেন। উদ্বেগে সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এই যে! আমি বার বার বলচি, কি একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েচে। কতবার তোমাকে বলেচি, পথে-ঘাটে কখনো একলা বার হতে নেই। বুড়োর কথা খাটলো ত? শিক্ষা হ'ল ত?

অজিত সলজ্জে একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনাদের এতখানি ভাবিয়ে তোলবার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত।

দুঃখ কাল ক'রো। ঘড়ির পানে তাকিয়ে ছাখো দুটো বাজে। দুটি খেয়ে এখন শোও গে। কাল শুনবো সব কথা। যদু! যদু! সে ব্যাটাও কি গেল নাকি তোমাকে খুঁজতে?

অজিত বলিল, দেখুন ত আপনাদের অন্যায়। এত বড় সহরে কোথায় সে আমাকে পথে পথে খুঁজবে?

আশুবাবু বলিলেন, তুমি ত বললে অন্যায়। কিন্তু আমাদের। যা হচ্ছিল তা আমরাই জানি। এগারোটার সময় শিবনাথের গান-বাজনা বন্ধ হয়েচে, তখন থেকে— মণিই বা গেলো কোথায়? তাকে ত তখন থেকে দেখচিনে।

অজিত কহিল, বোধ হয় শুয়েচেন।

শোবে কি হে? এখানো যে তার খাওয়া হয়নি। বলিয়াই তাঁহার হঠাৎ একটা কথা মনে হইতেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, আস্তাবলে কোচম্যানকে দেখলে?

অজিত কহিল, কই না?

তবেই হয়েচে। বলিয়া আশুবাবু দুশ্চিন্তায় আর একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, যা ভেবেচি তাই। গাড়িটা নিয়ে সেও দেখচি খুঁজতে বেরিয়েচে। ছাখো দিকি অন্যায়। পাছে বারণ করি, এই ভয়ে একটা কথাও বলেনি। চুপি চুপি চলে গেছে। কখন ফিরবে কে জানে! আজ রাতটা তা হলে জেগেই কাটলো।

আমি দেখচি গাড়িটা আছে কি না। বলিয়া অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আস্তাবলে গিয়া দেখিল গাড়ি মজুত এবং ঘোড়া মাঝে মাঝে পা ঠুকিয়া হৃষ্টচিত্তে ঘাস খাইতেছে। তাহার একটা দুশ্চিন্তা কাটিল। নীচের বারান্দার উত্তর প্রান্তে কয়েকটা বিলাতী ঝাউ ও পাম গাছ বহু অযত্ন মাথায় করিয়াও কোনমতে টিকিয়াছিল, তাহারই উপরে মনোরমার শয়নকক্ষ। তখনও আলো জ্বলিতেছে কি না জানিবার জন্য অজিত সেইদিক দিয়া ঘুরিয়া আশুবাবুর কাছে যাইতেছিল, ঝোপের মধ্যে হইতে মানুষের গলা কানে গেল। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ। কথা কহিতেছিল কি একটা গানের সুর লইয়া। দোষের কিছুই নয়—তাহার জন্য ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলার

প্রয়োজন ছিল না। ক্ষণকালের জন্য অজিতের দুই পা অসাড় হইয়া রহিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যই। আলোচনা চলিতেই লাগিল; সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল উভয়ের কেহ জানিতেও পারিল না—তাহাদের এই নিশীথ বিশ্রম্ভালাপের কেহ সাক্ষী রহিল কি না।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে?

অজিত কহিল, গাড়ি-ঘোড়া আস্তাবলেই আছে। মণি বাইরে যাননি।

বাঁচালে বাবা। এই বলিয়া আশুবাবু নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, রাত অনেক হ'ল, সে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘরে ঘুমিয়ে পড়েচে। আজ আর দেখচি মেয়েটার খাওয়া হ'ল না। যাও বাবা, তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

অজিত বলিল, এত রাত্রে আমি আর খাবো না, আপনি শুতে যান।

যাই। কিন্তু কিছুই খাবে না? একটু কিছু মুখে দিয়ে—

না কিছুই না। আপনি আর বিলম্ব করবেন না। শুতে যান। এই বলিয়া সেই রুগ্ন মানুষটিকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অজিত নিজের ঘরে আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাহল। সে নিশ্চয় জানিত সুয়ের আলোচনা শেষ হইলে পিতার খবর লইতে এদিকে একবার মনোরমা আসিবেই আসিবে।

মণি আসিল, কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা পরে। প্রথমে সে পিতার বসিবার ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। যদু বোধ হয় নিকটেই কোথাও সজাগ ছিল, মনিবের ডাকে সাড়া দেয় নাই বটে, কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলে আলো নিবাইয়া দিয়াছিল। মনোরমা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল অজিত তাহার খোলা জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ঘরে আলো ছিল না, কিন্তু উপরের গাড়ি-বারান্দার ক্ষীণ রশ্মিরেখা তাহার জানালায় গিয়া পড়িয়াছিল।

কে?

আমি অজিত।

বাঃ। কখন্ এলে? বাবা বোধ হয় শুতে গেছেন। এই বলিয়া সে যেন একটু চুপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসমাপ্ত কথার বেগ তাহাকে থামিতে দিল না। বলিতে লাগিল, ত্যাখো ত তোমার অন্যায়। বাড়িসুদ্ধ লোক ভেবে সারা—নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছিল। তাই ত বাবা বার বার বারণ করেন একলা যেতে।

এই সকল প্রশ্ন ও মন্তব্যের অজিত একটারও জবাব দিল না।

মনোরমা কহিল, কিন্তু তিনি কখনই ঘুমুতে পারেননি। নিশ্চয় জেগে আছেন। তাঁকে একটা খবর দিইগে।

অজিত কহিল, দরকার নেই। তিনি আমাকে দেখেই তবে শুতে গেছেন।

দেখেই শুতে গেছেন? তবে আমাকে একটা খবর দিলে না কেন?

তিনি মনে করেছিলেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েচ।

ঘুমিয়ে পড়ব কি-রকম? এখনো ত আমার খাওয়া হয়নি পর্য্যন্ত।

তা হলে খেয়ে শোও গে। রাত আর নেই।

তুমি খাবে না?

না, বলিয়া অজিত জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বাঃ! বেশ ত কথা! ইহার অধিক কথা তাহার মুখে ফুটিল না। কিন্তু ভিতর হইতেও আর জবাব আসিল না। বাহিরে একাকী মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়াপীড়ি করিয়া, রাগ করিয়া, নিজের জিদ্ বজায় রাখিতে তাহার জোড়া নাই—এখন কিসে যেন তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। অজিত রাত্রি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে, বাড়িসুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই—এতবড় অপরাধ করিয়াও সে-ই তাহাকে অপমানের একশেষ করিল, কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদের ভাষাও তাহার মুখে আসিল না। এবং শুধু কেবল জিহ্বাই নির্ব্বাক্ নয়, সমস্ত দেহটাই যেন কিছুক্ষণের মত বিবশ হইয়া রহিল, জানালায় কেহ ফিরিয়া আসিল না, সে রহিল, কি গেল একটু জানারও কেহ প্রয়োজন বোধ করিল না। গভীর নিশীথে এমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনোরমা বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সকালেই বেহারার মুখে আশুবাবু খবর পাইলেন কাল অজিত কিংবা মনোরমা কেহই আহার করে নাই। চা খাইতে বসিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল তোমার নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটেছিল, না?

অজিত বলিল, না।

তবে নিশ্চয় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল?

না, তেল যথেষ্ট ছিল।

তবে এত দেরি হ'ল যে?

অজিত শুধু কহিল, এমনি।

মনোরমা নিজে চা খায় না। সে পিতাকে চা তৈরী করিয়া দিয়া একবাটি চা ও খাবারের থালাটা অজিতের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু প্রশ্নও করিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না! উভয়ের এই ভাবান্তর পিতা লক্ষ্য করিলেন। আহার শেষ করিয়া অজিত স্নান করিতে গেলে তিনি কন্যাকে নিরালায় পাইয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন, না মা, এটা ভাল নয়। অজিতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হোক, তবুও এ-বাড়িতে তিনি অতিথি। অতিথির যোগ্য মর্য্যাদা তাঁকে দেওয়া চাই।

মনোরমা কহিল, দেওয়া চাইনে এ-কথা ত আমি বলিনি বাবা!

না না, বলনি সত্যি, কিন্তু আমাদের আচরণে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ পাওয়াও অপরাধ।

মনোরমা বলিল, তা মানি। কিন্তু আমার আচরণে অপরাধ হয়েচে এ তুমি কার কাছে শুনলে?

আশুবাবু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলেন না। তিনি শোনেননি কিছুই, জানেননি কিছুই, সমস্তই তাঁহার অনুমানমাত্র। তথাপি মন তাঁহার প্রসন্ন হইল না। কারণ এমনি করিয়া তর্ক করা যায়, কিন্তু উৎকণ্ঠিত পিতৃ-চিত্তকে নিঃশঙ্ক করা যায় না। খানিক পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, অত রাত্রে অজিত আর খেতে চাইলেন না, আমিও শুতে গেলাম; তুমি ত আগেই শুয়ে পড়েছিলে—কি জানি, কোথায় হয়ত আমাদের একটা অবহেলা প্রকাশ পেয়েচে; ওর মনটা আজ তেমন ভাল নেই।

মনোরমা বলিল, কেউ যদি সারা রাত পথে কাটাতে চায়, আমাদেরও কি তার জন্যে ঘরের মধ্যে জেগে কাটাতে হবে? এই কি আতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য বাবা?

আশুবাবু হাসিলেন। নিজেকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, গৃহস্থ মানে যদি এই বেতো রুগীটি হয় মা, তা হলে তাঁর কর্ত্তব্য আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়া। নইলে ঢের বড় সম্মানিত অতিথি বাত-ব্যাধির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। কিন্তু সে অর্থ যদি অন্য কাউকে বোঝায় ত তাঁর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করবার আমি কেউ নয়। আজ অনেকদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল মণি। তোমার মা তখন বেঁচে। গুপ্তিপাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরতে পারলাম না। শুধু একটা রাত মাত্রই, তবু একজন তাই নিয়ে গোটা রাত্রিটা জানালায় বসে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর কর্ত্তব্য কে নির্দ্দেশ করেছিলেন তখন জিজ্ঞেস করা হয়নি, কিন্তু আর একদিন দেখা হলে এ-কথা জেনে নিতে ভুলবো না। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য মুখ ফিরাইয়া কন্যার দৃষ্টিপথ হইতে নিজের চোখ দুটিকে আড়াল করিয়া লইলেন।

এ কাহিনী নূতন নয়। গল্পচ্ছলে এ ঘটনা বহুবার মেয়ের কাছে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তবু আর পুরাতন হয় না। যখনই মনে পড়ে তখনই নূতন হইয়া দেখা যায়।

ঝি আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। মনোরমা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, তুমি একটু ব'সো, আমি রান্নার যোগাড়টা করে দিয়ে আসি। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আলোচনাটা যে আর বেশী দূর গড়াইবার সময় পাইল না ইহাতে সে স্বস্তি বোধ করিল।

দিনের মধ্যে আশুবাবু কয়েকবার অজিতের খোঁজ করিয়া একবার জানিলেন সে বই পড়িতেছে, একবার খবর পাইলেন সে নিজের ঘরে বসিয়া চিঠিপত্র

লিখিতেছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় সে প্রায় কথাই কহিল না এবং খাওয়া শেষ হইতেই উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য দিনের তুলনায় তাহা যেমন রূঢ় তেমনি বিস্ময়কর।

আশুবাবুর ক্ষোভের পরিসীমা নাই, কহিলেন, ব্যাপার কি মণি?

মনোরমা আজ বরাবরই পিতার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেছিল, এখনও বিশেষ কোনদিকে না চাহিয়াই কহিল, জানিনে ত বাবা!

তিনি ক্ষণকাল নিজের মনে চিন্তা করিয়া যেন নিজেকেই বলিতে লাগিলেন, তার ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি ত জেগেই ছিলাম। খেতেও বললাম, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়েচে বলে সে নিজেই খেলে না। তোমার শুয়ে পড়াটা হয়ত ঠিক হয়নি, কিন্তু এতে এমন কি অন্যায় হয়েচে আমি ত ভেবেই পাইনি। এই তুচ্ছ কারণটাকে সে এত করে মনে নেবে এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ভিতরের লজ্জাটা দমন করিয়া বলিলেন, কথাটা তাকে তুমি জিজ্ঞেসা করলে না কেন?

মনোরমা জবাব দিল, জিজ্ঞেসা করবার কি আছে বাবা?

জিজ্ঞেসা করবার অনেক আছে, কিন্তু করাও কঠিন—বিশেষতঃ মণির পক্ষে। ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি কহিলেন, সে যে রাগ করে আছে এ ত খুব স্পষ্ট। বোধ হল সে ভেবেচে তুমি উপেক্ষা কর। এ-রকম অন্যায় ধারণা ত তার মনে রাখা যেতে পারে না।

মনোরমা বলিল, আমার সম্বন্ধে ধারণা যদি তিনি অন্যায় ভাবে করে থাকেন সে তাঁর দোষ! একজনের দোষ সংশোধনের গরজটা কি আর একজনের গায়ে পড়ে নিতে হবে বাবা?

তিনি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মেয়েকে তিনি যেভাবে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাহার আত্মসম্মানে আঘাত পড়ে এমন কোন আদেশই করিতে পারেন না। সে উঠিয়া গেলে এই কথাটাই নিজের মধ্যে অবিশ্রাম তোলপাড় করিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। এরূপ কলহ ঘটিয়াই থাকে এ ভ্রম ক্ষণিক মাত্র, এমন একটা কথা তিনি বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়াও জোর পাইলেন না। অজিতকেও তিনি জানিতেন। শুধু কেবল সে সকল দিক দিয়াই সুশিক্ষিত নয়, তাহার মধ্যে একটা চরিত্রের সত্যপরতায় তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আজিকার এই অহেতুক বিরাগের কোনমতেই সামঞ্জস্য হয় না। সকলের অপরিসীম উদ্বেগের হেতু হইয়াও সে লজ্জাবোধের পরিবর্ত্তে রাগ করিয়া রহিল, এমন অসম্ভব যে কি করিয়া তাহাতে সম্ভবপর হইল মীমাংসা করা কঠিন।

বিকালের দিকে একখানা টাঙ্গা গাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া আশুবাবু

খবর লইয়া জানিলেন। গাড়ি আসিয়াছে অজিতের জন্য। অজিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিতে তিনি কষ্টে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, টাঙ্গা কি হবে অজিত?

একবার বেড়াতে বার হবো।

কেন, মোটর কি হ'লো? আবার বিগড়েচে নাকি?

না। কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে ত।

যদি হয়ও তার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি আছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, বাবা অজিত, আমাকে সত্যি বল। মোটর নিয়ে কোন কথা উঠেচে?

অজিত কহিল, কই আমি ত জানিনে! তবে আজ আপনাদের গান-বাজনার আয়োজন আছে। তাঁদের আনতে বাড়ি পৌছে দিতে মোটরের আবশ্যকই বেশি। ঘোড়ার গাড়িতে ঠিক হয়ে উঠবে না।

সকাল হইতে নানারূপ দুশ্চিন্তায় কথাটা আশুবাবু ভুলিয়াই ছিলেন। এখন মনে পড়িল কাল সভাভঙ্গের পর আজিকার জন্যও তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পর মজলিশ বসিবে। একটা খাওয়ানোর কল্পনাও যে মনোরমার ছিল এই সঙ্গে এ-কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু মনে মনে একটু হাসিলেন। কারণ প্রচ্ছন্ন কলহের মানসিক অস্বচ্ছন্দতায় কথাটা তাঁহার নিজেরই মনে নাই এবং মনে পড়িয়াও ভাল লাগিল না, তখন মেয়ের কাছে যে আজ এ-সকল কতদূর বিরক্তিকর তাহা স্বতঃসিদ্ধের মত অনুমান করিয়া কহিলেন, আজ ও-সব হবে না অজিত।

অজিত কহিল, কেন?

কেন? মণিকেই একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ না। এই বলিয়া তিনি বেয়ারাকে উচ্চৈস্বরে ডাকাডাকি করিয়া কন্যাকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি রাগ করে আছ বাবা, গান-বাজনা শুনবে কে? মণি? আচ্ছা সে-সব আর একদিন হবে, এখন যাও তুমি মোটর নিয়ে একটু ঘুরে এসো গে। কিন্তু বেশী দেরি করতে পাবে না। আর তোমার একলা যাওয়া চলবে না তা বলে দিচ্চি। ড্রাইভার ব্যাটা যে কুঁড়ে হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটা সুকঠিন সমস্যার অভাবনীয় সুমীমাংসা করিয়া উজ্জ্বল আনন্দে আরাম-কেদারায় চিৎ হইয়া পড়িয়া ফোঁস করিয়া পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তুমি যাবে টাঙ্গা ভাড়া করে বেড়াতে! ছিঃ!

মনোরমা ঘরে পা দিয়া অজিতকে দেখিয়া ঘাড় বাঁকাইল। সাড়া পাইয়া আশুবাবু আবার সোজা হইয়া বসিলেন, সকৌতুক স্নিগ্ধ-হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলি আজকের কথাটা মনে আছে ত মা? না একদম ভুলে বসে আছ?

কি বাবা ?

আজ যে সকলের নেমন্তন্ন ? তোমাদের গানের পালা শেষ হলে তাদের যে আজ খাওয়াবে—বলি, মনে আছে ত ?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে বৈ কি ! মোটর পাঠিয়ে দিয়েচি তাঁদের আনতে।

মোটর পাঠিয়েচ আনতে ? কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ?

মণি কহিল, সমস্ত ঠিক আছে বাবা, ত্রুটি হবে না।

আচ্ছা, বলিয়া তিনি পুনরায় চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন। মুখের 'পরে কে যেন কালি লেপিয়া দিল।

মনোরমা চলিয়া গেল। অজিতও বাহির হইয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, অজিত, মেয়ের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার লজ্জা করে। কিন্তু ওর মা বেঁচে নেই, তিনি থাকলে আমাকে এ-কথা বলতে হ'তো না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু বলিলেন, ওর 'পরে তুমি কেন রাগ করে আছ এ তিনিই তোমার কাছ থেকে বার করে নিতেন, কিন্তু তিনি ত নেই, আমাকে কি তা বলা যায় না ?

তাহার কণ্ঠস্বর এমনি সকরুণ যে ক্লেশ বোধ হয়। তথাপি অজিত নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর সঙ্গে কি তোমার কোন কথাবার্ত্তা হয়নি ?

অজিত কহিল, হয়েছিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, হয়েছিল ? কখন হ'ল ? মণি হঠাৎ যে কাল ঘুমিয়ে পড়েছিল এ কি তোমাকে সে বলেছিল ?

অজিত কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বোধ হয় কি জবাব দিবে ইহাই ভাবিয়া লইল, তার পরে ধীরে ধীরে কহিল, অতরাত্রি পর্য্যন্ত নিরর্থক জেগে থা। সহজও নয়, উচিতও নয়। ঘুমুলে অন্যায় হ'তো না, কিন্তু তিনি ঘুমোননি। আপনি শুতে যাবার খানিক পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তার পরে ?

তার পরে আর কোন কথা আপনাকে বলব না। বলিয়া সে চলিয়া গেল। দ্বারের বাহির হইতে বলিয়া গেল, হয়ত কাল-পরশু আমি এখান থেকে যেতে পারি।

আশুবাবু কিছুই বুঝিলেন না, শুধু বুঝিলেন কি একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেছে।

অজিতকে লইয়া টাঙ্গা বাহির হইয়া গেল সে তিনি শুনিতে পাইলেন। মিনিট-

কয়েক পরে প্রচুর কোলাহল করিয়া নিমন্ত্রিতদের লইয়া মোটর ফিরিয়া আসিল সেও তাঁহার কানে গেল। কিন্তু তিনি নড়িলেন না, সেইখানেই মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। বৈঠক বসিলে বেহারা গিয়া সংবাদ দিল, বাবুর শরীর ভাল নয়, তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন।

সেদিন গান জমিল না খাওয়ার উৎসাহ ম্লান হইয়া গেল, সকলেরই বার বার মনে হইতে লাগিল বাড়ির একজন ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া গেছেন এবং আর একজন তাঁহার বিপুল দেহ প্রসন্ন স্নিগ্ধহাস্য লইয়া সভার যে স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন আজ সেখানটা শূন্য পড়িয়া আছে।

১০

এদিকে অজিতের গাড়ি আসিয়া কমলের বাটীর সম্মুখে থামিল। কমল পথের ধারের সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, চোখাচোখি হইতেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। গাড়িটাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিল, ওটা বিদেয় করে দিন। সুমুখে দাঁড়িয়ে কেবল ফেরবার তাড়া দেবে।

সিঁড়ির মুখেই আবার দেখা হইল। অজিত কহিল, বিদেয় করে ত দিলেন, কিন্তু ফেরবার সময় আর একটা পাওয়া যাবে ত?

কমল বলিল, না, কতটুকুই বা পথ, হেঁটে যাবেন।

হেঁটে যাব?

কেন ভয় করবে নাকি! না হয় আমি নিজে গিয়ে আপনাকে বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব। আসুন। বলিয়া সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরে আনিয়া বসিবার জন্য কল্যকার সেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া কহিল, চেয়ে দেখুন সারাদিন ধরে আমি কত রান্না রেঁধেছি। আপনি না এলে রাগ করে আমি সমস্ত মুচিদের ডেকে দিয়ে দিতাম।

অজিত বলিল, আপনার রাগ ত কম নয়! কিন্তু তাতে এর চেয়ে খাবারগুলোর ঢের বেশি সদগতি হ'তো।

এ-কথার মানে? বলিয়া কমল ক্ষণকাল অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজেই কহিল, অর্থাৎ আপনার অভাব নেই, হয়ত অধিকাংশই ফেলা যাবে,

কিন্তু তাদের অত্যন্ত অভাব। তারা খেয়ে বাঁচবে। সুতরাং তাদের খাওয়ানোই খাবারের যথার্থ সদ্ব্যবহার, এই না ?

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ-ছাড়া আর কি !

কমল বলিল, এ হ'লো সাধু লোকদের ভাল-মন্দর বিচার, পুণ্যাত্মাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধির যুক্তি। পরলোকের খাতায় তারা একেই সার্থক ব্যয় বলে লিখিয়ে রাখতে চায়, বোঝে না যে আসলে ঐটেই হ'লো ভুয়ো। আনন্দের সুধাপাত্র যে অপব্যয়ের অন্যায়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ-কথা তারা জানবে কোথা থেকে ?

অজিত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, মানুষের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ভেতরে আনন্দ নেই নাকি ?

কমল কহিল, না নেই। কর্ত্তব্যের মধ্যে যে আনন্দের ছলনা সে দুঃখেরই নামান্তর। তাকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে জোর করে মানতে হয়। সেই ত বন্ধন। তা না হলে এই যে শিবনাথের আসনে এনে আপনাকে বসিয়েচি, ভালবাসার এই অপব্যয়ের মধ্যে আমি আনন্দ পেতাম কোথায় ? এই যে সারাদিন অভুক্ত থেকে কত কি বসে রেঁধেচি—আপনি এসে খাবেন বলে এত বড় অকর্ত্তব্যের ভেতরে আমি তৃপ্তি পেতাম কোনখানে ? অজিতবাবু, আজ আমার সকল কথা আপনি বুঝবেন না, বোঝবার চেষ্ট করেও লাভ নেই, কিন্তু এতখানি উল্টো কথার অর্থ যদি কখনো আপনা থেকে উপলব্ধি করেন, সেদিন কিন্তু আমাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু এখন থাক্, আপনি খেতে বসুন। বলিয়া সে পাত্র ভরিয়া বহুবিধ ভোজ্যবস্তু তাহার সম্মুখে রাখিল।

অজিত বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ ঠিক যে আপনার শেষ কথাগুলোর অর্থ আমি ভেবে পেলাম না, কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে যেন একেবারে অবোধ্য নয়। বুঝিয়ে দিলে হয়ত বুঝতে পারি।

কমল কহিল, কে বুঝিয়ে দেবে অজিতবাবু, আমি ? আমার দরকার ? বলিয়া সে হাসিয়া বাকী পাত্রগুলি অগ্রসর করিয়া দিল।

অজিত আহারে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় জানেন না যে, কাল আমার খাওয়া হয়নি।

কমল কহিল, জানিনে বটে, কিন্তু আমার ভয় ছিল অত রাত্রে ফিরে গিয়ে হয়ত আপনি খাবেন না। তাই হয়েচে। আমার দোষেই কাল কষ্ট পেলেন।

কিন্তু আজ সুদ-সুদ্ধ আদায় হচ্চে। কথাটা বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল কমল এখনও অভুক্ত। মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু আমি একেবারে জন্তুর মত স্বার্থপর। সারাদিন আপনি খাননি, অথচ সেদিকে আমার হুঁস নেই, দিব্যি খেতে বসে গেছি।

কমল্ হাসিমুখে জবাব দিল, এ যে আমার নিজের খাওয়ার চেয়ে বড়, তাই ত তাড়াতাড়ি আপনাকে বসিয়ে দিয়েচি অজিতবাবু। এই বলিয়া সে একটু থামিয়া কহিল, আর এ-সব মাছ-মাংসের কাণ্ড আমি ত খাইনে।

কিন্তু কি খাবেন আপনি?

ঐ যে। বলিয়া সে দূরে এনামেলের বাটিতে ঢাকা একটা বস্তু হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওর মধ্যে আমার চাল-ডাল আলু-সেদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আমার রাজভোগ।

এ-বিষয়ে অজিতের কৌতূহল নিবৃত্ত হইল না, কিন্তু তাহার সঙ্কোচে বাধিল। পাছে সে দারিদ্র্যের উল্লেখ করে, এই আশঙ্কায় সে অন্য কথা পাড়িল। কহিল, আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই আমার কি যে বিস্ময় লেগেছিল তা বলতে পারিনে।

কমল হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, সে ত আমার রূপ। কিন্তু সেও হার মেনেচে অক্ষয়বাবুর কাছে। তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি।

অজিত লজ্জা পাইয়াও হাসিল, কহিল, বোধ হয় না। তিনি গোলকুণ্ডার মানিক তাঁর গায়ে আঁচড় পড়ে না। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছিল আপনার কথা শুনে। হঠাৎ যেন ধৈর্য্য থাকে না, রাগ হয়। মনে হয় কোন সত্যিকেই আপনি আমল দিতে চান না। হাত বাড়িয়ে পথ আগলানোই যেন আপনার স্বভাব।

কমল হয়ত ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, তা হবে। কিন্তু আমার চেয়ে বড় বিস্ময় সেখানে ছিল—সে আর একটা দিক। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি বিরাট শান্তি! ধৈর্য্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছায় না। ইচ্ছে হয় আমি যদি তাঁর মেয়ে হ'তাম।

কথাটি অজিতের অত্যন্ত ভাল লাগিল। আশুবাবুকে সে অন্তরের মধ্যে দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তথাপি কহিল, আপনাদের উভয়ের এমন বিপরীত প্রকৃতি মিলতো কি করে?

কমল বলিল, তা জানিনে। আমার ইচ্ছের কথাই শুধু বললাম। মণির মত আমিও যদি তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মাতাম! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমার নিজের বাবাও বড় কম লোক ছিলেন না। তিনি এমনি ধীর, এমনি শান্ত মানুষটি ছিলেন।

কমল দাসীর কন্যা, ছোটজাতের মেয়ে, সকলের কাছে অজিত এই কথাই শুনিয়াছিল। এখন কমলের নিজের মুখে তাহার পিতার গুণের উল্লেখে তাহার জন্ম-রহস্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে তাহার ব্যথার স্থানে অতর্কিত আঘাত করে এই ভয়ে প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিন্তু মনটি তাহার ভিতরে ভিতরে স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইল। কিন্তু তাহাকে উঠিতে বলায় অজিত অস্বীকার করিয়া বলিল, আগে আপনার খাওয়া শেষ হোক। তার পরে।

কেন কষ্ট পাবেন অজিতবাবু, উঠুন। বরঞ্চ মুখ ধুয়ে এসে বসুন, আমি খাচ্চি।

না, সে হবে না। আপনি না খেলে আমি আসন ছেড়ে এক-পাও উঠবো না।

বেশ মানুষ ত! বলিয়া কমল হাসিয়া আহার্য্য-দ্রব্যের ঢাকা খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। কমল লেশমাত্র অত্যুক্তি করে নাই। চাল-ডাল ও আলু-সিদ্ধই বটে। শুকাইয়া প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দিন সে কি খায়, না খায়, সে জানে না। কিন্তু আজ এত প্রকার পর্য্যাপ্ত আয়োজনের মাঝেও এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মপীড়নে তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। কাল শুনিয়াছিল দিনান্তে সে একটিবার মাত্র খায় এবং আজ দেখিতে পাইল তাহা এই। সুতরাং যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাহাই বলুক, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্ম-সংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধ চক্ষে মাধুর্য্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল, এবং এই বঞ্চনায়, অসম্মানে ও অনাদরে যে কেহ ইহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি তাহার ঘৃণার অবধি রহিল না। কমলের খাওয়ার প্রতি চাহিয়া এই ভাবটাকে সে আর চাপিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, নিজেদের বড় মনে করে যারা অপমানে আপনাকে দূরে রাখতে চায়, যারা অকারণে গ্লানি করে বেড়ায়, তারা কিন্তু আপনার পদস্পর্শেরও যোগ্য নয়। সংসারে দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।

কমল অকৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কেন তা জানিনে, কিন্তু আমি শপথ ক'রে বলতে পারি।

কমলের বিস্ময়ের ভাব কাটিল না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

অজিত বলিল, যদি ক্ষমা করেন ত একটা প্রশ্ন করি।

কি প্রশ্ন?

পাপিষ্ঠ শিবনাথের কাছে এই অপমান ও বঞ্চনা পাবার পরেই কি এই কৃচ্ছ্র অবলম্বন করেচেন?

কমল কহিল, না। আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকেই আমি এমনি খাই। এতে আমার কষ্ট হয় না।

অজিতের মুখের উপরে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল! সে কয়েকমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আর একবার বিবাহ হয়েছিল নাকি?

কমল কহিল, হাঁ। তিনি একজন অসমীয়া ক্রিশ্চান। তাঁর মৃত্যুর পরেই আমার বাবা মারা গেলেন হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে। তখন শিবনাথের এক খুড়ো ছিলেন বাগানের হেড ক্লার্ক। তাঁর স্ত্রী ছিল না, মাকে তিনি আশ্রয় দিলেন।

আমিও তাঁর সংসারে এলাম। এইরকম নানা দুঃখে-কষ্টে পড়ে একবেলা খাওয়াই অভ্যাস হয়ে গেল। কৃচ্ছ্রসাধন আর কি, বরঞ্চ শরীর মন দুই-ই ভাল থাকে।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনারা শুনেচি জাতে তাঁতি।

কমল কহিল, লোকে তাই বলে। কিন্তু মা বলতেন তাঁর বাবা ছিলেন আপনাদের জাতেরই একজন কবিরাজ। অর্থাৎ আমার সত্যিকার মাতামহ তাঁতি নয় বৈদ্য। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, তা তিনি যে-ই হোন, এখন রাগ করাও বৃথা, আপশোস করাও বৃথা।

অজিত কহিল, সে ঠিক।

কমল বলিল, মার রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। বিয়ের পরে কি একটা দুর্নাম রটায় তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে আসামের চা-বাগানে পালিয়ে যান। কিন্তু বাঁচলেন না, কয়েক মাসের জ্বরেই মারা গেলেন। বছর তিনেক পরে আমার জন্ম হ'ল বাগানের বড় সাহেবের ঘরে।

তাহার বংশ ও জন্মগ্রহণের বিবরণ শুনিয়া অজিতের মুহূর্তকাল পূর্ব্বের স্নেহ ও শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত হৃদয় বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া গেল। তাহার সবচেয়ে বাজিল এই কথাটা যে, নিজের ও জননীর এতবড় একটা লজ্জাকর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে ইহার লজ্জার লেশমাত্র নাই। অনায়াসে বলিল, মায়ের রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। যে অপরাধে একজন মাটির সহিত মিশিয়া যাইত, সে ইহার কাছে রুচির বিকার মাত্র। তার বেশী নয়।

কমল বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার বাপ ছিলেন সাধু লোক। চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততায়—এমন মানুষ খুব কম দেখেচি অজিতবাবু। জীবনের উনিশটা বছর আমি তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছিলাম।

অজিতের একবার সন্দেহ হইয়াছিল এ হয়ত পরিহাস করিতেছে। কিন্তু এ কি রকম তামাসা? কহিল, এসব কি আপনি সত্যি বলচেন?

কমল একটু আশ্চর্য্য হইয়া জবাব দিল, আমি ত কখনই মিথ্যে বলিনে অজিত-বাবু। পিতার স্মৃতি পলকের জন্য তাহার মুখের 'পরে একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি ফেলিয়া গেল। কহিল, জীবনে কখনো কোন কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বার বার দিয়ে গেছেন।

অজিত তথাপি যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, আপনি ইংরাজের কাছে যদি মানুষ, আপনার ইংরাজী জানাটাও ত উচিত।

প্রত্যুত্তরে কমল শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল। বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে, চলুন ও-ঘরে যাই।

না, এখন আমি উঠব।

বসবেন না? আজ এত শীঘ্র চলে যাবেন!

হাঁ, আজ আর সময় হবে না।

এতক্ষণ পরে কমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের উপর অত্যন্ত কঠোরতা লক্ষ্য করিল। হয়ত কারণটাও অনুমান করিল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা যান।

ইহার পরে যে কি বলিবে অজিত খুঁজিয়া পাইল না, শেষে কহিল, আপনি কি এখন আগ্রাতেই থাকবেন?

কেন?

ধরুন শিবনাথবাবু যদি আর না-ই আসেন। তাঁর 'পরে ত আপনার জোর নেই!

কমল কহিল, না। একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের ওখানে ত তিনি রোজ যান, গোপনে একটু জেনে নিয়ে কি আমাকে জানাতে পারবেন না?

তাতে কি হবে?

কমল কহিল, কি আর হবে। বাড়ি-ভাড়াটা এমাসের দেওয়াই আছে, আমি তা হ'লে কাল-পরশু চলে যেতে পারি।

কোথায় যাবেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনার হাতে বোধ করি টাকা নেই?

কমল এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

অজিত নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আসবার সময় আপনার জন্যে কিছু টাকা এনেছিলাম। নেবেন?

না।

না কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি আপনার হাতে কিছু নেই। যাও বা ছিল, আজ আমারই জন্য তাও নিঃশেষ হয়েচে। কিন্তু উত্তর না পাইয়া সে পুনশ্চ কহিল, প্রয়োজনে বন্ধুর কাছে কি কেউ নেয় না?

কমল কহিল, কিন্তু বন্ধু ত আপনি নন।

না ই হ'লাম। কিন্তু অ-বন্ধুর কাছেও ত লোকে ঋণ নেয়; আবার শোধ দেয়। আপনি তাই কেন নিন না।

কমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে বলেচি আমি কখনোই মিথ্যে বলিনে।

কথা মৃদু, কিন্তু তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ। অজিত বুঝিল ইহার অন্যথা হইবে না। চাহিয়া দেখিল প্রথম দিনে তাহার গায়ে সামান্য অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল আজ

তাহাও নাই। সম্ভবতঃ বাড়ি-ভাড়া ও এই কয়দিনের খরচ চালাইতে শেষ হইয়াছে। সহসা ব্যথার ভারে তাহার মনের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাওয়াই কি স্থির?

কমল কহিল, তা ছাড়া উপায় কি আছে?

উপায় কি আছে সে জানে না এবং জানে না বলিয়াই তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, জগতে কি কেউ নেই যাঁর কাছে এ-সময়েও কিছু সাহায্য নিতে পারেন?

কমল একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আছেন। মেয়ের মত তাঁর কাছে গিয়েই শুধু হাত পেতে নিতে পারি। কিন্তু আপনার যে রাত হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দেব কি?

অজিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, আমি একাই যেতে পারবো।

তা হলে আসুন, নমস্কার। বলিয়া কমল তাহার শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অজিত মিনিট-দুই সেখানে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

১১

বেলা তৃতীয় প্রহর। শীতের অবধি নাই। আশুবাবুর বসিবার ঘরে শার্সিগুলো সারাদিন বন্ধ আছে, তিনি আরাম-কেদারার দুই হাতলের উপর দুই পা মেলিয়া দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা পড়িতেছিলেন, সেই কাগজের পাতার পিছনের দরজার দিকে একটা ছায়া পড়ায় বুঝিলেন এতক্ষণে তাহার বেহারার দিবানিদ্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কহিলেন, কাঁচা ঘুমে ওঠোনি ত বাবা, তা হলে আবার মাথা ধরবে। বিশেষ কষ্ট বোধ না করো ত গায়ের কাপড়টা দিয়ে গরীবের পা দুটো-একটু ঢেকে দাও।

নীচের কার্পেটে একখানা মোটা বালাপোষ লুটাইতেছিল, আগন্তুক সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাঁহার দুই পা ঢাকিয়া দিয়া পায়ের তলা পর্য্যন্ত বেশ করিয়া মুড়িয়া দিল।

আশুবাবু কহিলেন, হয়েচে বাবা, আর অতি-যত্নে কাজ নেই। এইবার একটা চুরুট দিয়ে আর একটুখানি গড়িয়ে নাও গে, এখনো একটু বেলা আছে। কিন্তু বুঝবে বাবা কাল—

অর্থাৎ কাল তোমার চাকুরি যাইবেই। কোন সাড়া আসিল না, কারণ প্রভুর এবংবিধ মন্তব্যে ভৃত্য অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করাও যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিচলিত হওয়াও তেমনি বাহুল্য।

আশুবাবু হাত বাড়াইয়া চুরুট গ্রহণ করিলেন এবং দেশলাই জ্বালার শব্দে এতক্ষণে লেখা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অভিভূতের মত স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, তাই ত বলি, একি যেদোর হাত? এমন করে পা ঢেকে দিতে ত তার চৌদ্দপুরুষে জানে না।

কমল বলিল, কিন্তু এ-দিকে যে হাত পুড়ে যাচ্ছে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া জ্বলন্ত কাঠিটা তাহার হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন এবং সেই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে জোর করিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এতদিন তোমাকে দেখতে পাইনি কেন মা?

এই প্রথম তাহাকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের যে কোন অর্থ নাই তাহা উচ্চারণ করিবামাত্র নিজেই টের পাইলেন।

কমল একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দূরে বসিতে যাইতেছিল, তিনি তাহা হইতে দিলেন না, বলিলেন, ওখানে নয় মা, আমার খুব কাছে এসে ব'সো! এই বলিয়া তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এখন হঠাৎ যে কমল?

কমল কহিল, আজ ভারি ইচ্ছে হ'ল আপনাকে একবার দেখে আসি, তাই চলে এলাম।

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু কহিলেন, বেশ করেচো। কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্যান্য সকলের মতো তিনিও জানেন এদেশে কমলের সঙ্গী সাথী নাই, কেহ তাহাকে চাহে না, কাহারও বাটীতে তাহার যাইবার অধিকার নাই—নিতান্ত নিঃস্ব জীবনই এই মেয়েটিকে অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—কমল, তোমার যখন খুশি স্বচ্ছন্দে আসিয়ো। আর যাহার কাছেই হোক, আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার পরে বোধ করি কথার অভাবেই তিনি মিনিট দুই-তিন কেমন একপ্রকার অন্যমনস্কের মত মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাতের কাগজগুলো নীচে খসিয়া পড়িতে কমল হেঁট হইয়া তুলিয়া দিয়া কহিল, আপনি পড়ছিলেন, আমি অসময়ে এসে বোধ হয় বিঘ্ন করলাম।

আশুবাবু বলিলেন, না। পড়া আমার হয়ে গেছে। যেটুকু বাকী আছে তা না

পড়লেও চলে—পড়বার ইচ্ছেও নেই। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, তা ছাড়া তুমি চলে গেলে আমাকে একলা থাকতেই ত হবে, তার চেয়ে বসে দুটো গল্প করো, আমি শুনি।

কমল কহিল, আমি ত আপনার সঙ্গে সারাদিন গল্প করতে পেলে বেঁচে যাই। কিন্তু আর সকলে রাগ করবেন যে?

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও আশুবাবু ব্যথা পাইলেন; কহিলেন, কথা তোমার মিথ্যে নয় কমল। কিন্তু যাঁরা রাগ করবেন তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই। এখানকার নতুন ম্যাজিস্ট্রেট বাঙালী। তাঁর স্ত্রী হচ্চেন মণির বন্ধু, একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। দিন-দুই হ'ল তিনি স্বামীর কাছে এসেচেন, মণি তাঁর ওখানেই বেড়াতে গেছেন, ফিরতে বোধ হয় রাত্রি হবে।

কমল সহাস্যে প্রশ্ন করিল, আপনি বললেন যাঁরা রাগ করবেন। একজন ত মনোরমা, কিন্তু বাকী কারা?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই। এখানে তার অভাব নেই। আগে মনে হ'তো অজিতের হয়ত তোমার প্রতি রাগ নেই, কিন্তু এখন দেখি তার বিদ্বেষই যেন সবচেয়ে বেশি, যেন অক্ষয়বাবুকেও হার মানিয়েচে।

কমল চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এসেও তাকে এমন দেখিনি, কিন্তু হঠাৎ দিন দু'-তিনের মধ্যে সে যেন বদলে গেল। এখন অবিনাশকেও দেখি তাই। এরা সবাই মিলে যেন তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেচে।

এবার কমল হাসিল, কহিল, অর্থাৎ কুশাঙ্কুরের উপর বজ্রাঘাত। কিন্তু আমার মত সমাজ ও লোকালয়ের বাইরে তুচ্ছ একজন মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কিসের জন্য? আমি ত কারও বাড়িতে যাইনে।

আশুবাবু বলিলেন, তা যাও না সত্যি। সহরের কোথায় তোমাদের বাসা তাও কেউ জানে না, কিন্তু তাই বলে তুমি তুচ্ছ নয় কমল। তাই তোমাকে এরা ভুলতেও পারে না, মাপ করতেও পারে না। তোমার আলোচনা না করে, তোমায় খোঁটা না দিয়ে এদের স্বস্তিও নেই, শান্তিও নেই। অকস্মাৎ হাতের কাগজগুলো তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এটা কি জানো? অক্ষয়বাবুর রচনা। ইংরেজী না হলে তোমাকে পড়ে শোনাতাম। নাম-ধাম নেই, কিন্তু আগাগোড়া শুধু তোমারই কথা, তোমাকেই আক্রমণ। কাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে নারী-কল্যাণ সমিতির উদ্বোধন হবে—এ তারই মঙ্গল-অনুষ্ঠান। এই বলিয়া তিনি সেগুলো দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কহিলেন, এ শুধু প্রবন্ধ নয়, মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে নানা কথা বার করা হয়েচে। এর মূল নীতির সঙ্গে কারও বিরোধ নেই—বিরোধ থাকতেও পারে না, কিন্তু এ ত সে নয়। ব্যক্তি-বিশেষকে পদে পদে আঘাত করতে

পারাই যেন এর আসল আনন্দ। কিন্তু অক্ষয়ের আনন্দ আর আমার আনন্দ ত এক নয় কমল, একে ত আমি ভাল বলতে পারিনে।

কমল কহিল, কিন্তু আমি ত আর এ লেখা শুনতে যাবো না—আমাকে আঘাত করার সার্থকতা কি ?

আশুবাবু বলিলেন, কোন সার্থকতা নেই। তাই বোধ হয় ওরা আমাকে পড়তে দিয়েচে। ভেবেচে ভরাডুবির মুষ্টিলাভ। বুড়োকে দুঃখ দিয়ে যতটুকু ক্ষোভ মেটে। এই বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া কমলের হাতখানি আর একবার টানিয়া লইলেন। এই স্পর্শটুকুর মধ্যে যে কি কথা ছিল কমল তাহার সবটুকু বুঝিল না, তবু তাহার ভিতরটা কি একরকম করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া কহিল, আপনার দুর্ব্বলতাটুকু তাঁরা ধরেচেন, কিন্তু আসল মানুষটিকে তাঁরা চিনতে পারেননি।

তুমি কি পেরেচো মা ?

বোধ হয় ওঁদের চেয়ে বেশি পেরেচি।

আশুবাবু ইহার উত্তর দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, সবাই ভাবে এই সদানন্দ বুড়োলোকটির মত সুখী কেউ নেই। অনেক টাকা, অনেক বিষয়-আশয়—

কিন্তু সে ত মিথ্যে নয়।

আশুবাবু বলিলেন, না, মিথ্যে নয়। অর্থ এবং সম্পত্তি আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু ও মানুষের কতটুকু কমল ?

কমল সহাস্যে কহিল, অনেকখানি আশুবাবু।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন, পরে কহিলেন, যদি কিছু না মনে করো ত তোমাকে একটা কথা বলি।

বলুন।

আমি বুড়োমানুষ, আর তুমি আমার মণির সমবয়সী। তোমার মুখ থেকে আমার নিজের নামটা আমার নিজের কানেই যেন বাধে কমল। তোমার বাধা না থাকে ত আমাকে বরঞ্চ কাকাবাবু বলে ডেকো।

কমলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, কথায় বলে নেই-মামার চেয়ে কানা-মামাও ভালো। আমি কানা নই বটে, কিন্তু খোঁড়া—বাতে পঙ্গু। বাজারে আশু বদ্যির কেউ কানাকড়ি দাম দেবে না। এই বলিয়া তিনি সহাস্য কৌতুকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, নাই দিলে মা, কিন্তু যার বাবা বেঁচে নেই তার অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। তার খোঁড়া-কাকাই ভালো।

অন্য পক্ষ হইতে জবাব না পাইয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কেউ যদি খোঁচাই

দেয় কমল, তাকে বিনয় করে ব'লো, এই আমার চেয়। ব'লো গরীবের রাঙই সোনা।

তাঁহার চেয়ারের পিছন দিকে বসিয়া কমল ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া অশ্রু-নিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল, উত্তর দিতে পারিল না। এই দু'জনের কোথাও মিল নাই। শুধু অনাত্মীয়-পরিচয়ের সুদূর ব্যবধানই নয়—শিক্ষা, সংস্কার, রীতি-নীতি, সংসার ও সামাজিক ব্যবস্থায় উভয়ের কত বড়ই না প্রভেদ? কোন সম্বন্ধই যেখানে নাই, সেখানে শুধু কেবল একটা সম্বোধনের ছল করিয়া এই বাঁধিয়া রাখিবার কৌশলে কমলের চোখে বহুকাল পরে জল আসিয়া পড়িল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মা, পারবে ত বলতে?

কমল উচ্ছ্বসিত অশ্রু সামলাইয়া লইয়া শুধু কহিল, না।

না! না কেন?

কমল এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না, অন্য কথা পাড়িল। কহিল, অজিতবাবু কোথায়?

আশুবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কি জানি, হয়ত বাড়িতেই আছে। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ক'দিন থেকে আমার কাছে বড় একটা সে আসে না। হয়ত সে এখান থেকে শীঘ্রই চলে যাবে।

কোথায় যাবেন?

আশুবাবু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, বুড়োমানুষকে সবাই কি সব কথা বলে মা? বলে না। হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে না। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুনেচো বোধ হয় মণির সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ অনেকদিন থেকেই স্থির ছিল, হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ওরা কি নিয়ে একটা ঝগড়া করেচে। কেউ কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই কয় না।

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জগদীশ্বর মালিক, তাঁর ইচ্ছে। একজন গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠেচে, আর একজন তার পুরানো অভ্যাস সুদে-আসলে ঝালিয়ে তোলবার জোগাড় করেচে। এই ত চলচে।

কমল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কি তাঁর পুরানো অভ্যাস?

আশুবাবু বলিলেন, সে অনেক। ও গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েচে, মণিকে ভালবেসেচে, দেশের কাজে হাজতে গেছে, বিলেত গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েচে, ফিরে এসে সংসারী হবার ইচ্ছে, কিন্তু সম্প্রতি বোধ হয় সেটা একটু বদলেচে। আগে মাছ-মাংস খেতো না, তার পরে খাচ্ছিলো, আবার দেখচি পরশু থেকে বন্ধ করেচে। যদু বলে, বাবু ঘণ্টা-খানেক ধরে ঘরে বসে নাক টিপে যোগাভ্যাস করেন।

যোগাভ্যাস করেন?

হাঁ। চাকরটাই বলছিল ফেরবার পথে কাশীতে নাকি সমুদ্র-যাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে।

কমল অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সমুদ্র-যাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবেন? অজিতবাবু?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পারে ও। ও হ'ল সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িল এবং যে ভৃত্য এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ মনিবকে সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে সে-ই আসিয়া সশরীরে দণ্ডায়মান হইল এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সংবাদ এই দিল যে, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, অজিত প্রভৃতি বাবুদের দল আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। শুনিয়া শুধু কমল নয়, বন্ধুবর্গের অভ্যাগমে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে অভ্যর্থনা করাই যাঁহার স্বভাব, সেই আশুবাবুর পর্য্যন্ত মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে আগন্তুক ভদ্রব্যক্তিরা ঘরে ঢুকিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ এই মেয়েটির এখানে এভাবে দর্শন মিলিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত। হরেন্দ্র হাত তুলিয়া কমলকে নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

অবিনাশ হাসিবার মুখভঙ্গী করিয়া একবার দক্ষিণে ও একবার বামে ঘাড় নাড়িলেন—তাহার কোন অর্থ-ই নাই। আর সোজা মানুষ অক্ষয়। তিনি সোজা পথে সোজা মতলবে কাঠের মত ক্ষণকাল সোজা দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অবজ্ঞা ও বিরক্তি বর্ষণ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্টিকেলটা পড়লেন? বলিয়াই তাঁহার নজরে পড়িল সেই লেখাটা মাটিতে লুটাইতেছে। নিজেই তুলিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, থাক্ না অক্ষয়বাবু, ঝাঁট দেবার সময় চাকরটা ফেলে দেবে অখন।

তাহার হাতটা ঠেলিয়া অক্ষয় কাগজগুলো কুড়াইয়া আনিলেন।

হাঁ, পড়লাম, বলিয়া আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, অজিত ওধারের সোফায় বসিয়া সেইদিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলাইতে শুরু করিয়াছে। অবিনাশ কিছু একটা বলিতে পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, কহিলেন, আমিও লেখাটা আগাগোড়া মন দিয়ে পড়েচি আশুবাবু। ওর অধিকাংশ সত্য এবং মূল্যবান। দেশের সামজিক ব্যবস্থার যদি সংস্কার করতেই হয় ত সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই তাদের চালনা করা কর্ত্তব্য। য়ুরোপের সংস্পর্শে আমরা অনেক ভাল জিনিস পেয়েছি, নিজেদের বহু ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েচে মানি কিন্তু আমাদের সংস্কার আমাদের নিজের পথেই হওয়া চাই। পরের অনুকরণের মধ্যে কল্যাণ নেই। ভারতীয় নারীর যা বিশিষ্টতা, যা তাঁদের নিজস্ব, সে থেকে যদি

লোভ বা মোহের বশে তাঁদের নষ্ট করি, আমরা সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হব। এই না অক্ষয়বাবু?

কথাগুলি ভালো এবং সমস্তই অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধের। বিনয়বশে তিনি মুখে কিছুই বলিলেন, না, শুধু আত্মপ্রসাদের অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বার-কয়েক শিরশ্চালন করিলেন।

আশুবাবু অকপটে স্বীকার করিয়া কহিলেন, এ নিয়ে তর্ক নেই অবিনাশবাবু। বহু মনীষী বহুদিন থেকে এ-কথা বলে আসচেন এবং বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন লোকই এর প্রতিবাদ করেন না।

অক্ষয়বাবু বলিলেন, করবার জো নেই এবং এ-ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা প্রবন্ধে লিখিনি, কিন্তু কাল নারী-কল্যাণ সমিতিতে আমি বক্তৃতায় বলব।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া কমলের প্রতি চাহিলেন, কহিলেন, তোমার ত আর সমিতিতে নিমন্ত্রণ নেই, তুমি সেখানে যাবে না। আমিও বাতে কাবু। আমি না যাই, কিন্তু এ তোমাদেরই ভাল-মন্দর কথা। হাঁ কমল, তোমার ত এ-প্রস্তাবে আপত্তি নেই?

অন্য সময় হইলে আজকের দিনটায় কমল নীরব হইয়াই থাকিত, কিন্তু একে তার মন খারাপ, তাহাতে এই লোকগুলার এই পৌরুষহীন সঙ্ঘবদ্ধ, সদম্ভ প্রতিকূলতায় মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু নিজেকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কোন্‌টা আশুবাবু? অনুকরণটা, না ভারতীয় বিশিষ্টতা?

আশুবাবু বলিলেন, ধরো যদি বলি দুটোই?

কমল কহিল, অনুকরণ জিনিসটা শুধু যখন বাইরের নকল তখন সে ফাঁকি। তখন আকৃতিতে মিললেও প্রকৃতিতে মেলে না। কিন্তু ভেতরে-বাইরে সে যদি এক হয়েই যায় তখন অনুকরণ বলে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আছে বই কি কমল, আছে। ও রকম সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে আমরা নিজের বিশেষত্ব হারাই। তার মানে আপনাকে নিঃশেষে হারানো। এর মধ্যে যদি দুঃখ এবং লজ্জা না থাকে ত কিসের মধ্যে আছে বলো ত?

কমল বলিল, গেলোই বা বিশেষত্ব আশুবাবু। ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং য়ুরোপের বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ আছে, কিন্তু কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার আদর। আসল কথা, বর্ত্তমানকালে সে বৈশিষ্ট্য তার কল্যাণকর কি-না। এ-ছাড়া সমস্তই শুধু অন্ধ মোহ।

আশুবাবু ব্যথিত হইয়া কহিলেন, শুধুই অন্ধ মোহ কমল, তার বেশী নয়?

কমল বলিল, না, তার বেশি নয়। কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসচে বলেই সে-ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কই? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই। সেইখানে সত্যিকার লজ্জা আশুবাবু!

আশুবাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কহিলেন, তা হলে ত সমস্ত একাকার হয়ে যাবে? ভারতবর্ষীয় বলে ত আমাদের আর চেনাও যাবে না? ইতিহাসে যে এমনতর ঘটনার সাক্ষী আছে।

তাঁহার কুণ্ঠিত বিক্ষুব্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া বলিল, তখন মুনি-ঋষিদের বংশধর বলে হয়ত চেনা যাবে না, কিন্তু মানুষ বলে চেনা যাবে। আর আপনারা যাঁকে ভগবান বলেন তিনিও চিনতে পারবেন, তাঁর ভুল হবে না।

অক্ষয় উপহাসে মুখ কঠিন করিয়া বলিলেন, ভগবান শুধু আমাদের? আপনার নয়?

কমল উত্তর দিল, না।

অক্ষয় বলিলেন, এ-শুধু শিবনাথের প্রতিধ্বনি, শেখানো বুলি।

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট্।

দেখুন হরেন্দ্রবাবু—

দেখেচি। বিস্ট।

আশুবাবু সহসা যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ছাখো কমল, অপরের কথা বলতে চাইনে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা নয়। এ যাওয়া যে কতবড় ক্ষতি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। কত ধর্ম্ম, কত আদর্শ, কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান,—শিল্প—কত অমূল্য সম্পদ এই বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই ত আজও জীবিত আছে। এর কিছুই ত তা হ'লে থাকবে না?

কমল কহিল, থাকবার জন্যই বা এত ব্যাকুলতা কেন? যা যাবার নয় তা যাবে না। মানুষের প্রয়োজনে আবার তার নতুন রূপ, নতুন সৌন্দর্য্য, নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দেবে। সেই হবে তাদের সত্যিকার পরিচয়। নইলে বহুদিন ধরে কিছু একটা আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন আগলে রাখতে হবে এ কেমন কথা?

অক্ষয় বলিলেন, সে বোঝবার শক্তি নেই আপনার।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার অভদ্র ব্যবহারে আমি আপত্তি করি অক্ষয়বাবু!

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তোমার যুক্তিতে সত্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যা তুমি অবজ্ঞায় উপেক্ষা করচ, তার ভেতরেও বহু সত্য আছে। নানা কারণে

আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার 'পরে তোমার অশ্রদ্ধা জন্মেচে। কিন্তু একটা কথা ভুলো না কমল, বাইরে অনেক উৎপাত আমাদের সইতে হয়েচে, তবু যে আজও সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়ে বেঁচে আছি সে কেবল আমাদের সত্য আশ্রয় ছিল বলেই। জগতের অনেক জাতিই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল বলিল, তাতেই বা দুঃখ কিসের? চিরকাল ধরেই যে তাদের জায়গা জুড়ে বসে থাকতে হবে তারই বা আবশ্যক কি?

আশুবাবু বলিলেন, এ অন্য কথা কমল।

কমল কহিল, তা হোক। বাবার কাছে শুনেছিলাম আর্য্যদের একটি শাখা ইউরোপে গিয়ে বাস করেছিলেন, আজ তাঁরা নেই। কিন্তু তাঁদের বদলে যাঁরা আছেন তাঁরা আরও বড়। তেমনি যদি এদেশেও ঘটতো, ওদের মতই আমরা আজ পূর্ব্ব-পিতামহদের জন্য শোক করতে বসতাম না, নিজেদের সনাতন বিশেষত্ব নিয়ে দম্ভ করেও দিনপাত করতাম না। আপনি বলছিলেন অতীতের উপদ্রবের কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় উপদ্রব যে ভবিষ্যতে অদৃষ্টে নেই, কিংবা সমস্ত ফাঁড়াই আমাদের কেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাও ত সত্য না হতে পারে। তখন আমরা বেঁচে যাবো কিসের জোরে বলুন ত?

আশুবাবু এ-প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, কিন্তু অক্ষয়বাবু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তখনও বেঁচে যাবো, আমাদের আদর্শের নিত্যতার জোরে, যে আদর্শ বহু সহস্র যুগ আমাদের মনের মধ্যে অবিচলিত হয়ে আছে। যে আদর্শ আমাদের দানের মধ্যে, আমাদের পুণ্যের মধ্যে, আমাদের তপস্যার মধ্যে আছে। যে আদর্শ আমাদের নারীজাতির অক্ষয় সতীত্বের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা তারই জোরে বেঁচে যাব। হিন্দু কখনও মরে না।

অজিত হাতের কাগজ ফেলিয়া তাহার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল এবং মুহূর্ত্তকালের জন্য কমলও নির্ব্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল প্রবন্ধ লিখিয়া এই লোকটাই তাহাকে অকারণে আক্রমণ করিয়াছে এবং ইহাই সে কাল নারীর কল্যাণ উদ্দেশ্যে বহু নারীর সমক্ষে দম্ভের সহিত পাঠ করিবে এবং এই শেষোক্ত ইঙ্গিত শুধু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া। দুর্জ্জয় ক্রোধে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু এবারও সে আপনাকে সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ইচ্ছে হয় না অক্ষয়বাবু, আমার আত্মসম্মানে বাধে। বলিয়াই সে আশুবাবুর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েচে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্ত্তনেও লজ্জা নেই এই কথাটাই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম। তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও। একটা উদাহরণ দিই। আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান,

কত ধর্ম্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েচে। অতিথিকে খুশী করতে দাতাকর্ণ নিজেই পুত্রহত্যা করেছিলেন। এ নিয়ে কত লোক কত চোখের জলই যে ফেলেচে তার সংখ্যা নেই। অথচ এ কাহিনী আজ শুধু কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিল না, কিন্তু আজ সে-কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে। আপনার নিজের জীবনের যে আদর্শ যে ত্যাগ লোকের মনে আজ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে, একদিন সে হয়ত শুধু অনুকম্পার ব্যাপার হবে। এই নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহের বাড়াবাড়িতে লোকে উপহাস করে চলে যাবে।

এই আঘাতের নির্ম্মমতায় পলকের জন্য আশুবাবুর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। বলিলেন, কমল, একে নিগ্রহ বলে নিচ্চো কেন, এ যে আমার আনন্দ। এ যে আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বহুযুগের ধন।

কমল বলিল, হোক বহুযুগ। কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য্য হয় না। অচল, অনড়, ভুলে-ভরা সমাজের সহস্র বর্ষও হয়ত অনাগতের দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। সেই দশটা বছরই ঢের বড় আশুবাবু।

অজিত অকস্মাৎ জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, আপনার বাক্যের উগ্রতায় এ দের হয়ত বিস্ময়ের অবধি নেই, কিন্তু আমি বিস্মিত হইনি। আমি জানি এই বিজাতীয় মনোভাবের উৎস কোথায়। কিসের জন্যে আমাদের সমস্ত মঙ্গল-আদর্শের প্রতি আপনার এমন নিবিড় ঘৃণা। কিন্তু চলুন, আর আমাদের মিথ্যে দেরি করবার সময় নেই, পাঁচটা বেজে গেছে।

অজিতের পিছনে পিছনে সকলেই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহাকে একটা অভিবাদন করিল না, কেহ তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। যুক্তি যখন হার মানিল তখন এইভাবে পুরুষের দল নিজের জয় ঘোষণা করিয়া পৌরুষ বজায় রাখিল। তাহারা চলিয়া গেলে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, কমল, আমাকেই আজ তুমি সকলের চেয়ে বেশী আঘাত করেচ, কিন্তু আমিই তোমাকে আজ যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি। আমার মণির চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই খাটো নয় মা!

কমল বলিল, তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড়মানুষ কাকাবাবু। আপনি ত এঁদের মত মিথ্যে নয়। কিন্তু আমারও সময় বয়ে যায়, আমি চললাম। বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণাম সে সচরাচর কাহাকেও করে না, এই অভাবনীয় আচরণে আশু-বাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আবার কবে আসবে মা?

আর হয়ত আমি আসব না কাকাবাবু। বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল আশুবাবু সেদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

১২

আগ্রার নতুন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর নাম মালিনী। তাহারই যত্নে এবং তাঁহারই গৃহে নারী-কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম অধিবেশনের উদ্যোগটা একটু ঘটা করিয়াই হইয়াছিল, কিন্তু জিনিসটা সুসম্পন্ন ত হইলই না, বরঞ্চ কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। ব্যাপারটা মুখ্যতঃ মেয়েদের জন্যই বটে, কিন্তু পুরুষদের যোগ দেওয়া নিষেধ ছিল না। বস্তুতঃ এ প্রয়োজনে তাঁহারা একটু বিশেষ করিয়াই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভার ছিল অবিনাশের উপর। চিন্তাশীল লেখক বলিয়া অক্ষয়ের নাম ছিল; লেখার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারই পরামর্শ-মত একা শিবনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। অবিনাশের ছোটশালী নীলিমা ঘরে ঘরে গিয়া ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সহরের সমস্ত বাঙালী ভদ্রমহিলাদের আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না আশুবাবুর, কিন্তু বাতের কন্‌কনানি আজ তাঁহাকে রক্ষা করিল না, মালিনী নিজে গিয়া ধরিয়া আনিল। অক্ষয় লেখা-হাতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রচলিত দুই-চারিটা মামুলি বিনয়-ভাষণের পরে সোজা ও শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ-পাঠে নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল তাঁহার বক্তব্য বিষয় যেমন অরুচিকর তেমনি দীর্ঘ। সচরাচর যেমন হয়, পুরাকালের সীতা-সাবিত্রীর উল্লেখ করিয়া তিনি আধুনিক নারী-জাতির আদর্শ-বিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন। একজন আধুনিক ও শিক্ষিতা মহিলার বাটীতে বসিয়া ইহাদের 'তথাকথিত শিক্ষা'র বিরুদ্ধে কটূক্তি করিতে তাঁহার বাধে নাই। কারণ অক্ষয়ের গর্ব্ব ছিল এই যে, তিনি অপ্রিয় সত্য বলিতে ভয় পান না। সুতরাং লেখার মধ্যে সত্য যাই থাক্, অপ্রিয়-বচনের অভাব ছিল না। এবং এই 'তথাকথিত' শব্দটার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট উদাহরণের নজির যাহা ছিল—সে কমল। অনিমন্ত্রিত এই মেয়েটিকে অক্ষয় লেখার মধ্যে অপমানের একশেষ করিয়াছেন। শেষের দিকে তিনি গভীর পরিতাপের সহিত এই কথাটা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই সহরেই ঠিক এমনি একজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে যে ভদ্র-সমাজে

নিরন্তর প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। যে-স্ত্রীলোক নিজের দাম্পত্য-জীবনকে অবৈধ জানিয়াও লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, শুধু উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছে, বিবাহ-অনুষ্ঠান যাহার কাছে মাত্র অর্থহীন সংস্কার এবং পতি-পত্নীর একান্ত একনিষ্ঠ প্রেম নিছক মানসিক দুর্ব্বলতা। উপসংহারে অক্ষয় এ-কথারও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নারী হইয়াও নারীর গভীরতম আদর্শকে যে অস্বীকার করে, তথাকথিত সে শিক্ষিতা নারীর উপযুক্ত বিশেষণ ও বাসস্থান নির্ণয়ে প্রবন্ধ লেখকের নিজের কোন সংশয় না থাকিলেও শুধু সঙ্কোচবশতঃই বলিতে পারেন নাই। এই ত্রুটির জন্য তিনি সকলের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহেন।

মহিলা-সমাজে মনোরমা ব্যতীত কমলকে চোখে কেহ দেখে নাই। কিন্তু তাহার রূপের খ্যাতি ও চরিত্রের অখ্যাতি পুরুষদের মুখে মুখে পরিব্যাপ্ত হইতে অবশিষ্ট ছিল না। এমন কি, এই নব-প্রতিষ্ঠিত নারী-কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী মালিনীর কানেও তাহা পৌঁছিয়াছে এবং এ লইয়া নারী-মণ্ডলে, পর্দার ভিতরে ও বাহিরে কৌতূহলের অবধি নাই। সুতরাং রুচি ও নীতির সম্যক্ বিচারের উৎসাহে উদ্দীপ্ত প্রশ্নমালার প্রখরতায় ব্যক্তিগত আলোচনা সতেজ হইয়া উঠিতে বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না, কিন্তু লেখকের পরম বন্ধু হরেন্দ্রই ইহার কঠোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। সে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, অক্ষয়বাবুর এই লেখার আমি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি। কেবল অপ্রাসঙ্গিক বলে নয়, কোন মহিলাকেই তাঁর অসাক্ষাতে আক্রমণ করার রুচি বিস্ট্‌লি এবং তাঁর চরিত্রের অকারণ উল্লেখ অভদ্রোচিত ও হেয়। নারী-কল্যাণ সমিতির পক্ষে থেকে এই প্রবন্ধ-লেখককে ধিক্কার দেওয়া উচিত।

ইহার পরেই একটা মহামারী কাণ্ড বাধিল। অক্ষয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যা খুশি তাই বলিতে লাগিলেন এবং প্রত্যুত্তরে স্বল্পভাষী হরেন্দ্র মাঝে মাঝে কেবল বিস্ট্‌ এবং ব্রুট বলিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিল।

মালিনী নূতন লোক, সহসা এই প্রকার বাক্‌-বিতণ্ডার উগ্রতায় বিপন্ন হইয়া পড়িল এবং সেই উত্তেজনার মুখে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে প্রায় কেহই কার্পণ্য করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন শুধু আশুবাবু। প্রবন্ধ-পাঠের গোড়া হইতে সেই যে মাথা হেঁট করিয়া ছিলেন সভা শেষ না হইলে আর তিনি মুখ তুলিলেন না। আরও একটি মানুষ তর্ক-যুদ্ধে তেমন যোগ দিলেন না, ইনি হরেন্দ্র-অক্ষয়ের আলাপ-আলোচনায় নিত্য-অভ্যস্ত অবিনাশ।

ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রের ভালমন্দ নিরূপণ করা এই সমিতির লক্ষ্য নয় এবং এ প্রকার আলোচনায় নর-নারী কাহারও কল্যাণ হয় না, মালিনী তাহা জানিত। বিশেষতঃ লেখার মধ্যে আশুবাবুকেও কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই কথা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়া তাহার অতিশয় ক্লেশ বোধ হইল। সভা শেষ হইলে সে নিঃশব্দে

নিজের আসন ছাড়িয়া এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পাশে আসিয়া লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, নিরর্থক আজ আপনার শান্তি নষ্ট করার জন্য আমি দুঃখিত আশুবাবু।

আশুবাবু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বাড়িতেও ত আমি একাই বসে থাকতাম, তবু সময়টা কাটল।

মালিনী কহিল, সে এর চেয়ে ভাল ছিল। একটু থামিয়া কহিল, আজ উনি নেই, মণি এখান থেকে খেয়ে যাবে।

বেশ, আমি গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আর সব মেয়েরা?

তাঁরাও আজ এখানেই খাবেন।

অবিনাশ অজিতকে সঙ্গে লইয়া আশুবাবু গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন, হরেন্দ্র ও অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। যাত্রী হইতে হইল, সমস্ত পথটা আশুবাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। কমলকে উপলক্ষ করিয়া মেয়েদের মাঝখানে অক্ষয় তাঁকে অশিষ্ট কটাক্ষ করিয়াছে এই কথা তাঁহার নিজের মনে পড়িতে লাগিল।

গাড়ি আসিয়া বাসায় পৌঁছিল। নীচের বারান্দায় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়াছিল, বোম্বাই-ওয়ালার মত তাহার পোষাক, কাছে আসিয়া আশুবাবুকে অভিবাদন করিল।

কি?

জবাবে সে একটুকরা কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া কহিল, চিঠি।

চিঠিখানি তিনি অজিতের হাতে দিলেন, অজিত মোটরের ল্যাম্পের আলোকে পড়িয়া দেখিয়া কহিল, চিঠি কমলের।

কমলের? কি লিখেচে কমল?

লিখেচেন পত্রবাহকের মুখেই সমস্ত জানতে পারবেন।

আশুবাবু জিজ্ঞাসু-মুখে তাহার প্রতি চাহিতেই সে কহিল, এ পত্র আর কারো হাতে পড়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। আপনি তাঁর আত্মীয়—আমি কিছু টাকা পাই—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না, আশুবাবু সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমি তার আত্মীয় নই, বস্তুতঃ সে আমার কেউ নয়। তার হয়ে আমি টাকা দিতে যাব কিসের জন্য?

গাড়ির উপর হইতে অক্ষয় কহিল, just like her!

কথাটা সকলের কানে গেল। পত্রবাহক ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইয়া কহিল, টাকা আপনাকে দিতে হবে না, তিনিই দেবেন। আপনি শুধু কিছুদিনের জন্য জামিন হলে—

আশুবাবুর রাগ চড়িয়া গেল—বলিলেন, জামিন হওয়ার জন্য গরজ আমার নয়। তাঁর স্বামী আছেন, ধারের কথা তাঁকে জানাবেন।

ভদ্রলোক অতিশয় বিস্মিত হইল, বলিল, তাঁর স্বামীর কথা ত শুনিনি!

খোঁজ করলেই শুনতে পাবেন। Good night. এস অজিত, আর দেরি ক'রো না। বলিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। উপরের গাড়ি-বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া আর একবার ড্রাইভারকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের কুঠিতে গাড়ি পৌঁছিতে যেন বিলম্ব না হয়। অজিত সোজা তাহার ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, বস। মজা দেখলে একবার?

এ-কথার অর্থ কি অজিত তাহা বুঝিল। বস্তুতঃ তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা, শান্তিপ্রিয়তা ও চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার এই মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের অকারণ ও অভাবিত রূঢ়তা একা অক্ষয় ব্যতীত আঘাত করিতে বোধ করি উপস্থিত কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই। কিছুই না জানিয়া একদিন এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রতি অজিতের অন্তর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু যেদিন কমল তাহার নির্জ্জন নিশীথ গৃহ-কক্ষে এই অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আপনার বিগত নারী-জীবনের অসংবৃত ইতিহাস একান্ত অবলীলায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল, সেদিন হইতেই অজিতের পুঞ্জিত বিরাগ ও বিতৃষ্ণার আর যেন অবধি ছিল না। এমনি করিয়া তাহার এই কয়টা দিন কাটিয়াছে। তাই আজ নারী-কল্যাণ সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে আদর্শ-পন্থী অক্ষয় নারীত্বের আদর্শ নির্দ্দেশের ছলনায় যত কটূক্তিই এই মেয়েটিকে করিয়া থাক্ অজিত দুঃখবোধ করে নাই। এমনিই যেন সে আশা করিয়াছিল। তথাপি অক্ষয়ের ক্রোধান্ধ বর্ব্বরতায় যত তীক্ষ্ণ শূলই থাক্, আশুবাবু এইমাত্র যাহা করিয়া বসিলেন তাহাতে কমলের যেন কান মলিয়া দেওয়া হইল। কেবল অভাবিত বলিয়া নয়, পুরুষের অযোগ্য বলিয়া। কমলকে ভাল সে বলে না। তাহার মতামত ও সামাজিক আচরণের সুতীব্র নিন্দায় অজিত অবিচার দেখে নাই। তাহার নিজের মধ্যে এই রমণীর বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণার ভাবই পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। সে বলে, ভদ্র-সমাজে যে অচল তাহাকে পরিত্যাগ করার অপরাধ স্পর্শে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কি হইল! দুর্দ্দশাপন্ন, ঋণগ্রস্ত রমণীর দুঃসময়ে সামান্য কয়েকটি টাকা ভিক্ষার প্রত্যাখ্যানে সে যেন সমস্ত পুরুষের চরম অসম্মান অনুভব করিয়া অন্তরে মরিয়া গেল। সেই রাত্রের সমস্ত আলোচনা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়ানোর মাঝখানে সেইসকল চা-বাগানের অতীত দিনের ঘটনার বিবৃতি—তাহার মায়ের কাহিনী, তাহার নিজের ইতিহাস, ইংরাজ ম্যানেজার-সাহেবের গৃহে জন্মের বিবরণ। সে যেমন অদ্ভুত, তেমনি অরুচিকর। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল? গোপন করিলেই বা ক্ষতি কি হইত? কিন্তু দুনিয়ার এই সহজ সুবুদ্ধির জমা-খরচের হিসাব বোধ করি কমলের মনে পড়ে নাই। যদি বা পড়িয়াছে গ্রাহ্য করে নাই।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য তাহার সুকঠিন ধৈর্য্য। দৈবক্রমে তারই মুখে সে প্রথম সংবাদ পাইল যে, শিবনাথ কোথাও যায় নাই, এই শহরেই আত্মগোপন করিয়া আছে। শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। মুখের 'পরে না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা। এতবড় মিথ্যাচারের সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল না। সেদিন সম্রাটমহিষী মমতাজের স্মৃতি-সৌধের তীরে বসিয়া যে-কথা সে হাসিমুখে হাসিচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।

আশুবাবু নিজেও বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ সচেতন হইয়া পূর্ব্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, মজা দেখলে ত অজিত? আমি নিশ্চয় বলচি এ ঐ শিবনাথ লোকটার কৌশল।

অজিত কহিল, না-ও হতে পারে। না জেনে বলা যায় না।

আশুবাবু বলিলেন, তা বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এ চাল শিবনাথের। আমাকে সে বড়লোক বলে জানে।

অজিত কহিল, এ খবর ত সবাই জানে। কমল নিজেও না জানে তা নয়।

আশুবাবু বলিলেন, তা হলে, ঢের বেশি অন্যায়। স্বামীকে লুকানো ত ভাল কাজ নয়।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, স্বামীর অগোচরে, হয়ত তাঁর মতের বিরুদ্ধে পরের কাছে টাকা ধার করতে যাওয়া স্ত্রীলোকের কত বড় অন্যায় বল ত? এ কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

অজিত কহিল, তিনি টাকা ত চাননি, শুধু জামিন হতে অনুরোধ করেছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, সে ঐ একই কথা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর ঐ আমাকে আত্মীয়-পরিচয়ে লোকটাকে ছলনা করাই বা কিসের জন্য? সত্যিই ত আমি তার আত্মীয় নই।

অজিত বলিল, তিনি হয়ত আপনাকে সত্যিই আত্মীয় মনে করেন। বোধ হয় কাউকে ছলনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

না, কথাটা ঠিক ওভাবে আমি বলিনি অজিত। এই বলিয়া তিনি নিজের কাছেই যেন জবাবদিহি করিলেন। সেই লোকটাকে হঠাৎ ঝোঁকের উপর বিদায় করা পর্য্যন্ত মনের মধ্যে তাঁহার ভারী একটা গ্লানি চলিতেছিল; কহিলেন, সে আমাকে আত্মীয় বলেই যদি জানে, আর দু-পাঁচশো টাকার যদি দরকারই পড়েছিল, সোজা নিজে এসে তা নিয়ে গেলেই হ'ত। খামোকা একটা বাইরের লোককে সকলের সামনে পাঠান তার কি আবশ্যকতা ছিল? আর যাই বল, মেয়েটার বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

বেয়ারা আসিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে জানাইয়া গেল। অজিত উঠিতে যাইতেছিল, আশুবাবু কহিলেন, লোকটাকে মার্ক করেছিলে অজিত, বিশ্রী চেহারা মনি-লেনডার কি না। ফিরে গিয়ে হয়ত নানান্‌খানা করে বানিয়ে বলবে।

অজিত হাসিয়া কহিল, বানানোর দরকার হবে না আশুবাবু, সত্যি বললেই যথেষ্ট হবে। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই তিনি বাস্তবিকই বিচলিত হইয়া উঠিলেন,—এ অক্ষয় লোকটা একেবারে সুইসেল্‌স। মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। না হয় একটা কাজ কর না অজিত। যদুকে ডেকে ঐ দেরাজটা খুলে দেখ না কি আছে। অন্ততঃ পাঁচ-সাতশো টাকা—আপাততঃ যা আছে পাঠিয়ে দাও। আমাদের ড্রাইভার বোধ হয় তাদের বাসাটা চেনে—শিবনাথকে মাঝে মাঝে পৌঁছে দিয়ে এসেচে। এই বলিয়া তিনি নিজেই চীৎকার করিয়া বেহারাকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন।

অজিত বাধা দিয়া বলিল, যা হবার তা হয়েই গেছে, আজ রাত্রে থাক্‌, কাল সকালে বিবেচনা করে দেখলেই হবে।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন, তুমি বোঝ না অজিত, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে সে রাত্রে কখনো লোক পাঠাতো না।

অজিত কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বলিল, ড্রাইভার বাড়ি নেই, মনোরমাকে নিয়ে কখন ফিরবে তারও ঠিকানা নেই। ইতিমধ্যে কমল সমস্তই শুনতে পাবেন। তার পরে আর টাকা পাঠান উচিত হবে না আশুবাবু। বোধ হয় আপনার হাত থেকে আর তিনি সাহায্য নেবেন না।

কিন্তু এ ত তোমার অনুমান মাত্র অজিত।

হাঁ, অনুমান বৈ আর কি।

কিন্তু বিদেশে তার টাকার প্রয়োজন ত এর চেয়েও বড় হতে পারে?

তা পারে, কিন্তু আত্মমর্য্যাদার চেয়েও বড় না হতে পারে।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ-ও ত শুধু তোমার অনুমান।

অজিত সহসা উত্তর দিল না। ক্ষণকাল অধোমুখে নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, না, এ আমার অনুমানের চেয়ে বড়। এ আমার বিশ্বাস। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশুবাবু আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন না, কেবল বেদনায় দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। কমলের সম্বন্ধে এ-বিশ্বাস অসম্ভবও নয়, অসঙ্গতও নয়। ইহা তিনি নিজেও জানিতেন। নিরুপায় অনুশোচনায় বুকের ভিতরটা যেন তাঁহার আঁচড়াইতে লাগিল।

১৩

নারী-কল্যাণ সমিতি হইতে ফিরিয়া নীলিমা অবিনাশকে ধরিয়া পড়িল, মুখুয্যেমশাই, কমলকে আমি একবার দেখব। আমার ভারী ইচ্ছে করে তাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াই।

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, তোমার সাহস ত কম নয় ছোটগিন্নী; শুধু আলাপ নয়, একেবারে নেমন্তন্ন করা!

অবিনাশ বলিলেন, বাঘ-ভালুক এদেশে মেলে না, নইলে তোমার হুকুমে তাদেরও নেমন্তন্ন করে আসতে পারি, কিন্তু এঁকে নয়। অক্ষয় খবর পেলে আর রক্ষে থাকবে না। আমাকে দেশছাড়া করে ছাড়বে।

নীলিমা কহিল, অক্ষয়বাবুকে আমি ভয় করিনে।

অবিনাশ বলিলেন, তুমি না করলেও ক্ষতি নেই, আমি একা করলেই তাঁর কাজ চলে যাবে।

নীলিমা জিদ করিয়া বলিল, না, সে হবে না। তুমি না যাও, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে আহ্বান করে আসব।

কিন্তু আমি ত তাদের বাসাটা চিনিনে।

নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো চেনেন। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি তোমাদের মত ভীতু লোক নন।

একটু ভাবিয়া বলিল, তোমাদের মুখে যা শুনি, তাতে শিবনাথবাবুরই দোষ—তাঁকে ত আমি নেমন্তন্ন করতে চাইনে। আমি চাই কমলকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। কমল যদি আসতে রাজী হয়, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী—তিনিও বলেচেন আসবেন। বুঝলে?

অবিনাশ বুঝিলেন সমস্তই—কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সম্মতি দিতে পারিলেন না। অথচ বাধা দিতেও ভরসা পাইলেন না। নীলিমাকে তিনি শুধু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন তাই নয়, মনে মনে ভয়ও করিতেন।

পরদিন সকালে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো, তোমাকে আর একটি কাজ করে দিতে হবে। তুমি আইবুড়ো মানুষ, ঘরে বৌ নেই যে সদাচারের নাম করে তোমার কান মলে দেবে। বাসায় ত থাকো শুধু বাপ-মা-মরা একপাল ছাত্র নিয়ে—তোমার ভয়টা কিসের?

হরেন্দ্র কহিল, ভয়ের কথা হবে পরে, কিন্তু করতে হবে কি?

নীলিমা কহিল, কমলকে আমি দেখব, আলাপ করব, ঘরে এনে খাওয়াব। তুমি

কি ওদের বাসা চেন—আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাকে নেমন্তন্ন করে আসতে হবে। কখন যেতে পারবে বল ত?

হরেন্দ্র বলিল, যখনই হুকুম করবেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা? সেজদা? ওঁর অভিপ্রায়টা কি? এই বলিয়া সে বারান্দার ওধারে অবিনাশকে দেখাইয়া দিল। তিনি ইজিচেয়ারে শুইয়া পাইয়োনিয়ার পাড়িতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন সমস্তই—কিন্তু সাড়া দিলেন না।

নীলিমা বলিল, ওঁর অভিপ্রায় নিয়ে উনিই থাকুন—আমার কাজ নেই। আমি ওঁর শালী, শালীর বোন নই যে পতি পরম গুরুর গদা ঘুরিয়ে শাসন করবেন। আমার যাকে ইচ্ছা খাওয়াব। ম্যাজিস্ট্রেটের বৌ বলেছেন খবর পেলে তিনিও আসবেন। ওঁর ভাল না লাগে তখন আর কোথাও গিয়ে যেন সময়টা কাটিয়ে আসেন।

অবিনাশ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, কিন্তু কাজটা সমীচীন হবে না হরেন। কালকের ব্যাপারটা মনে আছে ত? আশুবাবুর মত সদাশিব ব্যক্তিকেও সাবধান হতে হয়।

হরেন্দ্র জবাব দিল না এবং পাছে সেই লজ্জাকর কথাটা উঠিয়া পড়ে এবং নীলিমার কানে যায়, তাই ভয়ে সে প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া বলিল, তার চেয়ে বরঞ্চ একটা কাজ করুন না বৌদি, আমার বাসাতে তাকে নিমন্ত্রণ করে আনুন। আপনি হবেন গৃহকর্ত্রী। লক্ষ্মীছাড়ার গৃহে একদিন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে। আমার ছেলে-গুলোও দুটো ভালোমন্দ জিনিস মুখে দিয়ে বাঁচবে।

নীলিমা অভিমানের সুরে বলিল, বেশ—তাই হোক ঠাকুরপো, আমিও ভবিষ্যতে খোটার জ্বালা থেকে নিস্তার পাব।

অবিনাশ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ, কেলেঙ্কারীর তা হলে আর অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ শিবনাথকে বাদ দিয়ে শুধু তাকে তোমার বাসায় আহ্বান করে নিয়ে যাবার কোন কৈফিয়তই দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে চান—এই ঢের ভাল শোনাবে।

কথাটা সত্যই যুক্তিসঙ্গত। তাই ইহাই স্থির হইল যে, কলেজের ছুটির পরে হরেন্দ্র গাড়ি করিয়া নীলিমাকে লইয়া গিয়া কমলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।

বৈকালে হরেন্দ্র আসিয়া জানাইল যে, কষ্ট করিয়া আর যাইবার প্রয়োজন নাই। কাল রাত্রে খাবার কথা তাঁহাকে বলা হইয়াছে—তিনি রাজী হইয়াছেন।

নীলিমা উৎসুক হইয়া উঠিল। হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, ফেরবার পথে হঠাৎ রাস্তার ওপরে দেখা। সঙ্গে মুটের মাথায় একটা মস্ত বাক্স। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওটা? কোথায় যাচ্ছেন? বললেন, যাচ্ছি একটু কাজে। তখন আপনার পরিচয়

দিয়ে বললাম, বৌদি যে কাল সন্ধ্যার পরে আপনাকে নেমন্তন্ন করেচেন। নিতান্তই মেয়েদের ব্যাপার—যেতে হবে যে। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা। বললাম, কথা আছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বৌদি নিজে গিয়ে আপনাকে যথারীতি বলে আসবেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন আছে কি? একটুখানি হেসে বললেন, না। জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু একলা ত যেতে পারবেন না, কাল কখন্ এসে আপনাকে নিয়ে যাব? শুনে তেমনি হাসতে লাগলেন। বললেন, একলাই যেতে পারব—অবিনাশবাবুর বাসা চিনি।

নীলিমা আর্দ্র হইয়া কহিল, মেয়েটি এদিকে কিন্তু খুব ভাল। ভারি নিরহঙ্কার।

পাশের ঘরে অবিনাশ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন, অন্তরাল হইতেই প্রশ্ন করিলেন, আর সেই মুটের মাথায় মোটা বাক্সটা? তার ইতিহাস ত প্রকাশ করলে না ভায়া?

হরেন্দ্র বলিল, জিজ্ঞেসা করিনি।

করলে ভাল করতে। বোধ হয় বিক্রী কিংবা বন্ধক দিতে যাচ্ছিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, হতেও পারে। আপনার কাছে বন্ধক দিতে এলে ইতিহাসটা জেনে নেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া কহিল, বৌদি, আপনাদের নারী-কল্যাণ সমিতিতে অক্ষয়ের বক্তৃতা শুনেচেন ত? আমরা লোকটাকে ক্রুট্ বলি। কিন্তু ও বেচারার আর একটুখানি ভণ্ডামি-বুদ্ধি থাকলে সমাজে অনায়াসেই সাধু-সজ্জন বলে চলে যেতে পারত—কি বলেন সেজদা? ঠিক না।

অবিনাশ ঘরের মধ্যে হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, হাঁ রে, নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বন্ধুবরকে কৌশলটা শিখিয়ে দাও গে যাও।

চেষ্টা করব। কিন্তু চললাম বৌদি, কাল আবার যথাসময়ে হাজির হব।—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

নীলিমা উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই। মনোরমা গোড়া হইতে কমলের অত্যন্ত বিরুদ্ধে—সে কোনমতে আসিবে না জানিয়া আশুবাবুদের কাহাকেও বলা হয় নাই। মালিনীকে খবর পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া তিনি আসিলেন না।

ঠিক সময়ে আসিল কমল। যান-বাহনে নয়, একাকী পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহকর্ত্রী তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। অবিনাশ সুমুখে

দাঁড়াইয়া ছিলেন, কমলকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ তাহার চেহারা ও জামা-কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। দৈন্যের ছাপ তাহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া পড়িয়াছে। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, রাত্রে একাকী হেঁটে এলে যে কমল?

কমল বলিল, কারণ খুবই সাধারণ অবিনাশবাবু, বোঝা একটুও শক্ত নয়।

অবিনাশ অপ্রতিভ হইলেন এবং তাহাই গোপন করিতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, কি যে বল! কাজটা ভাল হয়নি কিন্তু—ছোটগিন্নী, ইনিই কমল। আর একটা নাম শিবানী। এঁকে দেখবার জন্যই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। এসো, বাড়ির ভিতর গিয়ে বসবে চল। যোগাড় বোধ হয় তোমার সমস্ত হয়ে গেছে? তা হলে অনর্থক দেরি করে লাভ হবে না—ঠিক সময়ে আবার ওঁর বাসায় ফিরে যাওয়া চাই ত!

এ-সকল উপদেশ ও জিজ্ঞাসাবাদের অনেকটাই বাহুল্য। উত্তরের আবশ্যকও হয় না, প্রত্যাশাও থাকে না।

হরেন্দ্র আসিয়া কমলকে নমস্কার করিল। কহিল, অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নেবার সময়ে জুটতে পারিনি বৌদি, ত্রুটি হয়ে গেছে। অক্ষয় এসেছিলেন, তাঁকে যথোচিত মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করে বিদায় দিতে বিলম্ব হ'ল। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ভিতরে আসিয়া কমল আহার্য্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, আমার খাওয়াই হয়েচে, কিন্তু এ-সব আমি খাইনে।

সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলে সে কহিল, আপনারা যাকে হবিষ্যান্ন বলেন—আমি তাই শুধু খাই।

শুনিয়া নীলিমা অবাক্ হইল, সে কি কথা! আপনি হবিষ্যি খেতে যাবেন কিসের দুঃখে?

কমল কহিল, সে ঠিক। দুঃখ নেই তা নয়, কিন্তু এ-সব খাইনে বলেই অভাবটাও আমার কম। আপনি কিছু মনে করবেন না।

কিন্তু মনে না করিলেও চলে না। নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, না খেলে এত জিনিস যে আমার নষ্ট হবে?

কমল হাসিয়া কহিল, যা হবার তা হয়েচে, সে আর ফিরবে না। তার ওপর খেয়ে আবার নিজে নষ্ট হই কেন?

নীলিমা কাতর হইয়া শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, শুধু আজকের মত, কেবল একটা দিনের জন্যও নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন না?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তাহার হাসিমুখের একটিমাত্র শব্দ। শুনিলে হঠাৎ কিছুই মনে হয় না, কিন্তু তার দৃঢ়তা যে কত বড়—তাহা পৌঁছিল হরেন্দ্রর কানে। শুধু সে-ই বুঝিল, ইহার ব্যতিক্রম নাই। তাই গৃহকর্ত্রীর দিক হইতে অনুরোধের পুনরুক্তির সূত্রপাতেই সে বাধা দিয়া কহিল, থাক্ বৌদি, আর না। খাবার আপনার নষ্ট হবে না, আমার বাসার ছেলেদের এনে চেঁচে-পুঁচে খেয়ে যাব, কিন্তু ওঁকে আর নয়। বরঞ্চ যা খাবেন, তার যোগাড় করে দিন।

নীলিমা রাগ করিয়া বলিল, তা দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না ঠাকুরপো, তুমি থাম। এ ঘাস নয় যে তোমার একপাল ভেড়া নিয়ে এসে চরিয়ে দেবে। আমি বরঞ্চ রাস্তায় ফেলে দেব—তবু তাদের খাওয়াব না।

হরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, কেন, তাদের ওপর আপনার রাগ কিসের?

নীলিমা বলিল, তাদের জন্যই ত তোমার যত দুর্গতি। বাপ টাকা রেখে গেছেন, নিজেও উপার্জ্জন কম কর না। এতদিন বৌ এলে ত ছেলে-পুলেয় ঘর ভরে যেত। এ হতভাগা কাণ্ড ত ঘটত না। নিজেও যেমন আইবুড়ো কার্ত্তিক, দলটিও তৈরী হচ্চে তারি উপযুক্ত। তাদের আমি কিছুতেই খাওয়াব না—এই তোমাকে আমি বলে দিলুম। যাক আমার নষ্ট হয়ে।

কমল কিছুই বুঝিতে পারিল না, আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, বৌদির অনেকদিন থেকে আমার ওপরে নালিশ আছে, এ তারই শাস্তি। এই বলিয়া সে সংক্ষেপে জিনিসটা বিবৃত করিয়া কহিল, বাপ-মা-মরা নিরাশ্রয় গুটি-কয়েক ছাত্র আছে আমার—তারা আমার কাছে থেকে ইস্কুলে কলেজে পড়ে। তাদের ওপরেই ওঁর যত আক্রোশ।

কমল অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই নাকি? কৈ এ ত এতদিন শুনিনি?

হরেন্দ্র বলিল, শোনবার মত কিছুই নয়। কিন্তু চরিত্রবান ভাল ছেলে তারা। তাদের আমি ভালবাসি।

নীলিমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বড় হয়ে তারা দেশোদ্ধার করবে এই তাদের পণ। অর্থাৎ গুরুর মত ব্রহ্মচারী হয়ে দিগ্বিজয়ী বীর হবে বোধ করি।

হরেন্দ্র বলিল, যাবেন একবার তাদের দেখতে? দেখলে খুশী হবেন।

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই যেতে পারি যদি নিয়ে যান।

হরেন্দ্র বলিল, না, কাল নয়, আর একদিন। আমাদের আশ্রমের রাজেন এবং সতীশ গেছে কাশী বেড়াতে। তারা ফিরে এলে আপনাকে নিয়ে যাব। আমি নিশ্চয় বলতে পারি—তাদের দেখলে আপনি খুশীই হবেন।

অবিনাশ মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,

কতগুলো লক্ষ্মীছাড়ার আড্ডা বুঝি এরই মধ্যে আশ্রম হয়ে উঠল? কত ভণ্ডামিই তুই জানিস্ হরেন!

নীলিমা রাগ করিল। কহিল, এ তোমার অন্যায় মুখুয্যেমশায়। ঠাকুরপো ত তোমার কাছে আশ্রমের চাঁদা চাইতে আসেনি, যে ভণ্ড বলে গাল দিচ্চ! নিজের খরচে পরের ছেলে মানুষ করাকে ভণ্ডামি বলে না। বরঞ্চ যারা বলে—তাদেরই তাই বলে ডাকা উচিত।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, বৌদি, এইমাত্র যে আপনি নিজেই তাদের ভেড়ার পাল বলে তিরস্কার করছিলেন—এখন আপনারই কথার প্রতিধ্বনি করতে গিয়ে সেজদার ভাগ্যে এই পুরস্কার?

নীলিমা বলিল, আমি বলছিলাম রাগে? কিন্তু উনি বলেন কোন্ লজ্জায়? ভণ্ডামির ধারণা আগে নিজের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠুক, তার পরে যেন পরকে বলতে চান।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ছেলেরা ত সবাই ইস্কুল-কলেজে পড়েন?

হরেন্দ্র বলিল, হাঁ, প্রকাশ্যে তাই বটে।

অবিনাশ কহিলেন, আর অপ্রকাশ্যে কি-সব প্রাণায়াম, রেচক-কুম্ভকের চর্চ্চা করা হয়, সেটাও খুলে বল?

শুনিয়া সবাই হাসিল। নীলিমা অনুনয়ের সুরে কমলকে কহিল, মুখুয্যেমশায়ের আজকের মেজাজ দেখে যেন ওঁর বিচার করে নেবেন না। মাঝে মাঝে মাথা ওর অনেক ঠাণ্ডা থাকে। নইলে বহু পূর্ব্বেই আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হ'তো। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কোথায় একটুখানি যেন উত্তাপের বাষ্প জমিয়া উঠিতেছিল, এই স্নিগ্ধ পরিহাসটুকুর পরে যেন তাহা মিলাইয়া গেল। বামুনঠাকুর আসিয়া জানাইল, কমলের খাবার তৈরী হইয়া গিয়াছে। অতএব এখানকার মত আলোচনা স্থগিত রাখিয়া সকলকে উঠিতে হইল।

ঘণ্টা-দুই পরে আহারাদি সমাধা হইলে পুনরায় সকলে আসিয়া যখন বাহিরের ঘরে বসিলেন—কমল তখন পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া প্রশ্ন করিল, ছেলেরা রেচক-কুম্ভক না করুক, কলেজের পড়া মুখস্থ করা ছাড়াও ত কিছু করে—সে কি?

হরেন্দ্র বলিল, করে। ভবিষ্যতে যাতে সত্যিই মানুষ হতে পারে সে চেষ্টাতেও তাদের অবহেলা নেই। কিন্তু পায়ের ধূলো যেদিন পড়বে সেদিন সমস্ত বুঝিয়ে বলব, আজ নয়।

এই মেয়েটির প্রতি সম্মানের আতিশয্যে অবিনাশের গা জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

নীলিমা কহিল, আজ বলতেই বা বাধা কি ঠাকুরপো? তোমার শেখানোর পদ্ধতি না হয় না-ই ভাঙলে, কিন্তু পুরাকালের ভারতীয় আদর্শে নিজের মত করে যে তাদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিচ্ছ এ-কথা জানাতে দোষ কি? তোমার কাছে ত আমি আভাসে একদিন এই কথাই শুনেছিলুম।

হরেন্দ্র সবিনয়ে বলিল, মিথ্যে শুনেচেন তাও ত বলচিনে বৌদি, বলিয়াই তাহার সেদিনের তর্কের ব্যাপারটা স্মরণ হইল। কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনারও বোধ করি আমার কাজে সহানুভূতি নেই?

কমল কহিল, কাজটা আপনার ঠিক কি না জানলে ত বলা যায় না হরেনবাবু। কিন্তু পুরাকালের ছাঁচে তৈরী করে তোলাটাই যে সত্যিকারের মানুষের ছাঁচে তৈরী করে তোলা এও ত যুক্তি নয়।

হরেন্দ্র বলিল, কিন্তু সেই যে আমাদের ভারতের আদর্শ?

কমল জবাব দিল, ভারতের আদর্শ যে চিরযুগের চরম আদর্শ—এই বা কে স্থির করে দিলে বলুন?

অবিনাশ এতক্ষণ কথা কহেন নাই, রাগ চাপিয়া বলিলেন, চরম আদর্শ না হতে পারে কমল, কিন্তু এ আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণের আদর্শ। ভারতবাসীর এই নিত্য-কালের লক্ষ্য—এই তাদের একমাত্র চলবার পথ। হরেনের আশ্রমের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু সে এই লক্ষ্যই যদি গ্রহণ করে থাকে আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করি।

কমল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, জানিনে কেন মানুষের এ ভুল হয়। নিজেদের ছাড়া তারা যেন আর কোন ভারতবাসীকে চোখে দেখতেই পায় না। আরও ত ঢের জাত আছে—তারা এ আদর্শ নেবে কেন?

অবিনাশ কুপিত হইয়া কহিলেন, চুলোয় যাক তারা। আমাদের কাছে এ আবেদন নিষ্ফল। আমি শুধু নিজেদের আদর্শ-ই স্পষ্ট করে দেখতে পেলে যথেষ্ট মনে করব।

কমল ধীরে ধীরে বলিল, এ আপনার অত্যন্ত রাগের কথা অবিনাশবাবু। নইলে এতবড় অন্ধ ভাবতে আপনাকে আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু কি জানি, পুরুষেরা সবাই বুঝি শুধু এমনি করেই ভাবে! সেদিন অজিতবাবুর সুমুখেও হঠাৎ এই প্রসঙ্গই উঠে পড়েছিল। ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য, তার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবার উল্লেখে তাঁর সমস্ত মুখ ব্যথায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একদিন তিনি ছিলেন উৎকট স্বদেশী আজও মনে হয় ত তাই আছেন—এ সম্ভাবনা তাঁর কাছে কেবল প্রলয়ের নামান্তর। বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল। অবিনাশ কি একটা বোধ হয় জবাব দিতে উদ্যত ছিলেন, কিন্তু কমল সেদিকে দৃকপাত না করিয়াই বলিতে লাগিল, কিন্তু আমি ভাবি এতে ভয় কিসের? বিশেষ কোন একটা

দেশে জন্মেচি বলে তারই নিজস্ব আচার-আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে! এতই কি মমতা? বিশ্বের সকল মানব একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায়—কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই ত ভয়? নাই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানব-জাতির একজন বলে পরিচয় দিতে ত কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?

অবিনাশ সহসা জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, কমল, তুমি যা বলচ, নিজে তার অর্থ বোঝ না। এতে মানুষের সর্ব্বনাশ হবে।

কমল উত্তর দিল, মানুষের হবে না অবিনাশবাবু, যারা অন্ধ তাদের অহঙ্কারের সর্ব্বনাশ হবে।

অবিনাশ কহিল, এ-সব নিছক শিবনাথের কথা।

কমল কহিল, তা ত জানিনে—তিনিও এ-কথা বলেন।

এবার অবিনাশ আত্মবিস্মৃত হইলেন। বিদ্রূপে মুখ কালো করিয়া বলিলেন, খুব জান! কথাগুলি মুখস্থ করেচ, আর জান না কার?

তাঁহার এই কদর্য্য রূঢ়তার জবাব কমল দিল না, দিল নীলিমা। কহিল, কথা যারই হোক মুখুয্যেমশায়, মাস্টারিগিরি কাজে কড়া কথায় ধমক দিয়ে ছাত্রের মুখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে ত লজ্জা নেই, কিন্তু ভদ্রতা লঙ্ঘন করায় লজ্জা আছে। কিন্তু ঠাকুরপো, একটা গাড়ি ডাকতে পাঠাও না ভাই। তোমাকে কিন্তু গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, তোমাকে সঙ্গে দিতে ত আর ভয় নেই। এই বলিয়া সে কটাক্ষে অবিনাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, মুখুয্যেমশায়ের মুখের চেহারা যে-রকম মিষ্টি হয়ে উঠেচে—তাতে বিলম্ব করা আর সঙ্গত হবে না।

অবিনাশ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বেশ ত, তোমরা বসে গল্প কর না, আমি শুতে চললাম। বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

চাকর গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল, হরেন্দ্র কমলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আমার আশ্রমে কিন্তু একদিন যেতে হবে। সেদিন আনতে গেলে কিন্তু না বলতে পারবেন না।

কমল সহাস্যে কহিল, ব্রহ্মচারীদের আশ্রমে আমাকে কেন হরেনবাবু? নাই বা গেলাম?

না, সে হবে না। ব্রহ্মচারী বলে আমরা ভয়ানক কিছু নই। নিতান্তই শাদা-সিধে। গেরুয়াও পরিনে, জটা-বল্কলও ধারণ করিনি। সাধারণের মাঝখানে আমরা তাদের সঙ্গে মিশে আছি।

কিন্তু সে ত ভাল নয়! অসাধারণ হয়েও সাধারণের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা আর একরকমের অন্যায় আচরণ। বোধ হয় অবিনাশবাবু একেই বলেছিলেন ভণ্ডামি। তার চেয়ে বরং জটা-বল্কল-গেরুয়া ঢের ভাল। তাতে মানুষকে চেনবার সুবিধে হয়, ঠকবার সম্ভাবনা কম থাকে।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার জো নেই—হটতেই হবে। কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি কি ভাল বলেন না? পারি আর না পারি, এই আদর্শ কত বড়!

কমল কহিল, তা বলতে পারব না হরেনবাবু। সমস্ত সংযমের মত যৌন-সংযমেও সত্য আছে। কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘটা করে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য করে তুললে সে হয় আর এক-ধরণের অসংযম। তার দণ্ড আছে। আত্ম-নিগ্রহের উগ্র দম্ভে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে। বেশ, আমি যাব আপনার আশ্রমে।

হরেন্দ্র বলিল, যেতেই হবে—না গেলে আমি ছাড়ব না। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমাদের আড়ম্বর নেই—ঘটা করে আমরা কিছু করিনে। সহসা নীলিমাকে কহিল, আমার আদর্শ উনি। ওঁর মতই আমরা সহজের পথিক। বৈধব্যের কোন বাহ্যপ্রকাশ ওঁতে নেই—বাইরে থেকে মনে হবে যেন বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে আছেন, কিন্তু জানি ওঁর দুঃসাধ্য আচার-নিষ্ঠা, ওঁর কঠোর আত্মশাসন।

কমল মৌন হইয়া রহিল। হরেন্দ্র ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল, আপনি ভারতের অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন, ভারতের আদর্শ আপনাকে মুগ্ধ করে না, কিন্তু বলুন ত—নারীত্বের এতবড় মহিমা, এতবড় আদর্শ আর কোন্ দেশে আছে? এই গৃহেই উনি গৃহিণী, সেজদার মা-মরা সন্তানের উনি জননীর ন্যায়। এ-বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব ওঁর উপরে। অথচ কোন স্বার্থ, কোন বন্ধন নেই। বলুন ত, কোন্ দেশের বিধবা এমন পরের কাজে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পেরেচে?

কমলের মুখ স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল, বলিল, এর মধ্যে ভালটা কি আছে হরেনবাবু। অপরের গৃহের নিঃস্বার্থ গৃহিণী ও অপরের ছেলের নিঃস্বার্থ জননী হবার দৃষ্টান্ত হয়ত জগতের আর কোথাও নেই। নেই বলে অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু ভাল হয়ে উঠবে কিসের জোরে?

শুনিয়া হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং নীলিমা আশ্চর্য্য হইয়া, দুই চক্ষু মেলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। কমল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাক্যের ছটায়, বিশেষণের চাতুর্য্যে লোকে একে যত গৌরবান্বিতই করে তুলুক, গৃহিণীপনার এই মিথ্যে অভিনয়ের সম্মান নেই। এ গৌরব ছাড়াই ভাল।

হরেন্দ্র গভীর বেদনার সহিত কহিল, একটা সুশৃঙ্খল সংসার নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবার উপদেশ—এ ত আপনার কাছে কেউ আশা করে না।

কমল বলিল, কিন্তু সংসার ত ওঁর নিজের নয়—হলে এ উপদেশ দিতুম না। অথচ এমনি করেই কর্ম্মভোগের নেশায় পুরুষেরা আমাদের মাতাল করে রাখে। তাদের বাহবার কড়া মদ খেয়ে চোখে আমাদের ঘোর লাগে, ভাবি এই বুঝি নারী-জীবনের সার্থকতা। আমাদের চা-বাগানে হরিশবাবুর কথা মনে পড়ে। ষোল বছরের ছোট বোনটির যখন স্বামী মারা গেল—তাকে বাড়িতে এনে নিজের একপাল ছেলে-মেয়ে দেখিয়ে কেঁদে বললেন, লক্ষ্মী, দিদি আমার, এখন এরাই তোর ছেলে-মেয়ে। তোর ভাবনা কি বোন, এদের মানুষ করে, এদের মায়ের মত হয়ে, এ বাড়ির সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে আজ থেকে তুই সার্থক হ—এই আমার আশীর্ব্বাদ। হরিশবাবু ভাল লোক, বাগানময় তাঁর ধন্য ধন্য পড়ে গেল সবাই বললে, লক্ষ্মীর কপাল ভাল। ভাল ত বটেই! শুধু মেয়েমানুষেই জানে এতবড় দুর্ভোগ, এত বড় ফাঁকি আর নেই, কিন্তু একদিন এ বিড়ম্বনা যখন ধরা পড়ে, তখন প্রতিকারের সময় বয়ে যায়।

হরেন্দ্র বলিল, তারপরে?

কমল বলিল, পরের খবর জানিনে হরেনবাবু, লক্ষ্মীর সার্থকতার শেষ দেখে আসতে পারিনি—আগেই চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু ঐ যে আমার গাড়ি এসে দাঁড়াল। চলুন, পথে যেতে যেতে বলব। নমস্কার। বলিয়া সে একমুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলিমা নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষের তারকা যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতে লাগিল।

১৪

'আশ্রম' শব্দটা কমলের সম্মুখে হরেন্দ্রর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া অবিনাশ যে ঠাট্টা করিয়াছিলেন সে অন্যায় হয় নাই। জনকয়েক দরিদ্র ছাত্র ওখানে থাকিয়া বিনা-খরচায় স্কুলে পড়াশুনা করিতে পায়—ইহাই লোকে জানে। বস্তুতঃ নিজের এই বাসস্থানটাকে বাহিরের লোকের কাছে অতবড় একটা গৌরবের পদবীতে তুলিয়া ধরার সঙ্কল্প হরেন্দ্রর ছিল না। ও নিতান্তই একটা সাধারণ ব্যাপার এবং প্রথমে আরম্ভও হইয়াছিল সামান্যভাবে। কিন্তু এ-সকল জিনিসের স্বভাবই এই যে, দাতার দুর্ব্বলতায় একবার জন্মগ্রহণ করিলে আর ইহাদের গতির

বিরাম থাকে না। কঠিন আগাছার ন্যায় মৃত্তিকার সমস্ত রস নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া ডালে-মূলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে ইহাদের বিলম্ব হয় না। হইলও তাই। এ বিবরণটাই প্রকাশ করিয়া বলি।

হরেন্দ্রর ভাই-বোন ছিল না। পিতা ওকালতি করিয়া, অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সংসারে অবশিষ্ট ছিলেন শুধু হরেন্দ্রর বিধবা মা। তিনিও পরলোকগমন করিলেন। ছেলের তখন লেখা-পড়া সাঙ্গ হইল। অতএব আপনার বলিতে এমন কেহই. আর রহিল না যে তাহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করে কিংবা উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়া পায়ে শৃঙ্খল পরায়। অতএব পড়া যখন সমাপ্ত হইল তখন নিতান্তই কাজের অভাবেই হরেন্দ্র দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। সাধু-সঙ্গ বিস্তর করিল, ব্যাঙ্কের জমানো সুদ বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতি গঠন করিল, বন্যাপ্লাবনে আচার্য্যদেবের দলে ভিড়িল, সেবক-সঙ্ঘে মিলিয়া কানা-খোঁড়া নুলো-হাবা-বোবা ধরিয়া আনিয়া সেবা করিল—নাম জাহির হইতেই দলে দলে ভালো লোকেরা আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, টাকা দাও, পরোপকার করি। বাড়তি টাকা শেষ হইয়াছে, পুঁজিতে হাত না দিলে আর চলে না—এমনি যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন অবিনাশের সঙ্গে তাহার পরিচয়। সম্বন্ধ যত দূরের হোক, পৃথিবীতে একটা লোকও যে তখনো বাকী আছে যাহাকে আত্মীয় বলা চলে, এই খবর সেইদিন সে প্রথম পাইল। অবিনাশের কলেজে তখন মাস্টারি একটা খালি; চেষ্টা করিয়া সেই কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করাইয়া সঙ্গে করিয়া আগ্রায় আনিলেন। এ-দেশে আসিবার ইহাই তাহার ইতিহাস। পশ্চিমের মুসলমানী আমলের প্রাচীন সহরগুলায় সাবেককালের অনেক বড় বড় বাড়ি এখনও অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়, ইহারই একটা হরেন্দ্র যোগাড় করিয়া লইল। এই তাহার আশ্রম।

কিন্তু এখানে আসিয়া যে-কয়দিন সে অবিনাশের গৃহে অতিবাহিত করিল—তাহারই অবকাশে নীলিমার সহিত তাহার পরিচয়। এই মেয়েটি অচেনা লোক বলিয়া একটা দিনের জন্যও আড়ালে থাকিয়া দাসী-চাকরের হাত দিয়া আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা করিল না—একেবারে প্রথম দিনটিতেই সম্মুখে বাহির হইল। কহিল, তোমার কখন্ কি চাই ঠাকুরপো, আমাকে জানাতে লজ্জা ক'রো না! আমি বাড়ির গিন্নী নই—অথচ গিন্নীপনার ভার পড়েচে আমার ওপর। তোমার দাদা বলেছিলেন, ভায়ার অযত্ন হলে মাইনে কাটা যাবে। গরীবমানুষের লোকসান করে দিয়ো না ভাই, দরকারগুলো যেন জানতে পারি।

হরেন্দ্র কি জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না। লজ্জায় সে এমন জড়সড় হইয়া উঠিল যে, এই মিষ্টি কথাগুলি যিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া গেলেন তাঁহার মুখের দিকেও চাহিতে

পারিল না। কিন্তু লজ্জা কাটিতেও তাহার দিন-দুয়ের বেশি লাগিল না। ঠিক যেন না কাটিয়া উপায় নাই—এমনি। এই রমণীর যেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর প্রীতি, তেমনি সহজ সেবা। তিনি যে বিধবা, সংসারে তাঁহার যে সত্যকার আশ্রয় কোথাও নাই—তিনিও যে এ-বাড়িতে পর—এই কথাটাও একদিকে যেমন তাঁহার মুখের চেহারায়, তাঁহার সাজ-সজ্জায়, তাঁহার রহস্য-মধুর আলাপ-আলোচনায় ধরিবার যো নাই—তেমনি এইগুলাই যে তাঁহার সবটুকু নহে এ-কথাটাও না বুঝিয়া উপায়ান্তর নাই।

বয়স নিতান্ত কম নহে, বোধ করি বা ত্রিশের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই বয়সের সমুচিত গাম্ভীর্য্য হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া দায়—এমনি হাল্কা তাঁহার হাসি-খুশির মেলা, অথচ একটুখানি মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় এমন একটা অদৃশ্য আবেষ্টন তাঁহাকে অহর্নিশি ঘিরিয়া আছে যাহার ভিতরে প্রবেশের পথ নাই। বাটীর দাসী-চাকরেরও না, বাটীর মনিবেরও না।

এই গৃহে, এই আবহাওয়ার মাঝখানেই হরেন্দ্রর সপ্তাহ-দুই কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সে আলাদা বাসা ভাড়া করিয়াছে শুনিয়া নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি করতে গেলে কেন ঠাকুরপো, এখানে কি এমন তোমার আটকাচ্ছিল?

হরেন্দ্র সলজ্জে কহিল, একদিন যেতেই হ'ত বৌদি।

নীলিমা জবাব দিল, তা হয়ত হ'ত। কিন্তু দেশ-সেবার নেশার ঘোর তোমার এখনো চোখ থেকে কাটেনি ঠাকুরপো, আরও দিন-কতক না হয় বৌদির হেফাজতেই থাকতে!

হরেন্দ্র বলিল, তাই থাকব বৌদি। এই ত মিনিট-দশেকের পথ—আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাব কোথায়?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন; সেইখান হইতেই কহিলেন, যাবে জাহান্নামে। অনেক বারণ করেছিলাম, হরেন, যাস্‌নে আর কোথাও, এইখানে থাক্। কিন্তু সে কি হয়! ইজ্জত বড়—না, দাদার কথা বড়! যাও, নতুন আড্ডায় গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা চড়াও গে। ছোটগিন্নী, ওকে বলা বৃথা। ও হ'ল চড়কের সন্ন্যাসী—পিট ফুঁড়ে ঘুরতে না পেলে ওদের বাঁচাই মিথ্যে।

নূতন বাসায় আসিয়া হরেন্দ্র চাকর বামুন রাখিয়া অতিশয় শান্ত-শিষ্ট নিরীহ মাস্টারের ন্যায় কলেজের কাজে মন দিল। প্রকাণ্ড বাড়িতে অনেক ঘর। গোটা-দুই ঘর ছাড়া বাকী সমস্তই পড়িয়া রহিল। মাস-খানেক পরেই এই ঘরগুলো তাহাকে শুধু পীড়া দিতে লাগিল। ভাড়া দিতে হয়, অথচ কাজে লাগে না। অতএব পত্র গেল রাজেনের কাছে। সে ছিল তাহার দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতির সেক্রেটারী। দেশোদ্ধারের আগ্রহাতিশয্যে বছর-দুই অন্তরীণ থাকিয়া মাস পাঁচ-ছয় ছাড়া পাইয়া সাবেক বন্ধুবান্ধবগণের সন্ধানে ফিরিতেছিল। হরেন্দ্রর চিঠি এবং ট্রেনের মাশুল

পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিল। হরেন্দ্র কহিল, দেখি যদি তোমায় একটা চাকরি-বাকরি করে দিতে পারি। রাজেন বলিল, আচ্ছা। তাহার পরম বন্ধু ছিল সতীশ। সে কোনমতে অন্তরীণের দায় এড়াইয়া মেদিনীপুর জেলায় কোন একটা গ্রামে বসিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম খুলিবার চেষ্টায় ছিল; রাজেনের পত্র পাওয়ার সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার সাধুসঙ্কল্প মুলতবি রাখিয়া আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একাকী আসিল না, অনুগ্রহ করিয়া গ্রাম হইতে একজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সতীশ এ-কথা যুক্তি ও শাস্ত্র-বচনের জোরে নির্বিশেষে প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, ভারতবর্ষই ধর্ম্ম-ভূমি। মুনি-ঋষিরাই ইহার দেবতা। আমরা ব্রহ্মচারী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আমাদের সব গিয়াছে। এ-দেশের সহিত জগতের কোন দেশের তুলনা হয় না, কারণ আমরাই ছিলাম একদিন জগতের শিক্ষক, আমরাই ছিলাম মানুষের গুরু। সুতরাং বর্ত্তমানে ভারতবাসীর একমাত্র করণীয় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অসংখ্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করা। দেশোদ্ধার যদি কখনো সম্ভব হয় ত এই পথেই হইবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল। সতীশের নাম সে শুনিয়াছিল, কিন্তু পরিচয় ছিল না; সুতরাং এই সৌভাগ্যের জন্য সে মনে মনে রাজেনকে ধন্যবাদ দিল এবং ইতিপূর্ব্বে যে তাহার বিবাহ হইয়া যায় নাই এজন্য সে আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিল। সতীশ সর্ব্ববাদিসম্মত ভাল ভাল কথা জানিত; কয়েকদিন ধরিয়া সেই আলোচনাই চলিতে লাগিল। এই পুণ্যভূমির মুনি-ঋষিদের আমরাই বংশধর, আমাদেরই পূর্ব্বপিতামহগণ একদিন জগতের গুরু ছিলেন, অতএব আর একদিন গুরুগিরি করিবার আমরাই উত্তরাধিকারী। আর্য্যরক্তসম্ভূত কোন্ পাষণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে? পারে না এবং পারিবার মত দুর্ম্মতিপরায়ণ লোকও কেহ সেখানে ছিল না।

হরেন্দ্র মাতিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা তপস্যা-সাধনার বস্তু বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটা সাধ্যমত গোপনে রাখা হইতে লাগিল, কেবল রাজেন ও সতীশ মাঝে মাঝে দেশে গিয়া ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা বয়সে ছোট তাহারা স্কুলে প্রবেশ করিল, যাহারা সে শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা হরেন্দ্রের চেষ্টায় কোন একটা কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইল—এইরূপে অল্পকালেই প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের ছেলের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহিরের লোক বিশেষ কিছু জানিতও না, জানিবার চেষ্টাও করিত না। শুধু এইটুকুই সকলে ভাসা ভাসা রকমের শুনিতে পাইল যে, হরেন্দ্রের বাসায় থাকিয়া কতকগুলি দরিদ্র বাঙালীর ছেলে লেখাপড়া করে। ইহার অধিক অবিনাশও জানিত না, নীলিমাও না।

সতীশের কঠোর শাসনে বাসায় মাছ-মাংস আসিবার জো নাই, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠিয়া সকলকে স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়;

পরে লেখাপড়া ও নিত্যকর্ম্ম। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষদের ইহাতেও মন উঠিল না, সাধন-মার্গ ক্রমশঃ কঠোরতর হইয়া উঠিল। বামুন পলাইল, চাকরদের জবাব দেওয়া হইল—অতএব এ কাজগুলাও পালা করিয়া ছেলেদের ঘাড়ে পড়িল। কোনদিন একটা তরকারি হয়, কোনদিন বা তাহাও হইয়া উঠে না; ছেলেদের পড়া-শুনা গেল—ইস্কুলে তাহারা বকুনি খাইতে লাগিল, কিন্তু কঠিন বাধা-নিয়মের শৈথিল্য ঘটিল না—এমনি কড়াকড়ি। কেবল একটা অনিয়ম ছিল—বাহিরে কোথাও অহারের নিমন্ত্রণ জুটিলে। নীলিমার কি একটা ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই ব্যতিক্রম হরেন্দ্র জোর করিয়া বাহাল করিয়াছিল। এ-ছাড়া আর কোথাও কোন মার্জ্জনা ছিল না। ছেলেদের খালি পা, রুক্ষ মাথা—পাছে কোথাও কোনও ছিদ্র-পথে বিলাসিতা অনধিকার প্রবেশ করে সেদিকে সতীশের অতি সতর্ক চক্ষু অনুক্ষণ পাহারা দিতে লাগিল। মোটামুটি এইভাবে আশ্রমের দিন কাটিতেছিল। সতীশের ত কথাই নাই, হরেন্দ্রর মনের মধ্যেও শ্লাঘার অবধি রহিল না। বাহিরের কাহারো কাছে তাহারা বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিত না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হরেন্দ্র আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তির উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রায়ই এই কথাটা বলিত যে, একটা ছেলেও যদি সে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে ত এ-জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে মনে করিবে। সতীশ কথা কহিত না, বিনয়ে মুখখানি শুধু আনত করিত।

শুধু একটা বিষয়ে হরেন্দ্র এবং সতীশ উভয়েই পীড়া বোধ করিতেছিল। কিছুদিন হইতে উভয়েই অনুভব করিতেছিল যে, রাজেনের আচরণ পূর্ব্বের মত আর নাই। আশ্রমের কোন কাজেই সে আর গা দেয় না, সকালের সাধন-ভজনের নিত্যকর্ম্মে এখন সে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে; জিজ্ঞাসা করিলে বলে, শরীর ভাল নাই। অথচ শরীর ভাল না-থাকার বিশেষ কোন লক্ষণও দেখা যায় না। কিন্তু কেন সে এমন হইতেছে প্রশ্ন করিয়াও জবাব পাওয়া যায় না। কোনদিন হয়ত প্রভাতেই কোথায় চলিয়া যায়, সারাদিন আসে না, রাত্রে যখন বাড়ি ফিরে তখন এমনি তাহার চেহারা যে, কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হরেন্দ্ররও সাহস হয় না। অথচ এ-সকল একান্তই আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ; একা হরেন্দ্র ব্যতীত সন্ধ্যার পরে কাহারো বাহিরে থাকিবার জো নাই—এ-কথা রাজেন ভাল করিয়াই জানে, অথচ গ্রাহ্য করে না। আশ্রমের সেক্রেটারি সতীশ, শৃঙ্খলারক্ষার ভার তাহারই উপরে। এইসকল অনাচারের বিরুদ্ধে সে হরেন্দ্রর কাছে ঠিক যে অভিযোগ করিত তাহা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, ইহাকে আশ্রমে রাখা ঠিক সঙ্গত হইতেছে না—ছেলেরা বিগড়াইতে পারে। হরেন্দ্র নিজেও যে না বুঝিত তাহা নহে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস তাহার ছিল না। একদিন সমস্ত রাত্রিই তাহার দেখা নাই—সকালে যখন সে বাড়ি ফিরিল তখন এই লইয়াই একটা রীতিমত আলোচনা চলিতেছিল? হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি রাজেন! কাল ছিলে কোথায়?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, একটা গাছতলায় পড়েছিলাম।

গাছতলায়! গাছতলায় কেন?

অনেক রাত হয়ে গেল—আর ডাবাডাকি করে আপনাদের ঘুম ভাঙালাম না।

বেশ! অত রাত্রিই বা হ'ল কেন?

এমনি ঘুরতে ঘুরতে। বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সতীশ নিকটে ছিল, হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কি কাণ্ড বল ত?

সতীশ বলিল, আপনাকেই কথা কাটিয়ে চলে গেল—গ্রাহ্য করলে না, আর আমি জানব কি করে।

তাই ত হে, এতটা ভাল নয়।

সতীশ মুখ ভারি করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি ত একটা কথা জানেন, পুলিশে ওকে বছর-দুই জেলে রেখেছিল?

হরেন্দ্র বলিল, জানি, কিন্তু সে ত মিথ্যে সন্দেহের উপর। ওর ত কোন সত্যিকার দোষ ছিল না।

সতীশ কহিল, আমি শুধু ওর বন্ধু বলেই জেলে যেতে যেতে রয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশের সুদৃষ্টি ওকে আজও ছাড়েনি।

হরেন্দ্র কহিল, অসম্ভব নয়।

প্রত্যুত্তরে সতীশ একটুখানি বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, আমি ভাবি, ওর থেকে আমাদের আশ্রমের উপরে না তাদের মায়া জন্মায়।

শুনিয়া হরেন্দ্র চিন্তিত মুখে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ নিজেও খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বোধ হয় জানেন যে, রাজেন ভগবান পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না?

হরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কই না!

সতীশ কহিল, আমি জানি সে করে না। আশ্রমের কাজ-কর্ম্ম, বিধি-নিষেধের প্রতিও তার তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা নেই! আপনি বরঞ্চ কোথাও তার একটা চাকরি-বাকরি করে দিন।

হরেন্দ্র কহিল, চাকরি ত গাছের ফল নয় সতীশ, যে, ইচ্ছে করলেই পেড়ে হাতে দেব। তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়।

সতীশ বলিল, তা হলে তাই করুন। আপনি যখন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট ও আমি এর সেক্রেটারি, তখন সকল বিষয় আপনার গোচর করাই আমার কর্ত্তব্য। আপনি ওকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং আমারও সে বন্ধু। তাই তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে এতদিন আমার প্রবৃত্তি যায়নি, কিন্তু এখন আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

হরেন্দ্র মনে মনে ভীত হইয়া কহিল, কিন্তু আমি জানি তার নির্ম্মল চরিত্র—

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ। এদিক দিয়ে অতি বড় শত্রুও তার দোষ দিতে পারে না। রাজেন আজীবন কুমার, কিন্তু সে ব্রহ্মচারীও নয়। আসল কারণ, স্ত্রীলোক বলে সংসারে যে কিছু আছে এ-কথা ভাববারও তার সময় নেই। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তার চরিত্রের অভিযোগ আমি করিনি, সে অস্বাভাবিক রকমের নির্ম্মল, কিন্তু—

হরেন্দ্র প্রশ্ন করিল, তবুও তোমার কিন্তুটা কি?

সতীশ বলিল, কলকাতার বাসায় আমরা দুজনে এক ঘরে থাকতাম। ও তখন ক্যাম্‌বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এবং বাসায় বি. এস্‌-সি. পড়ত। সবাই জানত ও-ই ফার্স্ট হবে, কিন্তু একজামিনের আগে কোথায় চলে গেল—

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওকি ডাক্তারি পড়ত না-কি? কিন্তু আমাকে যে বলেছিল ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু পড়াশুনো ভয়ানক শক্ত বলে ওকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল—

সতীশ কহিল, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন কলেজে থার্ড ইয়ারে সে-ই হয়েছিল প্রথম। অথচ বিনা কারণে চলে আসায় কলেজের সমস্ত মাস্টারই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। ওর পিসিমা বড়লোক, তিনিই পড়ার খরচ দিচ্ছিলেন। এই ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে টাকা বন্ধ করলেন, তার পরেই বোধ হয় আপনার সঙ্গে ওর পরিচয়। বছর-দুই ঘুরে ঘুরে যখন ফিরে এলো তখন পিসিমা তারই মত নিয়ে তাকে ডাক্তারি স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। ক্লাশে প্রত্যেক বিষয়েই ফার্স্ট হচ্ছিল, অথচ বছর-তিনেক পড়ে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিলে। ওই এক ছুতো—ভারি শক্ত, ও আমি পেরে উঠবো না। ছেড়ে দিয়ে আমার বাসায় আমার ঘরে এসে আড্ডা নিলে। বললে, ছেলে পড়িয়ে বি. এস্‌-সি. পাশ করে কোথাও কোন গ্রামে গিয়ে মাস্টারি করে কাটাব। আমি বললাম, বেশ তাই কর। তার পরে দিন-পোনর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, চোখের ঘুম কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই—এমন পড়াই পড়লে যে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সবাই বললে, এ না হলে কি আর কেউ প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হতে পারে!

হরেন্দ্র এ-সব কিছুই জানিত না—রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, তার পরে?

সতীশ কহিল, তার পরে যা আরম্ভ করলে সেও এমনি অদ্ভুত। বই আর ছুঁলে না। কোথায় রইল তার খাতা-পেন্সিল, কোথায় রইল তার নোট্ বুক—কোথায় যায়, কোথায় থাকে, পাত্তাই পাওয়া যায় না। যখন ফিরে আসে তার চেহারা দেখলে ভয় হয়। যেন এতদিন ওর স্নানাহার পর্য্যন্ত ছিল না।

তার পরে?

তার পরে একদিন পুলিশের দলবল এসে সকাল থেকে বাড়িময় যেন দক্ষ-যজ্ঞ শুরু করলে। এটা ফেলে, সেটা ছড়ায়, সেটা খোলে, একে ধমকায়, তাকে আটকায় —সে বস্তু চোখে না দেখলে অনুধাবন করবার জো নেই। বাসার সবাই কেরানী, ভয়ে সকলের সর্দ্দি-গর্ম্মী হয়ে গেল—সবাই ভাবলে আর রক্ষে নেই, পুলিশের লোকে আজ সবাইকে ধরে ফাঁসি দেবে।

তার পরে?

তারপরে বিকেল নাগাদ রাজেনকে আর রাজেনের বন্ধু বলে আমাকে ধরে নিয়ে তারা বিদেয় হ'ল। আমাকে দিলে দিন-চারেক পরেই ছেড়ে, কিন্তু তার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না। ছাড়বার সময় সাহেব দয়া করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ওয়ান্ স্টেপ্! ওন্লি ওয়ান স্টেপ্! তোমার বাসার ঘর আর এই জেলের ঘরের মধ্যে ব্যবধান রইলো শুধু ওয়ান্ স্টেপ্। গো। গঙ্গাস্নান করে কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করে বাসায় ফিরে এলাম। সবাই বললে, সতীশ, তুমি ভাগ্যবান। অফিসে গেলাম, সাহেব ডেকে পাঠিয়ে দু'মাসের মাইনে হাতে দিয়ে বললেন, গো। শুনলাম ইতিমধ্যে আমার অনেক খোঁজ-তল্লাসিই হয়ে গেছে।

হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এইভাবে থামিয়া শেষে ধীরে ধীরে কহিল, তা হলে কি তোমার নিশ্চয় বোধ হয় যে রাজেন—

সতীশ মিনতির স্বরে বলিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার বন্ধু।

হরেন্দ্র খুশী হইল না, কহিল, আমারও ত সে ভাইয়ের মত।

সতীশ কহিল, একটা কথা ভেবে দেখবার যে, তারা আমাকে বিনা দোষে লাঞ্ছনা করেচে সত্যি, কিন্তু ছেড়েও দিয়েচে।

হরেন্দ্র বলিল, বিনা দোষে লাঞ্ছনা করাটাও ত আইন নয়। যারা তা পারে তারা এ-ই বা পারবে না কেন? এই বলিয়া সে তখনকার মত কলেজে চলিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভারী অশান্তি লাগিয়া রহিল। শুধু কেবল রাজেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই নয়, দেশের কাজে দেশের ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে এই যে সে আয়োজন করিয়াছে পাছে তাহা অকারণে নষ্ট হইয়া যায়। হরেন স্থির করিল, ব্যাপারটা সত্যই হোক, বা মিথ্যাই হোক, পুলিশের চক্ষু অকারণে আশ্রমের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনা কোনমতেই সমীচীন নয়। বিশেষতঃ সে যখন স্পষ্টই এখানকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে তখন কোথাও চাকরি করিয়া দিয়া হোক বা যে-কোন অজুহাতেই হোক, তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইহার দিন-কয়েক পরেই মুসলমানদের কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে দুদিন ছুটি ছিল।

সতীশ কাশী যাইবার অনুমতি চাহিতে আসিল। আগ্রা আশ্রমের অনুরূপ আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বিরাট কল্পনা হরেন্দ্রর মনের মধ্যে ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই সতীশের কাশী যাওয়া। শুনিয়া রাজেন আসিয়া কহিল, হরেনদা, ওর সঙ্গে আমিও দিন-কতক বেড়িয়ে আসি গে।

হরেন্দ্র বলিল, তার কাজ আছে বলে সে যাচ্ছে।

রাজেন বলিল, আমার কাজ নেই বলেই যেতে চাচ্ছি। যাবার গাড়িভাড়ার টাকাটা আমার কাছে আছে।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ফিরে আসবার?

রাজেন চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিল, রাজেন, কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারিনি।

রাজেন একটুখানি হাসিয়া কহিল, বলবার প্রয়োজন নেই হরেনদা, সে আমি জানি। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রির গাড়িতে তাহাদের যাইবার কথা। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে হরেন্দ্র দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার হাতের মধ্যে একটা কাগজের মোড়ক গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল, ফিরে না এলে বড় দুঃখ পাবো রাজেন, এই বলিয়াই চক্ষের পলকে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইহার দিন-দশেক পরে দুজনেই ফিরিয়া আসিল। হরেন্দ্রকে নিভৃতে ডাকিয়া সতীশ প্রফুল্লমুখে কহিল, আপনার সেদিনের ঐটুকু বলাতেই কাজ হয়েচে হরেনদা। কাশীতে আশ্রম-স্থাপনের জন্যে এ-কদিন রাজেন অমানুষিক পরিশ্রম করেচে।

হরেন্দ্র কহিল, পরিশ্রম করলেই ত সে অমানুষিক পরিশ্রমই করে সতীশ।

হাঁ, তাই সে করেচে। কিন্তু এর সিকি ভাগ পরিশ্রমও যদি সে আমাদের এই নিজের আশ্রমটুকুর জন্য করত।

হরেন্দ্র আশান্বিত হইয়া বলিল, করবে হে সতীশ, করবে। এতদিন বোধ করি ও ঠিক জিনিসটি ধরতে পারেনি। আমি নিশ্চয় বলচি তুমি দেখতে পাবে এখন থেকে ওর কর্ম্মের আর অবধি থাকবে না।

সতীশ নিজেও সেই ভরসাই করিল।

হরেন্দ্র বলিল, তোমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় একটা কাজ স্থগিত আছে। আমি মনে মনে কি স্থির করেচি জানো? আমাদের আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য গোপন রাখলে আর চলবে না। দেশের এবং দশের সহানুভূতি পাওয়া আমাদের প্রয়োজন। এর বিশিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি সাধারণ্যে প্রচার আবশ্যক।

সতীশ সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু তাতে কি কাজ বাধা পাবে না?

হরেন্দ্র বলিল, না। এই রবিবারে আমি কয়েকজনকে আহ্বান করেচি। তাঁরা দেখতে আসবেন। আশ্রমের শিক্ষা, সাধনা, সংযম ও বিশুদ্ধতার পরিচয়ে সেদিন যেন তাঁদের আমরা মুগ্ধ করে দিতে পারি। তোমার উপর সমস্ত দায়িত্ব।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কে কে আসবেন?

হরেন্দ্র বলিল, অজিতবাবু, অবিনাশদা, বৌঠাকরুণ। শিবনাথবাবু সম্প্রতি এখানে নেই—শুনলুম জয়পুরে গেছেন কার্য্যোপলক্ষ্যে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কমলের নাম বোধ করি শুনেচ—তিনিও আসবেন; এবং শরীর সুস্থ থাকলে হয়ত আশুবাবুকেও ধরে আনতে পারব। জান ত, কেউ এঁরা যে সে লোক নন। সেদিন এঁদের কাছ থেকে যেন আমরা সত্যিকার শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারি। সে ভার তোমার।

সতীশ সবিনয়ে মাথা নত করিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন, তাই হবে।

রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভ্যাগতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিলেন না শুধু আশুবাবু। হরেন্দ্র দ্বার হইতে তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেরা তখন আশ্রমের নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত। কেহ আলো জ্বালিতেছে, কেহ ঝাঁট দিতেছে, কেহ উনান ধরাইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ রান্নার আয়োজন করিতেছে। হরেন্দ্র অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিল, সেজদা, এরাই সব আমাদের আশ্রমের ছেলে। আপনি যাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল বলেন। আমাদের চাকর-বামুন নেই, সমস্ত কাজ এদের নিজেদের করতে হয়। বৌদি, আসুন আমাদের রান্নাশালায়। আজ আমাদের পর্ব্বদিন, সেখানকার আয়োজন একবার দেখে আসবেন চলুন।

নীলিমার পিছনে পিছনে সবাই আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। একটি বছর দশ-বারোর ছেলে উনান জ্বালিতেছিল এবং সেই বয়সের একটি ছেলে বঁটিতে আলু কুটিতেছিল, উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। নীলিমা ছেলেটিকে স্নেহের কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ তোমাদের কি রান্না হবে বাবা?

ছেলেটি প্রফুল্লমুখে কহিল, আজ রবিবারে আমাদের আলুর দম হয়।

আর কি হয়?

আর কিছু না।

নীলিমা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুধু আলুর দম? ডাল কিংবা ঝোল কিংবা আর কিছু।

ছেলেটি শুধু কহিল, ডাল আমাদের কাল হয়েছিল।

সতীশ পাশে দাঁড়াইয়াছিল, বুঝাইয়া বলিল, আমাদের আশ্রমে একটার বেশি হবার নিয়ম নেই।

হরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, হবার জো নেই বৌদি, হবে কোথা থেকে? ভায়া এই ভাবেই পরের কাছে আশ্রমের গৌরব রক্ষা করেন।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, দাসী-চাকরও নেই বুঝি?

হরেন্দ্র কহিল, না। তাদের আনলে আলুর দমকে বিদায় দিতে হবে। ছেলেরা সেটা পছন্দ করবে না।

নীলিমা আর প্রশ্ন করিল না, ছেলে দুটির মুখের পানে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। কহিল, ঠাকুরপো, আর কোথাও চল।

সকলেই এ-কথার অর্থ বুঝিল। হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, চলুন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতাম বৌদি, এ আপনি সইতে পারবেন না। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, কিন্তু আপনি নিজেই এতে অভ্যস্ত—শুধু আপনিই বুঝবেন এর সার্থকতা। তাই সেদিন আমার এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আপনাকে সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ করেছিলাম।

হরেন্দ্রর গভীর ও গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার নিজের কথা আলাদা, কিন্তু এইসব শিশুদের নিয়ে প্রচণ্ড আড়ম্বরে এই নিষ্ফল দারিদ্র্যচর্চ্চার নাম কি মানুষ-গড়া হরেনবাবু? এরাই বুঝি সব ব্রহ্মচারী? এদের মানুষ করতে চান ত সাধারণ সহজ পথ দিয়ে করুন—মিথ্যে দুঃখের বোঝা মাথায় চাপিয়ে অসময়ে কুঁজো করে দেবেন না।

তাহার বাক্যের কঠোরতায় হরেন্দ্র বিব্রত হইয়া উঠিল। অবিনাশ বলিলেন, কমলকে ডেকে আনা তোমার ঠিক হয়নি হরেন।

কমল লজ্জা পাইল, কহিল, আমাকে সত্যিই কারো ডাকা উচিত নয়।

নীলিমা কহিল, কিন্তু সে-কারও মধ্যে আমি নয় কমল। আমার ঘরের মধ্যে কখনো তোমার অনাদর হবে না। চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি গে। দেখি, ঠাকুরপোর আশ্রমে আরও কি কি আতসবাজি বার হয়। এই বলিয়া সে স্নিগ্ধ-হাস্যের আবরণ দিয়া কমলের লজ্জা ঢাকিয়া দিল।

দ্বিতলে আশ্রমের বসিবার ঘরখানি দিব্য প্রশস্ত। সাবেককালের কারুকার্য্য ছাদের নীচে ও দেওয়ালের গায়ে এখনও বিদ্যমান। বসিবার জন্য একখানা বেঞ্চ ও গোটা-চারেক চৌকি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কেহ তাহাতে বসে না। মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা। আজ বিশেষ উপলক্ষে শাদা চাদর বিছাইয়া প্রতিবেশী লালাজীর গৃহ হইতে কয়েকটা মোটা তাকিয়া চাহিয়া আনা হইয়াছে; মাঝখানে তাঁহারই বাড়ির লতা-পাতা-কাটা বারো ডালের শেজ এবং তাঁহারই দেওয়া সবুজ

রঙের ফাহুসে ঢাকা দেওয়াল-গিরি এক কোণে জ্বলিতেছে; নীচের অন্ধকার ও আনন্দহীন আবহাওয়ার মধ্যে হইতে এই ঘরটিতে উপস্থিত হইয়া সকলেই খুশী হইলেন।

অবিনাশ একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া পদদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ! বাঁচা গেল!

হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, আমাদের আশ্রমের এ ঘরখানি কেমন সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, এই ত মুস্কিলে ফেললি হরেন। কমল উপস্থিত রয়েচেন, ওঁর সুমুখে কোন-কিছুকে ভাল বলতে সাহস হয় না—হয়ত সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদের জোরে এখুনি সপ্রমাণ করে দেবেন যে, এর ছাদের নক্সা থেকে মেঝের গালচে পর্য্যন্ত সবই মন্দ। এই বলিয়া তিনি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আমার আর কোন সম্বল না থাক কমল, অন্ততঃ বয়সের পুঁজিটা যে জমিয়ে তুলেছি এ তুমিও মানবে। তারই জোরে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, সত্য বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রিয় হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু তাই বলে অপ্রিয় বাক্য মাত্রেই সত্য নয় কমল। তোমাকে অনেক কথাই শিবনাথ শিখিয়েচে, কেবল একটি দেখচি সে শেখাতে বাকী রেখেচে।

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার জবাব দিল নীলিমা। কহিল, শিবনাথের ত্রুটি হয়েচে মুখুয্যেমশাই, তাঁকে জরিমানা করে আমরা তার শোধ দেব। কিন্তু গুরুগিরিতে কোন পুরুষই ত কম নয়। তাই প্রার্থনা করি তোমার বয়সের পুঁজি থেকে আরও দু-একটা প্রিয় বাক্য বার কর—আমরা সবাই শুনে ধন্য হই।

অবিনাশ অন্তরে জ্বলিয়া গেলেন। এত লোকের মাঝখানে শুধু কেবল উপহাসের জন্যই নয়, এই বক্রোক্তির অভ্যন্তরে যে তীক্ষ্ণ ফলাটুকু লুকানো ছিল, তাহা বিদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইল না, অপমান করিল। কিছুকাল হইতে কি একপ্রকার অসন্তোষের তপ্ত বাতাস কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া উভয়ের মাঝখানে পড়িতেছিল। ঝড়ের মত ভীষণ কিছুই নয়, কিন্তু খড়-কুটা ধুলা-বালি উড়াইয়া মাঝে মাঝে চোখে-মুখে আনিয়া ফেলিতেছিল। অল্প একটুখানি নড়া দাঁতের মত, চিবানোর কাজটা চলিতেছিল, কিন্তু চিবানোর আনন্দে বাজিতেছিল। হরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, রাগ করতে পারিনে হরেন, তোমার বৌদি নিতান্ত মিথ্যে বলেননি—আমাকে চিনতে ত তাঁর বাকী নেই—ঠিকই জানেন আমার পুঁজি-পাটা সেই সেকেলে সোজাধরণের, তাতে বস্তু থাকলেও রস-কস নেই।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ কথার মানে সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মানেটা ঠিক বুঝবে না। কিন্তু ছোট-গিন্নী হঠাৎ যে-রকম কমলের ভক্ত হয়ে উঠেচেন তাতে আশা হয় তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে ধন্য হবার পথ ওঁর আপনি পরিষ্কার হবে।

এই ইঙ্গিতের কদর্য্যতা তাঁহার নিজের কানেও লাগিয়াছিল, কিন্তু দুর্বিনয়ের স্পর্দ্ধায় আরও কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরেন্দ্র থামাইয়া দিল। ক্ষুন্ন-কণ্ঠে কহিল, সেজদা, আপনারা সকলেই আজ অতিথি। কমলকে আমি আশ্রমের পক্ষে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম, এ-কথা আপনারা ভুলে গেলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকবে না।

নীলিমা বলিল, তা হলে আমার সম্বন্ধে দয়া করে ওঁকে স্মরণ করিয়ে দাও ঠাকুরপো, যে, কাউকে ছোটগিন্নী বলে ডাকতে থাকলেই সে সত্যিকার গৃহিণী হয়ে যায় না। তাকে শাসন করার মাত্রা-বোধ থাকা চাই। আমার দিক থেকে মুখুয্যেমশায়ের অভিজ্ঞতার ভাড়ার-ঘরে এইটুকু আজ বরঞ্চ জমা হয়ে থাক্,—ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

হরেন্দ্র হাত-জোড় করিয়া বলিল, রক্ষে করুন বৌদি, যত অভিজ্ঞতার লড়াই কি আজ আমার বাসায় এসে? যেটুকু বাকী রইল এখন থাক্, বাড়ি ফিরে গিয়ে সমাধা করে নেবেন, নইলে আমরা যে মারা যাই। যে ভয়ে অক্ষয়কে ডাকলাম না, তাই কি শেষে ভাগ্যে ঘটলো?

শুনিয়া অজিত ও কমল উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, অজিতবাবু, শুনলাম কাল নাকি আপনি বাড়ি যাবেন?

কিন্তু আপনি শুনলেন কার কাছে?

আশুবাবুকে আনতে গিয়েছিলুম, তিনি বললেন, কাল বোধ হয় আপনি বাড়ি চলে যাচ্চেন।

অজিত কহিল, বোধ হয়। কিন্তু সে কাল নয় পরশু। এবং বাড়ি কি না তারও নিশ্চয়তা নেই। হয়ত বিকেল নাগাদ স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হব—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যে-কোন দিকের গাড়ি পাবো তাতেই এ-বারের যাত্রা শুরু করে দেব।

হরেন্দ্র সহাস্যে কহিল, অনেকটা বিবাগী হওয়ার মত। অর্থাৎ গন্তব্য স্থানের নির্দ্দেশ নেই।

অজিত বলিল, না।

কিন্তু ফিরে আসবার?

না, তারও আপাততঃ কোন নির্দ্দেশ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, অজিতবাবু, আপনি ভাগ্যবান লোক। কিন্তু তল্পি বইবার

লোকের দরকার হয় ত আমি একজনকে দিতে পারি, বিদেশে এমন বন্ধু আর পাবেন না।

কমল কহিল, আর রাঁধবার লোকের দরকার হয় ত আমিও একজনকে দিতে পারি রাঁধতে তার জোড়া নেই। আপনিও স্বীকার করবেন, হাঁ, অহঙ্কার করতে পারে বটে।

অবিনাশের কিছুই আর ভাল লাগিতেছিল না; বলিলেন, হরেন, আর দেরি কিসের, এবার ফেরবার উদ্যোগ করা যাক্ না। কি বল?

হরেন্দ্র সবিনয়ে কহিল, ছেলেদের সঙ্গে একটু পরিচয় করবেন না? দুটো উপদেশ তাদের দিয়ে যাবেন না সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, উপদেশ দিতে ত আমি আসিনি, এসেছিলায শুধু ওঁদের সঙ্গী হিসাবে। তার বোধ হয় আর দরকার নেই।

সতীশ অনেকগুলি ছেলে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। দশ-বারো বছরের বালক হইতে উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক পর্য্যন্ত তাহাতে আছে। শীতের দিন। গায়ে শুধু একটি জামা, কিন্তু কাহারও পায়ে জুতা নাই—জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় নয় বলিয়াই। আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এ-সকল শিক্ষার অঙ্গ। হরেন্দ্র আজ একটা সুন্দর বক্তৃতা রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, মনে মনে তাহাই আবৃত্তি করিয়া লইয়া যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, এই ছেলেরা স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেচে। আশ্রমের এই মহৎ আদর্শ যাতে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে পারে আজ এদের সেই আশীর্ব্বাদ আপনারা করুন।

সকলে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, যদি সময় থাকে আমাদের বক্তব্য আমি পরে নিবেদন করব। এই বলিয়া সে কমলকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, আপনাকেই আজ আমরা বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করে এনেচি কিছু শুনবো বলে। ছেলেরা আশা করে আছে আপনার মুখ থেকে আজ তারা এমন কিছু পাবে যাতে জীবনের ব্রত তাদের অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমল সঙ্কোচ ও দ্বিধায় আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমি ত বক্তৃতা দিতে পারিনে হরেনবাবু!

উত্তর দিল সতীশ, কহিল, বক্তৃতা নয়, উপদেশ; দেশের কাজে যা তাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে শুধু তাই।

কমল তাহাকেই প্রশ্ন করিল, দেশের কাজ বলতে আপনারা কি বোঝেন আগে বলুন।

সতীশ কহিল, যাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় সেই তো দেশের কাজ।

কমল বলিল, কিন্তু কল্যাণের ধারণা ত সকলের এক নয়। আপনার সঙ্গে আমার ধারণা যদি না মেলে আমার উপদেশ ত আপনাদের কাজে লাগবে না!

সতীশ মুস্কিলে পড়িল। এ-কথার ঠিক উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হরেন্দ্র কহিল, দেশের মুক্তি যাতে আসে সেই হ'ল দেশের একমাত্র কল্যাণ। দেশে এমন কে আছে যে এ-সত্য স্বীকার করবে না?

কমল বলিল, না বলতে ভয় হয় হরেনবাবু, সবাই ক্ষেপে যাবে। নইলে আমিই বলতুম এই মুক্তি শব্দটার মত ভোলবার এবং ভোলাবার এতবড় ছল আর নেই। কার থেকে মুক্তি হরেনবাবু? ত্রিবিধ দুঃখ থেকে, না ভববন্ধন থেকে? কোন্‌টাকে দেশের একমাত্র কল্যাণ স্থির করে, আশ্রম-প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েচেন বলুন ত? এই কি আপনার স্বদেশ-সেবার আদর্শ?

হরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, এ-সব নয়, এ-সব নয়। এ আমাদেরও কাম্য নয়।

কমল বলিল, তাই বলুন এ আমাদের কাম্য নয়, বলুন আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। বলুন সংসারত্যাগ ও বৈরাগ্য-সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু তার কি শিক্ষা ছেলেদের এই? গায়ে একটা মোটা জামা নেই, পায়ে জুতা নেই, পরণে জীর্ণ বস্ত্র, মাথায় রুক্ষ কেশ, একবেলা অর্দ্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যেই বড় হয়ে উঠচে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু, পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখুন। যারা অনেক পেয়েচে, তারা সহজেই দিয়েচে, এমন অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্রাজুয়েট তৈরী করতে হয়নি।

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করিল, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে কি ধর্ম্মের সাধনা, ত্যাগের দীক্ষা প্রয়োজনীয় নয় আপনি বলেন?

কমল কহিল, মুক্তি-সংগ্রামের অর্থটা আগে পরিষ্কার হোক।

সতীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কমল হাসিয়া বলিল, ভাবে বোধ হয় আপনি বিদেশী রাজশক্তির বন্ধন-মোচনকেই দেশের মুক্তি-সংগ্রাম বলচেন! তা যদি হয় সতীশবাবু, আমি নিজে ত ধর্ম্মের সাধনাও করিনি, ত্যাগের দীক্ষাও নিইনি, তবু আমাকে ঠিক সামনের দলেই পাবেন এ আপনাকে আমি কথা দিলুম। কিন্তু আপনাদের খুঁজে পাব ত?

সতীশ কথা কহিল না, কেমন একপ্রকার যেন বিব্রত হইয়া উঠিল এবং তাহার চঞ্চল দৃষ্টির অনুসরণ করিতে গিয়া কমল কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

এই লোকটিই রাজেন্দ্র। কখন নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ভিন্ন আর কেহ লক্ষ্য করে নাই। সে আচ্ছন্নের ন্যায় নিষ্পলকচক্ষে এতক্ষণ তাহারই প্রতি চাহিয়াছিল, এখনও ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল। ইহার চেহারা একবার দেখিলে ভোলা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে। রঙ অতিশয় ফর্সা, হঠাৎ দেখিলে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রকাণ্ড কপাল, সুমুখের দিকটায় এই বয়সেই টাকের মত হইয়া ঢের বড় দেখাইতেছে, চোখ গভীর এবং অতিশয় ক্ষুদ্র-অন্ধকার গর্ত্ত হইতে ইঁদুরের চোখের মত জ্বলিতেছে, নীচেকার পুরু মোটা ঠোঁট সুমুখে ঝুঁকিয়া যেন অন্তরের সুকঠোর সঙ্কল্প কোনমতে চাপা দিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে ভয় হয় এই মানুষটাকে এড়াইয়া চলাই ভাল।

হরেন্দ্র কহিল, ইনিই আমার বন্ধু—শুধু বন্ধু নয়, ছোট ভায়ের মত, রাজেন। এতবড় কর্ম্মী, এতবড় স্বদেশভক্ত, এতবড় ভয়শূন্য সাধু-চিত্ত পুরুষ আমি আর দেখিনি। বৌদি, এর প্রশ্নই সেদিন আপনার কাছে করেছিলাম। ও যেমন অবলীলায় পায়, তেমনি অবহেলায় ফেলে দেয়। আশ্চর্য্য মানুষ! অজিতবাবু, একেই আপনার তল্পি বইতে সঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম।

অজিত কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, অক্ষয়বাবু আসিয়াছেন।

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, অক্ষয়বাবু!

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, হাঁহে হাঁ—তোমার পরমবন্ধু অক্ষয়কুমার। সহসা চমকিয়া বলিল, অ্যাঁ! ব্যাপার কি আজ? সবাই উপস্থিত যে! আশুবাবুর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে বেড়িয়েছিলাম, পথে নাবিয়ে দিলে। সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হ'ল হরি ঘোষের গোয়ালটা একটু তদারক করেই যাই না। তাই আসা, তা বেশ।

এ-সকল কথার কেহ জবাব দিল না, কারণ, জবাব দিবারও কিছু নাই এ-বিশ্বাসও কেহ করিল না। অক্ষয়ের এটা পথও নয়, এ বাসায় সে সহজে আসেও না।

অক্ষয় কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার ওখানে কাল সকালেই যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়িটা ত চিনিনে—ভালই হ'ল যে দেখা হয়ে গেল। একটা সুসংবাদ আছে।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, সুসংবাদটা কি শুনি? খবরটা যখন শুভ তখন গোপনীয় নিশ্চয়ই।

অক্ষয় কহিল, না, গোপন করবার আর কি আছে। পথের মধ্যে আজ সেই সেলাইয়ের কল বিক্রী-আলা পার্শী বেটার সঙ্গে দেখা। সেই সেদিন যে কমলের হয়ে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল। গাড়ি থামিয়ে ব্যাপারটা শোনা গেল। কমলকে

দেখাইয়া কহিল, উনি ধারে একটা কল কিনে ফতুয়া টতুয়া সেলাই করে খরচ চালাচ্ছিলেন—শিবনাথ ত দিব্যি গা-ঢাকা দিয়েচেন, কিন্তু কড়ায় মত দাম দেওয়া চাই ত! তাই সে কলটা কেড়ে নিয়ে গেছে—আশুবাবু আজ পুরো দাম দিয়ে সেটা কিনে নিলেন। কমল, কাল সকালে লোক পাঠিয়ে কলটা আদায় করে নিয়ো। খাওয়া-পরা চলছিল না, আমাদের ত সে-কথা জানালেই হ'ত।

তাহার বলায় বর্ব্বর নিষ্ঠুরতায় সকলেই মর্ম্মাহত হইল। কমলের লাবণ্যহীন শীর্ণ মুখের একটা হেতু দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অবিনাশের পর্য্যন্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

কমল মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে সেটা ফিরিয়ে দিতে বলবেন। আর আমার প্রয়োজন নেই।

কেন? কেন?

হরেন্দ্র কহিল, অক্ষয়বাবু, আপনি যান এ-বাড়ি থেকে। আপনাকে আমি আহ্বান করিনি—ইচ্ছে করিনি যে আপনি আসেন, তবু এসেচেন। মানুষের ব্রুট্যালিটির কি কোথাও কোন সীমা থাকবে না!

কমল হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল অজিতের দুই চক্ষু যেন জলভারে ছল ছল করিতেছে। কহিল, অজিতবাবু, আপনার গাড়ি সঙ্গে আছে, দয়া করে আমাকে পৌঁছে দেবেন?

অজিত কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

কমল নীলিমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আর বোধ হয় শীঘ্র দেখা হবে না, আমি এখান থেকে যাচ্ছি।

কোথায় এ-কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। নীলিমা শুধু তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া একটুখানি চাপ দিল এবং পরক্ষণেই সে হরেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া অজিতের পিছনে পিছনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৫

মোটরে বসিয়া কমল আকাশের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া ছিল, গাড়ি থামিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোথায় এলেন অজিতবাবু, আমার বাসার পথ ত নয়।

অজিত উত্তর দিল, না, এ-পথ নয়।

নয়? তা হলে ফিরতে হবে বোধ করি?

সে আপনি জানেন। আমাকে হুকুম করলেই ফিরব।

শুনিয়া কমল আশ্চর্য্য হইল। এই অদ্ভুত উত্তরের জন্য যতটা না হোক, তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা তাহাকে বিচলিত করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া হাসিয়া কহিল, পথ ভোলার অনুরোধ ত আমি করিনি অজিতবাবু, যে, সংশোধনের হুকুম আমাকেই দিতে হবে! ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আপনার—আমার কর্ত্তব্য শুধু আপনাকে বিশ্বাস করে থাকা।

কিন্তু দায়িত্ববোধের ধারণায় যদি ভুল করে থাকি কমল?

যদির ওপর ত বিচার চলে না অজিতবাবু। ভুলের সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হই, তার পরে এর বিচার করব।

অজিত অস্ফুট-স্বরে বলিল, তা হলে বিচারই করুন আমি অপেক্ষা করে রইলাম। এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত-কয়েক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কমল, আর একদিনের কথা মনে আছে তোমার? সেদিন ত ঠিক এমনি অন্ধকারই ছিল।

হাঁ, এমনি অন্ধকারই ছিল। বলিয়া সে গাড়ির দরজা খুলিয়া নামিয়া আসিয়া সম্মুখের আসনে অজিতের পাশে গিয়া বসিল। জনপ্রাণীহীন অন্ধকার রাত্রি একান্ত নীরব। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কথা কহিল না।

অজিতবাবু!

হুঁ।

অজিতের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, জবাব দিতে গিয়া তাহার মুখে বাধিয়া রহিল।

কমল পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি ভাবচেন বলুন না শুনি?

অজিতের গলা কাঁপিতে লাগিল, বলিল, সেদিন আশুবাবুর বাড়িতে আমার আচরণটা তোমার মনে পড়ে? সেদিন পর্য্যন্ত ভেবেছিলাম তোমার অতীতটাই বুঝি তোমার বড় অংশ, তার সঙ্গে আপস করব আমি কি করে? পিছনের ছায়াটাকেই সামনে বাড়িয়ে দিয়ে তোমার মুখ ফেলেছিলাম ঢেকে, সূর্য্যি যে ঘোরে এই কথাটাই গিয়েছিলাম ভুলে। কিন্তু—থাক কিন্তু। আমি আজ কি ভাবচি তুমি বুঝতে পার না?

কমল বলিল, মেয়েমানুষ হয়ে এর পরেও বুঝতে পারব না আমি কি এতই নির্ব্বোধ? পথ যখনি ভুলেচেন আমি তখনই বুঝেচি।

অজিত ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, কমল, মনে হচ্চে আজ বুঝি আর নিজেকে আমি সামলাতে পারবো না।

কমল সরিয়া বসিল না। তাহার আচরণে বিস্ময় বা বিহ্বলতার লেশমাত্র নাই। সহজ শান্ত-কণ্ঠে কহিল, এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই অজিতবাবু, এমনই হয়। কিন্তু আপনি ত শুধু কেবল পুরুষমানুষই নয়, ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্র পুরুষমানুষ। এর পর ঘাড় থেকে আমাকে নামাবেন কি করে? ততখানি ছোট কাজ ত আপনি পেরে উঠবেন না!

অজিত গাঢ়-কণ্ঠে কহিল, পারতেই হবে এ-আশঙ্কা তুমি কেন করচ কমল?

কমল হাসিল, কহিল, আশঙ্কা আমার নিজের জন্য করিনি অজিতবাবু, করি শুধু আপনার জন্য। পারলে ভয় ছিল না, পারবেন না বলেই ভাবনা। শুধু একটা রাত্রির ভুলের বদলে এতবড় শাস্তি আপনার মাথায় চাপাতে আমার মায়া হয়। আর না, চলুন ফিরে যাই।

কথাগুলো অজিতের কানে গেল, কিন্তু অন্তরে পৌঁছিল না। চক্ষের পলকে তাহার শিরার রক্ত পাগল হইয়া গেল—বক্ষের সন্নিকটে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া মুক্ত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আমাকে বিশ্বাস করতে কি তুমি পার না কমল?

মুহূর্ত্তের তরে কমলের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, পারি।

তবে কিসের জন্য ফিরতে চাও কমল, চল আমরা চলে যাই।

চলুন।

গাড়ি চালাইতে গিয়া অজিত হঠাৎ থামিয়া কহিল, বাসা থেকে সঙ্গে নেবার কি তোমার কিছু নেই?

না। কিন্তু আপনার?

অজিতকে ভাবিতে হইল? পকেটে হাত দিয়া কহিল, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই—তার ত দরকার।

কমল কহিল, গাড়িখানা বেচে ফেললেই অনায়াসে টাকা পাওয়া যাবে।

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, গাড়ি বেচবো? কিন্তু এ ত আমার নয়—আশুবাবুর।

কমল কহিল, তাতে কি? আশুবাবু লজ্জায় ঘৃণায় গাড়ির নাম কখনও মুখেও আনবেন না। কোন চিন্তা নেই—চলুন।

শুনিয়া অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বাঁ হাতখানা তখনও কমলের কাঁধের উপর ছিল, স্খলিত হইয়া নীচে পড়িল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, তুমি আমাকে উপহাস করচ?

না, সত্যি বলচি।

সত্যিই বলচ এবং সত্যিই ভাবচ পরের জিনিস আমি চুরি করতে পারি? এ-কাজ তুমি নিজে পার?

কমল বলিল, আমার পারা-না-পারার ওপর যদি নির্ভর করতেন অজিতবাবু, তখন এর জবাব দিতুম। পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহস আপনার নেই। চলুন, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন।

ফিরিবার পথে অজিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহসটা কি খুব বড় জিনিস বলে তোমার ধারণা?

কমল কহিল, বড়-ছোটর কথা বলিনি। এ সাহস আপনার নেই তাই শুধু বলেচি।

না নেই এবং সেজন্য লজ্জা বোধ করিনে! বলিয়া অজিত একটু থামিয়া কহিল, বরঞ্চ থাকলেই লজ্জা বোধ করতাম। আর আমার বিশ্বাস সমস্ত ভদ্রব্যক্তিই এই কথায় সায় দেবেন।

কমল কহিল, সায় দেওয়া সহজ। তাতে বাহবা পাওয়া যায়।

শুধুই বাহবা? তার বেশি নয়? শিক্ষিত ভদ্র-মন বলে কি কখনো কিছু দেখোনি?

যদি দেখেও থাকি, সে আলোচনা আর একদিন করব যদি সময় আসে, আজ নয়। বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার তর্কের উত্তরে আর কেউ হলে বিদ্রূপ করে বলত যে, কমলকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ত ভদ্র-মনের সঙ্কোচে বাধেনি? আমি কিন্তু তা বলতে পারব না, কারণ কমল কারও সম্পত্তি নয়! সে কেবল তার নিজেরই, আর কারও নয়।

কোনদিন বোধ করি হতেও পার না?

এ ত ভবিষ্যতের কথা অজিতবাবু, আজ কি করে এর জবাব দেব?

জবাব বোধ হয় কোনদিনই দিতে পারবে না। মনে হয়, এই জন্যই শিবনাথের এতবড় নির্ম্মমতাও তোমাকে বাজেনি। অত্যন্ত সহজেই সে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েচ। বলিয়া সে নিশ্বাস ফেলিল।

মোটরের আলোকে দেখা গেল কয়েকখানা গরুর গাড়ি। পাশেই বোধ হয় গ্রাম, কৃষকেরা যেমন-তেমনভাবে গাড়িগুলো রাস্তায় ফেলিয়া গরু লইয়া ঘরে গিয়াছে। অজিত সাবধানে এই স্থানটা পার হইয়া কহিল, তোমাকে বোঝা শক্ত।

কমল হাসিয়া কহিল, শক্ত কিসে? ঠিক ত বুঝেছিলেন পথ ভুললেই আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

হয়ত সে বোঝা আমার ভুল।

কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, পথ ভোলা ভুল, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা ভুল, আবার নিজেরও ভুল? এ ভুলের বোঝা আপনার সংশোধন হবে কবে? অজিত-বাবু, নিজেকে একটুখানি শ্রদ্ধা করতে শিখুন। অমন করে আপনার কাছে আপনাকে খাটো করবেন না।

কিন্তু নিজের ভুল অস্বীকার করলেই কি নিজেকে শ্রদ্ধা করা হয় কমল ?

না, তা হয় না। কিন্তু অস্বীকার করারও রীতি আছে। সংসার ত কেবল আপনাকে নিয়েই নয়—তা হ'লে ত সব গোলই চুকে যেত। এখানে আর দশজনের বাস, তাদের ইচ্ছে অনিচ্ছে, তাদেরও কাজের ধারা গায়ে এসে লাগে। তাই শেষ ফলাফল যদি নিজের মনোমত নাও হয়, তাকে ভুল বলে ধিক্কার দিতে থাকলে আপনাকেই অপমান করা হয়। নিজের প্রতি এর চেয়ে বড় অশ্রদ্ধা প্রকাশ আর কি আছে বলুন ত ?

অজিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেখানে সত্যকার ভুল হয় ? শিবনাথের সম্পর্কেও কি তোমার অনুশোচনা হয়নি কমল ? এই কি আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল ?

কমল এ-প্রশ্নের বোধ হয় ঠিকমত উত্তর দিল না, কহিল, বিশ্বাস করা না-করার গরজ আপনার। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কারও কাছে কোনদিন ত আমি নালিশ জানাইনি।

নালিশ জানাবার লোক তুমি নও, কিন্তু ভুলের জন্য নিজের কাছেও কি কখনো নিজেকে ধিক্কার দাও নি ?

না।

তা হলে এইটুকু মাত্র বলতে পারি, তুমি অদ্ভুত, তুমি অসাধারণ স্ত্রীলোক।

এ মন্তব্যের কোন জবাব কমল দিল না, নীরব হইয়া রহিল।

মিনিট-দশেক নিঃশব্দে কাটিবার পর অজিত সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, কমল, এমন ভুল যদি আবার কালও করে বসি তখনো কি তোমার দেখা পাব ?

কিন্তু যদির উত্তর ত যদি দিয়েই হয় অজিতবাবু। অনিশ্চিত প্রস্তাবের নিশ্চিত মীমাংসা আশা করতে নেই।

অর্থাৎ এ-মোহ আমার কাল পর্য্যন্ত টিকবে না, এই তোমার বিশ্বাস ?

অন্ততঃ অসম্ভব নয় এই আমার মনে হয়।

অজিত মনে মনে আহত হইয়া বলিল, আমি আর যাই হই কমল, শিবনাথ নই।

কমল উত্তর করিল, সে আমি জানি অজিতবাবু। আর হয়ত আপনার চেয়েও বেশী করে জানি।

অজিত কহিল, জানলে কখনো এ বিশ্বাস করতে না যে, আজ তোমাকে আমি মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলাম ; এর মধ্যে সত্যি কিছুই ছিল না।

কমল কহিল, মিথ্যের কথা ত হয়নি অজিতবাবু, মোহের কথাই হয়েছিল। এ-দুটো এক বস্তু নয়। আর মোহের বশে যদি কাউকে ভোলাতে চেয়ে থাকেন ত নিজেকেই চেয়েছেন। আমাকে বঞ্চনা করতে চাননি তা জানি।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত ত তুমিই হ'তে কমল। আমার রাত্রের মোহ দিনের আলোতে কেটে যাবে এ নিশ্চয় বুঝেও ত সঙ্গে যেতে অসম্মত হও'নি। একি শুধু উপহাস?

কমল একটুখানি হাসিল, যাচাই করে দেখলেন না কেন? পথ খোলা ছিল, একবারও ত নিষেধ করিনি।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি না করে থাকো তবে এই কথাই বলব যে, তোমাকে বোঝা বাস্তবিকই কঠিন। একটা কথা তোমাকে বলি কমল। নারীর ভালবাসা যেমন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে তেমনি অচেতন করে। করুক, কিন্তু একটা যত বড় সত্য, আর একটা তত বড়ই মিথ্যে। তুমি ত জানতে এ আমার ভালবাসা নয়, ·এ শুধু আমার ক্ষণিকের মোহ। কি করে একে তুমি প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েছিলে! কমল, কুহেলিকা যত বড় ঘটা করেই সূর্য্যালোক ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্য্যই ধ্রুব।

অন্ধকারে ক্ষণকাল কমল নির্নিমেষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে শান্ত-কণ্ঠে কহিল, ওটা কবির উপমা অজিতবাবু, যুক্তি নয়, সত্যও নয়। কোন্ আদিম-কালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে। সূর্য্যকে সে বার বার আবৃত করেচে এবং বার বার আবৃত করবে। সূর্য্য ধ্রুব কি-না জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়ত ও দুটোই নিত্যকালের। তেমনি হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের সত্য নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে। মালতীফুলের আয়ু সূর্য্যমুখীর মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে? আজ একটা রাত্রির মোহকে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিলুম এই যদি আপনার অভিযোগ হয় অজিতবাবু, আয়ুষ্কালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এত বড় সত্য?

কথাগুলো যে অজিত বুঝিতে পারিল না তাহা বুঝিয়াই সে বলিতে লাগিল, আমার কথা আজও বোঝবার দিন আপনার আসেনি। তাই শিবনাথের প্রতি আপনাদের ক্রোধের অবধি নেই, কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করেচি। যা পেয়েচি তার বেশী কেন পাইনি, এ-নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই।

অজিত বলিল, অর্থাৎ মনটাকে এমনিই নির্ব্বিকার করে তুলেচ। আচ্ছা, সংসারে কারও বিরুদ্ধে কি তোমার কোন নালিশ নেই?

কমল তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আছে শুধু একজনের বিরুদ্ধে।

কার বিরুদ্ধে শুনি না কমল?

কি হবে আপনার অপরের কথা শুনে?

অপরের কথা! যাই হোক, তবু ত নিশ্চিন্ত হতে পারব, অন্ততঃ আমার ওপর তোমার রাগ নেই।

কমল কহিল, নিশ্চিত হলেই কি খুশী হবেন? কিন্তু তার এখন আর সময় নেই, আমরা এসে পড়েচি, গাড়ি থামান, আমি নেমে যাই!

গাড়ি থামিল। অন্ধকারে রাস্তার ধারে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, কাছে আসিতেই উভয়েই চমকিয়া উঠিল। অজিত সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে?

আমি রাজেন। আজ হরেনদার আশ্রমে দেখেচেন।

ওঃ—রাজেন? এত রাত্রে এখানে কেন?

আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করে আছি! আপনারা চলে আসবার পরেই আশুবাবুর বাড়ি থেকে লোক গিয়েছিল আপনাকে খুঁজতে। বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিল।

কমল কহিল, আমাকে খুঁজতে যাবার হেতু?

লোকটি কহিল, আপনি বোধ হয় শুনেচেন চারিদিকে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মারা যাচ্ছে। শিবনাথবাবু অতিশয় পীড়িত। হঠাৎ ডুলি করে তাঁকে আশুবাবুর বাড়িতে নিয়ে এসেচে। আশুবাবু ভেবেছিলেন আপনি আশ্রমে আছেন তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলেন।

এখন রাত কত?

বোধ হয় তিনটে বেজে গেছে।

কমল হাত বাড়াইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, ভিতরে আসুন, পথে আপনাকে আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাব।

অজিত একটা কথাও কহিল না। কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে গাড়ি চালাইয়া হরেন্দ্রর বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল। রাজেন অবতরণ করিলে কমল কহিল, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে খবর দেবার জন্যে আজ আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করলেন।

এ আমার কাজ। প্রয়োজন হলেই সংবাদ দেবেন। বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভূমিকা নাই, আড়ম্বর নাই, সাদা কথায় জানাইয়া গেল এ তাহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। আজ সন্ধ্যাকালে হরেন্দ্রর মুখে এই ছেলেটির সম্বন্ধে যত কিছু সে শুনিয়াছিল সমস্তই মনে পড়িল। একদিকে তাহার একজামিন পাশ করিবার অসাধারণ দক্ষতা, আর একদিকে সফলতার মুখে তার ত্যাগ করিবার অপরিসীম ঔদাসীন্য। বয়স তাহার অল্প, সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে, এই বয়সেই নিজের বলিয়া কিছুই হাতে রাখে নাই, পরের কাজে বিলাইয়া দিয়াছে।

অজিত সে অবধি নীরব হইয়া ছিল। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেছে শোনার পর কোন-কিছুতে মন দেবার শক্তি আর তাহার ছিল না। শুধু একটা কাল্পনিক, অসংবদ্ধ প্রশ্নোত্তরমালার আঘাত অভিঘাতের নীচে এই নিশীথ অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন কুশ্রীতায়

অন্তর তাহার কালো হইয়া রহিল। খুব সম্ভব কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না, হয়ত জিজ্ঞাসা করিবার ভরসাও কেহ পাইবে না, শুধু আপন আপন ইচ্ছা অভিরুচি ও বিদ্বেষের তুলি দিয়া অজ্ঞাত ঘটনার আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণে বর্ণে সৃজন করিয়া লইবে। আর ইহার চেয়েও বেশী ব্যাকুল করিয়াছিল তাহাকে এই লজ্জাহীনা মেয়েটার নির্ভয় সত্যবাদিতা। এ-জগতে মিথ্যা বলার ইহার প্রয়োজন নাই। এ যেন পৃথিবী-সুদ্ধ সকলকে শুধু বিব্রত ও জব্দ করা।

এদিকে শিবনাথের পীড়ার উপলক্ষে কে এবং কাহারা উপস্থিত হইয়াছে সে জানে না। এই মেয়েটিকে তাহারা প্রশ্ন করিতেছে মনে করিয়াও অজিতের গায়ের রক্ত শীতল হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কমলকে সে ঘৃণা করে। ইহারই লুব্ধ আশ্বাসে সে যে আত্মবিস্মৃত উন্মাদের ন্যায় মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারাইয়াছে, ইহার কঠিন শাস্তি যেন তাহার হয়, এই বলিয়া সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি অভিশাপ দিল।

গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার চোখে পড়িল সম্মুখের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া আশুবাবু স্বয়ং। বোধ হয় তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। গাড়ির শব্দে নীচে চাহিয়া বলিলেন, অজিত এলে? সঙ্গে কে, কমল?

হ্যাঁ।

যদু, কমলকে শিবনাথের ঘরে নিয়ে যাও। শুনেচ বোধ হয় তাঁর অসুখ? বলিতে বলিতে তিনি নিজেই নামিয়া আসিলেন, কহিলেন, এই ঋতু পরিবর্ত্তনের কালটা এমনিই বড় খারাপ, তাতে ব্যারাম-স্যারাম হঠাৎ যা শুরু হয়েচে, লোক মারা পড়চেও বিস্তর। আমার নিজের দেহটাও সকাল থেকে ভাল নয়, যেন জ্বরভাব করে রেখেচে।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে আপনি কেন জেগে রয়েচেন? এখানে দেখবার লোকের ত অভাব নেই।

কে আর আছে বল? ডাক্তার এসে দেখে-শুনে গেছেন, আমাকে শুতে পাঠিয়ে মণি নিজেই জেগে বসে আছে। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। তোমার আসতে দেরি হতে লাগল—কমল, মানুষের রোগের সময়েও কি অভিমান রাখতে আছে? ঝগড়া-ঝাঁটি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তিন-চারিদিন কোথায় কোন বাসায় গিয়ে সে জ্বরে পড়েচে একটা খবর পর্য্যন্তও ত নাও নি? ছি, এ-কাজ ভাল হয়নি, এখন একলা তোমাকেই ভুগতে হবে।

শুনিয়া কমল বিস্মিত হইল, কিন্তু বুঝিল এই সরল-চিত্ত ব্যক্তিটি ভিতরের কোন কথাই জানেন না। সে চুপ করিয়া রহিল; আশুবাবু তাহার অভিমান শান্ত করিবার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, হরেনবাবুর মুখে শুনলাম তুমি বাড়ি নেই, তখন বুঝেচি

অজিত তোমায় ছাড়েনি। নিজে সে ভয়ানক ঘুরতে ভালবাসে, তোমাকেও ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু ভাবো তো অন্ধকারে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হলে তোমরা কি বিপদেই পড়তে!

অজিতের বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ নামিয়া গেল। কোন-কিছুর মন্দ দিকটা যেন এই মানুষটির মধ্যে ঢুকিতে চায় না, নিষ্কলুষ অন্তর অনুক্ষণ অকলঙ্ক শুভ্রতায় ধপ্ ধপ্ করিতেছে। স্নেহে ও শ্রদ্ধায় সে মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিল। কিন্তু কমল তাঁহার সকল কথায় কান দেয় নাই, হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে নাই; জিজ্ঞাসা করিল, উনি হাসপাতালে না গিয়ে এখানে এলেন কেন?

আশুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, হাসপাতালে? তবেই ত তোমার রাগ এখনো পড়েনি!

রাগের জন্য বলচিনে আশুবাবু, যেটা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক তাই শুধু বলচি।

ওটা স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত ত নয়ই। তবে এটা স্বীকার করি, এখানে না এনে তোমার কাছে পাঠানোই মণির উচিত ছিল।

কমল কহিল, না, উচিত ছিল না। মণি জানতেন চিকিৎসা করবার সাধ্য নেই আমার।

এই কথায় তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। কমল বলিতে লাগিল, কেবল মনোরমাই নয়, শিবনাথবাবু নিজেও জানতেন শুধু সেবা দিয়ে রোগ সারে না, ওষুধ-পথ্যেরও প্রয়োজন। হয়ত ভালই হয়েচে যে, খবর আমার কাছে না পৌঁছে মণির কাছে পৌঁছেচে। তাঁর পরমায়ুর জোর আছে।

আশুবাবু লজ্জায় ম্লান হইয়া মাথা নাড়িয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কথাই নয় কমল—সেবাই সব। যত্নই সবচেয়ে বড় ওষুধ। নইলে ডাক্তার-বদ্যি উপলক্ষমাত্র। তাঁহার পরলোকগত পত্নীকে মনে পড়ায় বলিলেন, আমি যে ভুক্তভোগী কমল, রোগে ভুগে সে শিক্ষা হয়ে গেছে। ঘরে চল, তোমার জিনিস তুমি যা ভাল বুঝবে তাই হবে। আমি থাকতে ওষুধ-পথ্যের ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অজিত কি করিবে না বুঝিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ লইল। রোগীর গৃহে পাছে গোলমালে বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সকলে প্রবেশ করিলেন। শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তিতে রোগীর বুকের উপর অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া বোধ করি এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার পরে পরস্পর সংবদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। স্বপ্নাতীত এই দৃশ্যের সম্মুখে অকস্মাৎ পিতার দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন ঘনান্ধকারের জাল নামিয়া আসিল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মাত্র। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। অজিত ও কমল চোখ তুলিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিল, তাহার পরে যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

১৬

যাতায়াতের পথের পাশেই একটা ঢাকা বারান্দা, রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া অজিত ও কমল সেইখানে থামিল। একটা খর্ব্বাকৃতি ঘষা কাঁচের লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, তাহার অস্পষ্ট আলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল অজিতের মুখ ফ্যাকাশে। আচম্বিতে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত রক্ত যেন সরিয়া গেছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই, তথাপি সে অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলার উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এখন বাসায় ফিরে যেতে চান? চাইলে আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অজিত বলিল, এ-বাড়িতে আর ত আপনার এক মুহূর্ত্ত থাকা চলে না।

আপনার থাকা চলে?

না, আমারও না। কাল সকালেই আমি অন্যত্র চলে যাব।

কমল কহিল, সেই ভাল, আমিও তখনই যাব। আপাততঃ এই চেয়ারটায় বসে বাকী রাতটুকু কাটাই, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

সেই ক্ষুদ্রায়তন চৌকিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অজিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু—

কমল বলিল, কিন্তুতে কাজ নেই অজিতবাবু, ওর অনেক ঝঞ্ঝাট। এখন বাসায় যাওয়াও সম্ভব নয়, আপনার ঘরে গিয়ে ওঠাও সম্ভব নয়। আপনি যান, দেরি করবেন না।

সকালে বেহারা আসিয়া অজিতকে আশুবাবুর শয়ন-কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি শয্যা ছাড়িয়া তখনও ওঠেন নাই, অদূরে চৌকিতে বসিয়া কমল—ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, শরীরটা কাল থেকেই ভাল ছিল না। আজ মনে হচ্ছে যেন—আচ্ছা ব'স অজিত।

সে উপবেশন করিলে কহিলেন, শুনলাম আজ সকালেই তুমি চলে যাবে, তোমাকে থাকতে বলতেও পারিনে, বেশ, গুড বাই। আর কখনো যদি দেখা না হয়, নিশ্চয় জেনো, তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আশীর্ব্বাদ করচি, যেন আমাদের ক্ষমা করে তুমি জীবনে সুখী হতে পার।

অজিত তাঁহার মুখের প্রতি তখনও চাহিয়া দেখে নাই, এখন জবাব দিতে গিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। নির্ব্বাক বলিলে ঠিক বলা হয় না, সে যেন অকস্মাৎ কথা

ভুলিয়া গেল। একটা রাত্রির কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে কাহারও এতবড় পরিবর্ত্তন সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

আশুবাবু নিজেও মিনিট দুই-তিন মৌন থাকিয়া একবার কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তোমাকে ডেকে আনিয়েচি, কিন্তু তোমার সঙ্গে চোখা-চোখি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। সারারাত্রি মনের মধ্যে যে কি করেচে, কত-কি যে ভেবেচি সে আমি কাকে জানাব?

একটু থামিয়া কহিলেন, অক্ষয় একদিন বলেছিলেন শিবনাথ নাকি তোমার ওখানে প্রায়ই থাকেন না। কথাটায় কান দিইনি, ভেবেছিলাম এ তাঁর বিদ্বেষের আতিশয্য। তুমি টাকার অভাবে কষ্টে পড়েছিলে, তখন তার হেতু বুঝিনি, কিন্তু আজ সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে—কোথাও কোন সন্দেহ নেই।

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল; তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি অনেক ব্যবহারই আমি ভাল করতে পারিনি, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই তোমাকে ভালবেসেছিলাম কমল। আজ তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছে আগ্রায় যদি আমরা না আসতাম। বলিতে বলিতে চোখের কোণে তাঁহার এক ফোঁটা জল আসিয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া শুধু কহিলেন, জগদীশ্বর!

কমল উঠিয়া আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিল, কপালে হাত দিয়া বলিল, আপনার যে জ্বর হয়েচে আশুবাবু।

আশুবাবু তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক। কমল, আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, আমার কিছু একটা উপায় করে দাও। আমার বাড়িতে ঐ লোকটার অস্তিত্ব যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বেলে দিয়েচে।

কমল চাহিয়া দেখিল অজিত অধোমুখে বসিয়া আছে। তাহার কাছে কোন ইঙ্গিত না পাইয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমাকে আপনি কি করতে বলেন বলুন। কিন্তু জবাব না পাইয়া সে নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; পরে কহিল, শিবনাথবাবুকে আপনি রাখতে চান না, কিন্তু তিনি যে পীড়িত। এ অবস্থায় হয় তাঁকে হাসপাতালে পাঠান, নয় তাঁর নিজের বাসাটা যদি জানেন পাঠাতে পারেন। আর যদি মনে করেন আমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয় তাও দিতে পারেন। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জানেন ত চিকিৎসা করার শক্তি নেই আমার; আমি প্রাণপণে শুধু সেবা করতেই পারি, তার বেশী পারিনে।

আশুবাবু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, কমল, কেন জানিনে, কিন্তু এমনি উত্তরই ঠিক তোমার কাছে আশা করেছিলাম। পাষণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে যে তুমি নিজে পাষাণ হতে পারবে না এ আমি জানতাম। তোমার জিনিস তুমি ঘরে নিয়ে যাও, চিকিৎসার খরচের জন্য ভয় করো না, সে ভার আমি নিলাম।

কমল কহিল, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা কথা সকলের আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আশুবাবু তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, তোমার বলবার দরকার নেই কমল, সে আমি জানি। একদিন সমস্ত আবর্জ্জনা দূর হয়ে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি বেঁচে থাকতে এতবড় অন্যায় অত্যাচার তোমার উপরে ঘটতে দেব না।

কমল তাঁহার প্রতি চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল, কথা কহিল না।

কি ভাবচ কমল?

ভাবছিলুম আপনাকে বলবার প্রয়োজন আছে কি-না। কিন্তু মনে হচ্ছে প্রয়োজন আছে, নইলে পরিষ্কার কিছুই হবে না, বরঞ্চ ময়লা বেড়ে যাবে। আপনার টাকা আছে, হৃদয় আছে, পরের জন্য খরচ করা আপনার কঠিন নয়, কিন্তু আমাকে দয়া করবেন এ-ভুল যদি আপনার থাকে সেটা দূর হওয়া চাই। কোন ছলেই আপনার ভিক্ষে আমি গ্রহণ করব না।

আশুবাবু সেই সেলাইয়ের কলের ব্যাপারটা মনে পড়িল, ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভুল যদি একটা করেই থাকি কমল, তার কি ক্ষমা নেই?

কমল কহিল, ভুল হয়ত তখন তত করেননি, যেমন এখন করতে যাচ্চেন। ভাবচেন শিবনাথবাবুকে বাঁচানোটা প্রকারান্তরে আমাকে বাঁচানো, আমাকেই অনুগ্রহ করা। কিন্তু তা নয়। এর পরে আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন আমার আপত্তি নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এমনি রাগই হয় বটে কমল; এ তোমার অস্বাভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। বেশ, আমি শিবনাথকেই বাঁচাতে চাচ্ছি, তোমাকে অনুগ্রহ করচিনে। এ হলে হবে ত?

কমলের মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল। কহিল, না হবে না। আপনাকে যখন আমি বোঝাতে পারব না, আমার উপায় নেই। ওঁকে হাসপাতালে পাঠাতে না চান হরেনবাবুর আশ্রমে দিন। তাঁরা অনেকের সেবা করেন, এঁরও করবেন। আপনার যা খরচ করবার তা সেখানেই করবেন। আমি নিজেও বড় ক্লান্ত, এখন উঠি। বলিয়া সে যথার্থ-ই উঠিবার উপক্রম করিল।

তাহার কথায় ও আচরণে আশুবাবু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি কমল। উভয়ের কল্যাণের জন্য যা করতে যাচ্ছি তাকে তুমি অকারণে বিকৃত করে দেখচ। একদিক দিয়ে যে আমায় লজ্জার অবধি নেই এবং এ কদাচার অঙ্কুরে বিনাশ না করলে যে আমার গ্লানির সীমা থাকবে না সে আমি জানি, কিন্তু আমার কন্যা সংশ্লিষ্ট বলেই যে আমি কোনমতে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্চি তাও সত্য নয়। শিবনাথকে আমি নানামতেই বাঁচাতে পারি, কিন্তু কেবল সেইটুকুই আমি

চাইনি। যাতে দুঃখের দিনে তোমার অন্তরের সেবা দিয়ে তাঁকে তেমনি করেই আবার ফিরে পাও সেই কামনা করেই এ প্রস্তাব করেচি, নিছক স্বার্থপরতা-বশেই করিনি।

কথাগুলি সত্য, সকরুণ এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ। কিন্তু কমলের মনের উপর দাগ পড়িল না। সে প্রত্যুত্তরে কহিল, ঠিক এই কথাই আপনাকে আমি বোঝাতে যাচ্ছিলাম আশুবাবু। সেবা করতে আমি অসম্মত নই, চা-বাগানে থাকতে অনেকের অনেক সেবা করেচি, এ আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু ফিরে পেতে ওঁকে আমি চাইনে। সেবা করেও না, সেবা না করেও না। এ আমার অভিমানের জ্বালা নয়, মিথ্যে দর্প করাও নয়—সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে পারব না।

তাহার মধ্যে উম্মাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, নিতান্তই সাদাসিধা কথা। ইহাই আশুবাবুকে এখন স্তব্ধ করিয়া দিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, একি কথা কমল? এই সামান্য কারণে স্বামী ত্যাগ করতে চাও? এ-শিক্ষা তোমাকে কে দিলে?

কমল নীরব হইয়া রহিল।

আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, ছেলেবেলায় এ-শিক্ষা তোমাকে যে-ই কেন না দিয়ে থাক্, সে ভুল শিক্ষা দিয়েচে। এ অন্যায়, এ অসঙ্গত, এ গভীর অপরাধের কথা। যে গৃহেই তুমি জন্মে থাকো তুমি বাঙলাদেশের মেয়ে, এ-পথ তোমার আমার নয়, এ তোমাকে ভুলতেই হবে। জান কমল, এক দেশের ধর্ম্ম আর এক দেশের অধর্ম্ম। আর স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কথা শেষ করিয়া যেন তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল সে লেশমাত্র বিচলিত হইল না।

আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, এই মোহই একদিন আমাদের রসাতলের পানে টেনে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু ভ্রান্তি ধরা পড়ে গেল জন-কয়েক মনীষীর চক্ষে। দেশের লোককে ডেকে তাঁরা বার বার শুধু এই কথাই বলতে লাগলেন, তোমরা উন্মাদের মত চলেচ কোথায়? তোমাদের কোন দৈন্য, কোন অভাব নেই, কারও কাছে তোমাদের হাত পাততে হবে না, কেবল ঘরের পানে একবার ফিরে চাও। পূর্ব্বপিতামহরা সবই রেখে গেছেন, শুধু একবার হাত বাড়িয়ে তুলে নাও। বিলেতের সমস্তই ত স্বচক্ষে দেখে এসেচি এখন ভাবি, সময়ে সে সতর্কবাণী যদি না তাঁরা উচ্চারণ করে যেতেন আজ দেশের কি হ'ত! ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে ত— উঃ, শিক্ষিত লোকদের সে কি দশা! এই বলিয়া তিনি স্বর্গতঃ মনীষীগণের উদ্দেশে যুক্ত-করে নমস্কার করিলেন।

কমল মুখ তুলিয়া দেখিল অজিত মুগ্ধ-চক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। কল্পনার আবেগে যেন তাঁহার সংজ্ঞা নাই—এমনি অবস্থা।

আশুবাবুর ভাবাবেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই, কহিলেন, কমল, আর কিছুই যদি তাঁরা না করে যেতেন, শুধু কেবল এইজন্যই, দেশের লোকের কাছে তাঁরা চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

শুধু কেবল এইজন্যই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় ?

হাঁ, শুধু কেবল এইজন্যই, বাইরে থেকে ঘরের পানে তাঁরা চোখ ফেরাতে বলে ছিলেন—তাই।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে যদি আলো জ্বলে, যদি পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্যোদয় হয়, তবুও পিছন ফিরে পশ্চিমের স্বদেশের পানেই চেয়ে থাকতে হবে? সেই হবে দেশপ্রীতি ?

কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি আশুবাবুর কানে গেল না, তিনি নিজের ঝোঁকে বলিতে লাগিলেন, আজ দেশের ধর্ম্ম, দেশের পুরাণ, ইতিহাস, দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যা বিদেশের চাপে লোপ পেতে বসেছিল, তার প্রতি যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ফিরে এসেচে এ ত শুধু তাঁদেরই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ফল। জাতি হিসেবে আমরা ধ্বংসের রাস্তায় চলেছিলাম, কমল, এ বাঁচা কি সোজা বাঁচা? আবার সমস্ত ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমরা যে কোনমতেই রক্ষা পাব না, এ বোধশক্তি আমাদের দিল কে বল ত ?

অজিত উত্তেজনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এ-সব চিন্তাও যে আপনার মনে স্থান পেতে পারে এ কখনো আমি কল্পনাও করিনি। আমার ভারি দুঃখ যে এতকাল আপনাকে চিনতে পারিনি, আপনার পায়ের নীচে বসে উপদেশ গ্রহণ করিনি। সে আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল যে, হরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি দেখা করিতে আসিয়াছেন এবং পরক্ষণেই সে সতীশ ও রাজেনকে লইয়া প্রবেশ করিল। কহিল, খবর নিয়ে জানলাম শিবনাথবাবু ঘুমোচ্চেন। আসবার সময় ডাক্তারের বাড়িটা অমনি ঘুরে এলাম; তাঁর বিশ্বাস অসুখ সিরিয়স্ নয়, শীঘ্রই সেরে উঠবেন। এই বলিয়া সে কমলকে একটা নমস্কার করিয়া সঙ্গীদের লইয়া আসন গ্রহণ করিল।

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল অজিতের প্রতি এবং তাহারই উদ্দেশে বলিলেন, আমার সমস্ত যৌবনকালটা যে বিদেশেই কেটেচে এ তোমরা ভোল কেন? এমন অনেক বস্তু আছে যা কাছে থেকে দেখা যায় না, যায় শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি শিক্ষিত-মনের পরিবর্ত্তন। এই যে হরেন্দ্রর আশ্রম, এই যে নগরে নগরে এর ডাল-পালা ছড়াবার আয়োজন, এ কি শুধু এইজন্যই নয়? বিশ্বাস না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ। সেই ব্রহ্মচর্য্য, সেই সংযম-সাধনা, সেই পুরানো রীতি-নীতির প্রবর্ত্তন—এ সবই কি আমাদের সেই

অতীত দিনটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যম নয়? তাই যদি ভুলি, তারই প্রতি যদি আস্থা হারাই, আশা করবার আর আমাদের বাকী থাকে কি? তপোবনের যে আদর্শ কেবল আমাদেরই ছিল, পৃথিবী খুঁজলেও কি আর কোথাও এর জোড়া মিলবে অজিত? আমাদের সমাজকে যাঁরা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন সন্ন্যাসী; তাঁদের দান নিঃসংশয়ে নতশিরে নিতে পারলেই হ'ল আমাদের চরম সার্থকতা। এই আমাদের কল্যাণের পথ কমল, এ-ছাড়া আর পথ নাই।

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রর বিস্ময়ের পরিসীমা নাই—এই সাহেবী চাল-চলনের মানুষটি আজ বলে কি! এবং রাজেন্দ্র ভাবিয়া পাইল না, অকস্মাৎ কিসের জন্য আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা? সকলের মুখের পরেই একটি অকপট শ্রদ্ধার ভাব নিবিড় হইয়া উঠিল।

বক্তার নিজের বিস্ময়ও কম ছিল না। শুধু বলিবার শক্তির জন্য নয়, এমন করিয়া কাহাকেও বলিবার সুযোগও তিনি কখনও পান নাই—তাঁহার মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তির হিল্লোল বহিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য ক্ষণকাল পূর্ব্বের দুঃখ যেন ভুলিয়া গেলেন। কহিলেন, বুঝলে কমল, কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

না? না কেন?

কমল কহিল, বিদেশী শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে আবার সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে এই খবরটাই আপনি পরমানন্দে শোনাচ্ছিলেন। আপনার বিশ্বাস এতে দেশের কল্যাণ হবে, কিন্তু কারণ কিছুই দেখাননি। অনেক প্রাচীন রীতি-নীতি লোপ পেতে বসেছিল, তাদের পুনরুদ্ধারের যত্ন চলচে। এ হয়ত সত্যি, কিন্তু তাতে ভালই যে হবে প্রমাণ কি আশুবাবু? কই সে ত বলেননি?

বলিনি কি রকম?

না, বলেননি। যা বলছিলেন তা সংস্কার-বিরোধী পুরাতনের অন্ধ স্তাবকমাত্রেই ঠিক এমনি করে বলে। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধারমাত্রেই যে ভাল তার প্রমাণ নেই। মোহের ঘোরে মন্দ বস্তুরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায়।

আশুবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু অজিত কহিল, মন্দকে উদ্ধার করবার জন্যে কেউ শক্তি ক্ষয় করে না?

কমল কহিল, করে। মন্দ বলে নয়, পুরাতনমাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ ভাল মনে করে করে। একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বলতে চেয়েছিলুম আশুবাবু, কিন্তু আপনি

কান দেননি। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানই হোক বা পারলৌকিক ধর্ম্ম-কর্ম্মই হোক, কেবলমাত্র দেশের বলেই আঁকড়ে থাকায় স্বদেশ-প্রীতির বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের দেবতাকে খুশী করা যায় না; তিনি ক্ষুণ্ণ হন।

আশুবাবু অবাক হইয়া কহিলেন, তুমি বল কি কমল? দেশের ধর্ম্ম, দেশের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে বাইরে থেকে ভিক্ষে নিতে থাকলে নিজের বলতে আর বাকী থাকবে কি? জগতে মানুষ বলে দাবী জানাতে যাব কোন্ পরিচয়ে?

কমল কহিল, দাবী আপনি এসে ঘরে পৌঁছবে, পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না, বিশ্বজগৎ বিনা পরিচয়েই চিনতে পারবে।

আশুবাবু অবাক হইয়া কহিলেন, তোমাকে ত বুঝতে পারলাম না কমল!

বোঝবার কথাও নয় আশুবাবু। এমনিই হয়। এই চলমান সংসারে গতিশীল মানব-চিত্তের পদে পদে সে সত্য নিত্য নূতনরূপে দেখা দেয়, সবাই তাকে চিনতে পারে না। ভাবে এ কোন্ আপদ কোথা থেকে এল। সেদিন তাজমহলের ছায়ার নীচে শিবানীকে মনে পড়ে? আজ কমলের মাঝখানে তাকে আর চিনতে পারা যাবে না। মনে হবে সে যাকে দেখেছিলাম কোথায় গেল সে! কিন্তু এই মানুষের সত্য পরিচয়, এমনিভাবেই লোকের সাথে যেন চিরদিন পরিচিত হতে পারি আশুবাবু।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু তর্ক-বিতর্কের ঝড়ো-হাওয়ায় আমাদের খেই হারিয়ে গেল—আসল ব্যাপার থেকে সবাই সরে গেছে। আমি কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত, এখন উঠি।

আশুবাবু নিরুত্তরে বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। এই মেয়েটাকে কোথাও তিনি অস্পষ্ট বুঝিলেন, কোথাও বা একেবারেই বুঝিলেন না। শুধু ইহাই মনে হইতে লাগিল, এইমাত্র সে যে ঝোড়ো-হাওয়ার উল্লেখ করিয়াছিল সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আবেদন-নিবেদন ভাসিয়া গেছে।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিল, সঙ্গে করে এনেছিলেন, চলুন না পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু আজ সে সঙ্কোচে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। কমল মনে মনে একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া সহসা রাজেনের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, রাজেনবাবু, তুমি চল না ভাই আমাকে রেখে আসবে।

এই আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে রাজেন বিস্মিত হইয়া একবার তাহার প্রতি চাহিল, তাহার পরে কহিল, চলুন।

দ্বারের কাছে আসিয়া কমল হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আশুবাবু, আমার প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাহার করিনি। ঐ সর্ত্তে ইচ্ছে হয় পাঠিয়ে দেবেন, আমি যথাসাধ্য

করে দেখব। বাঁচেন ভালই, না বাঁচেন অদৃষ্ট। বলিয়া চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া সকলে বসিয়া রহিলেন—অসুস্থ গৃহস্বামীর চোখের সম্মুখে প্রভাতের আলোটা পর্য্যন্ত বিবর্ণ ও বিষাদ হইয়া উঠিল।

অর্দ্ধেক পথে রাজেন বিদায় হইল। বলিয়া গেল ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই সে কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিবে। কমল অন্যমনস্কতাবশতঃই বোধ করি আপত্তি করিল না, কিংবা হয়ত আর কোন কারণ ছিল। দ্রুতপদে বাসায় আসিয়া দেখিল সিঁড়ির দরজায় তখনো তালা বন্ধ, ঘর খোলা হয় নাই। যে নীচ জাতীয় দাসীটি তাহার কাজ-কর্ম্ম করিয়া দিত সে আসে নাই। পথের ওধারে মুদির দোকানে সন্ধান করিয়া জানিল দাসী পীড়িত, তাহার ছোট নাতনী সকালে আসিয়া ঘরের চাবি রাখিয়া গেছে। ঘর খুলিয়া কমল গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। একরকম কাল হইতেই সে অভুক্ত; স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি কোনমতে কিছু রাঁধিয়া খাইয়া লইয়া বিশ্রাম করিবে, বিশ্রামের তাহার একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু আজ ঘরের কাজ আর তাহার কিছুতেই সারা হয় না। চারিদিকে এত যে আবর্জ্জনা জমা হইয়াছিল, এতদিন এমনি বিশৃঙ্খলার মাঝে যে তাহার দিন কাটিতেছিল, সে লক্ষ্যও করে নাই। আজ যাহাতে চোখ পড়িল সে-ই যেন তাহাকে তিরস্কার করিল—ছাদের পুরানো চুন-বালি খসিয়া খাটের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে—মুক্ত করা চাই; চড়াই পাখীর বাসা তৈরীর অতিরিক্ত মাল-মশলা বিছানায় পড়িয়াছে, চাদর বদলানো প্রয়োজন; বালিশের অড় অত্যন্ত মলিন, খুলিয়া ফেলা দরকার; চেয়ার টেবিল স্থানভ্রষ্ট, দরজার পা-পোষটায় কাদা জমাট বাঁধিয়াছে, আয়নাটার এমন অবস্থা যে পঙ্কোদ্ধার করিতে একটা বেলা লাগিবে, দোয়াতের কালি শুকাইয়াছে, কলমগুলা খুঁজিয়া পাওয়া দায়, প্যাডের ব্লটিং কাগজগুলার চিহ্নমাত্র নাই—এমনিধারা যেদিকে চাহিয়া দেখিল অপরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে তাহার নিজেরই মনে হইল এতকাল এখানে যেন মানুষ বাস করে নাই। নাওয়া-খাওয়া পড়িয়া রহিল, কোথা দিয়া যে বেলা কাটিল ঠাহর রহিল না। সমস্ত শেষ করিয়া গায়ের ধূলা-মাটি পরিষ্কার করিতে যখন সে নীচে হইতে স্নান করিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত এখানে সে থাকিবে না। থাকা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মাসের পর মাস বাসার ভাড়া যোগাইবে বা কোথা হইতে? যাইতেই হইবে, শুধু যাওয়ার দিনটারই সে কেমন করিয়া যেন নাগাল পাইতেছিল না—রাত্রির পর প্রভাত ও প্রভাতের পর রাত্রি আসিয়া তাহাকে পা বাড়াইবার সময় দিতেছিল না।

গৃহের প্রতি মমতা নাই, অথচ আজ কিসের জন্য যে এত খাটিয়া মরিল, অকস্মাৎ

কি ইহার প্রয়োজন হইল, এমনি একটা ঘোলাটে জিজ্ঞাসায় মনের মধ্যে যখনই আবর্ত্ত উঠিতেছিল, কাজ ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া সে শূন্য-চক্ষে রাস্তায় চাহিয়া কি যেন ভুলিবার চেষ্টা করিয়া আবার গিয়া কাজে লাগিতেছিল। এমনি করিয়াই আজ তাহার কাজ এবং বেলা দুই-ই শেষ হইয়াছে। কিন্তু বেলা ত রোজই শেষ হয়, শুধু এমনি করিয়াই হইতে পায় না। সন্ধ্যার পর সে আলো জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল এবং কেবল সময় কাটাইবার জন্যই একখানা বই লইয়া বিছানায় ঠেস দিয়া পাতা উল্টাইতে বসিল। কিন্তু শ্রান্তির আজ আর তাহার অবধি ছিল না—কখন বইয়ের এবং চোখের পাতা দুই-ই বুজিয়া আসিল সে টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন ঘরের আলো নিবিয়াছে এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অরুণালোকে সমস্ত গৃহ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেলা হইল, কিন্তু দাসী আসিল না। অতএব বাসাটা খোঁজ করিয়া তাহার অসুখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন এই মনে করিয়া কমল কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছিল, এমনি সময়ে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাইয়া তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

ডাক্ আসিল, ঘরে আছেন? আসতে পারি?

আসুন।

যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি হরেন্দ্র। চৌকি টানিয়া উপবেশন করিয়া বলিল, কোথাও বেরুচ্ছিলেন না-কি?

হাঁ। যে বুড়ো স্ত্রীলোকটি আমার কাজ করে তার অসুখের খবর পেয়েচি। তাকে দেখতে যাচ্ছিলুম।

বেশ খবর। ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া কিছু নয়। আগ্রাতেও এপিডেমিক ফর্ম্মেই বোধ করি শুরু হ'ল। বস্তিগুলোতে মরতেও আরম্ভ করেচে। মথুরা বৃন্দাবনের মত শুরু হলে পালাতে হবে, না হয় মরতে হবে। এ বুড়ী থাকে কোথায়?

ঠিক জানিনে। শুনেচি কাছাকাছি কোথায় থাকে, খোঁজ করে নিতে হবে।

হরেন্দ্র কহিল, বড্ড ছোঁয়াচে, একটু সাবধান হবেন। এ-দিকের খবর পেয়েচেন বোধ হয়?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভয় পাবেন না, ভয় পাবার মত কিছু নয়। কাল আসতাম, কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি। আমাদের অক্ষয়বাবু কলেজে আসেননি, শুনেছিলাম তাঁর শরীর খারাপ, আশুবাবু বিছানা নিয়েছেন সে ত কাল দেখেই এসেচেন—ওদিকে অবিনাশদার কাল বিকেল থেকে জ্বর, বৌদিদির মুখটিও দেখলাম শুক্‌নো শুক্‌নো। তিনি নিজে না পড়লে বাঁচি।

কমল চুপ করিয়া রহিল। এ-সকল খবরে সে যেন ভাল করিয়া মন দিতেই পারিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এ-ছাড়া শিবনাথবাবু। ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার—বলা কিছু যায় না। অথচ হাসপাতালে যেতেও চাইলে না। কাল বিকেলে তাঁর নিজের বাসাতেই তাঁকে রিমুভ করা হ'ল। আজ খবরটা একবার নিতে হবে।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে আছে কে?

একটা চাকর আছে। উপরের ঘরগুলোতে জন-কয়েক পাঞ্জাবী আছে—ঠিকাদারী করে। শুনলাম তারা লোক ভাল।

কমল নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, রাজেনবাবুকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন!

পারি, কিন্তু তাকে পাব কোথায়? আজ ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে। ঐ দিকের কোন্ একটা মুচীদের মহল্লায় নাকি জোর ব্যারাম চলেচে, সে গেছে সেবা করতে। আশ্রমে খেতে যদি আসে ত খবর দেব।

তাঁকে রিমুভ করলে কে? আপনি।

না, রাজেন, তার মুখেই জানতে পারলাম পাঞ্জাবীরা যত্ন নিচ্ছে। তবে তারা যাই করুক, ও যখন ঠিকানা পেয়েচে তখন সহজে ত্রুটি হতে দেবে না—হয়ত নিজেই লেগে যাবে। একটা ভরসা—ওকে রোগে ধরে না। পুলিশে না ধরলে ও একাই একশ। ভায়া ওদের কাছেই শুধু জব্দ, নইলে ওকে কাবু করে দুনিয়ায় এমন ত কিছুই দেখলাম না।

ধরার আশঙ্কা আছে নাকি?

আশা ত করি। অন্ততঃ আশ্রমটা তা হলে বাঁচে।

ওঁকে চলে যেতে বলে দেন না কেন?

ঐটি শক্ত। বললে এমনি চলে যাবে যে মাথা খুঁড়লেও আর ফিরবে না।

না ফিরলেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি? ওকে ত জানেন না, না জানলে সে ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যায় না। আশ্রম না থাক সেও সইবে, কিন্তু ও-ক্ষতি আমার সইবে না। এই বলিয়া হরেন্দ্র মিনিট-খানেক চুপ করিয়া প্রসঙ্গটা হঠাৎ বদলাইয়া দিল। কহিল, একটা মজার কাণ্ড ঘটেচে। কারও সাধ্য নেই সে কল্পনা করে। কাল সেজদার ওখান থেকে অনেক রাত্রে ফিরে গিয়ে দেখি অজিতবাবু উপস্থিত। ভয় পেয়ে গেলাম, ব্যাপার কি? অসুখ বাড়ল নাকি? না, সে-সব কিছু নয়, বাক্স-বিছানা নিয়ে তিনি এসেচেন আশ্রমবাসী হতে। ইতিমধ্যে সতীশের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে—আশ্রমের কাজে জীবন কাটাবেন এই তাঁর পণ, আর নড়চড় নেই। বড়লোক পেলে আমাদের ভালই হয়,

কিন্তু শঙ্কা হ'ল ভিতরে কি একটা গোলমাল আছে। সকালে আশুবাবুর কাছে গেলাম, তিনি শুনে বললেন, সঙ্কল্প অতিশয় সাধু। কিন্তু ভারতে আশ্রমের ত অভাব নেই, সে আগ্রা ছাড়া আর কোথাও গিয়ে এ বৃত্তি অবলম্বন করলে আমি দিন-কতক টিকতে পারতাম। আমাকে দেখচি তল্পি বাঁধতে হ'ল।

কমল কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিল, তাঁর ওখান থেকেই এখানে আসচি। ভাবচি ফিরে গিয়ে অজিত-বাবুকে বলব কি।

কমল বুঝিল শিবনাথকে স্থানান্তরিত করার উপলক্ষে অনেক কঠিন বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেছে। হয়ত প্রকাশ্যে এবং স্পষ্ট করিয়া একটা কথাও উচ্চারিত হয় নাই, সমস্তই নিঃশব্দে ঘটিয়াছে, তথাপি কর্কশতায় সে যে সর্ব্বপ্রকার কলহকে ছাপাইয়া গেছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিন্তু একটা কথারও সে উত্তর করিল না, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, মনে হয় আশুবাবু সমস্তই শুনেচেন। শিবনাথের আপনার প্রতি আচরণে তিনি মর্ম্মাহত। একরকম জোর করেই তাকে বাড়ি থেকে বিদেয় করেচেন। মনোরমার বোধ হয় এ ইচ্ছা ছিল না, শিবনাথ তার গানের গুরু, কাছে রেখে চিকিৎসা করবার সঙ্কল্পই ছিল, কিন্তু সে হতে পেল না। অজিতবাবু বোধ হয় এ-পক্ষ অবলম্বন করেই ঝগড়া করে ফেলেচেন।

কমল একটুখানি হাসিল, কহিল, আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু শুনলেন কার কাছে? রাজেন বললে?

সে? সে পাত্রই ও নয়। জানলেও বলবে না। এ আমার অনুমান। তাই ভাবছি, মিটমাট ত হবেই, মাঝ থেকে অজিতকে চটিয়ে লাভ কি? চুপচাপ থাকাই ভাল। যতদিন সে আশ্রমে থাকে যত্নের ত্রুটি হবে না।

কমল কহিল, সেই ভাল।

হরেন কহিল, কিন্তু এখন উঠি। সেজদার জন্যই ভাবনা, ভারি অল্পে কাতর হন। সময় পাই ত কাল একবার আসব।

আসবেন। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, রাজেনকে পাঠাতে ভুলবেন না। বলবেন, বড্ড দায়ে পড়ে তাঁকে ডেকেচি।

দায়ে পড়ে ডাকচেন? হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, দেখা পেলে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে বলা যায় না? আমাকেও আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই জানবেন।

তা জানি। কিন্তু তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন।

দেব, নিশ্চয় দেব, বলিয়া হরেন্দ্র আর কথা না বাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্ণ বেলায় রাজেন আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজেন, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

তা দেব। কিন্তু কাল নামের সঙ্গে একটুখানি 'বাবু' ছিল, আজ তাও খসল?

বেশ ত হালকা হয়ে গেল। না চাও ত বল জুড়ে দিই।

না, কাজ নেই। কিন্তু আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো?

সবাই ডাকে কমল বলে, তাতে আমার সম্মানের হানি হয় না। নামের আগে-পিছে ভার বেঁধে নিজেকে ভারি করে তুলতে আমার লজ্জা করে। আপনি বলবার দরকার নেই, আমাকে আমার সহজ নাম ধরে ডেকো।

ইহার স্পষ্ট জবাবটা রাজেন এড়াইয়া গিয়া কহিল, কি আমাকে করতে হবে?

আমার বন্ধু হতে হবে। লোকে বলে তুমি বিপ্লবপন্থী। তা যদি সত্যি হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার অক্ষয় হবে।

এই অক্ষয়-বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগবে?

কমল বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল। একটা সংশয় ও উপেক্ষার সুস্পষ্ট সুর তাহার কানে বাজিল, কহিল, অমন কথা বলতে নেই। বন্ধুত্ব বস্তুটা সংসারে দুর্লভ, আর আমার বন্ধুত্ব তার চেয়েও দুর্লভ। যাকে চেনো না তাকে অশ্রদ্ধা করে নিজেকে খাটো করো না।

কিন্তু এ অনুযোগ লোকটিকে কুণ্ঠিত করিল না, সে স্মিতমুখে সহজভাবেই বলিল, অশ্রদ্ধার জন্য নয়, বন্ধুত্বের প্রয়োজন বুঝিনে, তাই শুধু জানিয়েছিলাম। আর যদি মনে করেন এ বস্তু আমার কাজে লাগবে, আমি স্বীকার করব না। কিন্তু কি কাজে লাগবে তাই ভাবচি।

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা; তাহার দৃপ্ত তেজ অপরাজেয়, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষে আতঙ্কে আগুন জ্বালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভান করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।

কমলের একটা সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় অনেক কথাই শুনেচ?

রাজেন বলিল, ওঁরা প্রায়ই বলেন বটে।

কি বলেন?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, এ-সব ব্যাপারে আমার স্মরণ-শক্তি বড় খারাপ, কিছুই প্রায় মনে নেই।

সত্যি বলচ?

সত্যি বলচি।

কমল জেরা করিল না, বিশ্বাস করিল। বুঝিল স্ত্রীলোকের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে এই মানুষটির আজও কোন কৌতূহল জাগে নাই। সে যেমন শুনিয়াছে তেমনি ভুলিয়াছে। আরও একটা জিনিস্ বুঝিল। 'তুমি' বলিবার অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও কেন সে গ্রহণ করে নাই, 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। তাহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ততলে আজও নারী-মূর্তির ছায়া পড়ে নাই—'তুমি' বলিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার লুব্ধতা তাহার অপরিজ্ঞাত। কমল মনে মনে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে কহিল, শিবনাথবাবু আমাকে পরিত্যাগ করেচেন জান?

জানি।

কমল কহিল, সেদিন আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ফাঁকি ছিল, কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁক ছিল না। সবাই সন্দেহ করে নানা কথা কইলে, বললে, এ বিবাহ পাকা হ'ল না। আমার কিন্তু ভয় হ'ল না, বললুম, হোক গে কাঁচা, আমাদের মন যখন মেনে নিয়েচে তখন বাইরের গ্রন্থিতে ক'পাক পড়ল আমার দেখবার দরকার নেই। বরঞ্চ ভাবলুম এ ভালই হ'ল যে, স্বামী বলে যাকে নিলুম তাঁকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিনি। তাঁর মুক্তির আগল যদি একটু আলগাই থাকে ত থাক্ না। মনই যদি দেউলে হয়, পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদটা আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল ত ডুবল। কিন্তু এ-সব তোমাকে বলা বৃথা, তুমি বুঝবে না।

রাজেন চুপ করিয়া রহিল। কমল কহিল, তখন এই কথাটাই শুধু জানিনি যে তাঁর টাকার লোভটা এত ছিল। জানলে অন্ততঃ লাঞ্ছনার দায় এড়াতেও পারতুম।

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে?

কমল সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইল, বলিল, থাক্ গে মানে। এ তোমার শুনে কাজ নেই।

কিছুক্ষণ সূর্য্য অস্ত গিয়াছে ঘরের মধ্যে বাহিরের সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। কমল আলো জ্বালিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তা হোক, আমাকে ওর বাসায় একবার নিয়ে চল।

কি করবেন গিয়ে?

নিজের চোখে একবার দেখতে চাই। যদি প্রয়োজন হয় থাকব। না হয়, তোমার ওপরে তাঁর ভার রেখে আমি নিশ্চিন্ত হব। এইজন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবে না। তাঁর প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার সীমা নেই।

বলিতে বলিতে সে সহসা বাতিটা বাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাজেন কহিল, বেশ চলুন। আমি একটা গাড়ি ডেকে আনি গে। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া রাজেন বলিল, শিবনাথবাবুর সেবার ভার আমাকে অর্পণ করে আপনি নিশ্চিন্ত হতে চান, আমিও নিতে পারতাম। কিন্তু এখানে আমার থাকা চলবে না, শীঘ্রই চলে যেতে হবে। আপনি আর কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করুন।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে বোধ করি পিছনে লেগে অতিষ্ঠ করেচে?

তাদের আত্মীয়তা আমার অভ্যাস আছে - সেজন্য নয়।

কমল হরেন্দ্রর কথা স্মরণ করিয়া বলিল, তবে আশ্রমের এরা বুঝি তোমাকে চলে যেতে বলচেন? কিন্তু পুলিশের ভয়ে যারা এমন আতঙ্কিত, ঘটা করে তাঁদের দেশের কাজে না নামাই উচিত। কিন্তু তাই বলে তোমাকে চলে যেতেই বা হবে কেন? এই আগ্রা শহরেই এমন লোক আছে যে স্থান দিতে এতটুকু ভয় পাবে না।

রাজেন কহিল, সে বোধ করি আপনি স্বয়ং; কথাটা শুনে রাখলাম, সহজে ভুলব না। কিন্তু এ দৌরাত্ম্যে ভয় পায় না ভারতবর্ষে তেমন লোকের সংখ্যা বিরল। থাকলে দেশের সমস্যা ঢের সহজ হয়ে যেত।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু আমার যাওয়া সেজন্য নয়। আশ্রমকেও দোষ দিতে পারিনে। আর যাই হোক, আমাকে যাও বলা হরেনদার মুখে আসবে না।

তবে যাবে কেন?

যাব নিজেরই জন্য। দেশের কাজ বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতেও মেলে না, কাজের ধারাতেও মেলে না। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে। হরেনদার আমি সহোদরের চেয়ে প্রিয়, তার চেয়েও আত্মীয়, কোনকালে এর ব্যতিক্রম হবে না।

কমলের দুর্ভাবনা গেল। কহিল, এর চেয়ে আর বড় কি আছে রাজেন? মন যেখানে মিলেচে, থাক্ না সেখানে মতের অমিল। হোক না কাজের ধারা বিভিন্ন; কি যায় আসে তাতে? সবাই একই রকম ভাববে, একই কাজ করবে, তবেই একসঙ্গে বাস করা চলবে এ কেন? আর পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল ত সে কিসের শিক্ষা? মত এবং কর্ম্ম দুই-ই বাইরের জিনিস রাজেন, মনটাই সত্য। অথচ এদেরই বড় করে যদি তুমি দূরে চলে যাও, তোমাদের যে ভালবাসার ব্যতিক্রম নেই বলছিলে তাকেই অস্বীকার করা হয়। সেই যে কেতাবে লেখে ছায়ার জন্য কায়া ত্যাগ, এ ঠিক তাই হবে।

রাজেন কথা কহিল না, শুধু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসলাম তখন হাসিনি বলে। আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলনটাকেই একমাত্র সত্য স্থির করে বাহ্যিক অনুষ্ঠানে গরমিলটাকে কিছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।

তার মানে?

রাজেন বলিল, মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করিনে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাও হয়েচে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য্য এবং মহত্ত্ব দুই-ই প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য প্রকাশ পায় না। সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি। এটা ভুল।

একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্ত বড় শিক্ষা বলছিলেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায় না।

কমল অতি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। রাজেন বলিতে লাগিল, আমাদের সে নীতি নয়, মিথ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা সংসারের সর্ব্বনাশ করিনে—বন্ধুর হলেও না—তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই। এই আমাদের কাজ।

কমল কহিল, একেই তোমরা কাজ বল?

রাজেন কহিল, বলি। কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলে বাধা যদি আমার কর্ম্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য—ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই শিবানী—

কমল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, আবার এ নামটাও তুমি শুনেচ?

শুনেচি। কর্ম্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক্‌, অন্তরের বিচার অন্তর্য্যামী করুন, আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলে না। ওই আমাদের কষ্টিপাথর—ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কই, দুইজনের মনের মিল দিয়ে ত সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে। সে শুধু কোলাহল। রাজার যে সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের শক্তিটাই রাজার শক্তি, হৃদয় নিয়ে তাঁর গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম—এই আমাদের নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর।—গাড়োয়ান, রোকো রোকো।—শিবানী, এই তাঁর বাসা।

সম্মুখে জীর্ণ প্রাচীন গৃহ। উভয়ে নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া নীচের একটা ঘরে প্রবেশ করিল। পদশব্দে শিবনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু দীপের

স্বল্লালোকে বোধ হয় চিনিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত পরেই চোখ বুজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

১৭

চারিদিকে চাহিয়া কমল স্তব্ধ রহিল। ঘরের এ কি চেহারা! এখানে যে মানুষ বাস করিয়া আছে সহজে প্রত্যয় হয় না। লোকের সাড়া পাইয়া সতেরো-আঠারো বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল; রাজেন তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, এইটি শিবনাথবাবুর চাকর। পথ্য তৈরী করা থেকে ওষুধ খাওয়ানো পর্য্যন্ত এরই ডিউটি। সূর্য্যাস্ত হতেই বোধ করি ঘুমুতে শুরু করেছিল, এখন উঠে আসচে। রোগীর সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবার থাকে ত একেই দিন, বুঝতে পারবে বলেই মনে হয়। নেহাৎ বোকা নয়। নামটা কাল জেনে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভুলে গেছি। কি নাম রে?

ফাগুয়া!

আজ ওষুধ খাইয়েছিলি?

ছেলেটা বাঁ হাতের দুটো আঙুল দেখাইয়া কহিল, দো খোরাক খিলায়া।

আউর কুছ খিলায়া?

হাঁ—দুধ ভি পিলায়া।

বঁহুত আচ্ছা কিয়া। ওপরের পাঞ্জাবী বাবুরা কেউ এসেছিল?

ছেলেটা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, শায়েদ দো পহরমে একঠো বাবু আয়া রহা।

শায়েদ? তখন তুমি কি করছিলে বাবা, ঘুমুচ্ছিলে?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, ফাগুয়া, তোর এখানে ঝাড়ুটাড়ু কিছু আছে?

ফাগুয়া ঘাড় নাড়িয়া ঝাঁটা আনিতে গেল; রাজেন কহিল, ঝাঁটা কি করবেন? ওকে পিটুবেন না কি?

কমল গম্ভীর হইয়া কহিল, এ কি তামাসার সময়? মায়া-মমতা কি তোমার শরীরে নেই?

আগে ছিল। ফ্লাড্ আর ক্যামিন রিলিফে সেগুলো বিসর্জ্জন দিয়ে এসেচি।

ফাগুয়া ঝাঁটা আনিয়া হাজির করিল। রাজেন বলিল, আমি ক্ষিদের জ্বালায় মরি, কোথাও থেকে দুটো খেয়ে আসি গে। ততক্ষণ ঝাঁটা আর ছেলেটাকে নিয়ে যা পারেন করুন, ফিরে এসে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাব। ভয় পাবেন না, আমি ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই ফিরবো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

সহরের প্রান্তস্থিত এই স্থানটা অল্পকাল মধ্যে নিঃশব্দ ও নির্জ্জন হইয়া উঠিল। যাহারা উপরে বাস করে তাহাদের কলরব ও চলাচলের পায়ের শব্দ থামিল। বুঝা গেল তাহারা শয্যাশ্রয় করিয়াছে। শিবনাথের সংবাদ লইতে কেহ আসিল না। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, মেঝেয় কম্বল পাতিয়া ফাগুয়া ঝিমাইতেছে, সদর দরজা বন্ধ করিবার সময় হইয়া আসিল, এমনি সময়ে রাস্তায় সাইকেলের ঘণ্টা শুনা গেল এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া রাজেন প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া এই অল্পকালের মধ্যে গৃহের সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল, পরে হাতের ছোট পুঁটুলিটা পাশের টিপায়ের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, অন্যান্য মেয়েদের মত আপনাকে যা ভেবেছিলাম তা নয়। আপনার 'পরে নির্ভর করা যায়।

কমল নিঃশব্দে ফিরিয়া চাহিল। রাজেন কহিল, ইতিমধ্যে দেখচি বিছানাটা পর্য্যন্ত বদলে ফেলেচেন। খুঁজে পেতে না হয় বার করলেন, কিন্তু ওঁকে তুলে শোয়ালেন কি করে?

কমল আস্তে আস্তে বলিল, জানলে শক্ত নয়।

কিন্তু জানলেন কি করে? জানবার ত কথা নয়।

কমল বলিল, জানার কথা কি কেবল তোমাদেরই। ছেলেবেলায় চা-বাগানের আমি অনেক রুগীর সেবা করেচি।

তাই ত বলি! এই বলিয়া সে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, আসবার সময় সঙ্গে করে সামান্য কিছু খাবার এনেচি। কুঁজোয় জল আছে দেখে গিয়েছিলাম। খেয়ে নিন, আমি বসচি।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, খাবার কথা তো তোমাকে বলিনি, হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন?

রাজেন বলিল, খেয়াল হঠাৎই হ'ল সত্যি। নিজের যখন পেট ভরে গেল, তখন কি জানি কেন মনে হ'ল আপনারও হয়ত ক্ষিধে পেয়ে থাকবে। আসবার পথে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে এলাম। দেরি করবেন না, বসে যান। এই বলিয়া সে নিজে গিয়া জলের কুঁজোটা তুলিয়া আনিল। কাছে কলাই-করা একটা

গ্লাস ছিল, কহিল, সবুর করুন, বাইরে থেকে এটা মেজে আনি। এই বলিয়া সেটা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। এ-বাড়ির কোথায় কি আছে সে কালই জানিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান করিয়া একটুকরা সাবান বাহির করিল, কহিল, অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেচেন, একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমি জল ঢেলে দিচ্চি, খাবার আগে হাতটা ধুয়ে ফেলুন।

কমলের পিতার কথা মনে পড়িল। তাঁহারও এমনি কথার মধ্যে বিশেষ রস-কস ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। কহিল, হাত ধুতে আপত্তি নেই, কিন্তু খেতে পারব না ভাই। তুমি হয়ত জান না যে আমি নিজে রেঁধে খাই, আর এইসব দামী ভাল ভাল খাবারও খাইনে। আমার জন্য ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই, অন্যান্য দিন যেমন হয়, তেমনি বাসায় ফিরে গিয়েই খাব।

তা হলে রাত না করে বাসাতেই ফিরে চলুন, আপনাকে দিয়ে আসিগে।

তুমি এখানেই আবার আসবে?

আসব।

কতক্ষণ থাকবে?

অন্ততঃ কাল সকাল পর্য্যন্ত। ওপরে পাঞ্জাবীদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেছি, একটা মোকাবিলা না করে নড়ব না। একটু ক্লান্ত, তা হোক। এতটা অযত্ন হবে ভাবিনি। উঠুন, এদিকে গাড়ি পাওয়া যাবে না, হাঁটতে হবে। ফেরবার পথে মুচিদের বস্তিটা একবার ঘুরে আসা দরকার! দু'ব্যাটার মরবার কথা ছিল, দেখি তারা কি করলে?

কমলের আবার সেই কথা মনে পড়িল, এ-লোকটার অনুভূতি বলিয়া কোন বালাই নেই। অনেকটা যন্ত্রের মত। কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারংবার কর্ম্মে নিযুক্ত করে—কর্ম্ম করিয়া যায়। নিজের জন্য নয়, হয়ত কোন-কিছু আশা করিয়াও নয়। কাজ ইহার রক্তের মধ্যে, সমস্ত দেহের মধ্যে জল-বায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে। অথচ অন্যের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ভাবে কেমন করিয়া এমন হয়। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজেন, তুমি নিজে ত ডাক্তার?

ডাক্তার? না। ওদের ডাক্তারি-স্কুলে সামান্য কিছুদিন শিক্ষানবিশি করেছিলাম।

তা হলে ওদের দেখচে কে?

যম।

তবে তুমি কর কি?

আমি করি তাঁর তদ্বির। তাঁর গুণমুগ্ধ পরম ভক্ত আমি। এই বলিয়া সে কমলের বিস্ময়-অভিভূত মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, কহিল, যম নয়, তিনি যমরাজ। বলিহারি তার প্রতিভাকে যিনি রাজা বলে এঁকে

প্রথমে অভিবাদন করেছিলেন। রাজাই বটে। যেমন দয়া, তেমনি সুবিবেচনা। বিশ্ব-ভুবনে সৃষ্টিকর্তা যদি কেউ থাকে, এ তাঁর সেরা-সৃষ্টি আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পরিহাস করচ রাজেন?

একেবারে না। শুনে সতীশদা মুখ গম্ভীর করে, হরেনদা রাগ করে, বলেন আমাকে সিনিক, তাঁদের আশ্রমে সকলে মিলে তাঁরা কৃচ্ছ্রতা, সংযম, ত্যাগ ও নানাবিধ অদ্ভুত কঠোরতার অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে যমরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অতএব মনে করে আমি তাঁদের উপহাস করি। কিন্তু তা করিনে। দুঃখীদের পল্লীতে তাঁরা যান না, গেলে আমার ধারণা—আমারই মত পরম রাজভক্ত হয়ে উঠতেন। শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে মৃত্যু-রাজার গুণগান করতেন এবং অকল্যাণ মনে করে তাঁকে গালি দিয়ে আর বেড়াতেন না।

কমল কহিল, এই যদি তোমার সত্যিকারের মত হয় তোমাকে সিনিক বলাটা কি দোষের?

দোষের বিচার পরে হবে। যাবেন একবার আমার সঙ্গে মুচীদের পাড়ায়? গড়া গড়া পড়ে আছে—আজকের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলেই শুধু নয়—কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে কোন একটা উপলক্ষ তাদের জুটলেই হ'ল। ওষুধ নেই, পথ্য নেই, শোবার বিছানা নেই, চাপা দেবার কাপড় নেই, মুখে জল দেবার লোক নেই—দেখে হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে হয় এর কিনারা কোথায়? তখনি কূল দেখতে পাই, চিন্তা দূর হয়, মনে মনে বলি, ভয় নেই, ওরে ভয় নেই—সমস্যা যতই গুরুতর হোক, সমাধান করবার ভার যাঁর হাতে তিনি এলেন বলে। অন্যান্য দেশের অন্যান্য ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের এ দেব-ভূমির সমস্ত ভার নিয়েচেন একেবারে রাজার রাজা স্বয়ং। এক হিসেবে আমরা ঢের বেশি সৌভাগ্যবান্। কিন্তু কোথা থেকে কি-সব কথা এসে পড়ল। চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

কিন্তু তোমাকে ত আবার এই পথটা হেঁটেই ফিরতে হবে?

তা হবে।

তোমার মুচীদের পাড়া কত দূরে?

কাছেই। অর্থাৎ এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যে।

তা হলে তোমার পা-গাড়ি করে ঘুরে এসো গে—আমি বসচি।

রাজেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, সে কি কথা! আপনার যে দুদিন খাওয়া হয়নি।

কে দিলে তোমাকে এ খবর?

ওই যে খেয়ালের কথা হচ্ছিল, তাই। কিন্তু খবরটা আমি নিজে সংগ্রহ করেচি।

আসবার সময় আপনার রান্নাঘরটা একবার উঁকি মেরে এসেছিলাম, রান্না ভাত মজুত, পাত্রটির চেহারা দেখলে সন্দেহ থাকে না যে সে গত রাত্রির ব্যাপার। অর্থাৎ দিন-দুই চলেচে নিছক উপবাস। অতএব হয় চলুন, না হয় যা এনেচি আহার করুন। আজ স্বপাকের অজুহাত অবৈধ।

অবৈধ? কমল একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু আমার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

তা জানিনে। কারণ নিজেই অনুসন্ধান করচি, সংবাদ পেলে আপনাকে জানাব।

কমল কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পরে কহিল, জানিয়ো, লজ্জা ক'রো না। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, রাজেন, তোমার আশ্রমের দাদা তোমাকে অল্পই চিনেছেন, তাই তাঁরা তোমাকে উপদ্রব মনে করেন। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। সুতরাং আমাকেও চিনে রাখা তোমার দরকার। অথচ তার জন্য সময় চাই, সে পরিচয় কথা-কাটাকাটি করে হবে না। একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমি নিজে রেঁধে খাই, একবেলা খাই, অতি দরিদ্রের যা আহার—সেই একমুঠো ভাত-ডাল। কিন্তু এ আমার ব্রত নয়, তাই ভঙ্গ করতে পারি। কিন্তু দিন-দুই খাইনি বলেই নিয়ম লঙ্ঘন আমি করব না। তোমার স্নেহটুকু আমি ভুলব না, কিন্তু কথা রাখতেও তোমার পারব না রাজেন। তাই বলে রাগ ক'রো না যেন।

না।

কি ভাবচ বল ত?

ভাবচি, পরিচয়-পত্রের ভূমিকা অংশটুকু মন্দ হ'ল না। আমি দেখচি সহজে ভুলতে পারব না।

সহজে ভুলতেই বা আমি তোমাকে দেবো কেন? বলিয়া কমল হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, কিন্তু আর দেরি ক'রো না, যাও! যত শীঘ্র পার ফিরে এস। ঐ বড় আরাম-চৌকিটায় একটা কম্বল পেতে রাখব—দু-চার ঘণ্টা ঘুমোবার পরে যখন সকাল হবে, তখন আমরা বাসায় চলে যাব, কেমন?

রাজেন মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। ভেবেছিলাম রাত্রিটা বোধ হয় আমাকে আজও জেগে কাটাতে হবে। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, স্বামীর শুশ্রূষার ভার নিজের হাতেই নিলেন। ভালই। ফিরতে বোধ করি আমার দেরি হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

কমল বলিল, না। কিন্তু এই লোকটি যে আমার স্বামী এ-খবর তোমাকে দিলে কে? এখানকার ভদ্রলোকেরা বোধ করি? যে-ই দিয়ে থাক্ সে তামাসা করেচে। বিশ্বাস না হয়, একদিন এঁকে জিজ্ঞাসা করলেই খবর পাবে।

রাজেন কোন কথা কহিল না। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

শিবনাথ ঠিক এই জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিল। পাশ ফিরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে?

শুনিয়া কমল চমকিত হইল। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, জড়তার চিহ্নমাত্র নাই। চোখের চাহনিতে তখনো অল্প একটুখানি ঘোর আছে বটে, কিন্তু মুখের চেহারা প্রায় স্বাভাবিক; অসমাপ্ত নিদ্রা ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিলে যেমন একটু আচ্ছন্ন ভাব থাকে তাহার অধিক নয়। এতবড় রোগের এত সহজে ও এত শীঘ্র যে সমাপ্তি ঘটিয়াছে কমল হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাই উত্তর দিতে তাহার বিলম্ব হইল। শিবনাথ আবার প্রশ্ন করিল, এ লোকটি কে শিবানী? তোমাকে সঙ্গে করে ইনিই এনেচেন?

হাঁ। আমাকেও এনেচেন এবং তোমাকেও সঙ্গে করে যিনি কাল রেখে গিয়েচেন, তিনি।

নাম?

রাজেন।

তোমরা দু'জনে কি এখন এক বাড়িতে থাকো?

সেই চেষ্টাই ত করচি। যদি থাকেন আমার ভাগ্য।

হুঁ। ওকে এখানে এনেচ কেন?

কমল এ প্রশ্নের জবাব দিল না। শিবনাথও আর কোন প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পর শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই এ-কথা তুমি কার মুখে শুনলে? আমি বলেচি, এই কি লোকেরা বলে নাকি?

কমল ইহার জবাব দিল না, কিন্তু এবার সে নিজেই প্রশ্ন করিল, আমাকে যে তুমি বিয়ে করনি সে আমি না বিশ্বাস করে থাকি, তুমি ত করতে? চলে আসবার সময় এ-কথাটা বলে এলে না কেন? তোমাকে আটকাতে পারি, কেঁদে-কেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ ঘটাতে পারি, এই কি তুমি ভেবেছিলে? এ যে আমার স্বভাব নয় সে ত ভাল করেই জানতে; তবে কেন করনি তা?

শিবনাথ কয়েকমুহূর্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, কাজের ঝঞ্চাটে, ব্যবসার খাতিরে দিন-কতক একটা আলাদা বাসা করলেই কি ত্যাগ করা হয়? আমি ত ভেবেছিলাম—

শিবনাথের মুখের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্ থাক্, ও আমি জানতে চাইনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জা পাইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আপনাকে শান্ত করিয়া লইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি সত্যই অসুখ করেছিল?

সত্যি না ত কি?

সত্যি যদি এই, আমার ওখানে না গিয়ে আশুবাবুর বাড়িতে গেলে কিসের জন্য? তোমার একটা কাজ আমাকে ব্যথা দিয়েচে, কিন্তু অন্যটা আমাকে অপমানের এক-শেষ করেচে। আমি দুঃখ পেয়েচি শুনে তুমি মনে মনে হাসবে জানি, কিন্তু এই জানাটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি এত ছোট বলেই কেবল নিজের দুঃখ আমি সইতে পারলুম, নইলে পারতুম না।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল; কমল তাহার মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া কহিল, জান তুমি, আমার সব সইল, কিন্তু তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়াটা আমার সইল না, তাই এসেছিলুম তোমাকে সেবা করতে, তোমার মন ভোলাতে আসিনি।

শিবনাথ ধীরে ধীরে কহিল, তোমার এই দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ শিবানী।

কমল কহিল, তুমি আমাকে শিবানী বলে ডেকো না, কমল বলে ডেকো।

কেন?

শুনলে আমার ঘৃণা বোধ হয়, তাই।

কিন্তু একদিন ত তুমি এই নামটাই সবচেয়ে ভালবাসতে! বলিয়া সে ধীরে ধীরে কমলের হাতখানি লইয়া নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল। কমল চুপ করিয়া রহিল। নিজের হাত লইয়া টানাটানি করিতে কুণ্ঠা বোধ হইল।

চুপ করে রইলে, উত্তর দিলে না যে বড়?

কমল তেমনিই নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

কি ভাবচ বল ত শিবানী?

কি ভাবচি জান? ভাবচি, মানুষ কত বড় পাষণ্ড হলে তবে এ-কথা মনে করে দিতে পারে!

শিবনাথের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল, বলিল, পাষণ্ড আমি নই শিবানী। একদিন তোমার ভুল তুমি নিজেই জানতে পারবে, সেদিন তোমার পরিতাপের সীমা থাকবে না। কেন যে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করেচি—

কিন্তু আলাদা বাসা ভাড়া করার কারণ ত আমি একবারও জিজ্ঞেসা করিনি? আমি শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলুম, এ-কথা আমাকে তুমি জানিয়ে আসনি কেন? তোমাকে একদিনের জন্যও আমি ধরে রাখতুম না।

শিবনাথের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কহিল, জানাতে আমার সাহস হয়নি শিবানী।

কেন?

শিবনাথ জামার হাতায় চোখ মুছিয়া বলিল, একে টাকার টানাটানি, তাতে প্রত্যহই বাইরে যেতে হতে লাগল—পাথর কিনতে, চালান দিতে, স্টেশনের কাছে একটা কিছু—

কমল বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দূরে একটা চৌকিতে বসিল, কহিল, আমার নিজের জন্য আর দুঃখ হয় না, হয় আর একজনের জন্য। কিন্তু আজ তোমার জন্যও দুঃখ হচ্চে শিবনাথবাবু।

অনেকদিন পরে আবার সে এই প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। কহিল, ছাখ, নিছক বঞ্চনাকেই মূলধন করে সংসারে বাণিজ্য করা যায় না। আমার সঙ্গে হয়ত তোমার আর দেখা হবে না, কিন্তু আমাকে তোমার মনে পড়বে। যা হবার তা ত হয়ে গেছে, সে আর ফিরবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা ক'রো, হয়তো সুখী হতেও পারবে। লক্ষ্মীটি, ভুলো না। তোমার ভাল হোক, তুমি ভাল থাকো, এ আমি আজও সত্যি-সত্যিই চাই।

কমল কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল। আশুবাবু যে কেন তাহাকে সরাইয়া দিলেন, কি যে তাহার যথার্থ হেতু, এত কথার পরেও সে এতবড় আঘাত শিবনাথকে দিতে পারিল না।

বাহিরে পা-গাড়ির ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। শিবনাথ কোন কথা না কহিয়া পুনর্ব্বার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঘরে ঢুকিয়া রাজেন চাপা গলায় কহিল, এই যে সত্যিই জেগে আছেন দেখচি। রুগী কেমন? ওষুধ-টষুধ আর খাওয়ালেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আর কিছু খাওয়াইনি।

রাজেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কহিল, চুপ। ঘুম ভেঙে যাবে, সেটা ভাল না।

না। কিন্তু তোমার মুচীরা করলে কি?

তারা লোক ভাল, কথা রেখেচে। আমার যাবার আগেই যমরাজের মহিষ এসে আত্মা দুটো নিয়ে গেছে, সকালে ধড়দুটো তাদের মিউনিসিপ্যালিটির মহিষের হাবালা করে দিতে পারলেই খালাস। আরও গোটা-আষ্টেক শুষচে, কাল একবার দেখিয়ে আনব। আশাকরি প্রচুর জ্ঞানলাভ করবেন। কিন্তু আরাম-চৌকির ওপর আমার কম্বলের বিছানা কই? ভুলে গেছেন?

কমল বিছানা পাতিয়া দিল। আঃ—বাঁচলাম, বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাতলের উপর দুই পা ছড়াইয়া দিয়া রাজেন শুইয়া পড়িল। কহিল, ছুটো-ছুটিতে ঘেমে গেছি —একটা পাখা-টাখা আছে নাকি?

কমল পাখা হাতে করিয়া চৌকিটা তার শিয়রের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমি বাতাস করচি, তুমি ঘুমোও। রুগীর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি ভাল আছেন।

আঃ—সবদিকেই সুখবর। বলিয়া সে চোখ বুজিল।

১৮

ইনফ্লুয়েঞ্জা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধি নহে, 'ডেঙ্গু' বলিয়া মানুষে কতকটা অবজ্ঞা ও উপহাসের চক্ষেই দেখিত। দিন দুই-তিন দুঃখ দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই, ইহাই ছিল লোকের ধারণা। কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার মহামারীরূপেও সে যে দেখা দিতে পারে এ কেহ কল্পনাও করিত না। সুতরাং এবার অকস্মাৎ ইহার অপরিমেয় শক্তির সুনিশ্চিত কঠোরতায় প্রথমটা লোকে হতবুদ্ধি হইল, তাহার পরেই যে যেখানে পারিল পলাইতে শুরু করিল, আত্মীয়-পরে বিশেষ প্রভেদ রহিল না; রোগে শুশ্রূষা করিবে কি, মৃত্যুকালে মুখে জল দেবার লোকও অনেকের ভাগ্যে জুটিল না। সহর ও পল্লীর সর্ব্বত্র একই দশা, আগ্রার অদৃষ্টেও ইহার অন্যথা ঘটিল না।—এই সমৃদ্ধ জনবহুল প্রাচীন নগরীর মূর্ত্তি যেন দিন-কয়েকের মধ্যেই একেবারে বদলাইয়া গেল। স্কুল-কলেজ বন্ধ, হাটে-বাজারে দোকানের কবাট অবরুদ্ধ, নদীতীরে শূন্যপ্রায়, শুধু হিন্দু ও মুসলমান শব বাহকের শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে রাজপথ নিঃশব্দ জনহীন। যে-কোনদিকে চাহিলেই মনে হয় শুধু কেবল মানুষ-জনই নয়, গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর-দ্বারের চেহারা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি যখন সহরের অবস্থা, তখন চিন্তা, দুঃখ ও শোকের দাহনে অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা রফা হইয়া গেছে। চেষ্টা করিয়া, আলোচনা করিয়া, মধ্যস্থ মানিয়া নয়—যেন আপনি হইয়াছে। আজও যাহারা বাঁচিয়া আছে, এখনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারা সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয়; বহুদিন ধরিয়া যেখানে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সহসা পথে দেখা হইতে উভয়ের চোখেই জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছে—কাহারও ভাই, কাহারও পুত্র-কন্যা, কাহারও বা স্ত্রী ইতিমধ্যে মরিয়াছে—রাগ করিয়া মুখ ফিরাইবার মত জোর আর মনে নাই—কখনও কথা হইয়াছে, কখনও তাহাও হয় নাই—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছে।

মুচীদের পাড়ার লোক আর বেশী নাই। যত বা মরিয়াছে তত বা পলাইয়াছে। অবশিষ্টদের জন্য রাজেন একাই যথেষ্ট। তাহাদের গতি-মুক্তির ভার সে-ই গ্রহণ করিয়াছে। সহকারিণী হিসাবে কমল যোগ দিতে আসিয়াছিল। ছেলেবয়সে চা-বাগানে সে পীড়িত কুলিদের সেবা করিয়াছিল সেই ছিল তার ভরসা। কিন্তু দিন দুই-তিনেই বুঝিল সে-সম্বল এখানে চলে না। মুচীদের সে কি অবস্থা! ভাষার বর্ণনা করিয়া বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা। কুটিরে পা দেওয়া অবধি সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিত, কোথাও বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই এবং আবর্জ্জনা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া

উঠিতে পারে এখানে আসিবার পূর্ব্বে কমল জানিত না। অথচ এই সকলেরই মাঝখানে অহরহ থাকিয়া আপনাকে সাবধানে রাখিয়া কি করিয়া যে রোগীর সেবা করা সম্ভব এ কল্পনা সে মনে স্থান দিতেও পারিল না। অনেক দর্প করিয়া সে রাজেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, দুঃসাহসিকতায় সে কাহারও ন্যূন নয়, জগতে কোন-কিছুকেই সে ভয় করে না, মৃত্যুকেও না। নিতান্ত মিথ্যা সে বলে নাই, কিন্তু আসিয়া বুঝিল ইহারও সীমা আছে। দিন-কয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তথাপি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাক্কালে রাজেন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বার বার বলিতে লাগিল, এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখিনি। আসল ঝড়ের মুখটাই আপনি সামলে দিয়ে গেলেন! কিন্তু আর আবশ্যক নেই—আপনি দিন-কতক বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন গে। এদের যা করে গেলেন সে ঋণ এরা জীবনে শুধতে পারবে না।

আর তুমি?

রাজেন বলিল, এই ক'টাকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আমিও পালাব। নইলে কি মরব বলতে চান?

কমল জবাব খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। কিন্তু তাই বলিয়া এমন নয় যে সে এ-কয়দিন একেবারেই বাসায় আসিতে পারে নাই। রাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া খাবার লইয়া যাইতে প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে বাসায় আসিতে হইত। কিন্তু আজ আর সেই ভয়ানক জায়গায় ফিরিতে হইবে না মনে করিয়া কমল একদিকে যেমন স্বস্তি অনুভব করিল, আর একদিকে তেমনি অব্যক্ত উদ্বেগে তাহার সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া রহিল। আসিবার সময়ে সে রাজেনের খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে ভুলিয়াছিল। কিন্তু এই ত্রুটি যতই হোক, যেখানে তাহাকে সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল তাহার সমতুল্য কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইতেই হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমও বন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মচারী বালকদিগকে কোন নিরাপদস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া সতীশ সঙ্গে গিয়াছে। হরেন্দ্র নিজে যাইতে পারে নাই অবিনাশের অসুখের জন্য। আজ সে আসিয়া উপস্থিত হইল। নমস্কার করিয়া কহিল, পাঁচ-ছ দিন রোজ আসচি, আপনাকে ধরতে পারি না। কোথায় ছিলেন?

কমল মুচীদের পল্লীর নাম করিলে হরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, সেখানে? সেখানে ত ভয়ানক মরচে শুনতে পাই। এ মতলব আপনাকে দিলে কে? যেই দিয়ে থাক্ কাজটা ভাল করেনি।

কেন?

কেন কি? সেখানে যাওয়া মানে ত প্রায় আত্মহত্যা করা। বরঞ্চ আমরা ত ভেবেছিলাম শিবনাথবাবু আগ্রা থেকে চলে যাবার পরে আপনিও নিশ্চয় অন্যত্র গেছেন। অবশ্য দিন-কয়েকের জন্য, নইলে বাসাটা রেখে যেতেন না—আচ্ছা, রাজেনের খবর কিছু জানেন? সে কি সহরে আছে, না আর কোথাও চলে গেছে? হঠাৎ এমন ডুব মেরেচে যে কোন সন্ধান পাবার জো নেই।

তাঁকে কি আপনার বিশেষ প্রয়োজন?

না, প্রয়োজন বলতে সচরাচর লোকে যা বোঝে তা নেই। তবু প্রয়োজন বটে। কারণ আমিও যদি তার খোঁজ নেওয়া বন্ধ করি তো একা পুলিশ ছাড়া আর তার আত্মীয় থাকে না। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন সে কোথায় আছে।

কমল বলিল, জানি। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই। বাড়ি থেকে যাকে তাড়িয়ে দিয়েচেন, বেরিয়ে গিয়ে কোথায় আছে সন্ধান নেওয়া শুধু অন্যায় কৌতূহল।

হরেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু সে আমার বাড়ি নয়, আমাদের আশ্রম, সেখানে স্থান দিতে তাকে পারিনি, তাই বলে সে নালিশ আর একজনের মুখ থেকেও আমার সয় না। বেশ, আমি চললাম। তাকে পূর্ব্বেও অনেকবার খুঁজে বার করেচি, এবারও বার করতে পারব, আপনি ঢেকে রাখতে পারবেন না।

তাহার কথা শুনিয়া কমল হাসিয়া কহিল, তাঁকে ঢেকে যে রাখব হরেনবাবু, রাখতে পারলে কি আমার দুঃখ ঘুচবে আপনি মনে করেন।

হরেন্দ্র নিজেও হাসিল, কিন্তু সে-হাসির আশেপাশে অনেকখানি ফাঁক রহিল। কহিল, আমি ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব দেবার লোক আগ্রায় অনেক আছেন। তাঁরা কি বলবেন জানেন? বলবেন, কমল মানুষের দুঃখ ত একটাই নয়, বহু প্রকারের। তার প্রকৃতিও আলাদা, ঘোচাবার পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং তাদের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় আলোচনার দ্বারা একটা মোকাবিলা করে নেবেন। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আসলেই আপনার ভুল হচ্ছে। আমি সে দলের নই। অযথা উত্যক্ত করতে আমি আসিনি, কারণ সংসারে যত লোক আপনাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করেন আপনি কোন নীতিতে? আমার মত বা আচরণ কোনটার সঙ্গে ত আপনার মিল নেই।

হরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, না নেই। কিন্তু তবুও গভীর শ্রদ্ধা করি। আর এই আশ্চর্য্য কথাটাই আমি নিজে বারংবার জিজ্ঞেস করি।

কোন উত্তর পান না?

না। কিন্তু ভরসা হয় একদিন নিশ্চয় পাব। একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনার

ইতিহাস কতক আপনার নিজের মুখ থেকেও শুনেচি, কতক অজিতবাবুর কাছে শুনেচি—ভালো কথা, জানেন বোধ হয় তিনি আমাদের আশ্রমে গিয়ে আছেন।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ সংবাদ ত আগেই দিয়েচেন।

হরেন্দ্র বলিল, আপনার জীবন-ইতিহাসের বিচিত্র অধ্যায়গুলি এমন অকুণ্ঠ ঋজুতায় সুমুখে এসে দাঁড়াল যে তার বিরুদ্ধে সরাসরি রায় দিতে ভয় হয়। এতকাল যা-কিছু মন্দ বলে বিশ্বাস করতে শিখেচি, আপনার জীবনটা যেন তার প্রতিবাদে মামলা রুজু করেচে। এর বিচারক কোথায় মিলবে, কবে মিলবে, তার ফলই বা কি হবে কিছুই জানিনে, কিন্তু এমন করে যে নির্ভয়ে এলো, অবগুণ্ঠনের কোন প্রয়োজনই সে অনুভব করলে না, তাকে শ্রদ্ধা না করেই বা পারা যায় কি করে?

কমল বলিল, নির্ভয়ে এসে দাঁড়ানোটাই কি বড় কাজ নাকি? দু-কান-কাটার গল্প শোনেননি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আপনি দেখননি, কিন্তু আমি চা-বাগানের সাহেবদের দেখেচি। তাদের নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপনা জগতের কোন লজ্জাকেই আমল দেয় না, যেন গলা-ধাক্কায় দূর করে তাড়ায়। তাদের দুঃসাহসের সীমা নেই; কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু?

হরেন্দ্র এরূপ প্রত্যুত্তর আর যাহার কাছেই হোক এই স্ত্রীলোকটির কাছে আশা করে নাই। হঠাৎ কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, সে আলাদা জিনিস।

কমল কহিল, কি করে জানলেন আলাদা? বাইরে থেকে আমার বাবাকেও লোকে এদেরই একজন বলে ভাবত। অথচ আমি জানি তা সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি ত কেবল আমার জানার 'পরেই নির্ভর করে না—জগতের কাছে তার প্রমাণ কই?

হরেন্দ্র এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল।

কমল বলিতে লাগিল, আমার ইতিহাস আপনারা সবই শুনেচেন, খুব সম্ভব সে কাহিনী পরমানন্দে উপভোগ করেচেন। কাজগুলো আমার ভাল কি মন্দ, জীবনটা আমার পবিত্র কি কলুষিত সে-বিষয়ে আপনি নির্ব্বাক, কিন্তু সে যে গোপনে না হয়ে লোকের চোখের সুমুখে সকলকে উপেক্ষা করে ঘটে চলেচে এই হয়েচে আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার আকর্ষণ। হরেনবাবু, পৃথিবীতে মানুষের শ্রদ্ধা আমি এত বেশী পাইনি যে, অবহেলায় না বলে অপমান করতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেন আপনি অনেক জেনেচেন, তেমনি এটাও জেনে রাখুন যে, অক্ষয়বাবুদের শ্রদ্ধার চেয়েও এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। সে আমার সয়, কিন্তু এর বোঝা দুঃসহ।

হরেন্দ্র পূর্ব্বের মতই ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। কমলের বাক্য, বিশেষ করিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের শান্ত কঠোরতায় সে অন্তরে অপমান বোধ করিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, মত এবং আচরণের অনৈক্য সত্বেও যে একজনকে শ্রদ্ধা করা যায়, অন্ততঃ আমি পারি, এ আপনার বিশ্বাস হয় না?

কমল অতিশয় সহজে তখনই জবাব দিল, বিশ্বাস হয় না এ ত আমি বলিনি হরেনবাবু; আমি বলেচি এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিল, মত এবং নীতির দিক দিয়ে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাঁর বহু স্থলে অনাবশ্যক ও অত্যধিক রূঢ়তা না থাকলে আপনারা সকলেই এক, ও শ্রদ্ধার দিক দিয়েও এক। শুধু আমি যে নিজের লজ্জায় সঙ্কোচে লুকিয়ে বেড়াইনে আমার এই সাহসটুকুই আপনাদের সমাদর লাভ করেচে। এর কতটুকু দাম হরেনবাবু? বরঞ্চ ভেবে দেখলে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই আসে যে, এর জন্যই আমাকে এতদিন বাহবা দিয়ে আসছিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, বাহবা যদি দিয়েই থাকি সে কি অসঙ্গত? সাহস জিনিসটা কি সংসারে কিছুই নয়?

কমল কহিল, আপনারা সকল প্রশ্নকেই এমন একান্ত করে জিজ্ঞাসা করেন কেন? কিছুই নয় এ-কথা ত বলিনি। আমি বলছিলুম এ-বস্তু সংসারে দুর্লভ এবং দুর্লভ বলেই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় বস্তু আছে। বাইরে থেকে হঠাৎ তাকে সাহসের অভাব বলেই দেখতে লাগে।

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, বুঝতে পারলাম না। আপনার অনেক কথাই অনেক সময় হেঁয়ালির মত ঠেকে, কিন্তু আজকের কথাগুলো যেন তাকে ডিঙিয়ে গেল। মনে হচ্চে যেন আজ আপনি অত্যন্ত বিমনা। কারজবাব কাকে দিয়ে যাচ্চেন খেয়াল নেই।

কমল কহিল, তাই বটে। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হবেও বা। সত্যকার শ্রদ্ধা পাওয়া যে কি জিনিস সে হয়ত এতকাল নিজেও জানতুম না। সেদিন হঠাৎ যেন চমকে গেলুম। হরেনবাবু, আপনি দুঃখ করবেন না, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা করলে আর সমস্তই আজ পরিহাস বলে মনে লাগে। বলিতে বলিতে তাহার চোখের প্রখর দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং সমস্ত মুখের 'পরে এমনই একটা স্নিগ্ধ সজলতা ভাসিয়া আসিল যে, কমলের সে মূর্তি হরেন্দ্র কোনদিন দেখে নাই। আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না যে, অনুদ্দিষ্ট আর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কমল এইসকল বলিতেছে। সে শুধু উপলক্ষ এবং এইজন্যই আগাগোড়া সমস্তই তাহার হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছে।

কমল বলিতে লাগিল, আপনি এইমাত্র আমার দুর্মদ নির্ভীকতার প্রশংসা করছিলেন—ভাল কথা, শুনেচেন, শিবনাথ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন?

হরেন্দ্র লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল, হাঁ।

কমল কহিল, আমাদের মনে মনে একটা সর্ত্ত ছিল, ছাড়বার দিন যদি কখনো আসে যেন আমরা সহজেই ছেড়ে যেতে পারি। না না, চুক্তি-পত্রে লেখাপড়া করে নয়, এমনিই।

হরেন্দ্র কহিল, ঠিক।

কমল কহিল, সে ত আপনার বন্ধু অক্ষয়বাবু। শিবনাথ গুণী মানুষ, তার বিরুদ্ধে আমার নিজের খুব বেশী নালিশ নেই। নালিশ করেই বা লাভ কি? হৃদয়ের আদালতে একতরফা বিচারই একমাত্র বিচার, তার ত আর আপিল কোর্ট মেলে না।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ভালোবাসার অতিরিক্ত আর কোন বাঁধনই আপনি স্বীকার করেন না?

কমল কহিল, একে ত আমাদের ব্যাপারে আর কোন বাঁধন ছিল না, আর থাকলেই বা তাকে স্বীকার করিয়ে ফল কি? দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায় তার বাইরের বাঁধন মস্ত বোঝা। তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলেই সবচেয়ে বেশী বাজে। এই বলিয়া একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, আপনি ভাবচেন সত্যিকার বিবাহ হয়নি বলেই এমন কথা মুখে আনতে পারচি, হলে পারতুম না। হলেও পারতুম, শুধু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান পেতুম না। বিবশ অঙ্গটা হয়ত এ-দেহে সংলগ্ন হয়ে থাকত এবং অধিকাংশ রমণীর যেমন ঘটে, আমরণ তার দুঃখের বোঝা বয়েই এ জীবন কাটত। আমি বেঁচে গেছি হরেনবাবু, দৈবাৎ নিষ্কৃতির দোর খোলা ছিল বলে আমি মুক্তি পেয়েচি!

হরেন্দ্র কহিল, আপনি হয়ত মুক্তি পেয়েচেন, কিন্তু এমনিধারা মুক্তির দ্বার যদি সবাই খোলা রাখতে চাইত, জগতে সমাজ-ব্যবস্থার বোনেদ পর্য্যন্ত উপড়ে ফেলতে হ'ত, তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কল্পনায় আঁকতে পারে এমন কেউ নেই। এ সম্ভাবনা ভাবাও যায় না।

কমল বলিল, যায় এবং যাবেও একদিন। তার কারণ মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা শেষ হয়ে যায়নি। একদিনের অনুষ্ঠানের জোরে তার অব্যাহতির পথ যদি সারা জীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না। পৃথিবীতে সকল ভুল-চুকের সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলে না, কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভোবনা সবচেয়ে বেশী, আর তার নিরাকরণের প্রয়োজনও তেমনি অধিক, আর সেইখানেই লোকে সমস্ত উপায় যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ করে থাকে তাকে ভাল বলে মানি কি করে বলুন?

এই মেয়েটির নানাবিধ দুর্দ্দশায় হরেন্দ্রর মনের মধ্যে গভীর সমবেদনা ছিল; বিরুদ্ধ আলোচনায় সহজে যোগ দিত না এবং বিপক্ষ দল যখন নানাবিধ সাক্ষ্য প্রমাণের বলে তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, সে প্রতিবাদ করিত। তাহারা কমলের প্রকাশ্য আচরণ ও তেমনি নির্লজ্জ উক্তিগুলার নজির দেখাইয়া যখন ধিক্কার দিতে থাকিত, হরেন তর্ক-যুদ্ধে হারিয়াও প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, কমলের

জীবনে কিছুতেই ইহা সত্য নয়। কোথাও একটা নিগূঢ় রহস্য আছে একদিন তাহা ব্যক্ত হইবেই হইবে। তাহারা বিদ্রূপ করিয়া কহিত, দয়া করে সেইটে তিনি ব্যক্ত করলে প্রবাসী বাঙালী-সমাজে আমরা যে বাঁচি। অক্ষয় উপস্থিত থাকিলে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত, আপনারা সবাই সমান। আমার মত আপনাদের কারও বিশ্বাসের জোর নেই। আপনারা নিতেও পারেন না, ফেলতেও চান না। আধুনিক কালের কতকগুলো বিলিতী চোখা চোখা বুলি যেন আপনাদের ভূতগ্রস্ত করে রেখেচে।

অবিনাশ বলিতেন, বুলিগুলো কমলের কাছ থেকে নতুন শোনা গেল তা নয় হে অক্ষয়, পূর্ব্বে থেকেই শোনা আছে। আজকালের খান-দুই-তিন ইংরাজি তর্জ্জমার বই পড়লে জানা যায়। বুলির জৌলুস নয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিত, তবে কিসের জৌলুস? কমলের রূপের? অবিনাশবাবু, হরেন অবিবাহিত ছোকরা—ওকে মাপ করা যায়, কিন্তু বুড়োবয়সে আপনাদের চোখেও যে ঘোর লাগিয়েচে এই আশ্চর্য্য। এই বলিয়া সে কটাক্ষে আশুবাবুর প্রতিও একবার চাহিয়া লইয়া বলিত, কিন্তু এ আলেয়ার আলো অবিনাশ-বাবু, পচা পাঁকের মধ্যে এর জন্ম। পাঁকের মধ্যেই একদিন অনেককে টেনে নামাবে তা স্পষ্ট দেখতে পাই। শুধু অক্ষয়কে এ-সব ভোলাতে পারে না—সে আসল-নকল চেনে।

আশুবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতেন, কিন্তু অবিনাশ ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেন। হরেন্দ্র বলিত, আপনি মস্ত বাহাদুর অক্ষয়বাবু, আপনার জয়-জয়কার হোক। আমরা সবাই মিলে পাঁকের মধ্যে পড়ে যেদিন হাবুডুবু খাব, আপনি সেদিন তীরে দাঁড়িয়ে বগল বাজিয়ে নৃত্য করবেন, আমরা কেউ নিন্দে করব না।

অক্ষয় জবাব দিত, নিন্দের কাজ আমি করিনি হরেন। গৃহস্থ মানুষ, সহজ সোজা বুদ্ধিতে সমাজকে মেনে চলি। বিবাহের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চাইনে, বিশ্ব-বখাটে একপাল ছেলে জুটিয়ে ব্রহ্মচারী-গিরি করে বেড়াইনে। আশ্রমে পায়ের ধূলোর পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা কর গে ভায়া, সাধন-ভজনের জন্য ভাবতে হবে না। দেখতে দেখতে সমস্ত আশ্রম বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে এবং হয়ত চিরকালের মত তোমার একটা কীর্ত্তি থেকে যাবে।

অবিনাশ ক্রোধ ভুলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেন এবং নির্ম্মল চাপা-হাসিতে আশুবাবুর মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। হরেন্দ্রর আশ্রমের প্রতি কাহারও আস্থা ছিল না, ও একটা ব্যক্তিগত খেয়াল বলিয়াই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন।

প্রত্যুত্তরে হরেন্দ্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া কহিত, জানোয়ারের সঙ্গে ত যুক্তি-তর্ক চলে না, তার অন্য বিধি আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা হয়ে ওঠে না বলেই আপনি যাকে তাকে গুঁতিয়ে বেড়ান। ইতর-ভদ্র মহিলা-পুরুষ কিছুই বাদ যায় না। এই বলিয়া

সে অপর দুজনকে লক্ষ্য করিয়া কহিত, কিন্তু আপনারা প্রশ্রয় দেন কি বলে? এতে-বড় একটা কুৎসিত ইঙ্গিতও যেন একটা পরিহাসের ব্যাপার।

অবিনাশ অপ্রতিভ হইয়া কহিতেন, না না, প্রশ্রয় দেব কেন, কিন্তু জানই ত অক্ষয়ের কাণ্ডজ্ঞান নেই।

হরেন কহিত, কাণ্ডজ্ঞান ওর চেয়ে আপনাদের আরও কম। মানুষের মনের চেহারা ত দেখতে পাওয়া যায় না সেজন্য, নইলে হাসি-তামাসা কম লোকের মুখেই শোভা পেত। বিবাহের ছলনায় কমলকে শিবনাথ ঠকিয়েচেন, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সেই ঠকাটাও কমল সত্যের মতই মেনে নিয়েছিলেন, সংসারের দেনা-পাওনার লাভ-ক্ষতির বিবাদ বাধিয়ে তাকে লোক-চক্ষে ছোট করতে চাননি। কিন্তু তিনি না চাইলেই বা আপনারা ছাড়বেন কেন? শিবনাথ তার ভালবাসার ধন, কিন্তু আপনাদের সে কে? ক্ষমার অপব্যবহার আপনাদের সইল না! এই ত আপনাদের ঘৃণার মূলধন! একে ভাঙিয়ে যতকাল চালানো যায় চালান, আমি বিদায় নিলুম। এই বলিয়া হরেন্দ্র সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে এই প্রত্যয় সুদৃঢ় ছিল যে, কমলের মুখ দিয়াই একদিন এ কথা ব্যক্ত হইবে যে, শৈব-বিবাহকে সত্যকার বিবাহ জানিয়াই সে প্রতারিত হইয়াছে, স্বেচ্ছায় সমস্ত জানিয়া গণিকার মত শিবনাথকে আশ্রয় করে নাই। কিন্তু আজ তাহার বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ধূলিসাৎ হইল। হরেন্দ্র, অক্ষয় বা অবিনাশ নহে, নর-নারী নির্ব্বিশেষে সকলের 'পরেই তাহার একটা বিস্তৃত ও গভীর উদারতা ছিল—এই জন্যেই দেশের ও দশের কল্যাণে সকল প্রকার মঙ্গল অনুষ্ঠানেই সে ছেলেবেলা হইতে নিজেকে নিযুক্ত রাখিত। এই যে তাহার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, এই যে তাহার অকৃপণ দান, এই যে সকলের সাথে সব-কিছু ভাগ করিয়া লওয়া, এ-সকলের মূলেই ছিল ঐ একটিমাত্র কথা। তাহার এই প্রবৃত্তিই তাহাকে গোড়া হইতে কমলের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল। কিন্তু সে যে আজ তাহার মুখের 'পরে, তাহারই প্রশ্নের উত্তরে এমন ভয়ানক জবাব দিবে তাহা ভাবে নাই। ভারতের ধর্ম্ম, নীতি, আচার, ইহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, সভ্যতার প্রতি হরেনের অচ্ছেদ্য স্নেহ ও অপরিমেয় ভক্তি ছিল। অথচ সুদীর্ঘ অধীনতা ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্ব্বলতায় ইহার ব্যতিক্রম গুলোকেও সে অস্বীকার করিত না; কিন্তু এমন স্পর্দ্ধিত অবজ্ঞায় ইহার মূলসূত্রকেই অস্বীকার করায় তাহার বেদনার সীমা রহিল না, এবং কমলের পিতা ইউরোপীয়, মাতা কুলটা—তাহার শিরায় রক্তে ব্যাভিচার প্রবহমান, একথা স্মরণ করিয়া তাহার বিতৃষ্ণায় মন কালো হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল, এখন তা হলে যাই—

কমল হরেন্দ্রের মনের ভাবটা ঠিক অনুমান করিতে পারিল না, শুধু সুস্পষ্ট

পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেজন্যে এসেছিলেন তার ত কিছু করলেন না।

হরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কহিল, কি সে?

কমল বলিল, রাজেনের খবর জানতে এসেছিলেন, কিন্তু না জেনেই চলে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে তার থাকা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কি খুব বিশ্রী আলোচনা হয়? সত্যি বলবেন?

হরেন্দ্র বলিল, যদিও হয় আমি কখনও যোগ দিইনে। সে পুলিশের জিম্মায় না থাকলেই আমার কাছে যথেষ্ট। তাকে আমি চিনি।

কিন্তু আমাকে?

কিন্তু আপনি ত সে-সব কিছু মানেন না।

অনেকটা তাই বটে। অর্থাৎ মানতেই হবে এমন কোন কঠিন শপথ নেই আমার। কিন্তু বন্ধুকে শুধু জানলে হয় না হরেনবাবু, আর একজনকেও জানা দরকার।

বাহুল্য মনে করি। বহুদিনের বহু কাজে-কর্মে যাকে নিসংশয়ে চিনেচি বলেই জানি, তার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা নেই। তার যেখানে অভিরুচি সে থাক্‌, আমি নিশ্চিন্ত।

কমল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয় হরেনবাবু। তার একটা দিনের আগের প্রশ্ন হয়ত অন্যদিনের উত্তরের সঙ্গে মেলে না। কারও সম্বন্ধেই বিচার অমন শেষ করে রাখতে নেই, ঠকতে হয়।

কথাগুলো যে শুধু তত্ত্ব হিসাবে কমল বলে নাই, কি একটা ইঙ্গিত করিয়াছে হরেন্দ্র তাহা অনুমান করিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা ইহাকে স্পষ্টতর করিতেও তাহার ভরসা হইল না। রাজেনের প্রসঙ্গটা বন্ধ করিয়া হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা করিল। কহিল, আমরা স্থির করেচি শিবনাথকে যথোচিত শাস্তি দেব।

কমল সত্যিই বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা?

হরেন্দ্র বলিল, যারাই হোক আমি তার একজন। আশুবাবু পীড়িত, ভাল হয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েচেন।

তিনি পীড়িত?

হাঁ, সাত-আট দিন অসুস্থ। এর পূর্ব্বে মনোরমা চলে গেছেন। আশুবাবুর খুড়ো কাশীবাসী, তিনি এসে নিয়ে গেছেন।

শুনিয়া কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, শিবনাথ জানে আইনের দড়ি তার নাগাল পাবে না, এই জোরে সে তার মৃত বন্ধুর পত্নীকে বঞ্চিত করেচে, নিজের রুগ্ন স্ত্রীকে পরিত্যাগ

করেচে এবং নির্ভয়ে আপনার সর্ব্বনাশ করেচে। আইন সে খুব ভালই জানে, শুধু জানে না যে দুনিয়ার এই-ই সব নয়, এর বাইরেও কিছু বিদ্যমান আছে।

কমল সহাস্য কৌতুকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু শাস্তিটা তাঁর কি স্থির করেচেন? ধরে এনে আর একবার আমার সঙ্গে জুড়ে দেবেন? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

প্রস্তাবটা হরেন্দ্রর কাছেও হঠাৎ এমনি হাস্যকর ঠেকিল যে সেও না হাসিয়া পারিল না। কহিল, কিন্তু দায়িত্বটা যে এইভাবে নিজের খেয়াল-মত নির্ব্বিঘ্নে এড়িয়ে যাবে সেও ত হতে পারে না। আর আপনার সঙ্গে জুড়েই যে দিতে হবে তারও ত মানে নেই?

কমল কহিল, তা হলে হবে কি এনে? আমাকেও পাহারা দেবার কাজে লাগাবেন, না, ঘাড়ে ধরে খেসারত আদায় করে আমাকে পাইয়ে দেবেন? প্রথমতঃ টাকা আমি নেবো না, দ্বিতীয়তঃ সে বস্তু তাঁর নেই। শিবনাথ যে কত গরীব সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি!

তবে কি এতবড় অপরাধের কোন দণ্ডই হবে না? আর কিছু না হোক বাজারে যে আজও চাবুক কিনতে পাওয়া যায় এ খবরটা তাঁকে ত জানান দরকার?

কমল ব্যাকুল হইয়া বলিল, না না, সে করবেন না। ওতে আমার এতবড় অপমান যে সে আমি সইতে পারব না। কহিল, এতদিন এই রাগেই শুধু জলে মরেছিলুম যে, এমন চোরের মত পালিয়ে বেড়বার কি প্রয়োজন ছিল, স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলে কি বাধা দিতুম? তখন এই লুকোচুরির অসম্মানটাই যেন পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে দেখা দিত। তার পরে হঠাৎ একদিন মৃত্যুর পল্লী থেকে আহ্বান এল। সেখানে কত মরণই চোখে দেখলুম তার সংখ্যা নেই। আজ ভাবনার ধারা আমার আর একপথ দিয়ে নেমে এসেচে। এখন ভাবি, তাঁর বলে যাবার সাহস যে ছিল না সেই ত আমার সম্মান। লুকোচুরি, ছলনা, তাঁর সমস্ত মিথ্যাচার আমাকেই যেন মর্য্যাদা দিয়ে গেছে। পাবার দিন আমাকে ফাঁকি দিয়েই পেয়েছিলেন, কিন্তু যাবার দিন আমাকে সুদে-আসলে পরিশোধ করে যেতে হয়েচে। আর আমার নালিশ নেই, আমার সমস্ত আদায় হয়েচে। আশুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার ভাল করবার বাসনায় আর আমার যেন ক্ষতি না করেন।

হরেন্দ্র একটা কথাও বুঝিল না, অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কমল কহিল, সংসারের সব জিনিস সকলের বোঝবার নয় হরেনবাবু! আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। কিন্তু আমার কথা আর নয়। দুনিয়ায় কেবল শিবনাথ আর কমল আছে তাই নয়। আরও পাঁচজন বাস করে, তাদেরও সুখ-দুঃখ আছে। এই বলিয়া সে নির্ম্মল ও প্রশান্ত হাসি দিয়া যেন দুঃখ ও বেদনার ঘন বাষ্প একমুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল। কহিল, কে কেমন আছেন খবর দিন।

হরেন্দ্র কহিল, জিজ্ঞাসা করুন ?

বেশ। আগে বলুন অবিনাশবাবুর কথা। তিনি অসুস্থ শুনেছিলাম, ভাল হয়েচেন ?

হাঁ, সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা ভাল। তাঁর এক জাঠ্‌তুতো দাদা থাকেন লাহোরে, আরোগ্যলাভের জন্য ছেলেকে নিয়ে সেইখানে চলে গেছেন। ফিরতে বোধ করি দু-এক মাস দেরি হবে।

আর নীলিমা ? তিনিও কি সঙ্গে গেছেন ?

না, তিনি এখানেই আছেন।

কমল আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এখানে ? একলা ঐ খালি বাসায় ?

হরেন্দ্র প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে কহিল, বৌদির সমস্যাটা সত্যিই একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভগবান রক্ষে করেচেন, আশুবাবুর শুশ্রূষার জন্তে ঐখানে তাঁকে রেখে যাবার সুযোগ হয়েচে।

এই খবরটা এমনি খাপছাড়া যে কমল আর প্রশ্ন করিল না, শুধু বিস্তারিত বিবরণের আশায় জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্রর দ্বিধা কাটিয়া গেল এবং বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বরে গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কারণ, এই ব্যাপারে অবিনাশের সহিত তাহার সামান্য একটু কলহের মতও হইয়াছিল। হরেন্দ্র কহিল, বিদেশের নিজের বাসায় যা ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু তাই বলে বয়স্কা বিধবা শালী নিয়ে ত জাঠ্‌তুতো ভায়ের বাড়ি ওঠা যায় না। বললেন, হরেন, তুমিও ত আত্মীয়, তোমার বাসাতে কি—আমি জবাব দিলাম, প্রথমতঃ, আমি তোমারই আত্মীয়, তাও অত্যন্ত দূরের—কিন্তু তাঁর কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ, ওটা আমার বাসা নয়, আমাদের আশ্রম ; ওখানে রাখবার বিধি নেই। তৃতীয়তঃ, সম্প্রতি ছেলেরা অন্যত্র গেছে আমি একাকী আছি। শুনে সেজদার ভাবনার অবধি রইল না। আগ্রাতেও থাকা যায় না, লোক মরচে চারিদিকে, দাদার বাড়ি থেকে চিঠি এবং টেলিগ্রাফে ঘন ঘন তাগিদ আসচে—সেজদার সে কি বিপদ !

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নীলিমার বাপের বাড়ি ত আছে শুনেছি ?

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। একটা বড় রকম শ্বশুরবাড়িও আছে শুনেচি, কিন্তু সে-সকলের কোন উল্লেখই হল না। হঠাৎ একদিন অদ্ভুত সমাধান হয়ে গেল। প্রস্তাব কোন্ পক্ষ থেকে উঠেছিল জানিনে, কিন্তু পীড়িত আশুবাবুর সেবার ভার নিলেন বৌদি।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, তবে আশা আছে বৌদির চাকরিটা যাবে না। তাঁরা ফিরে এলেই আবার গৃহিণীপনার সাবেক কাজে লেগে যেতে পারবেন।

কমল এই শ্লেষেরও কোন উত্তর দিল না, তেমনই মৌন হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি জানি, বৌদি সত্যিই সৎ চরিত্রের মেয়ে। সেজদার দারুণ দুর্দ্দিনে ছেড়ে যেতে পারেননি, এই থাকার জন্যই হয়ত ওদিকের সকল পথ বন্ধ হয়েচে। অথচ এদিকেরও দেখলাম বিপদের দিনে পথ খোলা নেই। তাই ভাবি বিনা দোষেও এ-দেশের মেয়েরা কত বড় নিরুপায়।

কমল তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এই-সব শুনে আপনি হয়ত মনে মনে হাসচেন, না?

কমল শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

হরেন্দ্র বলিল, আমি প্রায়ই যাই আশুবাবুকে দেখতে, ওঁরা দু'জনেই আপনার খবর জানতে চাইছিলেন। বৌদির ত আগ্রহের সীমা নেই—একদিন যাবেন ওখানে?

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আজই চলুন না হরেনবাবু, তাঁদের দেখে আসি।

আজই যাবেন? চলুন। আমি একটা গাড়ি নিয়ে আসি। অবশ্য যদি পাই। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কমল তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, গাড়িতে দুজনে একসঙ্গে গেলে আশ্রমের বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন; হেঁটেই যাই চলুন।

হরেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এর মানে?

মানে নেই—এমনি। চলুন যাই।

১৯

হরেন্দ্র ও কমল আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বেলা অপরাহ্নপ্রায়। শয্যার উপরে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া অসুস্থ গৃহস্বামী সেইদিনের পাইয়োনিয়ার কাগজখানা দেখিতেছিলেন। দিন-কয়েক হইতে আর জ্বর ছিল না, অন্যান্য উপসর্গও সারিয়া আসিতেছিল, শুধু শরীরের দুর্ব্বলতা যায় নাই। ইহারা ঘরে প্রবেশ করিতে আশুবাবু কাগজ ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন, কি যে খুশী হইলেন সে তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় ছিল কমল হয়ত আসিবে না। তাই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, এস, আমার কাছে এসে ব'সো।

এই বলিয়া তাহাকে খাটের কাছেই যে চৌকিটা ছিল তাহাতে বসাইয়া দিলেন। বলিলেন, কেমন আছ বল ত কমল?

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, ভালই ত আছি।

আশুবাবু কহিলেন, সে কেবল ভগবানের আশীর্ব্বাদ। নইলে যে দুর্দ্দিন পড়েচে তাতে কেউ যে ভাল আছে তা ভাবতেই পারা যায় না। এতদিন কোথায় ছিলে বল ত? হরেন্দ্রকে রোজই জিজ্ঞাসা করি, সে রোজই এসে একই উত্তর দেয়, বাসায় তালাবন্ধ, তাঁর সন্ধান পাইনে। নীলিমা সন্দেহ করেছিলেন হয়ত বা তুমি দিন-কয়েকের তরে কোথাও চলে গেছ।

হরেন্দ্রই ইহার জবাব দিল, কহিল, আর কোথাও না—এই আগ্রাতেই মুচীদের পাড়ায় সেবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আজ দেখা পেয়ে ধরে এনেচি।

আশুবাবু ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, মুচীদের পাড়ায়? কিন্তু কাগজে লিখচে যে পাড়াটা উজোড় হয়ে গেল। এতদিন তাদের মধ্যেই ছিলে? একা?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, একলা নয়, সঙ্গে রাজেন ছিলেন।

শুনিয়া হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিল, কিছু বলিল না। তার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি না বলিলেও আমি অনুমান করিয়াছিলাম। যেথায় দৈবের এতবড় নিগ্রহ শুরু হইয়াছে সে দুর্ভাগাদের ত্যাগ করিয়া সে যে কোথাও এক পা নড়িবে না এ আমি জানিব না ত জানিবে কে?

আশুবাবু কহিলেন, অদ্ভুত মানুষ এই ছেলেটি। ওকে দু-তিনদিনের বেশী দেখিনি, কিছুই জানিনে, তবু মনে হয় কি যে সৃষ্টিছাড়া ধাতুতে ও তৈরী। তাকে নিয়ে এলে না কেন, ব্যাপারগুলো জিজ্ঞেসা করতাম। খবরের কাগজ থেকে ত সব বোঝা যায় না।

কমল বলিল, না। কিন্তু তাঁর ফিরতে এখনও দেরি আছে।

কেন?

পাড়াটা এখনো নিঃশেষ হয়নি। যারা অবশিষ্ট আছে তাদের রওনা না করে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন না, এই তাঁর পণ।

আশুবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হলে তোমার বা কি করে ছুটি হ'লো? আবার কি সেখানে ফিরতে হবে? নিষেধ করতে পারিনে, কিন্তু সে যে বড় ভাবনার কথা কমল?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাবনার জন্য নয় আশুবাবু, ভাবনা আর কোথায় নেই? কিন্তু আমার ঘড়িতে যেটুকু দম ছিল সমস্ত শেষ করে নিয়েই এসেচি। সেখানে ফিরে যাবার সাধ্য আমার নেই। শুধু রয়ে গেলেন রাজেন। এক-একজনের দেহ-যন্ত্রেও প্রকৃতি এমনি অফুরন্ত দম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন যে, সে

না হয় কখন শেষ, না যায় কখন বিগড়ে। এই লোকটি তাদেরই একজন। প্রথম প্রথম মনে হ'তো এই ভয়ানক পল্লীর মাঝখানে এ বাঁচবে কি করে? ক'দিনই বা বাঁচবে! সেখান থেকে একলা যখন চলে এলুম কিছুতেই যেন আর ভাবনা ঘোচে না, কিন্তু আর আমার ভয় নেই। কেমন করে যেন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি, প্রকৃতি আপনার গরজেই এদের বাঁচিয়ে রাখে। নইলে দুঃখীর কুটিরে বন্যার মত যখন মৃত্যু ঢোকে তখন তার ধ্বংসলীলার সাক্ষী থাকবে কে? আজই হরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি এই গল্পই করছিলাম। শিবনাথবাবুর ঘর থেকে রাত্রিশেষে যখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলুম—

আশুবাবু এ-বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, এতে তোমার লজ্জার কি আছে কমল? শুনেচি তাঁকে সেবা করার জন্যই তুমি অযাচিত তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে।

কমল কহিল লজ্জা সেজন্য নয় আশুবাবু। যখন দেখতে পেলুম তাঁর কোন অসুখই নেই—সমস্তই ভান—কোন একটা ছলনায় আপনাদের দয়া পাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু তাও সফল হতে পায়নি, আপনি বাড়ি থেকে বার করে দিয়েচেন—তখন কি যে আমার হ'লো সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। যে সঙ্গে ছিল তাকেও এ-কথা জানাতে পারিনি -শুধু কোনমতে রাত্রির অন্ধকারে সেদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলুম। পথের মধ্যে বার বার করে কেবল এই একটা কথাই মনে হতে লাগল, এই অতি ক্ষুদ্র কাঙাল লোকটাকে রাগ করে শাস্তি দিতে যাওয়ায় না আছে ধর্ম্ম, না আছে সম্মান।

আশুবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বল কি কমল, শিবনাথের অসুখটা কি শুধু ছলনা? সত্য নয়?

কিন্তু জবাব দিবার পূর্ব্বেই দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া সবাই চাহিয়া দেখিল নীলিমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে দুধের বাটি। কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিলে সে পাত্রটা শয্যার শিয়রে তেপায়ার উপর রাখিয়া দিয়া প্রতি-নমস্কার করিল। এবং অপরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়াছে মনে করিয়া নিজে কোন কথা না কহিয়া অদূরে নীরবে উপবেশন করিল।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ যে দুর্ব্বলতা কমল! এ জিনিস ত তোমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না! আমি বরাবর ভাবতাম, যা অন্যায়, যা মিথ্যাচার, তাকে তুমি মাপ করো না।

হরেন্দ্র কহিল, ওঁর স্বভাবের খবর জানিনে, কিন্তু মুচীদের পাড়ায় মরণ দেখে ওঁর ধারণা বদলেচে, এ সংবাদ ওঁর কাছেই পেলাম। আগে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাই থাক এখন কারও বিরুদ্ধেই নালিশ করতে উনি নারাজ।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে যে তোমার প্রতি এতখানি অত্যাচার করলে তার কি?

কমল মুখ তুলিতেই দেখিল নীলিমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। জবাবটা শুনিবার জন্য সে-ই যেন সবচেয়ে উৎসুক। না হইলে হয়ত সে চুপ করিয়াই থাকিত, হরেন্দ্র যতটুকু বলিয়াছে তার বেশি একটা কথাও কহিত না। কহিল, এ-প্রশ্ন আমার কাছে এখন অসংলগ্ন ঠেকে। যা নেই তা কেন নেই বলে চোখের জল ফেলতেও আজ আমার লজ্জা বোধ হয়; যেটুকু তিনি পেরেচেন, কেন তার বেশী পারলেন না বলে রাগারাগি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। আপনার কাছে প্রার্থনা শুধু এই যে, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তাঁকে আর টানাটানি করবেন না। এই বলিয়া সে যেন হঠাৎ শ্রান্ত হইয়া চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চোখ বুজিল।

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিল নীলিমা, সে চোখের ইঙ্গিতে দুধের বাটিটা নির্দ্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ওটা যে একেবারে জুড়িয়ে গেল। দেখুন ত খেতে পারবেন, না আবার গরম করে আন্‌তে বলব?

আশুবাবু বাটিটা মুখে তুলিয়া খানিকটা খাইয়া রাখিয়া দিলেন। নীলিমা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, পড়ে থাকলে চলবে না—ডাক্তারের ব্যবস্থা ভাঙতে আমি দেবো না।

আশুবাবু অবসন্নের মত মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া কহিলেন, তার চেয়েও বড় ব্যাবস্থাপক নিজের দেহ। এ-কথা তোমারও ভোলা উচিত নয়!

আমি ভুলিনি, ভুলে যান আপনি নিজে।

ওটা বয়সের দোষ নীলিমা—আমার নয়।

নীলিমা হাসিয়া বলিল, তাই বই কি! দোষ চাপাবার মত বয়স পেতে এখনও আপনার অনেক—অনেক বাকী। আচ্ছা, কমলকে নিয়ে আমরা একটু ও-ঘরে গিয়ে গল্প করিগে, আপনি চোখ বুজে একটুখানি বিশ্রাম করুন, কেমন? যাই?

আশুবাবুর এ ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না, তথাপি সম্মতি দিতে হইল; কহিলেন, কিন্তু একেবারে তোমরা চলে যেও না, ডাকলে যেন পাই।

আচ্ছা। চল ঠাকুরপো, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি গে। বলিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া গেল। নীলিমার কথাগুলি স্বভাবতঃই মধুর, বলিবার ভঙ্গিটিতে এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার আজিকার এই গুটি-কয়েক কথা যেন তাহাদেরও ছাড়াইয়া গেল। হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু লক্ষ্য করিল কমল। পুরুষের চোখে যাহা এড়াইল, ধরা পড়িল রমণীর দৃষ্টিতে। নীলিমা শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছিল, এই পীড়িত লোকটির স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানতায় আশ্চর্য্যের কিছু নাই, সাধারণের কাছে এ-কথা বলা চলে, কিন্তু সাধারণের একজন কমল নয়। নীলিমার এই একান্ত সতর্কতার অপরূপ স্নিগ্ধতায় সে যেন এক অভাবিত বিস্ময়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। বিস্ময় কেবল এক দিক দিয়া নয়, বিস্ময় বহু দিক দিয়া।

সম্পদের মোহ এই বিধবা মেয়েটিকে মুগ্ধ করিয়াছে এমন সন্দেহ কমল চিন্তায়ও ঠাঁই দিতে পারিল না। নীলিমার ততটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে। আশুবাবুর যৌবন ও রূপের প্রশ্ন এ-ক্ষেত্রে শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর। তবে কোথায় যে ইহার সন্ধান মিলিবে ইহাই কমল মনের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। এ-ছাড়া আরও একটা দিক আছে। সেদিক আশুবাবুর নিজের। এই সরল ও সদাশিব মানুষটির গভীর চিত্ততলে পত্নীপ্রেমের যে আদর্শ অচঞ্চল নিষ্ঠায় নিত্য পূজিত হইতেছে, কোনদিকের কোন প্রলোভনেই তাহাতে দাগ ফেলিতে পারে নাই ইহাই ছিল সকলের একান্ত বিশ্বাস। মনোরমার জননীর মৃত্যুকালে আশুবাবুর বয়স বেশী ছিল না—তখনও যৌবন অতিক্রান্ত হয় নাই; কিন্তু সেইদিন হইতেই সেই লোকান্তরিত পত্নীর স্মৃতি উন্মুলিত করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের দল উত্তম-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই, কিন্তু দুর্ভেদ্য দুর্গের দুয়ার ভাঙিবার কোন কৌশলই কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। এ-সকল কমলের অনেকের মুখে শোনা কাহিনী। এ-ঘরে আসিয়া অন্যমনস্কের মত নীরবে বসিয়া সে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল, নীলিমার মনোভাবের লেশমাত্র আভাসও এই মানুষটির চোখে পড়িয়াছে কি না। যদি পড়িয়াই থাকে, দাম্পত্যের যে সুকঠোর নীতি অত্যাজ্য ধর্ম্মের ন্যায় একাগ্র সতর্কতায় তিনি আজীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আসক্তির এই নবজাগ্রত চেতনায় সে ধর্ম্ম লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ হইয়াছে কি না।

চাকর চা রুটি ফল প্রভৃতি দিয়া গেল। অতিথিদের সম্মুখে সেই সমস্ত আগাইয়া দিয়া নীলিমা নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। আশুবাবুর অসুখ, তাঁহার স্বাস্থ্য, তাঁহার সহজ ভদ্রতা ও শিশুর ন্যায় সরলতার ছোট-খাটো বিবরণ যাহা এই কয়দিনেই তাহার চোখে পড়িয়াছে—এমনি অনেক কিছু। শ্রোতা হিসাবে হরেন্দ্র স্ত্রীলোকের লোভের বস্তু এবং তাহারই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে নীলিমার বাক্‌শক্তি উচ্ছ্বসিত আবেগে শতমুখে ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বলার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না যে, যে-বৌদিকে সে এতদিন অবিনাশের বাসায় দেখিয়া আসিয়াছে সে-ই এই কি না। এই পরিণত যৌবনের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য, সে কৌতুক-রসোজ্জ্বল পরিমিত পরিহাস, বৈধব্যের সীমাবদ্ধ সংযত আলাপ-আলোচনা, সেই সুপরিচিত সমস্ত কিছুই এই কয়দিনে বিসর্জ্জন দিয়া আকস্মিক বাচালতায় বালিকার ন্যায় যে প্রগলভ হইয়া উঠিয়াছে, সে-ই এ-ই কি না।

বলিতে বলিতে নীলিমার হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, চায়ের বাটিতে দু-একবার চুমুক দেওয়া ছাড়া কমল কিছুই খায় নাই। ক্ষুণ্ণস্বরে সেই অনুযোগ করিতেই কমল সহাস্যে কহিল, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?

ভুলে গেলাম? তার মানে?

তার মানে এই যে, আমার খাওয়ার ব্যাপারটা আপনার মনে নেই। অসময়ে আমি ত কিছু খাইনে।

এবং সহস্র অনুরোধেও এর ব্যতিক্রম হবার জো নেই এই কথাটা হরেন্দ্র যোগ করিয়া দিল।

প্রত্যুত্তরে কমল তেমনিই হাসিমুখে বলিল, অর্থাৎ এ একগুঁয়েমির পরিবর্তন নেই। কিন্তু অত দর্প করিনে হরেনবাবু, তবে সাধারণতঃ এই নিয়মটাই অভ্যাস হয়ে গেছে তা মানি।

পথে বাহির হইয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কোথায় চলেছেন বলুন ত?

হরেন্দ্র বলিল, ভয় নেই, আপনার বাড়ির মধ্যে ঢুকবো না, কিন্তু যেখান থেকে এনেচি সেখানে পৌঁছে না দিলে অন্যায় হবে।

তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক-চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ অতি-ঘনিষ্ঠের ন্যায় কমল তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চলুন আমার সঙ্গে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ আপনার কত সূক্ষ্ম দাঁড়িয়েচে তার পরীক্ষা দেবেন।

হরেন্দ্র সঙ্কোচে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহা যে ভাল হইল না, এমন করিয়া পথ চলায় যে বিপদ আছে এবং পরিচিত কেহ কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলে লজ্জার একশেষ হইবে হরেন্দ্র তাহা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু না বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লওয়ার অশোভন রূঢ়তাকেও সে মনে স্থান দিতে পারিল না। ব্যাপারটা বিশ্রী ঠেকিল এবং সঙ্কটাপন্ন অবস্থা মানিয়া লইয়াই সে তাহার বাসার দরজায় আসিয়া পৌঁছিল। বিদায় লইতে চাহিলে কমল কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? আশ্রমে অজিতবাবু ছাড়া ত কেউ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। আজ তিনিও নেই, সকালের গাড়িতে দিল্লী গেছেন, সম্ভবতঃ কাল ফিরবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, গিয়ে খাবেন কি? আশ্রমে পাচক রাখবার ত ব্যবস্থা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, না, আমরা নিজেরাই রাঁধি।

অর্থাৎ আপনি আর অজিতবাবু?

হাঁ। কিন্তু হাসচেন যে? নিতান্ত মন্দ রাঁধিনে আমরা।

তা জানি, এবং পরক্ষণে সত্যই গম্ভীর হইয়া বলিল, অজিতবাবু নেই, সুতরাং ফিরে গিয়ে আপনাকে নিজেই রেঁধে খেতে হবে। আমার হাতে খেতে যদি ঘৃণা বোধ না করেন ত আমার ভারি ইচ্ছে আপনাকে নিমন্ত্রণ করি। খাবেন আমার হাতে?

হরেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, এ বড় অন্যায়। আপনি কি সত্যিই মনে করেন আমি ঘৃণায় অস্বীকার করতে পারি? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনাকে জানাতে ক্রটি করিনি যে, যারা আপনাকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন। আমার আপত্তি —শুধু অসময়ে দুঃখ দিতে আপনাকে চাইনে।

কমল বলিল, আমি দুঃখ বিশেষ পাব না। তা নিজেই দেখতে পাবেন। আসুন।

রাঁধিতে বসিয়া কহিল, আমার আয়োজন সামান্য, কিন্তু আশ্রমে আপনাদেরও যা দেখে এসেচি তাকেও প্রচুর বলা চলে না। সুতরাং এখানে খাবার কষ্ট যদি বা হয়, অন্যের মত অসহ্য হবে না এইটুকুই আমার ভরসা।

হরেন্দ্র খুশী হইয়া উত্তর দিল, আমাদের খাবার ব্যবস্থা যা দেখে এসেচেন তাই বটে। সত্যিই আমরা খুব কষ্ট করে থাকি।

কিন্তু থাকেন কেন? অজিতবাবু বড়লোক, আপনার নিজের অবস্থাও অস্বচ্ছল নয়—কষ্ট পাওয়ার ত কারণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, কারণ না থাক্ প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস এ আপনিও বোঝেন বলে নিজের সম্বন্ধে এমনি ব্যবস্থাই করে রেখেচেন? অথচ বাইরে থেকে কেউ যদি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করে বসে, তাকেই কি এর হেতু দিতে পারেন?

কমল বলিল, বাইরের লোককে না পারি ভিতরের লোককে দিতে পারব। আমি সত্যিই বড় দরিদ্র, নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার যতটুকু শক্তি আছে তাতে এর বেশী চলে না। বাবা আমাকে দিয়ে যেতে পারেননি কিছুই, কিন্তু পরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার এই বীজ-মন্ত্রটুকু দান করে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এই বিদেশে কমল যে কিরূপ নিরুপায় তাহা সে জানিত। শুধু অর্থের জন্যই নয়—সমাজ, সম্মান, সহানুভূতি কোন দিক দিয়াই তাহার তাকাইবার কিছু নাই। কিন্তু এ সত্যও সে স্মরণ না করিয়া পারিল না যে, এতবড় নিঃসহায়তাও এই রমণীকে লেশমাত্র দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। আজও সে ভিক্ষা চাহে না—ভিক্ষা দেয়। যে শিবনাথ তাহার এতবড় দুর্গতির মূল তাহাকেও দান করিবার সম্বল তাহার শেষ হয় নাই এবং বোধ করি সাহস ও সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়েই কহিল, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করচিনে কমল, কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু ভাবতেও পারিনে যে, আপনাদের মত আমার দারিদ্র্য প্রকৃতও নয়, একবার ইচ্ছে করলেই এ দুঃখ মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে আপনার নেই কারণ আপনিও জানেন স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্য্যের মতই ভোগ করা যায়।

কমল বলিল, যায়। কিন্তু কেন জানেন? ওটা অপ্রয়োজনের দুঃখ—দুঃখের অভিনয় বলে। সকল অভিনয়ের মধ্যেই খানিকটা কৌতুক থাকে, তাকে উপভোগ করার বাধা নেই। বলিয়া সে নিজেও কৌতুকভরে হাসিল।

সহসা ভারি একটা বেসুরা বাজিল। খোঁচা খাইয়া হরেন্দ্র ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জবাব দিল, কিন্তু এটা ত মানেন যে, প্রাচুর্য্যের মাঝেই জীবন তুচ্ছ হয়ে আসে, অথচ দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্র মহৎ ও সত্য হয়ে গড়ে ওঠে?

কমল স্টোভের উপর হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল এবং আর একটা কি চড়াইয়া দিয়া বলিল, সত্য হয়ে গড়ে ওঠার জন্য ওদিকেও খানিকটা সত্য থাকা চাই হরেনবাবু। বড়লোক, বাস্তবিক অভাব নেই, তবু ছদ্ম অভাবের আয়োজনে ব্যস্ত। আবার যোগ দিয়েচেন অজিতবাবু। আপনার আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি দৈন্য-ভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ভ আর অহমিকা। সংস্কারে অন্ধ না হয়ে একটুখানি চেয়ে থাকলেই এ-বস্তু দেখতে পাবেন—দৃষ্টান্তের জন্য ভারত পর্য্যটন করে বেড়াতে হবে না। কিন্তু তর্ক থাক্, রান্না শেষ হয়ে এল, এবার খেতে বসুন।

হরেন্দ্র হতাশ হইয়া বলিল, মুস্কিল এই যে ভারতবর্ষের ফিলজফি বোঝা আপনার সাধ্য নয়। আপনার শিরার মধ্যে ম্লেচ্ছ-রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—হিন্দুর আদর্শ ও-চোখে তামাসা বলেই ঠেকবে। দিন, কি রান্না হয়েচে খেতে দিন্।

এই যে দিই, বলিয়া কমল আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। একটুও রাগ করিল না।

হরেন্দ্র সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, ধরুন কেউ যদি যথার্থ-ই সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে সত্যকার অভাব ও দৈন্যের মাঝেই নেমে আসে তখন ত অভিনয় বলে তাকে তামাসা করা চলবে না? তখন ত—

কমল বাধা দিয়া কহিল, না, তখন আর তামাসা নয়, তখন সত্যিকার পাগল বলে মাথা চাপড়ে কাঁদবার সময় হবে। হরেন্দ্রবাবু, কিছুকাল পূর্ব্বে আমিও কতকটা আপনার মত করেই ভেবেচি, উপবাসের নেশার মত আমাকেও তা মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করেচে, কিন্তু এখন সংশয় আমার ঘুচেচে। দৈন্য এবং অভাব ইচ্ছাতেই আসুক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আসুক, ও নিয়ে দর্প করবার কিছু নেই। ওর মাঝে আছে শূন্যতা, ওর মাঝে আছে দুর্ব্বলতা, ওর মাঝে আছে পাপ—অভাব যে মানুষকে কত হীন, কত ছোট করে আনে, সে আমি দেখে এসেচি মহামারীর মধ্যে—মুচীদের পাড়ায় গিয়ে। আর একজন দেখেচেন তিনি আপনার বন্ধু রাজেন। কিন্তু তার কাছে থেকে ত কিছু পাওয়া যাবে না, আসামের গভীর-অরণ্যের মত কি যে সেখানে লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। আমি প্রায় ভাবি, আপনারা তাঁকেই দিলেন বিদায় করে। সেই যে কথায় আছে—মণি ফেলে অঞ্চলে কাঁচখণ্ড গেরো দেওয়া—আপনারা ঠিক কি তাই করলেন! ভেতর থেকে কোথাও নিষেধ পেলেন না? আশ্চর্য্য!

হরেন্দ্র উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

আয়োজন সামান্য, তথাপি কি যত্ন করিয়াই না কমল অতিথিকে খাওয়াইল। খাইতে বসিয়া হরেন্দ্রের বার বার করিয়া নীলিমাকে স্মরণ হইল; নারীদের শান্ত মাধুর্য্য ও শুচিতার আদর্শে ইহার চেয়ে বড় সে কাহাকেও ভাবিত না। মনে মনে বলিল, শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও প্রবৃত্তিতে প্রভেদ ইহাদের মধ্যে যত বেশীই থাক্, সেবা ও মমতায় উহারা একেবারে এক। ওটা বাহিরের বস্তু বলিয়াই বৈষম্যেরও অবধি নাই, তর্কও শেষ হয় না, কিন্তু নারীর যেটি নিজস্ব আপন, সর্ব্বপ্রকার মতামতের একান্ত বহির্ভূত, সেই গূঢ় অন্তর্দ্দেশের রূপটি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। নানা কারণে আজ হরেন্দ্রর ক্ষুধা ছিল না, শুধু একজনকে প্রসন্ন করিতেই সে সাধ্যের অতিরিক্ত ভোজন করিল। কিন্তু একটা তরকারি ভাল লাগিয়াছে বলিয়া পাত্র উজাড় করিয়া ভক্ষণ করিল, কহিল, অনেকদিন অসময়ে হাজির হয়ে বৌদিদিকেও ঠিক এমনি করেই জব্দ করেচি কমল।

কাকে, নীলিমাকে?

হাঁ।

তিনি জব্দ হতেন?

নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বীকার করতেন না।

কমল হাসিয়া কহিল, কেবল আপনি নয়, সমস্ত পুরুষমানুষেরই এমনি মোটা বুদ্ধি।

হরেন্দ্র তর্ক করিয়া বলিল, আমি চোখে দেখেচি যে।

কমল কহিল, সেও জানি। আর ঐ চোখে-দেখার অহঙ্কারেই আপনারা গেলেন।

হরেন্দ্র কহিল, অহঙ্কার আপনাদেরও কম নয়। সে-বেলা বৌদির খাওয়া হ'তো না—উপবাস করে কাটাতেন, তবু হার মানতে চাইতেন না।

কমল চুপ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিল, আপনাদের আশীর্ব্বাদে মোটা বুদ্ধিই আমাদের অক্ষয় হয়ে থাক্—এতেই লাভ বেশী। আপনাদের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অভিমানে উপোস করে মরতে আমরা নারাজ'

কমল এ-কথার জবাব দিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এখন থেকে আপনার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটাকেও মধ্যে মধ্যে যাচাই করে দেখব।

কমল বলিল, সে আপনি পারবেন না, গরীব বলে আপনার দয়া হবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমটায় অপ্রতিভ হইল, তাহার পরে বলিল দেখুন এ-কথার জবাব দিতে বাধে। কেন জানেন? মনে হয় যেন রাজরাণী হওয়াই যাকে সাজে, কাঙাল-পনা তাকে মানায় না। মনে হয় যেন আপনার দারিদ্র্য পৃথিবীর সমস্ত বড়লোকের মেয়েকে উপহাস করচে।

কথাটা তীরের মত গিয়া কমলের বুকে বাজিল।

হরেন্দ্র পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে, এবার উঠুন। ও-ঘরে গিয়ে সারারাত গল্প শুনবো এ-ঘরের কাজটা ততক্ষণ সেরে নিই।

খানিক পরে শোবার ঘরে আসিয়া কমল বসিল, কহিল, আজ আপনার বৌদিদির সমস্ত ইতিহাস না শুনে আপনাকে ছাড়বো না, তা যত রাত্রিই হোক। বলুন—

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল, কহিল, বৌদিদির সমস্ত কথা ত আমি জানিনে। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার এই আগ্রায়, অবিনাশদার বাসায়। বস্তুতঃ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানিনে। যেটুকু এখানকার অনেকেই জানে, আমিও ততটুকু জানি। কেবল একটা কথা বোধ করি সংসারের সকলের চেয়ে বেশি জানি, সে তাঁর অকলঙ্ক শুভ্রতা। স্বামী যখন মারা যান, তখন বয়স ছিল ওঁর উনিশ-কুড়ি - তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই পেয়েছিলেন। সে স্মৃতি মোছেনি, মোছবার নয়—জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত সে স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। পুরুষ মহলে আশুবাবুর কথা যখন ওঠে, তাঁর নিষ্ঠাও অনন্যসাধারণ—আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু—

হরেনবাবু, রাত্রি অনেক হ'লো, এখন ত আর বাসায় যাওয়া চলে না এই ঘরেই একটা বিছানা করে দিই?

হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ঘরে? কিন্তু আপনি?

কমল কহিল, আমিও এইখানে শোব। আর ত ঘর নেই।

হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল।

কমল হাসিয়া বলিল, আপনি ত ব্রহ্মচারী। আপনার ভয়ের কারণ আছে না কি?

হরেন্দ্র নির্নিমেষ-চক্ষে শুধু চাহিয়া রহিল। এ যে কি প্রস্তাব সে কল্পনা করিতে পারিল না। স্ত্রীলোক হইয়া এ-কথা সে উচ্চারণ করিল কি করিয়া!

তাহার অপরিসীম বিহ্বলতা কমলকে ধাক্কা দিল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আমারই ভুল হয়েচে হরেনবাবু, আপনি বাসায় যান। তাতেই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রমে ঠাঁই মেলেনি, মিলেছিল আশুবাবুর বাড়ি। নির্জ্জন গৃহে অনাত্মীয় নর-নারীর একটিমাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন—পুরুষের কাছে যে মেয়েমানুষ সে শুধু মেয়েমানুষ, এর বেশী খবর আপনার কাছে আজো পৌঁছোয়নি। ব্রহ্মচারী হলেও না। যান, আর দেরি করবেন না, আশ্রমে যান। বলিয়া সে নিজেই বাহিরে অন্ধকার বারান্দায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন্দ্র মূঢ়ের মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

২৮

প্রায় মাসাধিককাল গত হইয়াছে। আগ্রার ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী মূর্ত্তিটি শান্ত হইয়াছে; স্থানে স্থানে দুই-একটা নূতন আক্রমণের কথা শুনা যায় বটে, তবে মারাত্মক নয়। কমল ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল, হরেন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা পুঁটুলি, নিকটে মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, যে-রকম খাটচেন তাতে তাগাদা করতে লজ্জা হয়। কিন্তু লোকগুলো এমনি বেহায়া যে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করবে, হ'লো? আমি কিন্তু স্পষ্টই জবাব দিই যে ঢের দেরি। জরুরী থাকে ত না হয় বলুন, কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু মজা এই যে, আপনার হাতের তৈরী জিনিস যে একবার ব্যবহার করেচে সে আর কোথাও যেতে চায় না। এই দেখুন না লালাদের বাড়ি থেকে আবার এক থান গরদ, আর নমুনার জামাটা দিয়ে গেল—

কমল সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, নিলেন কেন?

নিই সাধে? বললাম, ছ'মাসের আগে হবে না—তাতেই রাজি। বললে, ছ'মাসের পর ত হবে, তাতেই চলবে। এই দেখুন না মজুরির টাকা পর্য্যন্ত হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। বলিয়া সে পকেট হইতে একখানা নোটের মধ্যে মোড়া কয়েকটা টাকা ঠক্ করিয়া কমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

কমল কহিল, অর্ডার এত বেশী আসতে থাকলে দেখচি আমাকে লোক রাখতে হবে। এই বলিয়া সে পুঁটুলিটা খুলিয়া ফেলিয়া পুরানো পাঞ্জাবি জামাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, কোন বড় দোকানের বড় মিস্ত্রীর তৈরী—আমাকে দিয়ে এরকম হবে না। দামী কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে, তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন।

হরেন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, আপনার চেয়ে বড় কারিগর এখানে কেউ আছে নাকি?

এখানে না থাকে কোলকাতায় আছে। সেইখানেই পাঠিয়ে দিতে বলবেন।

না, না, সে হবে না। আপনি যা পারেন তাই করে দেবেন, তাতেই হবে।

হবে না হরেনবাবু, হলে দিতাম। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, অজিতবাবু বড়লোক, সৌখিন মানুষ, যা-তা তৈরী করে দিলে তিনি পরতে পারবেন কেন? কাপড়টা মিথ্যে নষ্ট করে লাভ নেই, আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হরেন্দ্র অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কি করে জানলেন এটা অজিতবাবুর?

কমল কহিল, আমি হাত গুনতে পারি। গরদের কাপড়, অপ্রিয় মূল্য অথচ ছ'মাস বিলম্ব হলে চলে—হিন্দুস্থানী লালাজিরা অত নির্ব্বোধ নয় হরেনবাবু। তাঁকে

জানাবেন—তাঁর জামা তৈরী করার যোগ্যতা আমার নেই, আমি শুধু গরীবের সস্তা গায়ের কাপড়ই সেলাই করতে পারি। ও পারিনে।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল। শেষে কহিল, এ তার ভারি ইচ্ছে। কিন্তু পাছে আপনি জানতে পারেন, পাছে আপনার মনে হয় আমরা কোনমতে আপনাকে কিছু দেবার চেষ্টা করেচি, সেই ভয়ে অনেকদিন আমি স্বীকার করিনি। তাকে বলেছিলাম অল্পমূল্যে সাধারণ একটা কোন কাপড় কিনে দিতে। কিন্তু সে রাজি হ'লো না। বললে, এ ত আমার নিত্য-ব্যবহারের মেরজাই নয়, এ কমলের হাতে তৈরি জামা, এ শুধু বিশেষ উপলক্ষে পর্ব্বদিনে পরবার। এ আমার তোলা থাকবে। এ-জগতে তার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা বোধ করি আপনাকে কেউ করে না।

কমল বলিল, কিছুকাল পূর্ব্বে ঠিক তার উল্টো কথাই তাঁর মুখ থেকে বোধ করি অনেকেই শুনেছিল। নয় কি? একটু চেষ্টা করলে আপনারও হয়ত স্মরণ হবে। মনে করে দেখুন ত?

এই সেদিনের কথা, হরেন্দ্রর সমস্তই মনে ছিল। একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, মিথ্যে নয়; কিন্তু এ ধারণা ত একদিন অনেকেরই ছিল। বোধ হয় ছিল না শুধু আশুবাবুর; কিন্তু তাঁকেও একদিন বিচলিত হতে দেখেচি। আমার নিজের কথাটাই ধরুন না—আজ ত আর প্রমাণ দিতে হবে না, কিন্তু সেদিনের কষ্টি-পাথরে ঘষে ভক্তি-শ্রদ্ধা যাচাই করতে চাইলে আমিই বা দাঁড়াই কোথায়?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, রাজেনের খোঁজ পেলেন?

হরেন্দ্র বুঝিল, এই সকল হৃদয়-সম্পর্কিত আলোচনা আর একদিনের মত আজও স্থগিত রহিল। বলিল, না এখনো পাইনি। ভরসা আছে এসে উপস্থিত হলেই পাবো।

কমল বলিল, সে আমি জানতে চাইনি, পুলিশের জিম্মায় গিয়ে পড়েচে কি না এই খোঁজটাই আপনাকে নিতে বলেছিলুম।

হরেন্দ্র কহিল, নিয়েচি। আপাততঃ তাদের আশ্রয়ে নেই।

শুনিয়া কমল নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না বটে, কিন্তু স্বস্তি বোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় গেছেন এবং কবে গেছেন, মুচীদের পাড়ায় চেষ্টা করে একটু খোঁজ নিলে কি বার করা যায় না? হরেনবাবু, তাঁর প্রতি আপনার স্নেহের পরিমাণ জানি, এ-সকল প্রশ্ন হয়ত বাহুল্য মনে হবে, কিন্তু ক'দিন থেকে এ-ছাড়া কিছু আর আমি ভাবতেই পারিনে, আমার এমনি দশা হয়েচে। এই বলিয়া সে এমনি ব্যাকুল-চক্ষে চাহিল যে, হরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ নামাইয়া পূর্ব্বের মতই সেলাইয়ের কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এইসময়ে এক-একটা প্রশ্ন তাহার মনে আসে, কৌতূহলের সীমা নাই—মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িতেও চায়, কিন্তু নিজেকে

সামলাইয়া লয়। কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, এ জিজ্ঞাসার ফল কি হইবে। এইভাবে পাঁচ-সাত মিনিট কাটার পরে কমল নিজেই কথা কহিল। সেলাইটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা সমাপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক আজ আর না। এই বলিয়া মুখ তুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এ কি, দাঁড়িয়ে আছেন যে! একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসতেও পারেননি?

বসতে ত আপনি বলেননি।

বেশ যা হোক! বলিনি বলে বসবেন না!

না। না বললে বসা উচিত নয়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেও বলিনি—দাঁড়িয়েই বা আছেন কেন?

এ যদি বলেন ত আমার না-দাঁড়ানই উচিত ছিল। ত্রুটি স্বীকার করচি।

শুনিয়া কমল হাসিল। বলিল, তা বলে আমিও দোষ স্বীকার করচি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা আমার অপরাধ। এখন বসুন।

হরেন্দ্র চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলে কমল হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। একবার কি একটু চিন্তা করিল, তাহার পর কহিল, দেখুন হরেন্দ্রবাবু আসলে এর মধ্যে যে কিছুই নেই এ আমিও জানি, আপনিও জানেন। তবু লাগে। এই যে বসতে বলতে ভুলেছি, যে আদরটুকু অতিথিকে করা উচিত ছিল করিনি—হাজার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়েও সে ত্রুটি আপনার চোখে পড়েচে। না, না রাগ করচেন বলিনি, তবুও কেমন যেন মনের মধ্যে একটু লাগে। এ-সংসারে মানুষের গিয়েও যেতে চায় না—কোথায় একটু থেকে যায়। না?

হরেন্দ্র ইহার তাৎপর্য্য বুঝিল না, একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, এর থেকে সংসারে কত অনর্থপাতই না হয়। অথচ এইটিই লোকে সবচেয়ে বেশি ভোলে। না?

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব আমাকে বলচেন, না আপনাকে আপনি বলচেন? যদি আমার জন্য হয় ত আর একটু খোলসা করে বলুন। এ-হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢুকচে না।

কমল হাসিয়া বলিল, হেঁয়ালিই বটে। সহজ সরল রাস্তা, মনেই হয় না যে বিপত্তি চোখ রাঙিয়ে আছে। চলতে হোঁচট লেগে আঙুল দিয়ে যখন রক্ত ঝরে পড়ে, তখনি কেবল চৈতন্য জাগে—আর একটুখানি চোখ মেলে চলা উচিত ছিল। না?

হরেন্দ্র কহিল, পথের সম্বন্ধে হাঁ। অন্ততঃ আগ্রার রাস্তায় একটু হুঁস করে চলা ভাল—ও দুর্ঘটনা আশ্রমের ছেলেদের প্রায় ঘটে। কিন্তু হেঁয়ালি ত হেঁয়ালিই রয়ে গেল, মর্ম্মার্থ উপলব্ধি হ'ল না।

কমল কহিল, তার উপায় নেই হরেনবাবু। বললেই সকল কথার মর্ম্ম

বোঝা যায় না। এই দেখুন, আমাকে ত কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু অর্থ বুঝতেও বাধেনি।

হরেন্দ্র বলিল, তার মানে আপনি ভাগ্যবতী, আমি দুর্ভাগা। হয় সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে এমনি ভাষায় বলুন, না হয় থামুন। চিনে-বাজির মত এ যত চাচ্ছি খুলতে—তত যাচ্চে জড়িয়ে। অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় বাধা থেকে বক্তব্য আরম্ভ হয়ে যে এ কোথায় এসে দাঁড়াল তার কূল-কিনারা পাচ্চিনে। এ-সমস্ত কি আপনি রাজেনকে স্মরণ করে বলচেন? তাকে আমিও ত চিনি, সহজ করে বললে হয়ত কিছু কিছু বুঝতেও পারব। নইলে এভাবে ঘুমন্ত মানুষের বক্তৃতা শুনতে থাকলে নিজের বুদ্ধির পরে আস্থা থাকবে না।

কমল হাসি-মুখে বলিল, কার বুদ্ধির 'পরে? আমার না নিজের?

দুজনেরই।

কমল বলিল, শুধু রাজেনকেই নয়, কি জানি কেন, সকাল থেকে আজ আমার সকলকে মনে পড়েচে। আশুবাবু, মনোরমা, অক্ষয়, অবিনাশ, নীলিমা, শিবনাথ— এমন কি আমার বাবা—

হরেন্দ্র বাধা দিল, ও চলবে না। আপনি আবার গম্ভীর হয়ে উঠচেন। আপনার বাপ-মা স্বর্গে গেছেন, তাঁদের টানাটানি আমার সইবে না। বরঞ্চ যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কথা, আপনি রাজেনের কথা বলতে চাচ্ছিলেন—তাই বলুন আমি শুনি। সে আমার বন্ধু, তাকে চিনি, জানি, ভালবাসি—আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আশ্রমই করি, আর যাই করি আপনাকে ঠকাবো না, সংসারে আরও পাঁচজনের মত ভালবাসার গল্প শুনতে আমিও ভালবাসি।

কমলের গাম্ভীর্য্য সহসা হাসিতে ভরিয়া গেল, প্রশ্ন করিল, শুধু পরের কথা শুনতেই ভালবাসেন? তার বেশীতে লোভ নেই?

হরেন্দ্র বলিল, না। আমি ব্রহ্মচারীদের পাণ্ডা—অক্ষয়ের দল শুনতে পেলে আমায় খেয়ে ফেলবে।

শুনিয়া কমল পুনশ্চ হাসিয়া বলিল, না, তারা খাবে না, আমি উপায় করে দেবো।

হরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারবেন না। আশ্রম ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গিয়েও আর আমার নিস্তার নেই। অক্ষয় একবার যখন আমাকে চিনেচে, যেখানেই যাই সৎপথে সে আমাকে রাখবেই। বরঞ্চ আপনি নিজের কথা বলুন। রাজেনকে যে ভুলে থাকতে পারবে না—আবার সেইখান থেকে আরম্ভ করুন। কি করে সেই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াকে এতখানি ভালবাসলেন আমার শুনতে সাধ হয়।

কমল কহিল, ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি বারে বারে আপনাকে আপনি করি।

সন্ধান পান না?

না।

পাবার কথাও নয় এবং সত্যি বলে আমার বিশ্বাসও হয় না।

কেন বিশ্বাস হয় না?

সে যাক। মনে হচ্ছে আগে একবার বলেচি। কিন্তু আরও ভাল ক্যানডিডেট আছে। মীমাংসা চূড়ান্ত করার আগে তাদের কেসগুলো একটুখানি নজর দিয়ে দেখবেন। এইটুকু নিবেদন।

কিন্তু কেস্ ত অনুমানে ভর করে' বিচার করা যায় না হরেনবাবু, রীতিমত সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে হয়। সে করবে কে?

তারা নিজেরাই করবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে, হাঁক দিলেই হাজির হয়।

কমল জবাব দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটুখানি হাসিল। তাহার পরে সমাপ্ত ও অসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজগুলো একে একে পরিপাটি ভাঁজ করিয়া একটা বেতের টুক্‌রিতে তুলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনার বোধ করি চা খাবার সময় হয়েচে হরেনবাবু, একটুখানি চা তৈরী করে আনি, আপনি বসুন।

হরেন কহিল, বসেই ত আছি। কিন্তু জানেন ত চা খাবার আমার সময় অসময় নেই, কারণ পেলেই খাই, না পেলে খাইনে। ওর জন্যে কষ্ট পাবার প্রয়োজন নেই। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

স্বচ্ছন্দে।

অনেকদিন আপনি কোথাও যান নি। ওটা কি ইচ্ছে করেই বন্ধ করেচেন?

কমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, না। আমার মনেও হয়নি।

তা হলে চলুন না আজ আশুবাবুর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। তিনি সত্যিই খুব খুশী হবেন। সেই অসুখের মধ্যেই একবার গিয়েছিলেন, এখন তিনি ভাল আছেন। শুধু ডাক্তারের নিষেধ বলে বাইরে আসেন না, নইলে হয়ত একদিন নিজে এসে উপস্থিত হতেন।

কমল বলিল, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। যাওয়া আমারই উচিত ছিল, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে যেতে পারিনি। অন্যায় হয়ে গেছে।

তা হলে আজই চলুন না?

চলুন। কিন্তু সন্ধ্যেটা হোক। আপনি বসুন, চট করে একবাটি চা নিয়ে আসি। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে উভয়ে পথে বাহির হইলে হরেন্দ্র বলিল, একটু বেলা থাকতে গেলেই ভাল হ'তো।

কমল কহিল, হ'তো না। চেনা লোক, কেউ হয়ত দেখে ফেলতো।

দেখলেই বা। ওসব আমি আর এখন গ্রাহ্য করিনে।

কিন্তু আমি এখন গ্রাহ্য করি।

হরেন্দ্র মনে করিল পরিহাস, কহিল, কিন্তু এই চেনা-লোকেরাই যদি শোনে আপনি আমার সঙ্গে একলা বার হতে আজকাল সঙ্কোচ-বোধ করেন, কি তারা ভাবে?

বোধ হয় ভাবে ঠাট্টা করচি।

কিন্তু আপনাকে যে চেনে সে কি অন্য কিছু ভাবতে পারে? বলুন? এবার কমল চুপ করিয়া রহিল।

জবাব না পাইয়া হরেন্দ্র বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েচে জানিনে, সমস্তই দুর্ব্বোধ্য।

কমল বলিল, যা বোঝবার নয় সে না বোঝাই ভাল। রাজেনকে যে ভুলতে পারিনে—এ সবচেয়ে বেশি টের পাই আপনি এলে। তার আশ্রমে স্থান হ'লো না, কিন্তু গাছতলায় থাকলেও তার চলে যেতো, শুধু আমিই থাকতে দিইনি, আদর করে ডেকে এনেছিলুম। আমার ঘরে এলো, কিন্তু কোথাও মন বাধা পেলে না। হাওয়া আলোর মত সব দিক খালি পড়ে রইলো—পুরুষের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলাম। ভাল কি মন্দ, ভেবে দেখবার সময় পাইনি—হয়ত বুঝতে দেরি হবে।

হরেন্দ্র কহিল, এ মস্ত সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা? কেন?

তা জানিনে।

কেহই আর কথা কহিল না—উভয়েই কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই বোধ করি একটু ঘুর-পথ লইয়াছিল, আশুবাবুর বাটীতে আসিয়া যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। খবর দিয়া ঘরে ঢুকিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় হরেন্দ্র আসিতে পারে নাই বলিয়া বেয়ারাকে সুমুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ভাল আছেন?

সে প্রণাম করিয়া কহিল, হাঁ, ভালই আছেন।

তাঁর ঘরেই আছেন?

না, উপরের সামনের ঘরে বসে সবাই গল্প করচেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কমল জিজ্ঞাসা করিল, সবাইটা কারা?

হরেন্দ্র কহিল, বৌদি—আর বোধ হয় কেউ—কি জানি।

পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুজনেই একটু আশ্চর্য্য হইল। এসেন্স ও চুরুটের কড়া গন্ধ একত্রে মিশিয়া ঘরের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নীলিমা উপস্থিত নাই,

আশুবাবু বড় চেয়ারের হাতলে দুই পা ছড়াইয়া চুরুট টানিতেছেন, এবং অদূরে সোফার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া একজন অপরিচিতা মহিলা। ঘরের কড়া আবহাওয়ার মতই কড়া ভাব—বাঙালীর মেয়ে, কিন্তু বাংলা বলার রুচি নাই। হয়ত অভ্যাসও নাই। হরেন্দ্র ও কমল ঘরে পা দিয়াই শুনিয়াছিল তিনি অনর্গল ইংরাজি বলিয়া যাইতেছেন।

আশুবাবু মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। কমলের প্রতি চোখ পড়িতেই সমস্ত মুখ তাঁহার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধ করি একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু হঠাৎ পারিয়া উঠিলেন না। মুখের চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া শুধু বলিলেন, এসো কমল, এসো। অপরিচিতা রমণীকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি আমার একজন আত্মীয়া। পরশু এসেচেন, খুব সম্ভব এখানে কিছুদিন ধরে রাখতে পারব।

একটু থামিয়া বলিলেন, বেলা, ইনি কমল। আমার মেয়ের মত।

উভয় উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

হরেন্দ্র কহিল, আর আমি?

ওহো—তাও ত বটে। ইনি হরেন্দ্র—প্রফেসার অক্ষয়ের পরম বন্ধু। বাকী পরিচয় যথাসময়ে হবে—চিন্তার হেতু নেই হরেন্দ্র। কমলকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কাছে এসো ত কমল, তোমার হাতখানি নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসি। এইজন্য প্রাণটা যেন কিছুদিন থেকে ছটফট করছিল।

কমল হাসিমুখে তাঁহার কাছে গিয়া বসিল এবং দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার মোটা ভারী হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইল।

আশুবাবু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, খেয়ে এসেচো ত?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আশুবাবু ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, জেনেই বা লাভ কি? এ-বাড়িতে খাওয়াতে পারবো না ত।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

২১

বেলার মুখের প্রতি চাহিয়া আশুবাবু একটু হাসিলেন, কহিলেন, কেমন, বর্ণনা আমার মিললো তো? বুড়োবয়সে extravagance বলে উপহাস করা হয়নি, মানলে ত?

মহিলাটি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু কমলের হাতখানি বার কয়েক নাড়া-চাড়া করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মেয়ের বাইরেটা দেখেও মানুষের যেমন আশ্চর্য্য লাগে, ভেতরটা দেখতে পেলে তেমনি অবাক হতে হয়। কেমন হরেন্দ্র, ঠিক নয়?

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, কমল হাসিয়া জবাব দিল, এ ঠিক কি না তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু কেউ যদি আপনাকে extravagant বলে তামাসা করে থাকেন, তিনি যে বেঠিক নন তাতে সন্দেহ নেই। মাত্রাজ্ঞানটা আপনার এ-সংসারে অচল।

ইস, তাই বই কি? বলিয়া আশুবাবু গভীর সস্নেহের স্বরে কহিলেন, এ-বাড়িতে খাওয়াতে তোমাকে কিছুতেই পারবো না জানি, কিন্তু নিজের বাসাতে আজ কি খেলে বল ত?

রোজ যা খাই।

তবু কি শুনিই? বেলা ভাবছিলেন, এও আমি বাড়িয়ে বলেচি।

কমল কহিল, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে আমার অসাক্ষাতে অনেক আলোচনাই হয়ে গেছে?

তা হয়েচে—অস্বীকার করবো না।

রৌপ্য-পাত্রে একখানা ছোট কার্ড লইয়া বেহারা ঘরে ঢুকিল। লেখাটা সকলেরই চোখে পড়িল এবং সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। এ-গৃহে অজিত একদিন বাড়ির ছেলের মতই ছিল, কিন্তু আগ্রায় থাকিয়াও আর আসে না। হয়ত ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি এই না আসার লজ্জা ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই এমনিই একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে শুধু আশুবাবুই নয়, উপস্থিত সকলেই একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখের 'পরে ভারী একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিলেন, তাঁকে এই ঘরে নিয়ে আয়।

খানিক পরে অজিত ঘরে ঢুকিল। পরিচিত ও অপরিচিত এতগুলি লোকের উপস্থিতির সম্ভাবনা সে আশঙ্কা করে নাই।

আশুবাবু কহিলেন, বসো অজিত। ভাল আছ?

অজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার শরীরটা এখন কেমন আছে? ভাল মনে হচ্ছে ত?

আশুবাবু বলিলেন, অসুখটা সেরেচে বলে ভরসা পাচ্চি।

পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর এইখানেই থামিল। কমল না থাকিল হয়ত আরও দুই-একটা কথা চলিতে পারিত, কিন্তু চোখাচোখি হইবার ভয়ে অজিত সেদিকে মুখ তুলিতে সাহস করিল না। মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পর হরেন্দ্র প্রথমে কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সোজা বাসা থেকে এখন আসচেন?

কিছু একটা বলিতে পাইয়া অজিত বাঁচিয়া গেল। বলিল, না, ঠিক সোজা আসতে পারিনি, আপনার সন্ধানে একটু ঘুর-পথেই আসতে হয়েচে।

আমার সন্ধানে? প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমার নয়, আর একজনের। তিনি রাজেনের খোঁজে দুপুর থেকে বোধ করি বার-চারেক উঁকি মেরে গেলেন। বসতে বলেছিলাম। রাজি হলেন না। স্থির হয়ে অপেক্ষা করাটা হয়ত ধাতে সয় না।

হরেন্দ্র শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকটি কে? দেখতে কেমন? বললেন না কেন সে এখানে নেই?

অজিত কহিল, সে সংবাদ তাঁকে দিয়েচি। বোধ হয় বিশ্বাস করলেন না।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্ন-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কমলকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিবা তার আশুবাবুর 'পরে দিয়া প্রস্থান করিল। সে চলিয়া গেলে আশুবাবু বলিলেন, কমল, এই রাজেন ছেলেটাকে আমি দু-তিনবারের বেশী দেখিনি · বিপদে না পড়লে তার সাক্ষাৎ মেলে না, কিন্তু মনে হয় তাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কি যেন একটা মহামূল্য জিনিস সে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। অথচ হরেন্দ্রর মুখে শুনি সে ভারী wild—পুলিশে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে—ভয় হয় কোথায় কি একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বসবে, হয়ত খবরও একটা পাবো না—এই দেখ না হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হয়েচে কেউ খুঁজে পাচ্চে না।

কমল প্রশ্ন করিল, হঠাৎ যদি খবর পান সে বি দে পড়েচে কি করেন?

আশুবাবু বলিলেন, কি করি সে জবাব শুধু তখনই দেওয়া যায়—এখন নয়। অসুখের সময় নীলিমা আর আমি বহু কাহিনীই তার হরেন্দ্রর কাছ থেকে শুনেচি। পরার্থে আপনাকে সত্যি করে বিলিয়ে দেওয়ার স্বরূপটা যে কি—শুনতে শুনতে যেন তার ছবি দেখতে পেতাম! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তার কোন বিপদ না ঘটে।

প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে সকলে বোধ হয় এ-প্রার্থনায় যোগ দিল।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাকে আজ ত দেখতে পেলুম না? বোধ করি কাজে ব্যস্ত আছেন?

আশুবাবু কহিলেন, কাজের লোক, দিনরাত কাজেই ব্যস্ত থাকেন সত্যি, কিন্তু আজ শুনতে পেলাম মাথা ধরে বিছানা নিয়েচেন। শরীরটা বোধ হয় একটু বেশী রকমই খারাপ হয়েচে, নইলে এ তাঁর স্বভাব নয়। কোন মানুষই যে অবিশ্রান্ত এত সেবা, এত পরিশ্রম করতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, অবিনাশের সঙ্গে আলাপ আগ্রায়। মাঝে মাঝে আসি যাই—কতটুকুই বা পরিচয়, অথচ আজ ভাবি সংসারে আপন-পর বলে যে একটা কথা আছে সে কত অর্থহীন। দুনিয়ায় আপন-পর কেউ নেই কমল, স্রোতের টানে কে যে কখন কাছে আসে, আর কে যে ভেসে দূরে যায়—তার কোন হিসাব কেউ জানে না।

কথাটা যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিসের দুঃখে বলা হইল তাহা শুধু সেই অপরিচিতা রমণী বেলা ব্যতীত অপর দুজনেই বুঝিল। আশুবাবু কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, এই রোগ থেকে উঠে পর্য্যন্ত সংসারে অনেক জিনিসই যেন আর একরকম চেহারায় চোখে ঠেকে। মনে হয়, কিসের জন্যই বা এত টানাটানি, এত বাঁধাবাঁধি, এত ভাল-মন্দর বাদানুবাদ—মানুষে অনেক ভুল, অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও তাকে বহু যুগ ধরে অনেক অজানা সত্য আবিষ্কার করতে হবে, তবে যদি একদিন সে সত্যকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আনন্দ ত নয়, নিরানন্দই যেন তার সভ্যতা ও ভদ্রতার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেচে।

কমল বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য যে নিঃসংশয়ে বুঝিতেছে তাহা নয়—যেন কুয়াশার মধ্যে আগন্তুকের মুখ দেখা। কিন্তু পায়ের চলন অত্যন্ত চেনা।

আশুবাবু আপনিই থামিলেন। বোধ হয় কমলের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁহাকে নিজের দিকে সচেতন করিল, বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে কমল, আর একদিন এসো।

আসবো। আজ যাই।

এসো। গাড়িটা নীচেয় আছে, তোমাকে পৌছে দেবে বলেই বাসদেওকে এখনো ছুটি দিইনি। অজিত, তুমি কেন সঙ্গে যাও না, ফেরবার পথে তোমাদের আশ্রমে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে?

উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বেলা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির কাছে আসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আজ সময় হ'লো না, কিন্তু এবার যেদিন দেখা হবে আমি ছাড়বো না।

কমল হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু ভয় হয় পরিচয় পেয়ে না আপনার মত বদলায়।

গাড়ির মধ্যে দুজনে পাশাপাশি বসিল। রাস্তায় মোড় ফিরিলে কমল কহিল, সেদিনের রাতটাও এমনি অন্ধকার ছিল—মনে পড়ে?

পড়ে।

সেদিনের পাগলামি?

তাও মনে পড়ে।

আমি রাজি হয়েছিলুম সে মনে আছে।

অজিত হাসিয়া কহিল, না। কিন্তু আপনি যে বিদ্রূপ করেছিলেন সে মনে আছে?

কমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বিদ্রূপ করেছিলুম? কই না!

নিশ্চয় করেছিলেন।

কমল কহিল, তা হলে আপনি ভুল বুঝেছিলেন। সে যাক, আজ ত আর করচিনে—চলুন না, আজ দুজনে চলে যাই?

ছ্যাৎ। আপনি ভারি দুষ্টু।

কমল হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দুষ্টু কিসের? আমার মত এমন শান্ত সুবোধ কে আছে বলুন ত? হঠাৎ হুকুম করলেন, কমল, চল যাই, তখ্খুনি রাজি হয়ে বললুম, চলুন।

কিন্তু সে ত শুধু পরিহাস।

কমল বলিল, বেশ, তা না হয় পরিহাসই হ'লো, কিন্তু হঠাৎ অপরাধটা কি করেচি বলুন ত? ডাকতেন তুমি বলে, আরম্ভ করেচেন আপনি বলতে। কত দুঃখে কষ্টে দিন চলে—আপনাদেরই জামা-কাপড় সেলাই করে কোন মতে হয়ত দুটি খেতে পাই, অথচ আপনার টাকার অবধি নেই—একটাদিনও কি খবর নিয়েচেন? মনোরমা এ-দুঃখে পড়লে কি আপনি সইতেন? দিন রাত খেটে খেটে কত রোগা হয়ে গেছি দেখুন ত? এই বলিয়া সে নিজের বাঁ হাতখানি অজিতের হাতের উপর রাখিতেই আচম্বিতে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুটে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু কমল সহসা হাত টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ড্রাইভার, রোকো রোকো—এ যে পাগলা-গারদের সামনে এসে পড়েচি। গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারা যায়নি।

অজিত কহিল, হাঁ, দোষ অন্ধকারের। শুধু সান্ত্বনা এই যে, হাজার অবিচারেও ও-বেচারার প্রতিবাদ করবার জো নেই। সে অধিকারে ও বঞ্চিত। এই বলিয়া সে

একটু হাসিল। শুনিয়া কমল হাসিল, কহিল, তা বটে। কিন্তু বিচার জিনিসটাই ত সংসারে সব নয়, এখানে অবিচারেরও স্থান আছে বলে আজও দুনিয়া চলচে, নইলে কোন্‌কালে সে থেমে যেতো। ড্রাইভার, থামাও।

অজিত কবাট খুলিয়া দিতে কমল রাস্তায় নামিয়া আসিয়া কহিল, অন্ধকারের ওর চেয়েও বড় অপরাধ আছে অজিতবাবু, একলা যেতে ভয় করে।

এই ইঙ্গিতে অজিত নিঃশব্দে পাশে নামিয়া দাঁড়াইতে কমল ড্রাইভারকে বলিল, এবার তুমি বাড়ি যাও, এঁর ফিরে যেতে দেরি হবে।

সে কি কথা! এত রাত্রে এ-অঞ্চলে আমি গাড়ি পাব কোথায়?

তার উপায় আমি করে দেব।

গাড়ি চলিয়া গেল। অজিত কহিল, কোন ব্যবস্থাই হবে না জানি, অন্ধকারে তিন-চার মাইল হাঁটতে হবে। অথচ আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারতাম।

পারতেন না। কারণ আপনাকে না খাইয়ে ওই আশ্রমের অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি যেতে দিতে পারতুম না। আসুন।

বাসায় দাসী আজ আলো জ্বালিয়া অপেক্ষা করিয়া ছিল, ডাকিতেই দ্বার খুলিয়া দিল। উপরে গিয়া কমল সেই সুন্দর আসনখানি পাতিয়া অজিতকে বসিতে দিল। আয়োজন প্রস্তুত ছিল, স্টোভ জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া অদূরে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এমনি আর একদিনের কথা মনে পড়ে।

নিশ্চয় পড়ে।

আচ্ছা, তার সঙ্গে আজ কোথায় তফাৎ বলতে পারেন? বলুন ত দেখি?

অজিত ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কোনখানে কি ছিল এবং নাই—মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমল হাসিমুখে কহিল, ওদিকে সারারাত খুঁজলেও পাবেন না। আর একদিকে সন্ধান করতে হবে।

কোনদিকে বলুন তো?

আমার দিকে।

অজিত হঠাৎ কি একপ্রকার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল, কোনদিনই আপনার মুখের পানে আমি খুব বেশী করে চেয়ে দেখিনি। অন্য সবাই পেরেচে, শুধু আমিই কি জানি কেন পেরে উঠিনি।

কমল কহিল, অপরের সঙ্গে আপনার প্রভেদ এইখানে। তারা যে পারতো তার কারণ, তাদের দৃষ্টির মধ্যে আমার প্রতি সম্ভ্রম-বোধ ছিল না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, আমি স্থির করেছিলুম, যেমন করে হোক আপনাকে খুঁজে বার করবোই। আশুবাবুর বাড়িতে আজই যে দেখা হবে এ আশা ছিল না, কিন্তু দৈবাৎ দেখা হয়ে যখন গেল, তখনই জানি ধরে আনবোই। খাওয়ানো একটা ছোট উপলক্ষ—তাই ওটা শেষ হলেই ছুটি পাবেন না—আজ রাত্রে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না—এ বাড়িতেই বন্ধ করে রাখবো।

কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি?

কমল কহিল, লাভের কথা পরে বলবো, কিন্তু আমাকে 'আপনি' বললে আমি সত্যিই ব্যথা পাই। একদিন 'তুমি' বলে ডাকতেন, সেদিনও বলতে আমি সাধিনি, নিজে ইচ্ছে করেই ডেকেছিলেন। আজ সেটা বদলে দেবার মত কোনও অপরাধও করিনি। অভিমান করে সাড়া যদি না দিই, আপনি নিজেও কষ্ট পাবেন।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা বোধ হয় পাবো।

কমল কহিল, বোধ হয় নয়, নিশ্চয় পাবেন। আপনি আগ্রায় এসেছিলেন মনোরমার জন্য। কিন্তু সে যখন অমন করে চলে গেল, তখন সবাই ভাবলে আর একদণ্ডও আপনি এখানে থাকবেন না। কেবল আমি জানতুম আপনি যেতে পারবেন না। আচ্ছা, আমিও যে আপনাকে ভালবাসি এ-কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

না, করিনে।

নিশ্চয় করেন। তাই আপনার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ আছে।

অজিত কৌতূহলী হইয়া বলিল, অনেক নালিশ? একটা শুনি।

কমল বলিল, শোনাবো বলেই ত যেতে দিইনি। প্রথমে নিজের কথাটা বলি। উপায় নেই বলে দুঃখী-গরীবদের কাপড় সেলাই করে নিজের খাওয়া-পরা চালাই—এ আমার সয়। কিন্তু দায়ে পড়েচি বলে আপনারও জামা-সেলাই করার দাম নেবো—এও কি সয়?

কিন্তু তুমি ত কারও দান নাও না।

না, দান আমি কারও নিইনে, এমন কি আপনারও না। কিন্তু দান করা ছাড়া দেবার কি সংসারে আর কোন পথ খোলা নেই? কেন এসে জোর করে বললেন না, কমল, এ-কাজ তোমাকে আমি করতে দেবো না। আমি তার কি জবাব দিতুম? আজ যদি কোন দুর্বিপাকে আমার খেটে খাবার শক্তি যায়, আপনি বেঁচে থাকতে কি আমি পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবো।

কথাটার ব্যথায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া দিল। অজিত বলিল, এমন হতেই পারে না কমল, আমি বেঁচে থাকতে এ অসম্ভব। তোমার সম্বন্ধে আমি একটা দিনও এমন

করে ভেবে দেখিনি। এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না যে, যে-কমলকে আমরা সবাই জানি সে-ই তুমি।

কমল কহিল, সবাই যা ইচ্ছে জানুক, কিন্তু আপনি কি কেবল তাদেরই একজন? তার বেশী নয়?

এ-প্রশ্নের উত্তর আসিল না, বোধ করি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই; এবং ইহার পরে উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। হয়ত অপরকে প্রশ্ন করার চেয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন দুজনেই বেশী করিয়া অনুভব করিল।

কি-ই বা রান্না, শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। আহারে বসিয়া অজিত গম্ভীর হইয়া বলিল, অথচ মজা এই যে, যার যত টাকাকড়ি থাকুক—তোমার উপার্জ্জনের অন্ন হাত পেতে না খেয়ে কারও পরিত্রাণ নেই। অথচ নিজে তুমি কারও নেবে না, কারও খাবে না। মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না।

কমল হাসিয়া কহিল, আপনারা খান কেন? তা ছাড়া কবেই বা আপনি মাথা খুঁড়লেন?

অজিত বলিল, মাথা খোঁড়বার ইচ্ছে বরাবর হয়েচে। আর তোমার খাই শুধু তোমার জবরদস্তির সঙ্গে পেরে উঠিনে বলে। আজ আমি যদি বলি, কমল, এখন থেকে তোমার সমস্ত ভার নিলাম, এ উঞ্ছবৃত্তি আর ক'রো না, তুমি তখনি হয়ত এমনি কটু কথা বলে উঠবে যে আমার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্য বার হবে না।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা বলেছিলেন কোনদিন?

মনে হয় যেন বলেছিলাম।

আর আমি শুনিনি সে-কথা?

না।

তা হলে শোনবার মত করে বলেননি। হয়ত মনের মধ্যে শুধু ইচ্ছে হয়েই ছিল—মুখ দিয়ে তা প্রকাশ পায়নি।

আচ্ছা, ধর আজই যদি বলি।

তা হলে আমিও যদি বলি, না।

অজিত হাতের গ্রাস নামাইয়া রাখিয়া কহিল, এই ত! তোমাকে একটাদিনও আমরা বুঝতে পারলাম না; যেদিন তাজের সুমুখে প্রথম দেখি সেদিনও যেমন তোমার কথা বুঝিনি, আজও তেমনি আমাদের সকলের কাছে তুমি রহস্যই রয়ে গেলে। এইমাত্র নিজে বললে আমার ভার নিন—আবার তখনি বললে, না।

কমল হাসিয়া কহিল, এমনিধারা একটা 'না' আপনি বলুন ত দেখি? বলুন ত যা খেয়েচেন আর কোনদিন খাবেন না—কেমন আপনার কথা থাকে।

অজিত কহিল, থাকবে কি করে? না খাইয়ে তুমি ত ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু এবার কমল আর হাসিল না। শান্তভাবে বলিল, আমার ভার নেবার সময় আজও আপনার আসেনি। যেদিন আসবে সেদিন আমার মুখ দিয়েও 'না' বেরুবে না। রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনি খেয়ে নিন।

নিই। সেদিন কখনো আসবে কি-না বলে দিতে পার?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, সে আমি পারিনে। জবাব আপনাকে নিজেই একদিন খুঁজে নিতে হবে।

সে শক্তি আমার নেই। একদিন অনেক খুঁজেচি কিন্তু পাইনি। জবাব তোমার কাছে পাবো, এই আশা করে আজ থেকে আমি হাত পেতে থাকব। বলিয়া অজিত নিঃশব্দে খাইতে লাগিল।

খানিক পরে কমল জিজ্ঞাসা করিল, এত জায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ হরেন্দ্রের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন কেন?

অজিত কহিল, কোথাও ত থাকা চাই; তুমি নিজেই ত জানো আগ্রা ছেড়ে আমার যাবার জো ছিল না।

জানি তা হলে?

হাঁ, জানো বই কি।

আর তাই যদি সত্যি, সোজা, আমার কাছে চলে এলেন না কেন?

যদি আসতাম, সত্যিই কি স্থান দিতে?

সত্যি ত আর আসেননি? সে যাক, কিন্তু হরেন্দ্রের আশ্রমে ত কষ্টের সীমা নেই —সেই ওদের সাধনা—কিন্তু অত আপনার কষ্ট সইল কি করে?

জানিনে কি করে সইল, কিন্তু আজ আমার ও-কথা মনেও হয় না। এখন ওদেরই আমি একজন। হয়ত এই আমার সমস্ত ভবিষ্যতের জীবন। এতদিন চুপ করেও ছিলাম না। লোক পাঠিয়ে স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেচি—তিন-চারটি আশ্রমের আশাও পেয়েচি—ইচ্ছে আছে নিজে একবার বার হব।

এ পরামর্শ আপনাকে দিলে কে? হরেন্দ্র বোধ হয়?

অজিত কহিল, যদি দিয়েও থাকেন নিষ্পাপ হয়েই দিয়েচেন। দেশের সর্ব্বনাশ যারা চোখে দেখেচে—এর দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দুঃখ, এর ধর্ম্মহীনতার গভীর গ্লানি, এর দৌর্ব্বল্যের একান্ত ভীরুতা—

কমল বাধা দিয়া বলিল, হরেন্দ্র এ-সব দেখেচেন অস্বীকার করিনে, কিন্তু আপনার ত শুধু শোনা কথা। নিজের চোখে কোন কিছু দেখবার ত আজও সুযোগ পাননি?

কিন্তু এ-সবই ত সত্যি?

সত্যি নয় তা বলিনে, কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় কি এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা?

নয় কেন? ভারতবর্ষ বলতে ত শুধু উত্তরে হিমালয় এবং অপর তিন দিকে সমুদ্র-

ঘেরা কতকটা ভূখণ্ড মাত্র নয়? এর প্রাচীন সভ্যতা, এর ধর্মের বিশিষ্টতা, এর নীতির পবিত্রতা, এর ন্যায়-নিষ্ঠার মহিমা—এই ত ভারত, তাই ত এর নাম দেবভূমি—একে নিরতিশয় হীনতা থেকে বাঁচাবার তপস্যা ছাড়া আর কি কোন পথ আছে? ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী নিষ্কলুষ ছেলেদের—জীবনে সার্থক হবার—ধন্য হবার -

কমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার খাওয়া হয়েচে, হাত-মুখ ধুয়ে ও-ঘরে চলুন—আর না।

তুমি খাবে না?

আমি কি দুবেলা খাই যে আজ খাব? উঠুন।

কিন্তু আশ্রমে আমাকে ত ফিরে যেতে হবে।

না হবে না, ও-ঘরে চলুন। অনেক কথা আমার শোনবার আছে।

আচ্ছা চলো। কিন্তু বাইরে থাকবার আমাদের বিধি নেই, যত রাত্রিই হোক আশ্রমে আমাকে ফিরতেই হবে।

কমল বলিল, সে বিধি দীক্ষিত আশ্রমবাসীদের, আপনার জন্য নয়।

কিন্তু লোকে বলবে কি?

লোকের উল্লেখে কোনদিনই কমলের ধৈর্য্য থাকে না, কহিল, লোকেরা আপনাকে শুধু নিন্দেই করবে, রক্ষে করতে পারবে না। যে পারবে তার কাছে আপনার ভয় নেই—তাদের চেয়ে আমি ঢের বেশি আপনার। সেদিন সঙ্গে যেতে আমাকে ডেকেছিলেন—কিন্তু পারিনি, আজ আর না পারলে আমার চলবে না। চলুন ও-ঘরে, আমাকে ভয় নেই। পুরুষের ভোগের বস্তু যারা—আমি তাদের জাত নই। উঠুন।

এ-ঘরে আসিয়া কমল সম্পূর্ণ নূতন শয্যা-বস্ত্র দিয়া খাটের উপর পরিপাটি করিয়া বিছানা করিয়া দিল এবং নিজের জন্য মেঝের উপর যেমন-তেমন গোছের আর একটা বিছানা পাতিয়া রাখিয়া বলিল, আসচি। মিনিট-দশেকের বেশি দেরি হবে না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

না।

তা হলে ঠেলে তুলে দেব।

তার দরকার হবে না কমল, ঘুম আমার চোখ থেকে উবে গেছে।

আচ্ছা, সে পরীক্ষা পরে হবে, বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রান্নার পাত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখা, উচ্ছিষ্ট বাসন বারান্দায় বাহির করিয়া দেওয়া—দাসী বহুক্ষণ চলিয়া গেছে, নীচে সিঁড়ির কপাট বন্ধ করা—গৃহস্থালীর এমনি সব ছোট-খাটো কাজ তখনো বাকী, সে-সব সারিয়া তবে তাহার ছুটি।

কমলের সযত্ন-রচিত শুভ্র সুন্দর শয্যাটির 'পরে বসিয়া একাকী ঘরের মধ্যে হঠাৎ

তাহার দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বিশেষ কোন গভীর হেতু ছিল তাহা নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা ভালো-লাগার তৃপ্তি। হয়ত একটু কৌতূহল মিশানো, কিন্তু আগ্রহের উত্তাপ নাই—শুধু একটি শান্ত আনন্দের মধুর স্পর্শ যেন নিঃশব্দে সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

অজিত ধনীর সন্তান, আজন্ম বিলাসের মধ্যেই প্রতিপালিত; কিন্তু হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ভর্ত্তি হওয়া অবধি দৈন্য ও আত্ম-নিগ্রহের সুদুর্গম পথে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্ম্মোপলব্ধির একান্ত সাধনা এদিক হইতে দৃষ্টি তাহার অপসারিত করিয়াছিল। হঠাৎ চোখে পড়িল হলুদ রঙের সুতা দিয়া তৈরি বালিশের অড়ের চারিধারে ছোট গুটি-কয়েক চন্দ্রমল্লিকা ফুল। বিছানার চাদরের যে-কোণটি ঝুলিয়া আছে তাহাতে শাদা রেশম দিয়া বোনা কোন একটা অজানা লতার একটুখানি ছবি। এইটুকু শিল্প-কর্ম্ম—সামান্যই ব্যাপার। কত লোকের ঘরেই ত আছে। অবসরকালে কমল নিজের হাতে সেলাই করিয়াছে। দেখিয়া অজিত মুগ্ধ হইয়া গেল। হাতে করিয়া সেইটি নাড়া-চাড়া করিতেছিল, কমল বাহিরের কাজ সারিয়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বেশ ত!

কমল একটু আশ্চর্য্য হইল—কি বেশ? ঐ লতাটুকু?

হাঁ, আর এই হলদে রঙের ফুলগুলি। তুমি নিজে করেচ, না?

কমল হাসিমুখে বলিল, চমৎকার প্রশ্ন। নিজে নয় ত কি কারিগর ডেকে তৈরি করিয়েচি? আপনার চাই ঐ-রকম?

না না না -আমার চাইনে। আমি কি করব?

তাহার এই ব্যাকুল ও সলজ্জ প্রত্যাখ্যানে কমল হাসিয়া কহিল, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে শোবেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, কমল রাত জেগে তৈরি করে দিয়েচে।

ছ্যাৎ!

ছ্যাৎ কেন? নিজের জন্য এ-সব জিনিস কেউ তৈরি করে না, করে আর এক জনের জন্য। কষ্ট করে ঐ ফুলগুলি যে সেলাই করেছিলুম সে কি নিজে শোবো বলে? একদিন একজন আসবেই—শুধু তারই জন্য এ-সব তোলা ছিল। সকালে যখন চলে যাবেন, সমস্ত আপনার সঙ্গে দেব।

এবার অজিত নিজেও হাসিল, কহিল, আচ্ছা কমল, আমি কি এতই বোকা?

কেন?

তুমি আমাকেই মনে করে এ-সব তৈরি করেছিলে এও বিশ্বাস করব?

কেন করবেন না?

করব না সত্যি নয় বলে।

কিন্তু সত্যি বললে বিশ্বাস করবেন বলুন ?

নিশ্চয় করব। তোমার পরিহাসের কোন সীমা নেই—কোথাও বাধে না। সেই মোটরে বেড়াবার কথা মনে হলে আমার লজ্জার অবধি থাকে না। সে আলাদা। কিন্তু যা পরিহাস নয়, সে যে তুমি কোন কিছুর জন্যেই মিথ্যে বলতে পারো না এ আমি জানি।

তা হলে যদি বলি বাস্তবিক পরিহাস করিনি, সত্যি কথাই বলচি, বিশ্বাস করবেন ?

নিশ্চয় করব।

কমল কহিল, তা যদি করেন আজ আপনাকে সত্যি কথা বলব। তখনো রাজেন আসেনি। অর্থাৎ আশ্রমে স্থান না পেয়ে তখনো সে আমার গৃহে আশ্রয় নেয়নি। আমারো ত সেই দশা। আপনারা সবাই যখন আমাকে ঘৃণায় দূর করে দিলেন, এই বিদেশে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যখন আর পথ রইল না—সেই গভীর দুঃখের দিনের ঐ শিল্প-কাজটুকু। সেদিন ঠিক কাকে স্মরণ করে যে করেছিলুম আমি কোনদিন হয়ত জানতে পারতুম না। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ বিছানা পাততে এসে হঠাৎ মনে হ'লো, না না, শুতে নয়। যাতে কেউ কোনদিন শুয়েচে তাতে আপনাকে আমি কোনমতে শুতে দিতে পারিনে।

কেন পারো না ?

কি জানি, কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঐ কথা বলে দিয়ে গেল। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, হঠাৎ স্মরণ হ'লো ঐগুলি বাক্সে তোলা আছে। আপনি তখন বাইরে মুখ ধুচ্ছিলেন, এখনি এসে পড়বেন, তাড়াতাড়ি খুলে এনে পাততে গিয়ে আজ প্রথম টের পেলুম সেদিন যাকে ভেবে রাত্রি জেগে ফুল-লতা-পাতা এঁকেছিলুম সে আপনি।

অজিত কথা কহিল না। শুধু একটা আরক্ত আভা তাহার মুখের 'পরে দেখা দিয়া চক্ষের নিমিষে নিবিয়া গেল।

কমল নিজেও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুপ করে কি ভাবচেন বলুন ত ?

অজিত কহিল, শুধু চুপ করেই আছি, ভাবতে পারচিনে।

তার কারণ ?

কারণ। তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় বয়ে গেল। শুধুই ঝড়—না এলো আনন্দ, না এলো আশা।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। অজিত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কমল, একটা গল্প বলি শোনো। আমার মাকে একবার আমাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ জিউ পূজোর

ঘরে মূর্ত্তি ধরে দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে খাবার নিয়ে সুমুখে বসে খেয়েছিলেন—এ তাঁর নিজের চোখে দেখা। তবু বাড়ির কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। সবাই বুঝলে এ তাঁর স্বপ্ন, কিন্তু এই অবিশ্বাসের দুঃখ তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যায়নি। আজ তোমার কথা শুনে আমার সেই কথা মনে পড়চে। তুমি তামাসা করোনি জানি, কিন্তু আমার মায়ের মতো তোমারো কোথাও মস্ত ভুল হয়েচে। মানুষের জীবনে এমন বহুকাল যায়, নিজের সম্বন্ধে সে অন্ধকারেই থাকে। হয়ত হঠাৎ একদিন চোখ খোলে। আমারও তেমনি। এতদিন পৃথিবীর কত জায়গায় ত ঘুরেচি, শুধু এই আগ্রায় এসে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম। আমার থাকার মধ্যে আছে শুধু টাকা, বাবার দেওয়া। এ-ছাড়া এমন কিছুই নিজের নেই যে আমারও অজ্ঞাতসারে তুমি আমাকেই ভালবাসতে পার।

কমল কহিল, টাকার জন্য ভাবনা নেই, আশ্রমবাসীরা একবার যখন সন্ধান পেয়েচে তখন সে ব্যবস্থা তারাই করবে, এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু অন্য সকল দিকেই যে আপনি এমন নিঃস্ব এ-খবর কি ছাই আগে পেয়েচি! তা হলে কি কখনো ভালবাসতে যেতুম? তা ছাড়া আপনার স্বভাবের ভাল-মন্দটুকু বুঝে দেখবার সময় পেলুম কই? মনের মধ্যে ছিল শুধু একটা সন্দেহ, তার ঠিকানা পেলুম না, কেবল এই ত মিনিট-দশেক হ'লো একলা ঘরে বিছানার সুমুখে দাঁড়িয়ে, অকস্মাৎ ঠিক খবরটি কে এসে আমার কানে কানে দিয়ে গেল।

অজিত গভীর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সত্যি বলচ মাত্র মিনিট দশেক? কিন্তু সত্যি হলে এ তো পাগলামি।

কমল বলিল, পাগলামিই ত। তাই ত আপনাকে বলেছিলুম আমাকে আর কোথাও নিয়ে চলুন। বিবাহ করে ঘর-সংসার করুন এ-ভিক্ষে ত চাইনি?

অজিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল, ভিক্ষে বলচ কেন কমল, এ ভিক্ষে চাওয়া নয়, এ তোমার ভালবাসার অধিকার। কিন্তু অধিকারের দাবী তুমি করলে না, চাইলে শুধু তাই যা বুদ্‌বুদের মত স্বল্পায়ু এবং তারই মত মিথ্যে।

কমল কহিল, হতেও ত পারে এর পরমায়ু কম, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে হবে কেন? আয়ুর দীর্ঘতাকেই যারা সত্যি বলে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাদের কেউ নয়?

কিন্তু এ আনন্দের যে কোন স্থায়িত্ব নেই কমল!

না-ই থাক্‌। কিন্তু গাছের ফুল শুকাবে বলে সুদীর্ঘস্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুল-দানিতে সাজিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না। আপনাকে আরও একবার ঠিক এই কথাই বলেছিলুম যে, কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই ত মানব-জীবনের চরম সঞ্চয়।

তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা করে মরে।

অজিতের মনে পড়িল ঠিক এই কথাই সে ইহার কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছে। শুধু মুখের কথা নয়, ইহাই তাহার অন্তরের বিশ্বাস। শিবনাথ তাহাকে বিবাহ করে নাই, ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু এ লইয়া কমল একটাদিনের জন্যও অভিযোগ করে নাই। কেন করে নাই? আজ এই প্রথমদিনের জন্য অজিত নিঃসংশয়ে বুঝিল এই ফাঁকির মধ্যে তাহার নিজেরও সায় ছিল। পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব-জাতির এই প্রাচীন ও পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি এতবড় অবজ্ঞায় অজিতের মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার কাছে গর্ব্ব করা আমার সাজে না। কিন্তু তোমার কাছে আর কিছুই গোপন করব না। এরা বলেন, সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই পুরুষের সবচেয়ে বড় পুরুষার্থ। বুদ্ধির দিক দিয়ে এ আমি বিশ্বাস করি এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই এ-বিষয়েও আমি নিঃসংশয়। কাঞ্চন আমার যথেষ্ট আছে, তাতে লোভ নেই, কিন্তু সমস্ত জীবনে ভালবাসার কেউ নেই, কেউ কখনো থাকবে না, মনে হলে বুক যেন শুকিয়ে ওঠে। ভয় হয়, অন্তরের এ দুর্ব্বলতা হয়ত আমি মরণকাল পর্য্যন্ত জয় করতে পারবো না। অদৃষ্টে তাই যদি কখনো ঘটে, আশ্রম ত্যাগ করে আমি চলে যাবো। কিন্তু তোমার আহ্বান তার চেয়েও মিথ্যে। ও-ডাকে সাড়া দিতে আমি পারব না।

একে মিথ্যে বলচেন কেন?

মিথ্যেই ত। মনোরমা সত্যিই কখনো আমাকে ভালবাসেনি, তার আচরণে বোঝা যায়, কিন্তু শিবনাথের প্রতি শিবানীর ভালবাসা ত আমি নিজের চোখেই দেখেচি। সেদিন তার যেন সীমা ছিল না, কিন্তু আজ তার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেচে।

কমল কহিল, আজ যদি তা গিয়েই থাকে, সেদিন কি শুধু আমার ছলনাই আপনার চোখে পড়েছিল?

অজিত বলিল, সে তুমিই জানো, কিন্তু আজ মনে হয় নারী-জীবনে এর চেয়ে মিথ্যে বুঝি আর নেই।

কমলের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কহিল, নারী-জীবনের সত্যাসত্য নির্দ্দেশের ভার নারীর 'পরেই থাকে। সে বিচারের দায়িত্ব পুরুষের নিয়ে কাজ নেই —মনোরমারও না, কমলেরও না। এমনি করেই সংসারে চিরদিন ন্যায়-বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ কলুষিত হয়ে গেছে। তাই এই মিথ্যে-মামলার আর নিষ্পত্তি হতে পেলে না। অবিচারে কেবল একপক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না

অজিতবাবু, দুপক্ষের সর্ব্বনাশ করে। সেদিন শিবনাথ যা পেয়েছিলেন দুনিয়ার কম পুরুষের ভাগ্যেই জোটে, কিন্তু আজ তা নেই। কেন নেই এই তর্ক তুলে পুরুষের মোটা হাতে, মোটা দণ্ড ঘুরিয়ে শাসন করা চলে, কিন্তু ফিরে পাওয়া যায় না। সেদিনের থাকাটা যেমন সত্যি, আজকের না-থাকাটাও ঠিক তত বড়ই সত্যি। শঠতার ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ে একে ঢাকা দিতে লজ্জাবোধ করেচি বলে পুরুষের বিচারে এই হ'লো নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় মিথ্যে? এই সুবিচারের আশাতেই আমরা আপনাদের মুখ চেয়ে থাকি?

অজিত উত্তর দিল, কিন্তু উপায় কী? যা এমন ক্ষণস্থায়ী, এমন ভঙ্গুর, তাকে এর বেশী সম্মান মানুষ দেবে কেন?

কমল বলিল, দেবে না জানি। আমার উঠোনের ধারে যে ফুল ফোটে তার জীবন একবেলার বেশী নয়। তার চেয়ে ওই মশলা-পেশা নোড়াটা ঢের টিকসই, ঢের দীর্ঘস্থায়ী। সত্য যাচাই করার এর চেয়ে মজবুত মানদণ্ড আপনারা পাবেন কোথায়?

কমল, এ যুক্তি নয়, শুধু তোমার রাগের কথা।

রাগ কিসের অজিতবাবু? কেবল স্থায়িত্ব নিয়েই যাদের কারবার তারা এমনি করেই মূল্য ধার্য্য করে। আমার আহ্বানে যে আপনি সাড়া দিতে পারেননি তার মূলেও এই সংশয়। চিরদিনের দাসখৎ লিখে যে বন্ধন নেবে না তাকে বিশ্বাস করবেন আপনি কি দিয়ে? ফুল যে বোঝে না তার কাছে ঐ পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশী সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাওয়ার শঙ্কা নেই, ওর আয়ু একটা বেলার নয় ও নিত্য কালের। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ও চিরদিন রগড়ে মশলা পিশে দেবে—ভাত গেলবার তরকারির উপকরণ—ওর প্রতি নির্ভর করা চলে! ও না থাকলে সংসার বিস্বাদ হয়ে ওঠে।

অজিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, এ বিদ্রূপ কিসের কমল?

কমলের কানে বোধ করি এ প্রশ্ন গেল না, সে যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, মানুষ বোঝে না যে হৃদয়-বস্তুটা লোহার তৈরী নয়। অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাতে ভর দেওয়া চলে না। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু এই তার ধর্ম্ম, এই তার সত্য। অথচ এ-কথা বলাও চলে না, স্বীকার করাও যায় না। এর চেয়ে বড় দুর্নীতি সংসারে আর আছে কি? তাই ত কেউ ভেবেই পেলে না শিবনাথকে কি করে আমি নিঃশেষে ক্ষমা করতে পারি। কেঁদে কেঁদে যৌবনের যোগিনী হওয়াটা তাঁরা বুঝতেন, কিন্তু এ তাঁদের সইল না। অরুচি ও অবহেলায় সমস্ত মন তাঁদের তেতো হয়ে গেল। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ করে তোলে। এই হ'লো মিথ্যে, আর বাইরের শুকনো লতা মরে গিয়েও গাছের সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, সেই হ'লো সত্য?

অজিত একমনে শুনিতেছিল, শেষ হইলে সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, একটা কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, আসলে তুমি আমাদের আপনার নয়। তোমার রক্ত, তোমার সংস্কার, তোমার সমস্ত শিক্ষা বিদেশের। তার প্রচণ্ড সংঘাত তুমি কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারো না। এবং এইখানেই আমাদের সঙ্গে তোমার অহরহ ধাক্কা লাগে। রাত অনেক হ'লো কমল, এ নিষ্ফল কলহ বন্ধ কারো—এ আদর্শ তোমার জন্য নয়!

কোন্ আদর্শ? আপনার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের?

অজিত খোঁচা খাইয়া মনে মনে রাগ করিল, কহিল, বেশ তাই। কিন্তু এ গূঢ়তত্ত্ব বিদেশীদের জন্য নয়। এ তুমি বুঝবে না।

আপনার সাগরেদি করলেও পারব না?

না।

এবার কমল হাসিয়া উঠিল। যেন সে-মানুষ আর নয়। কহিল, আচ্ছা বলুন ত কি হলে ঐ সাধুদের আড্ডা থেকে আপনার নাম কাটিয়ে দিতে পারি? বাস্তবিক, ঐ আশ্রমটা হয়েছে আমার চক্ষুশূল।

অজিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, রাজেনকে ডেকে এনে তুমি অনায়াসে আশ্রয় দিলে—তোমার কিছুই বোধ হয় মনে হ'লো না, না?

কি আবার মনে হবে?

এ-সব বোধ করি তুমি গ্রাহ্যই করো না?

কি গ্রাহ্য করিনে, আপনাদের মতামত? না।

নিজের সম্বন্ধেও বোধ করি কখনো ভয় করো না?

কমল বলিল, কখনো করিনে তা বলতে পারিনে, কিন্তু ব্রহ্মচারীকে ভয় কিসের?

হুঁ, বলিয়া অজিত চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, কেঁচো মাটির নীচে অন্ধকারে থাকে, সে জানে বাইরের আলোতে বার হলে তার রক্ষে নেই—তাকে গিলে খাবার মুখ হাঁ করে আছে। লুকানো ছাড়া আত্মরক্ষার কোন উপায় সে জানে না। কিন্তু তুমি জানো মানুষ কেঁচো নয়। এমন কি মেয়েমানুষ হলেও না। শাস্ত্রে আছে, নিজের স্বরূপটিকে জানতে পারাই পরম শক্তি—এই জানাটাই তোমার আসল শক্তি, না কমল?

কমল কিছুই না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

অজিত কহিল, মেয়েরা যে বস্তুটিকে তাদের ইহজীবনের যথাসর্ব্বস্ব বলে জানে, সেইখানে তোমার এমন একটি সহজ ঔদাসীন্য যে, যত নিন্দেই করি, সেই-ই যেন আগুনের বেড়ার মতো তোমাকে অনুক্ষণ আগলে রাখে। গায়ে লাগবার আগেই

পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইমাত্র আমাকে বলছিলে পুরুষের ভোগের বস্তু যারা, তাদের জাত তুমি নও। আজ রাতে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে এই কথাটার মানে স্পষ্ট হয়ে আসছে। আমাদের নিন্দে-সুখ্যাতিকে অবজ্ঞা করার সাহস যে তুমি কোথায় পাও, তাও বুঝতে পারচি।

কমল কৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি অজিতবাবু, কথাগুলো যে অনেকটা জ্ঞানবানের মত শোনাচ্চে?

অজিত কহিল, আচ্ছা কমল, সত্যি বলো আমার মতামতও কি অন্য সকলের মতো তোমার কাছে এমন তুচ্ছ?

কিন্তু এ-কথা জেনে আপনার হবে কি?

কমল, নিজেকে শক্তিমান বলে আমি তোমার কাছে কোনদিন অহঙ্কার করিনি। বাস্তবিক ভিতরে ভিতরে আমি যেমন দুর্ব্বল, তেমনি অসহায়। কোন কিছু জোর করে করার সামর্থ্য নেই আমার।

কমল হাসিয়া কহিল, সে আমি আপনার নিজের চেয়েও ঢের বেশি জানি।

অজিত কহিল, আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় তোমাকে পাওয়াও আমার যেমন সহজ, হারানোও তেমনি সহজ।

কমল বলিল, আমি তাও জানি।

অজিত নিজের মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, সেই ত। তোমাকে আজ পাওয়াই ত শুধু নয়, একদিন যদি এমনি করে হারাতেই হয় তখন কি হবে?

কমল শান্ত-কণ্ঠে কহিল, কিছুই হবে না। সেদিন হারানোও ঠিক এমনি সহজ হয়ে যাবে। যতদিন কাছে থাকবো আপনাকে সেই বিদ্যেই দিয়ে যাবো।

অজিত অন্তরে চমকিয়া উঠিল। বলিল, বিলেতে থাকতে দেখেছি, ওরা কত সহজে, কত সামান্য কারণেই না চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে ভাবি, কিছুই কি বাজে না? আর এই যদি তাদের ভালবাসার পরিচয়, তারা সভ্যতার গর্ব্ব করে কিসের?

কমল কহিল, অজিতবাবু, বাইরে থেকে খবরের কাগজে যত সহজ দেখেচেন হয়ত তত সহজ নয়, কিন্তু তবুও কামনা করি নর-নারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো-বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।

অজিত নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না। তার পর ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া শুইতেই তাহার কি কারণে কোথা দিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হয়ত কমল বুঝিতে পারিল। উঠিয়া আসিয়া শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া তাহার মাথার মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথাও উচ্চারণ করিল না।

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া দেখা গেল পূবের আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে

অজিতবাবু, ঘুমোবার বোধ করি আর সময় নেই।

না, এইবার উঠি। বলিয়া সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল।

২২

সংসারে সাধারণের একজন মাত্র, এর বেশী দাবী আশুবাবু বোধ করি তাঁর সৃষ্টি-কর্ত্তার কাছে একদিনও করেন নাই। পৈতৃক বিপুল ধন-সম্পদও যেমন শান্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিরাট দেহ-ভার ও আনুষঙ্গিক বাত-ব্যাধিটাও তেমনি সাধারণ দুঃখের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জগতের সুখ-দুঃখ যে বিধাতা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গড়েন নাই, তাহারা স্ব স্ব নিয়মেই চলে—এ সত্য শুধু বুদ্ধি দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতেও তাঁহাকে তপস্যা করিতে হয় নাই, সহজাত সংস্কারের মতই পাইয়াছিলেন। একদিন আকস্মিক স্ত্রী-বিয়োগের দুর্ঘটনায় সমস্ত পৃথিবী যখন চোখের সম্মুখে শুষ্ক হইয়া দেখা দিল, সেদিনও যেমন ভাগ্য-দেবতাকে সহস্র ধিক্কারে লাঞ্ছিত করেন নাই, একান্ত স্নেহের ধন মনোরমাও যেদিন তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসায় আগুন ধরাইয়া দিল সেদিনও তেমনি মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে বসেন নাই। ক্ষোভ ও দুঃসহ নৈরাশ্যের মাঝখানেই তাঁহার মনের মধ্যে কে যেন অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে বার বার করিয়া বলিতে থাকিত যে, এমনি হয়। এমনি দুঃখ বহু মানবের ভাগ্যে বহুবার ঘটিয়াছে, এমনি করিয়াই সংসার চলে। ইহার কোথাও নূতনত্ব নাই--ইহা সৃষ্টির মতই সুপ্রাচীন। উচ্ছ্বসিত শোকের তরঙ্গ তুলিয়া ইহাকেই নবীন করিয়া সংসারে পরিব্যাপ্ত করায় না আছে পৌরুষ, না আছে প্রয়োজন। তাই সর্ব্ববিধ দুঃখই তাঁহাতে আপনিই শান্ত হইয়া চারিদিকে এমন একটি স্নিগ্ধপ্রচ্ছন্নতার বেষ্টনী সৃজন করিত যে, ভিতরে আসিলে সকলের সকল বোঝাই যেন আপনা হইতে লঘু ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

এইভাবে আশুবাবুর চিরদিন কাটিয়াছে। আগ্রায় আসিয়াও নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই, অথচ এই ব্যতিক্রমটুকুই চোখে পড়িতে লাগিল আজকাল অনেকেরই। হঠাৎ দেখা যায় তাঁহার আচরণে ধৈর্য্যের অভাব বহুস্থলেই যেন চাপা পড়িতে চাহে না, মনে হয় আলাপ-আলোচনা অকারণে রূঢ়তার ধার ঘেঁসিয়া আসে,

মন্তব্য-প্রকাশের অহেতুক তীক্ষ্ণতা চাকর-বাকরদের কানে অদ্ভুত শুনায়—কিন্তু কেন যে এমন ঘটিতেছে তাহাও ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। রোগের বাড়াবাড়ির মধ্যেও এ বিকৃতি তাঁহাতে অবিশ্বাস্য মনে হইত, এখন ত তিনি সারিয়া আসিতেছেন। কিন্তু হেতু যাই হোক, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তাঁহার নিভৃত চিত্ত-তলে যেন একটা দাহ চলিতেছে; তাহারই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে বাহিরে ফাটিয়া পড়ে।

প্রকাশ করিয়া আজও বলেন নাই বটে, কিন্তু আভাস পাওয়া যায় যে, আগ্রা-বাসের দিন তাঁহার ফুরাইয়া আসিল। হয়ত আর একটুখানি সুস্থ হওয়ার বিলম্ব। তার পরে হঠাৎ যেমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনি হঠাৎ আর একদিন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন।

বিকেলটায় আজকাল পদস্থ বাঙালীদের অনেকেই দেখা করিয়া খোঁজ লইতে আসেন। সপত্নীক ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব, রায়বাহাদুর, সদরআলা, কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী—নানা কারণে স্থানত্যাগের সুযোগ যাঁহারা পান নাই তাঁহারা—হরেন্দ্র, অজিত এবং বাঙালী-পাড়ার যাঁহারা আনন্দের দিনে—বহু পোলাও-মাংস উদরস্থ করিয়া গেছেন তাঁহাদের কেহ কেহ। আসে না শুধু অক্ষয়, এখানে সে নাই বলিয়া। মহামারীর সূচনাতেই সস্ত্রীক বাড়ি গিয়াছে, বোধ হয় দেশ ঠাণ্ডা হওয়ার সংবাদ পৌঁছিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। আর আসে না কমল। সেই যে আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই।

আশুবাবু মজলিশি লোক, তথাপি তেমন করিয়া মজলিশে আর যোগ দিতে পারেন না, উপস্থিত থাকিলেও প্রায় নীরবে থাকেন—তাঁহার স্বাস্থ্যহীনতা স্মরণ করিয়া লোকে সানন্দে ক্ষমা করে। একদিন যে-সকল কর্তব্য মনোরমা করিত, আত্মীয় বলিয়া বেলাকে এখন তাহা করিতে হয়। আতিথেয়তার কোথাও ত্রুটি ঘটে না, বাহিরের লোকে বাহির হইতে আসিয়া ইহার রসটুকুই উপভোগ করে, হয়ত বা সভাশেষে পরিতৃপ্ত চিত্তে এই নিরভিমান গৃহস্বামীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইয়া সবিস্ময়ে ভাবে, অভ্যর্থনার এমন নিখুঁত ব্যবস্থা এই পীড়িত মানুষটিকে দিয়া নিত্যই কি করিয়া সম্ভবপর হয়।

সম্ভব কি করিয়া যে হয়—এই ইতিহাসটুকুই গোপন থাকে। নীলিমা সকলের সম্মুখে বাহির হইত না, অভ্যাসও ছিল না, ভালও বাসিত না। কিন্তু অন্তরাল হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ এই গৃহের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা যেমন নিগূঢ় তেমনি নীরব। শিরায় সঞ্চারিত রক্তধারার ন্যায় এই নিঃশব্দ প্রবাহ একাকী আশুবাবু ভিন্ন আর বোধ করি কেহ অনুভবও করে না।

হিম-ঋতুর প্রথমার্দ্ধ প্রায় গত হইতে চলিল, কিন্তু যে-কারণেই হোক, এ বৎসর শীত এখনো তেমন কড়া করিয়া পড়ে নাই। আজ কিন্তু সকাল হইতেই টিপ টিপ

বৃষ্টি নামিয়াছিল—বিকেলের দিকে সেটা চাপিয়া আসিল। বাহিরের কেহ যে আসিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। ঘরের শার্শিগুলো অসময়েই বন্ধ হইয়াছে। আশুবাবু আরাম-কেদারায় তেমনি পা ছাড়াইয়া একটা শাল চাপা দিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিলেন, বেলা হয়ত কতকটা বিরক্তির জন্যই বলিয়া বসিল, এ পোড়াদেশের সবই উল্টো। কিছুকাল আগে এ-অঞ্চলে একবার এসেছিলুম—জুন কিংবা জুলাই হয়ত হবে—এই জলের জন্য যে দেশ জুড়ে এতবড় হাহাকার ওঠে, না এলে এ কখনো আমি ভাবতেও পারতুম না। তাই ভাবি, এ কঠিন দেশে লোকে তাজমহল গড়তে গিয়েছিল কোন্ বিবেচনায়?

নীলিমা অদূরে একটা চৌকিতে বসিয়াই সেলাই করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল, এর কারণ কি সকলে টের পায়? পায় না।

বেলা সরল-চিত্তে প্রশ্ন করিল, কেন?

নীলিমা বলিল, সমস্ত বড় জিনিসই যে মানুষের হাহাকারের মধ্যেই জন্মলাভ করে, পৃথিবীর আমোদ-আহ্লাদেই যারা মগ্ন এ তাদের চোখে পড়বে কোথা থেকে!

জবাবটা এমনি অভাবিতরূপে কঠোর যে শুধু বেলা নিজে নয়, আশুবাবু পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বই হইতে মুখ সরাইয়া দেখিলেন, সে তেমনি একমনে সেলাই করিয়া যাইতেছে, যেন এ-কথা তাহার মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হয় নাই।

বেলা কলহপ্রিয় রমণী নয় এবং মোটের উপর সে সুশিক্ষিতা। দেখিয়াছে শুনিয়াছে অনেক এবং বয়সও বোধ করি পঁয়ত্রিশের উপরের দিকেই গেছে, কিন্তু সযত্ন সতর্কতায় যৌবনের লাবণ্য আজও পশ্চিমে হেলে নাই—অকস্মাৎ মনে হয় বুঝি বা তেমনিই আছে। রঙ উজ্জ্বল, মুখের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় স্নিগ্ধ কোমলতার অভাবে তাহাকে যেন রুক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। চোখের দৃষ্টি হাস্য-কৌতুকে চপল, চঞ্চল—নিরন্তর ভাসিয়া বেড়ানোই যেন তাহার কাজ—কোথাও কোন-কিছুতে স্থির হইবার মত তাহাতে ভারও নাই, গভীর তলদেশে কোন মূলও নাই। আনন্দ-উৎসবেই তাহাকে মানায়; দুঃখের মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গৃহস্বামীকে লজ্জায় পড়িতে হয়।

বেলার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়া গেলে ক্ষণিকের জন্য মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল, রাগ করিয়া ঝগড়া করিতে তাহার শিক্ষা ও সৌজন্যে বাধে, সে আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, আমাকে কটাক্ষ করে কোন লাভ নেই। শুধু অনধিকারচর্চা বলেই নয়, হাহাকার করে বেড়ানো যত উচ্চাঙ্গের ব্যাপারই হোক সে আমি পারিনে বরং তার থেকে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেও আমি অক্ষম। আমার আত্মসম্মান-বোধ বজায় থাক্, তার বড় আমি কিছু চাইনে।

নীলিমা কাজ করিতেই লাগিল, জবাব দিল না।

আশুবাবু অন্তরে ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু আর না বাড়ে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না, না, তোমাকে কটাক্ষ নয় বেলা, কথাটা নিশ্চয়ই উনি সাধারণভাবেই বলেচেন। নীলিমার স্বভাব জানি, এমন হতেই পারে না—কখন পারে না তা বলচি।

বেলা সংক্ষেপে শুধু কহিল, না হলেই ভাল। এতদিন একসঙ্গে আছি এ ত আমি ভাবতেই পারতুম না।

নীলিমা হঁ-না একটা উত্তরও দিল না, যেন ঘরে কেহ নাই এমনিভাবে নিজের মনে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। গৃহ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বেলার জীবনের একটু ইতিহাস আছে, এইখানে সেটা বলা আবশ্যক। তাহার পিতা ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায়ে যশ বা অর্থ কোনটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মমত কি ছিল কেহ জানে না, সমাজের দিক দিয়াও হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান কোন সমাজই মানিয়া চলিতেন না। মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেলা নামটি সখ করিয়া তাঁহারই দেওয়া। সমাজ না মানিলেও দল একটা ছিল। বেলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলিয়া দলের মধ্যে নাম রটিয়া গেল, অতএব ধনী পাত্র জুটিতেও বিলম্ব হইল না। তিনিও সম্প্রতি বিলাত হইতে আইন পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন, দিন-কতক দেখা-শুনা ও মন জানা-জানির পালা চলিল, তাহার পরে বিবাহ হইল আইন-মতে রেজেস্ট্রী করিয়া। আইনের প্রতি গভীর অনুরাগের এক অঙ্ক সারা হইল। দ্বিতীয় অঙ্কে বিলাস-ব্যসন, একত্রে দেশ ভ্রমণ, আলাদা বায়ু পরিবর্ত্তন, এমনি অনেক কিছু। উভয় পক্ষেই নানাবিধ জনরব শুনা গেল, কিন্তু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশ যেটুকু তাহা অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বর-পক্ষ হাতে হাতে ধরা পড়িলেন এবং কন্যা-পক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করিতে চাহিলেন। বন্ধু-মহলে আপসের চেষ্টা হইল, কিন্তু শিক্ষিতা বেলা নর-নারীর সমানাধিকার-তত্ত্বের বড় পাণ্ডা, এই অসম্মানের প্রস্তাবে সে কর্ণপাত করিল না। স্বামী-বেচারা চরিত্রের দিক দিয়া যাহাই হোক, মানুষ হিসাবে মন্দ লোক ছিল না, স্ত্রীকে সে শক্তি এবং সাধ্যমত ভালই বাসিত। অপরাধ সলজ্জে স্বীকার করিয়া আদালতের দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, কিন্তু স্ত্রী ক্ষমা করিল না। শেষে বহুদুঃখে নিষ্পত্তি একটা হইল। নগদে ও গ্রাসাচ্ছাদনের মাসিক বরাদ্দে অনেক টাকা ঘাড় পাতিয়া লইয়া সে মামলার দায় হইতে রক্ষা পাইল এবং দাম্পত্য-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বেলা ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া দিতে সিমলা, মুসৌরী, নইনি প্রভৃতি পর্ব্বতাঞ্চলে সদর্পে

প্রস্থান করিল। সে আজ প্রায় ছয়-সাত বৎসরের কথা। ইহার অনতিকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারে তাঁহার সম্মতি ত ছিলই না, বরঞ্চ অতিশয় মর্ম্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। আশুবাবুর পরলোকগত পত্নীর সহিত তাঁহার কি একটা দূরসম্পর্ক ছিল; সেই সম্বন্ধেই বেলা আশুবাবুর আত্মীয়া। তাহার বিবাহ-উপলক্ষেও নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহার স্বামীর সহিতও পরিচয় ঘটিবার তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল। এইরূপে নানা আত্মীয়তা-সূত্রে আপনার জন বলিয়াই বেলা আগ্রায় আসিয়া উঠিয়াছিল; নিতান্ত পরের মত আসে নাই, নিরাশ্রয় হইয়াও বাড়িতে ঢুকে নাই। এ-তুলনায় নীলিমার সহিত তাহার যথেষ্ট প্রভেদ।

অথচ অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল একেবারে অন্যরূপ। এ-গৃহে তাহার স্থান যে কোথায় এ-বিষয়ে বাটীর কাহারও মনে তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হেতুও ছিল যেমন অজ্ঞাত, কর্তৃত্বও ছিল তেমনি অবিসম্বাদিত।

বহুক্ষণ মৌন থাকার পরে বেলাই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, স্পষ্ট নয় মানি, কিন্তু আমাকে ধিক্কার দেবার জন্যই যে ও-কথা নীলিমা বলেচেন, এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

আশুবাবুর মনের মধ্যেও হয়ত সন্দেহ ছিল না, তথাপি বিস্ময়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধিক্কার? ধিক্কার কিসের জন্য বেলা?

বেলা কহিল, আপনি ত সমস্তই জানেন। নিন্দে করবার লোকের সেদিনও অভাব হয়নি, আজও হবে না। কিন্তু নিজের সম্মান, সমস্ত নারী-জাতির সম্মান রাখতে সেদিনও গ্রাহ্য করিনি, আজও করব না। নিজের মর্য্যাদা খুইয়ে স্বামীর ঘর করতে চাইনি বলে সেদিন গ্লানি প্রচার করেছিল মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি, আজ তাদেরই হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়া সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু অন্যায় করিনি বলে সেদিনও যেমন ভয় পাইনি, আজও তেমনি নির্ভয়। নিজের বিবেক-বুদ্ধির কাছে আমি সম্পূর্ণ খাঁটি।

নীলিমা সেলাই হইতে মুখ তুলিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে কহিল, একদিন কমল বলেছিলেন যে, বিবেক-বুদ্ধিটাই সংসারের মস্ত বড় বস্তু নয়। বিবেকের দোহাই দিয়েই সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা হয় না।

আশুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে বলে নাকি?

নীলিমা কহিল, হাঁ। বলেন, ওটা শুধু নির্ব্বোধের হাতের অস্ত্র। সামনে পিছনে দুদিকেই কাটে—ওর কোন ঠিক-ঠিকনা নেই।

আশুবাবু কহিলেন, সে বলে বলুক, ও-কথা তুমি মুখে এনো না নীলিমা।

বেলা কহিল, এতবড় দুঃসাহসের কথাও ত কখনো শুনিনি।

আশুবাবু মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃসাহসই বটে। তার সাহসের অন্ত নেই। আপন নিয়মে চলে; তার সব কথা সবসময় বোঝাও যায় না, মানাও চলে না।

বেলা কহিল, আপন নিয়মে আমিও চলি আশুবাবু। তাই বাবার নিষেধও মানতে পারিনি—স্বামী পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু হেঁট হতে পারলুম না।

আশুবাবু বলিলেন, গভীর পরিতাপের ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার বাবা মত দিতে না পারলেও আমি না দিয়ে পারিনি।

বেলা কহিল, Thanks, সে আমার মনে আছে আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, তার কারণ স্ত্রী-পুরুষের সমান দায়িত্ব এবং সমান অধিকার আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাদের হিন্দু-সমাজে এটা মস্ত দোষ যে, শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই, কিন্তু তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার তার সহস্র পথ খোলা। এ বিধি আমি কোনদিনই ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারিনি। তাই বেলার বাবা যখন আমার মতামত চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তখন উত্তরে এই কথাই জানিয়েছিলাম যে, জিনিসটা শোভনও নয়, সুখেরও নয়, সে যদি তার অসচ্চরিত্র স্বামীকে সত্যই বর্জ্জন করতে চায়, তাকে অন্যায় বলে আমি নিষেধ করতে পারবো না।

নীলিমা কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি সত্যিই এই অভিমত জবাবে লিখেছিলেন?

সত্যি বই কি।

নীলিমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেই স্তব্ধতার সম্মুখে আশুবাবু কেমন একপ্রকার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, এতে আশ্চর্য্য হবার তো কিছু নেই নীলিমা, বরঞ্চ না লিখলেই আমার পক্ষে অন্যায় হ'তো।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, তুমি ত কমলের একজন বড় ভক্ত; বল ত সে নিজে এ-ক্ষেত্রে কি করতো? কি জবাব দিত? তাইত সেদিন যখন ওদের দুজনের আলাপ করিয়ে দিই, তখন এই কথাটা জোর দিয়ে বলেছিলাম, কমল, তোমার মত করে ভাবতে, তোমার মত সাহসের পরিচয় দিতে কেবল একটি মেয়েকে দেখেচি, সে এই বেলা।

নীলিমার দুই চক্ষু সহসা ব্যথায় ভরিয়া আসিল, কহিল, সে বেচারা ভদ্র-সমাজের বাইরে, লোকালয়ের বাইরে পড়ে আছে, তাকে আপনাদের টানাটানি করা কেন?

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, না না, টানাটানি নয় নীলিমা, এ শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া।

নীলিমা কহিল, ওই ত টানাটানি। এইমাত্র বলছিলেন তার সকল কথা বোঝাও যায় না, মানাও চলে না। চলে না কিছুই, চলে কি শুধু উদাহরণ দেওয়া?

তাঁহার কথার মধ্যে দোষের কি আছে আশুবাবু ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে

বলিলেন, যে জন্যই হোক, আজ তোমার মন বোধ হয় খুব খারাপ হয়ে আছে। এ-সময়ে আলোচনা করা ভাল নয়।

নীলিমা এ-কথা কানে তুলিল না, বলিল, যেদিন আপনি ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মত দিয়েছিলেন এবং আজ অসঙ্কোচে কমলের দৃষ্টান্ত দিলেন। ওঁর অবস্থায় কমল কি করত তা সে-ই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি করে অনুসরণ করতে গেলে আজ ওকে কুলি-মজুরের জামা সেলাই করে আহার সংগ্রহ করতে হ'তো—তাও হয়ত সবদিন জুটতো না। কমল আর যাই করুক; যে স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেচে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে বাঁচতে চাইত না। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা করে মরতো।

আশুবাবু জবাব দিবেন কি, অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং বেলা ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। নীলিমার হাসি-তামাসা করিয়াই দিন কাটে, সকলের মুখ চাহিয়া থাকাই যে তার কাজ, সে যে সহসা এমন নির্ম্মম হইয়া উঠিতে পারে দুজনের কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

নীলিমা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের মজলিশে আমি বসিনে, কিন্তু যাদের নিয়ে যে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা চলে সে আমার কানে আসে। নইলে কোন কথা হয়ত আমি বলতুম না। কমল একটি দিনের জন্যও শিবনাথের নিন্দা করেনি, একটা লোকের কাছেও তার দুঃখের নালিশ জানায়নি— কেন জানেন?

আশুবাবু বিমূঢ়ের ন্যায় শুধু প্রশ্ন করিলেন, কেন?

নীলিমা কহিল, কেন তা বলা বৃথা। আপনারা বুঝতে পারবেন না। একটু থামিয়া বলিল, আশুবাবু, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার—এ একটা অত্যন্ত স্থূল কথা। কিন্তু তাই বলে এমন ভাববেন না যে, মেয়েমানুষ আমি, মেয়েদের দাবীর প্রতিবাদ করচি। প্রতিবাদ আমি করিনে, আমি জানি এ সত্যি, কিন্তু এ-কথাও জানি সত্য-বিলাসী একদল অবুঝ নর-নারীর মুখে মুখে, আন্দোলনে আন্দোলনে এ সত্য এমনি ঘুলিয়ে গেছে যে, আজ একে মিথ্যে বলতেই সাধ যায়। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা, সকলের সঙ্গে জুটে কমলকে নিয়ে আর চর্চ্চা করবেন না।

আশুবাবু জবাব দিতে গেলেন, কিন্তু কথা বলবার পূর্ব্বেই সে সেলাইয়ের জিনিস-পত্রগুলি তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তখন ক্ষুণ্ণ বিস্ময়ে নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, ও কবে কি শুনেচে জানিনে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ অত্যন্ত অযথা দোষারোপ।

বাহিরে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিয়াছিল, কিন্তু উপরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঘরের মধ্যে অসময়ে অন্ধকার সঞ্চারিত করিল। ভৃত্য আলো দিয়া গেলে তিনি চোখের

সম্মুখে বইখানা আর একবার তুলিয়া ধরিলেন। ছাপার অক্ষরে মনঃসংযোগ করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু বেলার সঙ্গে মুখোমুখি বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হওয়া আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

ভগবান দয়া করিলেন। একটা ছাতার মধ্যে সমস্ত পথ ঠেলাঠেলি করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতধারী হরেন্দ্র-অজিত ঝড়ের বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দুজনেই অর্দ্ধেক ভিজিয়াছে। বলিল, বৌদি কই?

আশুবাবু চাঁদ হাতে পাইলেন। আজকার দিনে কেহ যে আসিয়া জুটিবে এ ভরসা তাঁহার ছিল না, সাগ্রহে উঠিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এসো অজিত, ব'সো হরেন্দ্র।

বসি। বৌদি কোথায়?

ইস্! দুজনেই যে ভারি ভিজে গেছো দেখচি।

আজ্ঞে হাঁ। তিনি কোথায় গেলেন?

ডেকে পাঠাচ্চি, বলিয়া আশুবাবু একটা হুঙ্কার ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেই ভিতরের দিকের পর্দ্দা সরাইয়া নীলিমা আপনি প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুখানি শুষ্ক বস্ত্র এবং জামা।

হরেন্দ্র কহিল, একি? আপনি হাত গুনতে জানেন নাকি?

নীলিমা বলিল, গোনা-গাঁথার দরকার হয়নি ঠাকুরপো, জানালা থেকেই দেখতে পেয়েছিলুম। একটা ভাঙা ছাতির মধ্যে যেভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে পথ চলছিলে, সে শুধু আমি কেন, বোধ করি দেশ-শুদ্ধ লোকের চোখে পড়েচে।

আশুবাবু বললেন, একটা ছাতার মধ্যে দুজনে? তাতেই দুজনকে ভিজতে হয়েচে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

নীলিমা কহিল, ওঁরা বোধ হয় সমানাধিকারতত্ত্বে বিশ্বাসী, অন্যায় করেন না, তাই চুল-চিরে ছাতি ভাগ করে পথে হাঁটছিলেন। নাও ঠাকুরপো, কাপড় ছাড়ো। বলিয়া সে জামা-কাপড় হরেন্দ্রের হাতে দিল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র কহিল, কাপড় দিলেন দুটো, কিন্তু জামা যে একটি।

জামাটা মস্ত বড় ঠাকুরপো, একটাতেই হবে, বলিয়া গম্ভীর হইয়া পাশের চৌকিটায় উপবেশন করিল।

হরেন্দ্র বলিল, জামাটা আশুবাবুর, সুতরাং দুজনের কেন, আরও জন-চারেকের হতে পারে, কিন্তু মশারীর মত খাটাতে হবে, গায়ে দেওয়া চলবে না।

বেলা ততক্ষণ শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে নীরবে বসিয়াছিল, হাসি চাপিতে না পারিয়া উঠিয়া গেল এবং নীলিমাও জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, রোগে ভুগে আধখানি হয়ে গেছি যে হরেন, আর খুঁড়ো না। দেখচো না মেয়েদের কি-রকম ব্যথা লাগলো। একজন সইতে না পেরে উঠে গেলেন, আর একজন রাগে মুখ ফিরিয়ে রয়েচেন।

হরেন্দ্র কহিল, খুঁড়িনি আশুবাবু, বিরাটের মহিমা কীর্ত্তন করেচি। খোঁড়াখুঁড়ির দুষ্প্রভাব শুধু আমাদের মত নর-জাতিকেই বিপন্ন করে, আপনাদের স্পর্শ করতেও পারে না। অতএব চিরস্তুয়মান হিমাচলের ন্যায় ও-দেহ অক্ষয় হোক, মেয়েরা নিঃশঙ্ক হোন এবং জল-বৃষ্টির ছুঁতা-নাতায় ইতর-জনের ভাগ্যে দৈনন্দিন মিষ্টান্নের বরাদ্দে আজও যেন তাদের বিন্দুমাত্র ন্যূনতা না ঘটে।

নীলিমা মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বড়দের স্তুতিবাদ ত আবহমানকাল চলে আসচে ঠাকুরপো, সেইটেই নির্দ্দিষ্ট ধারা এবং তাতে তুমি সিদ্ধহস্ত, কিন্তু আজ একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হবে। আজ ছোটর খোসামোদ না করলে ইতর-জনের ভাগ্যে মিষ্টান্নের অঙ্কে একেবারে শূন্য পড়বে।

বেলা বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন বৌদি?

গভীর স্নেহে নীলিমার চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, অমন মিষ্টি কথা অনেকদিন শুনিনি ভাই, তাই শুনতে একটু লোভ হয়।

তবে আরম্ভ করব নাকি?

আচ্ছা এখন থাক্। তোমরা ও-ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়গে, আমি জামা পাঠিয়ে দিচ্চি।

কিন্তু কাপড় ছাড়া হলে? তার পরে?

নীলিমা সহাস্যে কহিল, তার পরে চেষ্টা করে দেখি গে ইতর-জনের ভাগ্যে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারি।

হরেন্দ্র বলিল, কষ্ট করে চেষ্টা করতে হবে না বৌদি, শুধু একবার চোখ মেলে চাইবেন। আপনার অন্নপূর্ণার দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই অন্নের ভাঁড়ার উথলে যাবে। চলো অজিত, আর ভাবনা নেই, আমরা ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছেড়ে আসি গে, বলিয়া সে অজিতের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

২৩

অজিত কহিল, জল থামবার ত কোন লক্ষণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। অতএব আবার দু'জনে সেই ভাঙা-ছাতির মধ্যে মাথা গুঁজে সমানাধিকারতত্ত্বের সত্যতা সপ্রমাণ করতে করতে অন্ধকারে পথ চলা এবং অবশেষে আশ্রমে পৌঁছনো। অবশ্য তার পরের ভাবনাটা নেই, এখানে ত চুকিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং আর একবার ভিজে কাপড় ছাড়া ও শুয়ে পড়া।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, তা হলে তোমরা দুজনে একেবারে পেট ভরেই খেয়ে নিলে না কেন?

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, না থাক্, তাতে আর কি হয়েচে, আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না আশুবাবু।

নীলিমা প্রথমটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, কেন মিছে রোগামানুষের উৎকণ্ঠা বাড়াও। আশুবাবুকে কহিল, উনি সন্ন্যাসীমানুষ, বৈরাগ্যগিরিতে পেকে গেছেন, সুতরাং খাবার দিক থেকে ওঁর ত্রুটি কেউ দেখতে পাবে না। ভাবনা শুধু অজিতবাবুর জন্য। এমন সংসর্গেও যে উনি তাড়াতাড়ি সুপক্ক হয়ে উঠতে পারচেন না, সে ওঁর আজকের খাওয়া দেখলেই ধরা যায়।

হরেন্দ্র বলিল, বোধ হয় মনের মধ্যে পাপ আছে, তাই ধরা পড়বে একদিন।

অজিত লজ্জায় আরক্ত হইয়া কহিল, আপনি কি যে বলেন হরেনবাবু!

নীলিমা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল; তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, তাই যেন হয়। ওঁর মনের মধ্যে একটুখানি পাপ থাক্, উনি ধরাই পড়ুন একদিন—আমি কালীঘাটে গিয়ে ঘটা করে পূজা দেব।

তা হলে আয়োজন করুন।

অজিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, আপনি কি বাজে বকচেন হরেনবাবু, ভারী বিশ্রী বোধ হয়।

হরেন্দ্র আর কথা কহিল না। অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমার কৌতূহল তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও চুপ করিয়া রহিল।

অজিতের কথা চাপা পড়িলে কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদের আশ্রমের ওপর কমলের ভারী রাগ। আপনার বোধ করি মনে আছে বৌদি?

নীলিমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। এখনো তার সেই ভাব নাকি?

হরেন্দ্র কহিল, ঠিক সেই ভাব নয়, আর একটুখানি বেড়েচে এইমাত্র প্রভেদ। পরে কহিল, শুধু আমাদের উপরেই নয়, সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তার অত্যন্ত অনুরাগ। ব্রহ্মচর্য্যই বলুন, বৈরাগ্যের কথাই বলুন, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা হোক, শোনা মাত্রই অহেতুক ভক্তি ও প্রীতির প্রাবল্যে অগ্নিবৎ হয়ে উঠেন। মেজাজ ভাল থাকলে মূঢ়-বুড়ো-খোকাদের ছেলেখেলায় আবার কৌতুক বোধ করতেও অপারগ হন না। চমৎকার!

বেলা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, কহিল, ঈশ্বর ওর কাছে ছেলেখেলা? আর এঁরই সঙ্গে আমার তুলনা করেছিলেন, আশুবাবু? এই বলিয়া সে পর্য্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কাহারও কাছে কোন উৎসাহ পাইল না। তাহার রুক্ষ স্বর ইহাদের কানে গেল কি না ঠিক বুঝা গেল না।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল—অথচ নিজের মধ্যে এমনি একটি নির্ব্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্ব্বিশঙ্ক তিতিক্ষা আছে যে দেখে বিস্ময় লাগে। আপনার শিবনাথের ব্যাপারটা মনে আছে আশুবাবু? সে আপনাদের কে, তবুও এতবড় অন্যায় সহ্য হ'লো না, দণ্ড দেবার আকাঙ্ক্ষায় বুকের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল। কিন্তু কমল বললে, না। তার সেদিনের মুখের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে না-র মধ্যে বিদ্বেষ নেই, জ্বালা নেই, উপরে হাত বাড়িয়ে দান করবার শ্লাঘা নেই, ক্ষমতার দম্ভ নেই—দাক্ষিণ্য যেন অধিকৃত করুণায় ভরা। শিবনাথ যত অন্যায়ই করে থাক, আমার প্রস্তাবে কমল কেবল চমকে উঠে শুধু বললে, ছি ছি—না না, সে হয় না। অর্থাৎ একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল তার প্রতি নির্ম্মমতার হীনতা কমল ভাবতেই পারলে না এবং সকলের চোখের আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ করে মুছে ফেলে দিলে। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছন্ন হা-হুতাশ নয়—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নীচে গড়িয়ে বয়ে গেল।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিলেন, সত্যি কথা।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার সবচেয়ে রাগ হয় ও যখন শুধু কেবল আমার নিজের আইডিয়ালটাকেই নয়, আমাদের ধর্ম্ম, ঐতিহ্য, রীতি, নৈতিক অনুশাসন সব-কিছুকেই উপহাস করে উড়িয়ে দিতে চায়। বুঝি, ওর দেহের মধ্যে উৎকট বিদেশী রক্ত, মনের মধ্যে তেমনি উগ্র পরধর্ম্মের ভাব বয়ে যাচ্ছে; তবুও ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারিনে। ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েচে। শিক্ষা দ্বারা নয়, অনুভব-উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থটাকে সোজা দেখতে পাচ্ছে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক এই জিনিসটি আমারও অনেকবার মনে হয়েচে। তাই ওর যেমন কথা তেমনি কাজ। ও যদি মিথ্যে বুঝে থাকে, তবে সে

মিথ্যের গৌরব আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখ হরেন, এ একপ্রকার ভালই হয়েছে যে, পাষণ্ড চলে গেছে। ওকে চিরদিন আচ্ছন্ন করে থাকলে ন্যায়ের মর্য্যাদা থাকত না। শূয়োরের গলায় মুক্তার মালার মত অপরাধ হ'তো।

হরেন্দ্র বলিল, আবার আর একদিকে এমনি মায়া-মমতা যে, একা বৌদি ছাড়া কোন মেয়েকে তার সমান দেখিনি। সেবায় যেন লক্ষ্মী! হয়ত পুরুষের চেয়ে অনেক দিকে অনেক বড় বলেই নিজেকে তাদের কাছে এমনি সামান্য করে রাখে যে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মন গলে গিয়ে যেন পায়ে পড়তে চায়।

নীলিমা সহাস্যে কহিল, ঠাকুরপো, তুমি বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কোন রাজরাণীর স্তুতিপাঠক ছিলে, এ জন্মে তার সংস্কার ঘোচেনি। ছেলে-পড়ানো ছেড়ে এ ব্যবসা ধরলে যে ঢের সুরাহা হ'তো।

হরেন্দ্রও হাসিল, কহিল, কি করব বৌদি, আমি সরল সোজা মানুষ, যা ভাবি তাই বলে ফেলি। কিন্তু জিজ্ঞেসা করুন দিকি অজিতবাবুকে, এক্ষুনি উনি হাতের আস্তিন গুটিয়ে মারতে উদ্যত হবেন। তা হোক, কিন্তু বেঁচে থাকলে দেখতে পাবেন একদিন।

অজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আঃ, কি করেন হরেন বাবু। আপনার আশ্রয় থেকে দেখচি চলে যেতে হবে একদিন।

হরেন্দ্র বলিল, একদিন সে আমি জানি। কিন্তু ইতিমধ্যের দিন ক'টা একটু সহ্য করে থাকুন।

তা হলে বলুন আপনার যা ইচ্ছা হয়। আমি উঠে যাই।

নীলিমা বলিল, ঠাকুরপো, তোমায় ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটা ছাই তুলেই দাও না ভাই। তুমিও বাঁচো, ছেলেগুলোও বাঁচে।

হরেন্দ্র বলিল, ছেলেগুলো বাঁচতে পারে বৌদি, কিন্তু আমার বাঁচবার আশা নেই। অন্ততঃ অক্ষয়টা বেঁচে থাকতে নয়। সে আমাকে যমের বাড়ি রওনা করে দিয়ে ছাড়বে।

আশুবাবু কহিলেন, অক্ষয়কে দেখছি তোমরা তা হলে ভয় করো।

আজ্ঞে, করি। বিষ খাওয়া সহজ, কিন্তু তার টিটকিরি হজম করা অসাধ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত লোক মারা গেল, কিন্তু সে ত মরল না। দিব্যি পালালো।

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। নীলিমা বলিল, অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা কইনে বটে, কিন্তু এবার তোমার জন্যে বার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নেবো। ভেতরে ভেতরে জ্বলে-পুড়ে যে একেবারে কয়লা হয়ে গেলে।

হরেন্দ্র কহিল, আমরাই ধরা পড়ে গেছি বৌদি, আপনারা সব জ্বালা-পোড়ার অতীত। বিধাতা আগুন শুধু আমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন, আপনারা তার এলাকার বাইরে।

নীলিমা লজ্জায় আরক্ত হইয়া শুধু কহিল, তা নয় ত কি!

বেলা কহিল, সত্যিই ত তাই।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। অজিত কথা কহিল, বলিল, সেদিন ঠিক এই নিয়ে একটি চমৎকার গল্প পড়েচি। আশুবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পড়েননি?

কই, মনে ত হয় না।

যে মাসিকপত্রগুলো আপনার বিলেত থেকে আসে, তারই একটাতে আছে। ফরাসী গল্পের অনুবাদ, স্ত্রীলোকের লেখা। বোধ করি ডাক্তার। একটুখানি নিজের পরিচয়ে বলেচেন যে, তিনি যৌবন পার হয়ে সবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েচেন। ঐ ত সুমুখের শেল্‌ফেই রয়েচে; এই বলিয়া সে বইখানি পাড়িয়া আনিয়া বসিল।

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন, গল্পের নামটা কি?

অজিত কহিল, নামটা একটু অদ্ভুত—'একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম'।

বেলা কহিল, তার মানে? লেখিকা কি এখন পুরুষের দলে গেলেন নাকি?

অজিত বলিল, লেখিকা হয়ত নিজের কথাই বলে গেছেন এবং হয়ত নিজে ডাক্তার বলেই নারীদেহের ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের যে ছবি দিয়েচেন, তা স্থানে স্থানে রুচিকে আঘাত করে। যথা—

নীলিমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, যথায় কাজ নেই অজিতবাবু ও থাক্।

অজিত কহিল, থাক্। কিন্তু অন্তরের, অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের যে রূপটি এঁকেচেন তা ঠিক মধুর না হলেও বিস্ময়কর।

আশুবাবু কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন—বেশ ত অজিত, বাদ-সাদ দিয়ে পড়ো না শুনি। জলও থামেনি, রাতও তেমন হয়নি।

অজিত কহিল, বাদ-সাদ দিয়েই পড়া চলে। গল্পটা বড়, ইচ্ছে হলে সবটা পরে পড়তে পারেন।

বেলা কহিল, পড়ুন না শুনি। অন্ততঃ সময়টা কাটুক।

নীলিমার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া যায়, কিন্তু উঠিয়া যাইবার কোন হেতু না থাকায় সসঙ্কোচে বসিয়া রহিল।

বাতির সম্মুখে বসিয়া অজিত বই খুলিয়া কহিল, গোড়ায় একটু ভূমিকা আছে তা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। এ যাঁর আত্মকাহিনী তিনি সুশিক্ষিতা, সুন্দরী এবং বড়ঘরের মেয়ে। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক কি না গল্পে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, দাগ যদি বা কোনদিন কোন ছলে লেগেও থাকে সে যৌবনের প্রারম্ভে— সে বহুদিন পূর্ব্বে।

সেদিন তাকে ভালবেসেছিল অনেকে—একজন সমস্যার মীমাংসা করলে আত্মহত্যা করে এবং আর একজন চলে গেল সাগর পার হয়ে ক্যানাডায়। গেল বটে, কিন্তু আশা ছাড়তে পারলে না। দূরের থেকে দয়া ভিক্ষে চেয়ে সে এত চিঠি লিখেচে যে, জমিয়ে রাখলে একখানা জাহাজ বোঝাই হতে পারতো। জবাবের আশা করেনি, জবাব পায়ওনি। তার পরে পনেরো বছর পরে দেখা। দেখা হতে হঠাৎ সে যেন চমকে উঠলো। ইতিমধ্যে যে পনেরো বছর কেটে গেছে—যাকে পঁচিশ বৎসরের যুবতী দেখে বিদেশে গিয়েছিল তার যে বয়স আজ চল্লিশ হয়েছে এ ধারণাই যেন তার ছিল না। কুশল প্রশ্ন অনেক হ'লো, অভিযোগ-অনুযোগও কম হ'লো না; কিন্তু সেদিন দেখা হলে যার চোখের কোণ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বার হ'তো, উন্মত্ত কামনার ঝঞ্ঝাবর্ত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধ দ্বার ভেঙে বাইরে আসতে চাইত, আজ তার কোন চিহ্নই কোথাও নেই। এ যেন কবেকার এক স্বপ্ন দেখা। মেয়েদের আর সব ঠকানো যায়, এ যায় না। এইখানে গল্পের আরম্ভ। এই বলিয়া বইয়ের পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আশুবাবু বাধা দিলেন, না না, ইংরিজি নয়, অজিত ইংরিজি নয়। তোমার মুখ থেকে বাংলায় গল্পের সহজ ভাবটুকু বড় মিষ্টি লাগল, তুমি এমনি করেই বাকিটুকু বলে যাও।

আমি পারব কেন?

পারবে, পারবে। যেমন করে বলে গেলে তেমনি করে বল।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রবাবুর মত আমার ভাষায় জ্ঞান নেই; বলার দোষে যদি সমস্ত কটু হয়ে ওঠে সে আমারই অক্ষমতা। এই বলিয়া সে কখনো বা বইয়ের প্রতি চাহিয়া, কখনো বা না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

"মেয়েটি বাড়ি ফিরে এলো। ঐ লোকটিকে যে সে কখনো ভালবেসেছিল বা কোনদিন চেয়েছিল তা নয়, বরঞ্চ একান্তমনে চিরদিন এই প্রার্থনাই করে এসেচে, ঈশ্বর যেন ঐ মানুষটিকে একদিন মোহমুক্ত করেন, এই নিষ্ফল প্রণয়ের দাহ থেকে অব্যাহতি দান করেন। অসম্ভব বস্তুর লুব্ধ আশ্বাসে আর যেন না সে যন্ত্রণা পায়। দেখা গেল, এতদিনে ভগবান সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর করেচেন। কোন কথাই হ'লো না, তবুও নিঃসন্দেহে বুঝা গেল, সে ক্যানাডায় ফিরে যাক বা না যাক, সকাতরে প্রণয়-ভিক্ষা চেয়ে আর সে নিরন্তর নিজেও দুঃখ পাবে না, তাকেও দুঃখ দেবে না। দুঃসাধ্য সমস্যার আজ শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে। চিরদিন 'না' বলে মেয়েটি অস্বীকার করেই এসেচে, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু সেই শেষ 'না' এলো আজ একেবারে উল্টো দিক থেকে। দুয়ের মধ্যে যে এত বড় বিভেদ ছিল, মেয়েটি স্বপ্নেও ভাবেনি। মানবের লোলুপ-দৃষ্টি চিরদিন তাকে বিব্রত করেচে, লজ্জায় পীড়িত

করেচে, আজ ঠিক সেইদিক থেকেই যদি তার মুক্তি ঘটে থাকে, শরীরধর্ম্ম-বশে অবসিতপ্রায় যৌবন যদি তার পুরুষের উদ্দীপ্ত কামনা, উন্মাদ আসক্তির আজ গতিরোধ করে থাকে—অভিযোগের কি আছে? অথচ বাড়ি ফেরার পথে সমস্ত বিশ্ব-সংসার আজ যেন চোখে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিলে। ভালবাসা নয়, আত্মার একান্ত মিলনের ব্যাকুলতা নয়—এ-সব অন্য কথা। বড় কথা। কিন্তু যা বড় নয়—যা রূপজ, যা অশুভ, যা অসুন্দর, যা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—সেই কুৎসিতের জন্যও যে নারীর অভিজাত চিত্ত-তলে এতবড় আসন পাতা ছিল, পুরুষের বিমুখতা যে তাকে এমন নির্ম্মম অপমানে আহত করতে পারে আজকের পূর্ব্বে সে তার কি জানত?'

হরেন্দ্র কহিল, অজিত বেশ ত বলেন। গল্পটা খুব মন দিয়ে পড়েচেন।

মেয়েরা চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না।

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। তার পরে অজিত?

অজিত বলিতে লাগিল, মহিলাটির অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল যে, কেবল ঐ মানুষটিই ত নয়, বহু লোক বহুদিন ধরে তাকে ভালবেসেচে, প্রার্থনা করেচে, সেদিন তার একটুখানি হাসিমুখের একটিমাত্র কথার জন্য তাদের আকুলতার শেষ ছিল না। প্রতিদিনের প্রতি পদক্ষেপেই যে তারা কোন মাটি ফুড়ে এসে দেখা দিতো, তার হিসেব মিলতো না। তারাই আজ গেল কোথায়? কোথাও ত যায়নি, এখনো ত মাঝে মাঝে তারা চোখে পড়ে। তবে গেছে কি তার নিজের কণ্ঠের সুর বিগড়ে? তার হাসির রূপ বদলে? এই তো সেদিন, দশ-পনেরো বছর, কতদিনই বা, এরই মাঝখানে কি তার সব হারালো?

আশুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, যায়নি কিছুই অজিত, হয়ত শুধু গেছে তার যৌবন—তার মা হবার শক্তিটুকু হারিয়ে।

অজিত তাঁহার প্র‍তি চাহিয়া বলিল, ঠিক কথা। গল্পটা আপনি পড়েছিলেন?

না।

নইলে ঠিক এই কথাটিই জানালেন কি করে?

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, তুমি তার পরে বল।

অজিত বলিতে লাগিল, তিনি বাড়ি ফিরে শোবার ঘরের বড় আরশীর সুমুখে আলো জ্বেলে দাঁড়ালেন। বাইরে যাবার পোষাক ছেড়ে রাত্রিবাসের কাপড় পরতে পরতে নিজের ছায়ার পানে চেয়ে আজ এই প্রথম চোখের দৃষ্টি যেন একেবারে বদলে গেল। এমন করে ধাক্কা না খেলে হয়ত এখনো চোখে পড়তো না যে, নারীর যা সবচেয়ে বড় সম্পদ—আপনি যাকে বলছিলেন তার মা হবার শক্তি—সে শক্তি আজ নিস্তেজ, ম্লান; সে আজ সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েচে; এ জীবনে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার নিশ্চেতন দেহের উপর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন

জলধারার স্থায় যে সম্পদ প্রতিদিন ব্যর্থতায় ক্ষয় হয়ে গেছে ; কিন্তু এতবড় ঐশ্বর্য্য যে এমন স্বল্পায়ু এ-বার্ত্তা পৌঁছিল তার কাছে আজ শেষ বেলায় !

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এমনই হয় অজিত, এমনিই হয়। জীবনের অনেক বড় বস্তুকেই চেনা যায় শুধু তাকে হারিয়ে। তার পরে ?

অজিত বলিল, তার পরে সেই আরশীর সুমুখে দাঁড়িয়ে যৌবনান্ত দেহের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। একদিন কি ছিল এবং আজ কি হতে বসেচে ! কিন্তু সে বিবরণ আমি বলতেও পারবো না, পড়তেও পারবো না।

নীলিমা পূর্ব্বের মতই ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল, না না, অজিতবাবু, ও থাক। ঐ জায়গাটা বাদ দিয়ে আপনি বলুন।

অজিত কহিল, মহিলাটি বিশ্লেষণের শেষের দিকে বলেচেন, নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যের মত সুন্দর বস্তুও যেমন সংসারে নেই, এই বিকৃতির মত অসুন্দর বস্তুও হয়ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আশুবাবু বলিলেন, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি অজিত।

নীলিমা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল, না, একটুও বাড়াবাড়ি নয়। এ সত্যি।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু মেয়েটির যা বয়েস তাকে তো বিকৃতির বয়স বলা চলে না নীলিমা।

নীলিমা কহিল, চলে। কারণ ও তো কেবলমাত্র বছর গুনে মেয়েদের বেঁচে থাকবার হিসাব নয়, এর আয়ুষ্কাল যে অত্যন্ত কম, এ-কথা আর যেই ভুলুক, মেয়েদের ভুললে চলবে না।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এই উত্তরটি তিনি নিজে দিয়েচেন। বলেচেন—আজ থেকে সমাপ্তির শেষ প্রতীক্ষা করে থাকাই হবে অবশিষ্ট জীবনের একটি-মাত্র সত্য। এতে সান্ত্বনা নেই, আনন্দ নেই, আশা নেই জানি, তবু তো উপহাসের লজ্জা থেকে বাঁচবো। ঐশ্বর্য্যের ভগ্নস্তূপ হয়ত আজও কোন দুর্ভাগার মনোহরণ করতে পারে, কিন্তু সে-মুগ্ধতা তার পক্ষেও যেমন বিড়ম্বনা, আমার নিজের পক্ষেও হবে তেমনি মিথ্যে। যে-রূপের সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েচে, তাকেই নানাভাবে, নানা সজ্জায় সাজিয়ে 'শেষ হয়নি' বলে ঠকিয়ে বেড়াতে আমি নিজেকেও পারবো না, পরকেও না।

আর কেহ কিছু কহিল না, শুধু নীলিমা কহিল, সুন্দর। কথাগুলি আমার ভারি সুন্দর লাগলো অজিতবাবু।

সকলের মত হরেন্দ্রও একমনে শুনিতেছিল ; সেই মন্তব্যে খুশী হইল না, কহিল, এ আপনার ভাবাতিশয্যের উচ্ছ্বাস বৌদি, খুব ভেবে বলা নয়। উঁচু ডালে শিমুল-ফুলও হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, তবু ফুলের দরবারে তার নিমন্ত্রণ পৌঁছায় না। রমণীর দেহ কি এমনই তুচ্ছ জিনিস যে, এ ছাড়া আর তার কোন প্রয়োজন নেই ?

নীলিমা কহিল, নেই, এ-কথা তো লেখিকা বলেননি। দুর্ভাগা মানুষগুলোর প্রয়োজন যে সহজে মেলে না এ আশঙ্কা তাঁর নিজেরও ছিল। একটুখানি হাসিয়া কহিল, উচ্ছ্বাসের কথা বলছিলে ঠাকুরপো, অক্ষয়বাবু উপস্থিত নেই, তিনি থাকলে বুঝতেন ওর আতিশয্যটা আজকাল কোন্ দিকে চেপেচে।

হরেন্দ্র জবাব দিল, আপনি গালাগালি দিতে থাকলেই যে পচে যাবো তাও নয় বৌদি।

শুনিয়া আশুবাবু নিজেও একটু হাসিলেন, কহিলেন, বাস্তবিক হরেন, আমারও মনে হয় গল্পটিতে লেখিকা মেয়েদের রূপের সত্যকার প্রয়োজনকেই ইঙ্গিত করেচেন।

কিন্তু এই কি ঠিক?

ঠিক নয়, এ-কথা জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে মনে করা কঠিন।

হরেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে যাই কেন না করুন, মানুষের দিকে চেয়ে একে স্বীকার করা আমার পক্ষেও কঠিন। মানুষের প্রয়োজন জীব-জগতের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহুদূরে চলে গেছে—তাই তো সমস্যা তার এমন বিচিত্র, এত দুরূহ। একে চালুনিতে ছেঁকে বেছে ফেলা যায় না বলেই তো তার মর্য্যাদা আশুবাবু।

তাও বটে। গল্পের বাকীটা শুনি অজিত।

হরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইল, বাধা দিয়া কহিল, সে হবে না আশুবাবু। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উত্তরটা এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না, হয় আমাকে সত্যিই স্বীকার করুন, না হয় আমার ভুলটা দেখিয়ে দিন। আপনি অনেক দেখেচেন, অনেক পড়েচেন—প্রকাণ্ড পণ্ডিত মানুষ, আপনার এই অনির্দ্দিষ্ট ঢিলে-ঢালা কথার ফাঁক দিয়ে যে বৌদি জিতে যাবেন, সে আমার সইবে না।

আশুবাবু হাসিমুখে বলিলেন, তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, রূপের বিচারে হারলে তো তোমার লজ্জা নেই হরেন।

না, সে আমি শুনবো না।

আশুবাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার কথা অপ্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে তর্ক করতে আমার লজ্জা করে। বস্তুতঃ নারী-রূপের নিগূঢ় অর্থ অপরিস্ফুট থাকে সেই ভাল হরেন। পুনরায় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, অজিতের গল্প শুনতে শুনতে আবার বহুকাল পূর্ব্বের একটা দুঃখের কাহিনী মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় আমার এক ইংরেজ বন্ধু ছিলেন; তিনি একটি পোলিশ রমণীকে ভালবেসেছিলেন। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী,; ছাত্রীদের পিয়ানো বাজনা শিখিয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করতেন। শুধু রূপে নয়, নানা গুণে গুণবতী, আমরা

সবাই তাঁদের শুভকামনা করতাম। নিশ্চিত জানতাম, এঁদের বিবাহে কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটবে না।

অজিত প্রশ্ন করিল, বিঘ্ন ঘটলো কিসে?

আশুবাবু বলিলেন, শুধু বয়সের দিক দিয়ে। দেশ থেকে একদিন মেয়েটির মা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরই মুখে কথায় কথায় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কনের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। অজিত জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কি আপনাদের কাছে বয়েস লুকিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, না। আমার বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোপন করতেন না, সে প্রকৃতিই তাঁর নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার কথা কারও মনে উদয় হয়নি। এমনি তাঁর দেহের গঠন, এমনি মুখের সুকুমার শ্রী, এমনি মধুর কণ্ঠস্বর যে কিছুতেই মনে হয়নি বয়স তাঁর ত্রিশের বেশী হতে পারে।

বেলা কহিল, আশ্চর্য্য। আপনাদের কারও কি চোখ ছিল না?

ছিল বই কি। কিন্তু জগতের সকল আশ্চর্য্যই কেবল চোখ দিয়েই ধরা যায় না। এ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পাত্রের বয়স কত?

তিনি আমারই সম-বয়সী—তখন বোধ করি আটাশ-উনত্রিশের বেশী ছিল না।

তার পরে?

আশুবাবু বলিলেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ছেলেটির সমস্ত মন এক নিমিষেই যেন এই প্রৌঢ়া রমণীর বিরুদ্ধে পাষাণ হয়ে গেল। কতদিনের কথা, তবু আজও মনে পড়লে ব্যথা পাই। কত চোখের জল, কত হা-হুতাশ, কত আসা-যাওয়া, কত সাধা-সাধি, কিন্তু সে বিতৃষ্ণাকে মন থেকে তার বিন্দু-পরিমাণও নড়ানো গেল না। এ বিবাহ যে অসম্ভব, এর বাইরে সে আর কিছু ভাবতেই পারলে না।

ক্ষণকাল সকলেই নীরব হইয়া রহিল। নীলিমা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হলে বোধ করি অসম্ভব হ'তো না?

বোধ হয় না।

কিন্তু ও-রকম বিবাহ কি ওদের দেশে একটিও হয় না? তেমন পুরুষ কি সেদেশে নেই?

আশুবাবু হাসিয়া কহিলেন, আছে। অজিতের গল্পের গ্রন্থকার বোধ করি দুর্ভাগ্য বিশেষণটা বিশেষ করে সেই পুরুষদের স্মরণ করে লিখেচেন। কিন্তু রাত্রি তো অনেক হয়ে গেল অজিত, এর শেষটা কি?

অজিত চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আমি আপনার গল্পের কথাই ভাবছিলাম। অত ভালবেসেও ছেলেটি কেন যে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলে না, এতবড় সত্য বস্তুটা কোথা দিয়ে যে এক নিমিষে মিথ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, সারাজীবন হয়ত মহিলাটি এই কথাই ভেবেচেন—একদিন যেদিন আমি নারী ছিলুম! নারীত্বের সত্যকার অবসান যে নারীর অজ্ঞাতসারেই কবে ঘটে এর পূর্ব্বে হয়ত সেই বিগত-যৌবনা নারী চিন্তাও করেননি।

কিন্তু তোমার গল্পের শেষটা?

অজিত শান্তভাবে কহিল, আজ থাক্। যৌবনের ঐ শেষটাই যে এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি—নিজের এবং পরের কাছে মেয়েদের এই প্রতারণার করুণ কাহিনী দিয়েই গল্পের শেষটুকু সমাপ্ত হয়েচে। সে বরঞ্চ অন্যদিন বলব।

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না না, তার চেয়ে ওটুকু বরঞ্চ অসমাপ্ত থাক্।

আশুবাবু সায় দিলেন, ব্যথার সহিত কহিলেন, বাস্তবিক এই সময়টাই মেয়েদের নিঃসঙ্গ জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়। অসহিষ্ণু, কপট, পরছিদ্রান্বেষী, এমন কি নিষ্ঠুর হয়—তাই বোধ হয় সকল দেশেরই মানুষে এদের—এই অবিবাহিত প্রৌঢ়া নারীদের—এড়িয়ে চলতে চায় নীলিমা।

নীলিমা হাসিয়া কহিল, মেয়েদের বলা উচিত নয় আশুবাবু, বলা উচিত তোমাদের মত পতি-পুত্রহীনা দুর্ভাগা মেয়েদের এড়িয়ে চলতে চায়।

আশুবাবু ইহার জবাব দিলেন না, কিন্তু ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, অথচ স্বামী-পুত্রে সৌভাগ্যবতী যাঁরা, তারা স্নেহে, প্রেমে, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে, জীবনের এতবড় সঙ্কটকাল যে কবে কোন্ পথে অতিবাহিত হয়ে যায় টেরও পান না।

নীলিমা বলিল, ভাগ্যদেবতাদের ঈর্ষা করিনে আশুবাবু, যে প্রেরণা মনের মধ্যে আজও এসে পৌঁছোয়নি, কিন্তু ভাগ্যদোষে যাঁরা আমাদের মত ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েচেন, তাঁদের পথের নির্দ্দেশ কোন্‌দিকে আমাকে বলে দিতে পারেন?

আশুবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, এর জবাবে আমি শুধু বড়দের কথার প্রতিধ্বনিমাত্রই করতে পারি নীলিমা, তার বেশী শক্তি নেই। তাঁরা বলেন, পরার্থে আপনাকে উৎসর্গ করে দিতে। সংসারের দুঃখেরও অভাব নেই, আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নেই। এসব আমিও জানি, কিন্তু এর মাঝে নারীর নিরবরুদ্ধ কল্যাণময় সত্যকার আনন্দ আছে কি না আজও আমি নিঃসংশয়ে জানিনে নীলিমা।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ সন্দেহ কি আপনার বরাবর ছিল?

আশুবাবু মনে মনে যেন কুণ্ঠিত হইলেন, একটু থামিয়া বলিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারিনে হরেন। তখন দিন দুই-তিন হ'লো মনোরমা চলে গেছে, মন ভারাতুর, দেহ বিবশ, এই চৌকিটাতেই চুপ করে পড়ে আছি, হঠাৎ দেখি কমল এসে উপস্থিত। আদর করে ডেকে কাছে বসালুম। আমার ব্যথার জায়গাটা সে সাবধানে পাশ কাটিয়ে যেতেই চাইলে, কিন্তু পারলে না। কথায় কথায় এই ধরণের কি একটা প্রসঙ্গ উঠে পড়ল, তখন আর তার হুঁস রইলো না। তোমরা জানোই তো তাকে, প্রাচীন যা-কিছু তার 'পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণা। নাড়া দিয়ে ভেঙে ফেলাই যেন তার passion। মন সায় দিতে চায় না, চিরদিনের সংস্কার ভয়ে কাঠ হয়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলে না, পরাভব মানতে হয়। মনে আছে সেদিনও তার কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলুম, কিন্তু কমল স্বীকার করলে না, বললে, মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশী জানি। ও-প্রবৃত্তি তো তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শূন্যতা থেকে—ওঠে বুক খালি করে দিয়ে। ও-তো স্বভাব না—অভাব। অভাবের আত্মোৎসর্গে আমি কানা-কড়ি বিশ্বাস করিনে আশুবাবু। কি যে জবাব দেবো ভেবে পেলাম না, তবু বললাম, কমল, হিন্দু-সভ্যতার মর্ম্মবস্তুটির সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে আজ হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারতুম যে, ত্যাগ ও বিসর্জ্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করাই আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা এবং এই পথ ধরেই আমাদের কত বিধবা মেয়েই একদিন জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতা উপলব্ধি করে গেছেন।

কমল হেসে বলল, করতে দেখেচেন? একটা নাম করুন তো? সে এ-রকম প্রশ্ন করবে ভাবিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলাম কথাটা হয়ত মেনে নেবে। কেমনধারা যেন ঘুলিয়ে গেল—

নীলিমা বলিল, বেশ! আপনি আমার নামটা করে দিলেন না কেন? মনে পড়েনি বুঝি?

কি কঠোর পরিহাস! হরেন্দ্র ও অজিত মাথা হেঁট করিল এবং বেলা আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

আশুবাবু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলেন না, কহিলেন, না, মনেই পড়েনি সত্যি। চোখের সামনের জিনিস যেমন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—তেমনি। তোমার নামটা করতে পারলে সত্যিই তার মস্ত জবাব হ'তো, কিন্তু সে যখন মনে এলো না, তখন কমল বললে, আমাকে যে শিক্ষার খোঁটা দিলেন আশুবাবু, আপনার নিজের সম্বন্ধেও কি তাই ষোলো আনায় খাটে না? সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ বুলিই তো তারা সদর্পে আবৃত্তি করে ভাবে এই বুঝি সত্যি! আপনারাও ঠকেন, আত্মপ্রসাদের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।

বলেই বললে, সহমরণের কথা তো আপনার মনে পড়া উচিত। যারা পুড়ে মরত এবং যারা প্রবৃত্তি দিত দু'পক্ষের দম্ভই তো সেদিন এই ভেবে আকাশে গিয়ে ঠেকত যে, বৈধব্য জীবনের এতবড় আদর্শের দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথায়?

এর উত্তর যে কি আছে খুঁজে পেলুম না। কিন্তু সে অপেক্ষাও করলে না, নিজেই বলল, উত্তর তো নেই, দেবেন কি? একটু থেমে আমার মুখের পানে চেয়ে বললে, প্রায় সকল দেশেই এ আত্মোৎসর্গ কথাটার একটা বহুব্যাপ্ত ও বহু প্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য অবস্তু ইহলোকের সঙ্কীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন করে দেয়, ভাবতেই দেয় না ওর মাঝে নর-নারী কারও জীবনেরই শ্রেয়ঃ আছে কি না। সংস্কার-বুদ্ধি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত কানে ধরে স্বীকার করিয়ে নেয়—অনেকটা ঐ সহমরণের মতই—কিন্তু আর না, আমি উঠি।

সে সত্যিই চলে যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে বললাম, কমল, প্রচলিত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে অবজ্ঞায় চূর্ণ করে দেওয়াই যেন তোমার ব্রত। এ-শিক্ষা তোমাকে যে দিয়েচে জগতের সে কল্যাণ করেনি।

কমল বললে, আমার বাবা দিয়েছিলেন।

বললাম, তোমার মুখেই শুনেচি তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ-কথা কি তিনি কখনো শেখাননি যে, নিঃশেষে দান করেই তবে মানুষ সত্য করে আপনাকে পায়? স্বেচ্ছায় দুঃখ-বরণের মধ্যেই আত্মার যথার্থ প্রতিষ্ঠা।

কমল বললে, তিনি বলতেন, মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেবার দুরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্ব্বুদ্ধি যোগায়। দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখ-বরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। জগতে দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের দুঃখ তো ও নয়—ওকে যেন স্বেচ্ছায় যেচে ঘরে ডেকে আনা। অর্থহীন সৌখীন জিনিসের মত ও শুধু ছেলেখেলা, তার বড় নয়।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বললাম, কমল, তোমার বাবা কি তোমাকে কেবল নিছক ভোগের মন্ত্রই দিয়ে গেছেন, এবং জগতের যা-কিছু মহৎ তাকেই অশ্রদ্ধায় তাচ্ছিল্য করতে?

কমল এ অনুযোগ বোধ করি আশা করেনি, ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, এ আপনার অসহিষ্ণুতার কথা আশুবাবু। আপনি নিশ্চয় জানেন, কোন বাপই তার মেয়েকে এমন মন্ত্র দিয়ে যেতে পারেন না। আমার বাবাকে আপনি অবিচার করচেন। তিনি সাধু লোক ছিলেন।

বললুম, তুমি যা বলচো, সত্যিই এ-শিক্ষা যদি তিনি দিয়ে গিয়ে থাকেন তাকে সুবিচার করাও শক্ত। মনোরমার জননীর মৃত্যুর পরে অন্য কোন স্ত্রীলোককে আমি যে ভালবাসতে পারিনি শুনে তুমি বলেছিলে এ চিত্তের অক্ষমতা, এবং অক্ষমতা নিয়ে

গৌরব করা চলে না। মৃত-পত্নীর স্মৃতির সম্মানকে তুমি নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহ বলে উপেক্ষার চোখে দেখেছিলে। সংযমের কোন অর্থ-ই সেদিন তুমি দেখতে পাওনি।

কমল বললে, আজও পাইনে আশুবাবু, সংযম যেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে আনে। ও তো কোন বস্তু নয়, এ একটা মনের লীলা—তাকে বাঁধার দরকার। সীমা মেনে চলাই তো সংযম—শক্তির স্পর্দ্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্য্যাদা দেওয়া চলে না। অতি-সংযম যে আর এক ধরণের অসংযম, এ-কথা কি কোনদিন ভেবে দেখেননি আশুবাবু।

ভেবে দেখিনি সত্য। তাই চিরদিনের ভেবে-আসা কথাটাই খপ্‌ করে মনে পড়ল। বললুম, ও কেবল তোমার কথার ভোজবাজি। সেই ভোগের ওকালতিতেই পরিপূর্ণ। মানুষ যতই আঁকড়ে ধরে গ্রাস করে ভোগ করতে চায় ততই সে হারায়। তার ভোগের ক্ষুধা তো মেটে না—অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, ও-পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা। তাঁরা বলেচেন, ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে। আগুনে ঘি দিলে যেমন বেশী জ্বলে উঠে, তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বৈ কোনদিন কমে না।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তার কাছে শাস্ত্রবাক্য বলতে গেলেন কেন? তার পরে?

আশুবাবু কহিলেন, ঠিক তাই। শুনে হেসে উঠে বললে, শাস্ত্রে ঐ রকম আছে নাকি? থাকবেই তো। তাঁরা জানতেন জ্ঞানের চর্চ্চায় জ্ঞানের ইচ্ছা বাড়ে, ধর্ম্মের সাধনায় ধর্ম্মের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে, পুণ্যের অনুশীলনে পুণ্যলোভ ক্রমশঃ উগ্র হয়ে উঠে, মনে হয় যেন এখনো ঢের বাকী—এও ঠিক তেমনি। শাম্যতি নেই বলে এ-ক্ষেত্রে তাঁরা আক্ষেপ করে যাননি। তাঁদের বিবেচনা ছিল।

হরেন্দ্র, অজিত, বেলা ও নীলিমা চারিজনেই হাসিয়া উঠিল।

আশুবাবু বলিলেন, হাসির কথা নয়। মেয়েটার উপহাস ও বিদ্রূপে যেন হতবাক্ হয়ে গেলাম, নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, এ তাঁদের অভিপ্রায় নয়, ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই, কামনার নিবৃত্তি হতে পারে না, এই ইঙ্গিতই তাঁরা করে গেছেন।

কমল একটুখানি থেমে বললে, কি জানি, এমন বাহুল্য ইঙ্গিত তাঁরা কেন করে গেলেন। এ কি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা শোনা, না প্রতিবেশীর গৃহের গ্রামোফোনের বাজনা যে, মাঝখানেই মনে হবে, থাক্, যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করা গেছে—আর না। এর আসল সত্তা তো বাইরের ভোগের মধ্যে নেই—উৎস ওর জীবনের মূল্য, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।

বললুম, তা হতে পারে, কিন্তু যে রিপু, ওকে তো মানুষের জয় করা চাই?

কমল বললে, কিন্তু রিপু বলে গাল দিলেই তো সে ছোট হয়ে যাবে না। প্রকৃতির পাকা দলিলে যে দখলদার—তাদের কোন্ সত্তাটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই তো দুঃখ জয় করা নয়? অথচ ঐ-ধরণের যুক্তির জোরেই মানুষ অকল্যাণের সিংহদ্বারে শক্তির পথ হাতড়ে বেড়ায়। শান্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।

শুনে মনে হ'লো ও-বুঝি কেবল আমাকেই খোঁচা দিলে। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি যে হ'লো মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, কমল, তোমার নিজের জীবনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। কথাটা বলে ফেলে কিন্তু নিজের কানেই বিঁধলো, কারণ কটাক্ষ করার মত কিছুই তো তার নেই—কমল নিজেও বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'লো, কিন্তু রাগ অভিমান কিছুই করলে না, শান্তমুখে আমার পানে চেয়ে বললে, আমি প্রতিদিনই ভেবে দেখি আশুবাবু। দুঃখ যে পাইনি তা বলিনে, কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নিইনি। শিবনাথের দেবার যা ছিল তিনি দিয়েচেন, আমার পাবার যা ছিল তা পেয়েচি—আনন্দের সেই ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিত্ত-দাহে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলিনি, শুক্‌নো ঝরনার নীচে গিয়ে ভিক্ষে দাও বলে শূন্য দু'হাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকিনি। তাঁর ভালবাসার আয়ু যখন ফুরালো, তাকে শান্তমনেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে তুলতে আমার প্রবৃত্তি হ'লো না। তাই তাঁর সম্বন্ধে আমার সেদিনের আচরণ আপনাদের কাছে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। আপনারা ভাববেন এতবড় অপরাধ মাপ করলে কি করে? কিন্তু অপরাধের কথার চেয়ে মনে এসেছিল সেদিন নিজেরই দুর্ভাগ্যের কথা।

মনে হ'লো যেন তার চোখের কোণে জল দেখা দিল। হয়ত সত্যি, হয়ত আমারই ভুল, বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় মুচড়ে উঠল—এর সঙ্গে আমার প্রভেদ কতটুকু! বললাম, কমল, এমনি মণি-মাণিক্যের সঞ্চয় আমারো আছে—সেই তো সাতরাজার ধন—আর আমরা লোভ করতে যাবো কিসের তরে বলো তো?

কমল চুপ করে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলুম, এ-জীবনে তুমিই কি আর কাউকে কখনো ভালবাসতে পারবে কমল? এমনিধারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে?

কমল অবিচলিতকণ্ঠে জবাব দিলে, অন্ততঃ সেই আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে আশুবাবু। অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য্য অস্ত গেছে বলে সেই অন্ধকারটাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতের আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়,

দু'চোখ বুজে তাকেই বলব, এ আলো নয়, এ মিথ্যে? জীবনটাকে নিয়ে এমনি ছেলেখেলা করেই কি সাঙ্গ করে দেবো?

বললুম, রাত্রি কেবল একটি মাত্রই নয় কমল, প্রভাতের আলো শেষ করে সে তো আবার ফিরে আসতে পারে?

সে বললে, আসুক না। তখনও ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন করব।

বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলাম, কমল চলে গেল।

ছেলেখেলা! মনে হয়েছিল শোকের মধ্যে দিয়ে আমাদের উভয়ের ভাবনার ধারা বুঝি গিয়ে একস্রোতে মিশেচে। দেখলাম, না না, তা নয়। আকাশ পাতাল প্রভেদ। জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র—আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্ট ও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর সুমুখের পথ রোধ করে না। ওর অনাগত তাই—যা আজও এসে পৌঁছোয়নি। তাই ওর আশাও যেমন দুর্ব্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েচে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোনমতেই সম্মত নয়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আশ্চর্য্য মেয়ে! সেদিন বিরক্তি ও আক্ষেপের অবধি রইলো না, কিন্তু এ-কথাও তো মনে মনে স্বীকার না করে পারলাম না যে, এ তো কেবল বাপের কাছে শেখা মুখস্থ বুলিই নয়। শিখেচে একেবারে নিঃসংশয়ে একান্ত করেই শিখেচ। কতটুকুই বা বয়স, কিন্তু নিজের মনটাকে যেন ও এই বয়েসেই সম্যক্ উপলব্ধি করে নিয়েচে।

একটু থামিয়া বলিলেন, সত্যিই তো। জীবনটা সত্যিই তো আর ছেলেখেলা নয়। ভগবানের এতবড় দান তো সেজন্য আসেনি। আর-একজন কেউ আর-একজনের জীবনে বিফল হ'লো বলে সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে, এমন কথাই বা তাকে বলব কি বলে?

বেলা আস্তে আস্তে বলল, সুন্দর কথাটি।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত অনেক হ'লো, বৃষ্টিও কমেচে—আজ আসি।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুই বলিল না—উভয়ে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা শুইতে গেল। ছোট-খাটো দুই-একটা কাজ নীলিমার তখনও বাকী ছিল, কিন্তু আজ সে-সকল তেমনই অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিল—অন্যমনস্কের মত সেও নীরবে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের অপেক্ষায় আশুবাবু চোখে হাত চাপা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বেলা ও নীলিমার শয়নকক্ষ পরস্পরের ঠিক বিপরীত মুখে! ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—এত কথা ও আলোচনার সমস্তটাই যেন নির্জ্জন নিঃসঙ্গ গৃহের মাঝে আসিয়া তাহাদের কাছে ঝাপ্সা হইয়া গেল; অথচ পরামাশ্চর্য্য এই যে, কাপড় ছাড়িবার পূর্ব্বে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই দুটি নারীর একই সময় ঠিক একটি কথাই কেবল মনে পড়িল—একদিন যেদিন নারী ছিলাম।

২৪

দশ-বারোদিন কমল আগ্রা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে, অথচ আশুবাবুর তাহাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। কম-বেশী সকলেই চিন্তিত, কিন্তু উদ্বেগের কালো মেঘ সবচেয়ে জমাট বাঁধিল হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মাথার উপর। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র অজিত উৎকণ্ঠার পাল্লা দিয়া এমনি শুকাইয়া উঠিতে লাগিল যে, তাদের ব্রহ্ম হারাইলেও বোধ করি এতটা হইত না। অবশেষে তাহারাই একদিন খুঁজিয়া বাহির করিল। অথচ ঘটনাটা অতিশয় সামান্য। কমলের চা-বাগানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ফিরিঙ্গী সাহেব বাগানের কাজ ছাড়িয়া রেলের চাকুরি লইয়া সম্প্রতি টুন্‌ডলায় আসিয়াছে। তাহার স্ত্রী নাই, বছর-দুয়েকের একটি ছোট মেয়ে; অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সে কমলকে লইয়া গেছে, তাহারই ঘর-সংসার গুছাইয়া দিতে তাহার এত বিলম্ব। আজ সকালে সে বাসায় ফিরিয়াছে, অপরাহ্নে মোটর পাঠাইয়া দিয়া আশুবাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

বেলার ম্যাজিস্ট্রেটের বাটীতে নিমন্ত্রণ, কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে-ও গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সেলাই করিতে করিতে নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সে লোকটার পরিবার নেই, একটি কচি মেয়ে ছাড়া বাসায় আর কোন স্ত্রীলোক নেই, অথচ তারই ঘরে কমল স্বচ্ছন্দে দশ-বারোদিন কাটিয়ে দিলে।

আশুবাবু অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন, এ কথার তাৎপর্য্য যে কি ঠাহর করিতে পারিলেন না।

নীলিমা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, ও যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে ভেজা, না-ভেজার প্রশ্নই ওঠে না; খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, শাসন করার অভিভাবক নেই, চোখ রাঙাবার সমাজ নেই—একেবারে স্বাধীন।

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অনেকটা তাই বটে।

ওর রূপ-যৌবনের সীমা নেই, বুদ্ধিও যেন তেমনি অফুরন্ত। সেই রাজেন ছেলেটির সঙ্গে ক'দিনের বা জানা-শোনা, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে কোথাও যখন তার ঠাঁই হ'লো না, ও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে ডেকে নিলে। কারও মতামতের মুখ চেয়ে তার নিজের কর্ত্তব্যে বাধা দিলে না। কেউ যা পারলে না ও তাই অনায়াসে পারলে। শুনে মনে হ'লো সবাই যেন ওর চেয়ে ছোট হয়ে গেছে, অথচ মেয়েদের কত কথাই ত ভাবতে হয়!

আশুবাবু বলিলেন, ভাবাই ত উচিত নীলিমা?

বেলা কহিল, ইচ্ছে করলে ও-রকম বে-পরোয়া স্বাধীন হয়ে উঠতে তো আমরাও পারি।

নীলিমা বলিল, না পারিনে। ইচ্ছে করলে আমিও পারিনে, আপনিও না; কারণ জগৎ-সংসার যে-কালি গায়ে ঢেলে দেবে, সে তুলে ফেলবার শক্তি আমাদের নেই।

একটুখানি থামিয়া কহিল, ও-ইচ্ছে একদিন আমারও হয়েছিল, তাই অনেকদিন থেকেই এ-কথা ভেবে দেখেচি। পুরুষের তৈরী সমাজের অবিচারে জ্বলে জ্বলে মরেচি—কত যে জ্বলেছি সে জানাবার নয়। শুধু জ্বলুনিই সার হয়েচে—; কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি। মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা তো আজকাল নরনারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশি আর এক-পা এগোয় না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েচি স্বাধীনতা তত্ত্ব-বিচারে মেলে না, ন্যায়-ধর্ম্মের দোহাই পেড়ে মেলে না, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল করে মেলে না—এ কেউ কাউকে দিতে পারে না—দেনা-পাওনার বস্তুই এ নয়; কমলকে দেখলেই দেখা যায় এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না—মরে। আমাদের সঙ্গে তার তফাৎ ঐখানে।

বেলাকে কহিল, এই যে দশ-বারোদিন কোথায় চলে গেল, সকলের ভয়ের সীমা রইল না, কিন্তু এ আশঙ্কা কারও স্বপ্নেও উদয় হ'লো না যে, এমন কিছু কাজ কমল করতে পারে যাতে তার মর্য্যাদা হানি হয়। বলুন তো, মানুষের মনে এতখানি বিশ্বাসের জোর আমরা হলে পেতাম কোথায়? এ গৌরব আমাদের দিত কে? পুরুষেও না, মেয়েরাও না।

আশুবাবু সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই সত্য নীলিমা।

বেলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তার স্বামী থাকলে সে কি করত?

নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা করতো, রাঁধতো-বাড়তো, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতো, ছেলে হলে তাদের মানুষ করতো; বস্তুতঃ একলা-মানুষ, টাকাকড়ি

কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারতো না।

বেলা কহিল, তবে?

নীলিমা বলিল, তবে কি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ-কর্ম্ম করব না, শোক-দুঃখ অভাব-অভিযোগ থাকবে না, হরদম্ ঘুরে বেড়াবো এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? স্বয়ং বিধাতার তো কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি? এই সংসারে আমার নিজের খাটুনিই কি সামান্য?

আশুবাবু গভীর বিস্ময়ে মুগ্ধ-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বস্তুতঃ এই ধরণের কোন কথা এতদিন তাহার মুখে তিনি শোনেন নাই।

নীলিমা বলিতে লাগিল, কমল বসে থাকতে তো জানে না তখন স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে সে কর্ম্মের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যেতো—আনন্দের ধারার মত সংসার তার উপর দিয়ে বয়ে যেতো ও টেরও পেতো না। কিন্তু যেদিন বুঝতো স্বামীর কাজ বোঝা হয়ে তার ঘাড়ে চেপেছে, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, কেউ একটাদিনও সে-সংসারে তাকে ধরে রাখতে পারত না।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই মনে হয়।

অদূরে পরিচিত মোটরের হর্নের আওয়াজ পাওয়া গেল। বেলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, হাঁ, আমাদের গাড়ি।

অনতিকাল পরে ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া কমলের আগমন-সংবাদ দিল।

কয়দিন যাবৎ আশুবাবু এই প্রতীক্ষা করিয়াই ছিলেন, অথচ খবর পাওয়ামাত্র তাঁহার মুখ অতিশয় ম্লান ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এইমাত্র আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, পুনরায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘরে ঢুকিয়া কমল সকলকে নমস্কার করিল এবং আশুবাবুর পাশের চৌকিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, শুনলাম আমার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েচেন। কে জানতো আমাকে আপনারা এত ভালবাসেন, তা হলে যাবার আগে নিশ্চয় একটা খবর দিয়ে যেতুম। এই বলিয়া সে তাঁহার সুপরিপুষ্ট শিথিল হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

আশুবাবুর মুখ অন্যদিকে ছিল, ঠিক তেমনই রহিল, একটি কথারও উত্তর দিতে পারিলেন না।

কমল প্রথমে মনে করিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া গিয়াছিল এবং এতদিন কোন খোঁজ লয় নাই—তাই অভিমান। তাঁহার মোটা আঙুলগুলির মধ্যে নিজের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি বলচি আমার দোষ হয়েচে, আমি ঘাট মানচি।

কিন্তু ইহারও উত্তরে যখন তিনি কিছুই বলিলেন না। তখন সে সত্যই ভারি আশ্চর্য্য হইল এবং ভয় পাইল।

বেলা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-বচনে কহিল, আপনি আসবেন জানলে মালিনীর নিমন্ত্রণটা আজ কিছুতেই নিতুম না, কিন্তু এখন না গেলে তাঁরা ভারি হতাশ হবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, মালিনী কে?

নীলিমা জবাব দিল, বলিল, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের স্ত্রী, নামটা বোধ হয় তোমার স্মরণ নেই। বেলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, সত্যই আপনার যাওয়া উচিত। না গেলে তাঁদের গানের আসরটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে।

না না, মাটি হবে না—তবে ভারী ক্ষুণ্ণ হবেন তাঁরা। শুনেচি আরও দু-চারজনকে আহ্বান করেচেন। আচ্ছা, আজ তা হলে আসি, আর একদিন আলাপ হবে। নমস্কার। বলিয়া সে একটু ব্যগ্রপদেই বাহির হইয়া গেল।

নীলিমা কহিল, ভালই হয়েচে যে আজ ওঁর বাইরে নিমন্ত্রণ ছিল, নইলে সব কথা খুলে বলতে বাধত। হাঁ কমল, তোমাকে আমি আপনি বলতুম, না তুমি বলে ডাকতুম?

কমল কহিল, তুমি বলে। কিন্তু এমন নির্ব্বাসনে যাইনি যে এর মধ্যেই তা ভুলে গেলেন।

না ভুলিনি, শুধু একটু খটকা বেধেছিল। বাধবারই কথা। সে যাক। সাত-আটদিন থেকে তোমাকে আমরা খুঁজছিলুম। আমরা কিন্তু ঠিক খোঁজা নয় পাবার জন্য যেন মনে মনে তপস্যা করছিলুম।

কিন্তু তপস্যার শুষ্ক গাম্ভীর্য্য তাহার মুখে নাই, তাই অকৃত্রিম স্নেহের মিষ্টি একটুখানি পরিহাস কল্পনা করিয়া কমল হাসিয়া কহিল, এ সৌভাগ্যের হেতু? আমি তো সকলের পরিত্যক্ত দিদি, ভদ্রসমাজের কেউ তো আমাকে চায় না।

এই সম্ভাষণটি নূতন। নীলিমার দুই চোখ হঠাৎ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু থাকিতে পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ভদ্রসমাজের প্রয়োজন হয় তো এ অনুযোগের জবাব তারাই দেবে, কিন্তু আমি জানি জীবনে কেউ যদি তোমাকে সত্যি করে চেয়ে থাকে তো এই নীলিমা। এতখানি ভালবাসা হয়ত তুমি কারও কখনো পাওনি কমল।

কমল কহিল, সে আমি জানি।

নীলিমা চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথাও যাইবার জন্য নহে, এই ধরণের আলোচনায় ব্যক্তিগত ইঙ্গিতে চিরদিনই সে যেন অস্থির হইয়া পড়িত। বহুক্ষেত্রে

প্রিয়জনে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, তথাপি এমনিই ছিল তাহার স্বভাব। কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, কমল, তোমাকে আমাদের দুটো খবর দেবার আছে।

কমল তাহার মনের ভাব বুঝিল, হাসিয়া কহিল, বেশ তো, দেবার থাকে দিন।

নীলিমা আশুবাবুকে দেখাইয়া বলিল, উনি লজ্জায় তোমার কাছে মুখ লুকিয়ে আছেন, তাই, আমিই ভার নিয়েচি বলবার। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। পিতা ও ভাবী শ্বশুরের অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে দুজনেই পত্র দিয়েচেন।

শুনিয়া কমলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, তাতে ওঁর লজ্জা কিসের ?

নীলিমা কহিল, সে ওঁর মেয়ে বলে। এবং চিঠি পাবার পরে এই ক'টা দিন কেবল একটি কথাই বার বার বলেচেন, আগ্রায় এত লোক মারা গেল, ভগবান তাঁকে দয়া করলেন না কেন ? জ্ঞানতঃ কোনদিন কোন অন্যায় করেননি, তাই একান্ত বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর ওঁর প্রতি সদয়। সেই অভিমানের ব্যথাই যেন ওঁর সকল বেদনার বড় হয়ে উঠেচে। আমি ছাড়া কাউকে কিছু বলতে পারেননি এবং রাত্রিদিন মনে মনে কেবল তোমাকেই ডেকেচেন। বোধ হয় ধারণা এই যে, তুমিই শুধু এর থেকে পরিত্রাণের পথ বলে দিতে পার।

কমল উঁকি দিয়া দেখিল আশুবাবুর মুদ্রিত দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া ফোঁটা-কয়েক জল গড়াইয়া পড়িয়াছে ; হাত বাড়াইয়া সেই অশ্রু নিঃশব্দে মুছাইয়া দিয়া সে নিজেও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, একটা খবর তো এই, আর একটা ?

নীলিমা রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিতে চাহিলেও ঠিক পারিয়া উঠিল না, কহিল, ব্যাপারটা অভাবিত, নইলে গুরুতর কিছু নয়। আমাদের মুখুয্যেমশায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সকলেরই দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি আরোগ্যলাভ করেচেন এবং পরে দাদা এবং বৌদি তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর জবরদস্তি একটি বিয়ে দিয়ে দিয়েচেন। লজ্জার সঙ্গে খবরটি তিনি আশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েচেন, এইমাত্র। এই বলিয়া এবার সে নিজেই হাসিতে লাগিল।

এ হাসির মধ্যে সুখও নাই, কৌতুকও নাই। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, এ দুটোই বিয়ের ব্যাপার। একটা হয়ে গেছে, আর একটা হবার জন্যে স্থির হয়ে আছে। আমাকে খুঁজছিলেন কেন ? এর কোনটাই তো আমি ঠেকাতে পারিনে।

নীলিমা কহিল, অথচ ঠেকাবার কল্পনা নিয়েই বোধ করি উনি তোমাকে খুঁজছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে খুঁজিনি ভাই, কায়মনে ভগবানকে ডাকছিলাম

যেন দেখা পেয়ে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করতে পারি। বাঙলাদেশে মেয়ে হয়ে জন্মে অদৃষ্টকে দোষ দিতে গেলে থেই খুঁজে পাবো না, কিন্তু বুদ্ধির দোষে বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি দুটোই তো খুইয়েচি, এর ওপর উপরি-লোকসান যা ভাগ্যে ঘটেচে সে বিবরণ দিতে পারবো না—এখন ভগ্নীপতির আশ্রয়টাও ঘুচল। আশুবাবুকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা নেই, যে-কটা দিন এখানে আছেন মাথা গোঁজবার স্থান পাবো, কিন্তু তার পরে অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পাইনে। ভেবেচি, এবার তোমাকে ঠাঁই দিতে বলব, না পাই মরব। পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে স্রোতের আবর্জ্জনার মত আর ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে আয়ুর শেষ দিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বরটা ভারি হইয়া আসিল, কিন্তু চোখের জল জোর করিয়া দমন করিয়া রাখিল।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসাটা জবাব দেওয়ার চেয়ে সহজ বলে।

নীলিমা বলিল, সে জানি। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাও, সেই তো আমার ভয়।

কমল কহিল, হলুম বা অদৃশ্য। কিন্তু দরকার হলে আমাকে খুঁজতে যেতে হবে না দিদি, আমি পৃথিবীময় আপনাকে খুঁজে বেড়াতে বার হবো। এ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোন।

আশুবাবু কহিলেন, এবার এমনি করে আমাকেও অভয় দাও কমল, আমিও যেন ওঁর মতই নিঃসংশয় হতে পারি।

আদেশ করুন আমি কি করতে পারি?

তোমাকে কিছুই করতে হবে না কমল, যা করবার আমি নিজেই করব। আমাকে শুধু এইটুকু উপদেশ দাও, পিতার কর্ত্তব্যে অপরাধ না করি। এ-বিবাহে কেবল যে মত দিতে পারিনে তাই নয়, ঘটতে দিতেও পারিনে।

কমল বলিল, মত আপনার, না দিতেও পারেন। কিন্তু বিবাহ ঘটতে দেবেন না কি করে?

আশুবাবু উত্তেজনা চাপিতে পারিলেন না, কারণ অস্বীকার করার জো নাই বলিয়া এই কথাটাই মনের মধ্যে তাঁহার অহর্নিশি পাক খাইয়াছে। বলিলেন, তা জানি, কিন্তু মেয়েরও জানা চাই যে বাপের চেয়ে বড় হয়ে ওঠা যায় না। শুধু মতামতটাই আমার নিজের নয় কমল, সম্পত্তিটাও নিজের। আশুবদ্যির দুর্ব্বলতার পরিচয়টাই লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তার আরও একটা দিক আছে—সেটা লোকে ভুলেচে।

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আপনার সে-দিকটা যেন লোকে ভুলেই থাকে আশুবাবু। কিন্তু তাও যদি না হয়, পরিচয়টা কি সর্ব্বাগ্রে দিতে হবে নিজের মেয়ের কাছেই ?

হাঁ, অবাধ্য মেয়ের কাছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, মা-মরা আমার ঐ একমাত্র সন্তান, কি করে যে মানুষ করেচি সে শুধু তিনিই জানেন যিনি পিতৃহৃদয় সৃষ্টি করেচেন। এর ব্যথা যে কি তা মুখে ব্যক্ত করতে গেলে তার বিকৃতি কেবল আমাকে নয়, সকল পিতার পিতা যিনি তাঁকে পর্য্যন্ত উপহাস করবে। তা ছাড়া তুমি বুঝবেই বা কি করে ? কিন্তু পিতার স্নেহই তো শুধু নয় কমল, তার কর্ত্তব্যও তো আছে ? শিবনাথকে আমি চিনতে পেরেচি। তার সর্ব্বনেশে গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষে করতে পারি এ-ছাড়া আর কোন পথই আমার চোখে পড়ে না। কাল তাদের চিঠি লিখে জানাবো এর পরে মণি যেন না আমার কাছে একটি কপর্দ্দকও আশা করে।

কিন্তু এ-চিঠি যদি তারা বিশ্বাস করতে না পারে ? যদি ভাবে এ রাগ বাবার বেশী-দিন থাকবে না, সেদিন নিজের অবিচার তিনি নিজেই সংশোধন করবেন, তা হলে ?

তা হলে তারা তার ফল ভোগ করবে। লেখার দায়িত্ব আমার, বিশ্বাস করার দায়িত্ব তাদের।

এই কি আপনি সত্যই স্থির করেচেন ?

হাঁ।

কমল নীরবে বসিয়া রহিল। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, চুপ করে রইলে যে কমল, জবাব দিলে না ?

কই, প্রশ্ন তো কিছুই করেননি ? সংসারে একের সঙ্গে অপরের মতের মিল না হলে যে শক্তিমান সে দুর্ব্বলকে দণ্ড দেয়। এ ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসচে। এতে বলবার কি আছে ?

আশুবাবুর ক্ষোভের সীমা রহিল না, বলিলেন, এ তোমার কি কথা কমল ? সন্তানের সঙ্গে পিতার তো শক্তি-পরীক্ষার সম্বন্ধ নয় যে দুর্ব্বল বলেই তাকে শাস্তি দিতে চাইচি ? কঠিন হওয়া যে কত কঠিন, সে কেবল পিতাই জানে, তবু যে এতবড় কঠোর সঙ্কল্প করেচি সে শুধু তাকে ভুল থেকে বাঁচাবো বলেই তো ? সত্যিই কি এ তুমি বুঝতে পারোনি ?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, পেরেচি। কিন্তু কথা আপনার না শুনে যদি সে ভুলই করে, তার দুঃখ সে পাবে। কিন্তু দুঃখ নিবারণ করতে পারলেন না বলে কি রাগ করে তার দুঃখের বোঝা সহস্র-গুণে বাড়িয়ে দেবেন ?

একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি তার সকল আত্মীয়ের পরমাত্মীয়। যে লোকটাকে অত্যন্ত মন্দ বলে জেনেচেন তারই হাতে নিজের মেয়েকে চিরদিনের মত নিঃস্ব নিরুপায় করে বিসর্জ্জন দেবেন, ফেরবার পথ তার কোনদিন কোন দিক থেকেই খোলা রাখবেন না ?

আশুবাবু বিহ্বল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁহার মুখে আসিল না— শুধু দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিবার পরে তিনি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, ফেরবার পথ এখনি আছে কমল, পরে নেই। স্বামী ত্যাগ করে যে ফেরা, জগদীশ্বর করুন সে যেন না আমাকে চোখে দেখতে হয়।

কমল কহিল, এ অন্যায়। বরঞ্চ আমি কামনা করি ভুল যদি কখনো তার নিজের চোখে ধরা পড়ে, সেদিন যেন না সংশোধনের পথ অবরুদ্ধ থাকে। এমনি করেই মানুষে আপনাকে শোধরাতে শোধরাতে আজ মানুষ হতে পেরেচে। ভুলকে তো ভয় নেই আশুবাবু, যতক্ষণ তার অন্যদিকে পথ খোলা থাকে। সেই পথটা চোখের সম্মুখে বন্ধ ঠেকচে বলেই আজ আপনার আশঙ্কার সীমা নেই।

মনোরমা কন্যা না হইয়া আর কেহ হইলে এই সোজা কথাটা তিনি সহজেই বুঝিতেন, কিন্তু একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যতের নিঃসন্দিগ্ধ দুর্গতি কমলের সকল আবেদন বিফল করিয়া দিল, শুধু অসংলগ্ন মিনতির স্বরে কহিলেন, না কমল, এ বিবাহ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই আমার চোখে পড়ে না। কোন উপায়ই কি তুমি বলে দিতে পারো না ?

আমি ? ইঙ্গিতটা কমল এতক্ষণে বুঝিল এবং ইহা স্পষ্ট করিতে গিয়া তাহার স্নিগ্ধ কণ্ঠ মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও মুহূর্ত্তের জন্যই। নীলিমার প্রতি চোখ পড়িতেই আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, না, এ-ব্যাপারে কোন সাহায্যই আপনাকে আমি করতে পারবো না। উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করার ভয় দেখালে সে ভয় পাবে কি না জানিনে, যদি পায় তখন এই কথাই বলবো যে, খাইয়ে পরিয়ে, ইস্কুল-কলেজের বই মুখস্থ করিয়ে মেয়েকে বড়ই করেচেন, কিন্তু মানুষ করতে পারেননি। সেই অভাব পূর্ণ করার সুযোগটুকু তার যদি দৈবাৎ এসে পড়ে থাকে, আমি হন্তারক হতে যাব কিসের জন্যে ?

কথাটা আশুবাবুর ভাল লাগিল না, কহিলেন, তুমি কি তা হলে বলতে চাও বাধা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয় ?

কমল কহিল, অন্ততঃ ভয় দেখিয়ে নয় এইটুকু বলতে পারি। আমি আপনার মেয়ে

হলে বাধা হয়ত পেতাম, কিন্তু এ-জীবনে আর কখনো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না। আমার বাবা আমাকে এইভাবেই গড়ে গিয়েছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, অসম্ভব নয় কমল, তোমার কল্যাণের পথ তিনি এইদিকেই দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পাইনে। তবু আমি পিতা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি শিবনাথকে কেউ যথার্থ ভালবাসা দিতে পারে না—এ তার মোহ। এ মিথ্যে এ ক্ষণস্থায়ী নেশার ঘোর যেদিন কেটে যাবে সেদিন মণির দুঃখের অন্ত থাকবে না। কিন্তু তখন তাঁকে বাঁচাবে কিসে?

কমল কহিল, নেশার মধ্যেই বরঞ্চ ভাবনা ছিল, কিন্তু সে ঘোর কেটে গিয়ে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠবে তখন তার আর ভয় নেই। তার স্বাস্থ্যই তখন তাকে রক্ষা করবে।

আশুবাবু অস্বীকার করিয়া বলিলেন, এ-সব কথার মার-প্যাচ কমল, যুক্তি নয়। সত্য এর থেকে অনেক দূরে। ভুলের দণ্ড তাকে বড় করেই পেতে হবে, ওকালতির জোরে তার অব্যাহতি মিলবে না।

কমল কহিল, অব্যাহতির ইঙ্গিত আমি করচি না আশুবাবু। ভুলের দণ্ড পেতে হয়, এ আমি জানি। তার দুঃখ আছে, কিন্তু লজ্জা নেই—মণি কাউকে ঠকাতে যায়নি, ভুল-ভেঙে সে যদি ফিরে আসে, তাকে মাথা হেঁট করে আসতে হবে না এই ভরসাই আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলাম।

তবু তো ভরসা পাইনে কমল। জানি, ভুল তার ভাঙবেই, কিন্তু তার পরেও যে তাকে দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে, তখন সে থাকবে কি নিয়ে? বাঁচবে কোন্ অবলম্বনে?

অমন কথা আপনি বলবেন না। মানুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা হ'তো, তার মূল্য ছিল না। সে একদিকের ক্ষতি আর একদিকের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে পূর্ণ করে তোলে, নইলে আমিই বা আজ বেঁচে থাকতুম কি করে? বরঞ্চ আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, ভুল যদি ভাঙে তখন যেন সে তাকে মুক্ত করে নিতে পারে, তখন যেন কোন লোভ, কোন ভয় না তাকে রাহুগ্রস্থ করে রাখে।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব দিতে বাধিল, কিন্তু স্বীকার করিতেও ঢের বেশী বাধিল। বহুক্ষণ পরে বলিলেন, পিতার দৃষ্টি দিয়ে আমি মণির ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার দেখতে পাই! তুমি কি তবুও সত্যিই বল যে আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়, নীরবে মেনে নেওয়াই কর্ত্তব্য?

আমি মা হলে মেনে নিতুম। তার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হয়ত আপনারই মত কষ্ট পেতুম, তবু এই উপায়ে বাধা দেবার আয়োজন করতুম না। মনে মনে বলতুম, এ-জীবনে যে-রহস্যের সামনে এসে আজ সে দাঁড়িয়েচে, সে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার চেয়েও বৃহৎ। একে স্বীকার করতেই হবে।

আশুবাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তবু বুঝতে পারলুম না কমল। শিবনাথের চরিত্র, তার সকল দুষ্কৃতির বিবরণ মণি জানে। একদিন এ-বাড়িতে আসতে দিতেও তার আপত্তি ছিল, কিন্তু আজ যে সম্মোহনে তার হিতাহিত-বোধ, তার সমস্ত নৈতিক বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সে ত যথার্থ ভালবাসা নয়, সে যাদু, সে মোহ; এ মিথ্যে যেমন করে হোক নিবারণ করাই পিতার কর্ত্তব্য।

এইবার কমল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং এতক্ষণ পরে উভয়ের চিন্তার প্রকৃতিগত প্রভেদ তাহার চোখে পড়িল। ইহাদের জাতিই আলাদা এবং প্রমাণের বস্তু নয় বলিয়াই এতক্ষণের এত আলোচনা একেবারেই সম্পূর্ণ বিফল হইল। যেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ সেদিকে সহস্র বর্ষ চোখ মেলিয়া থাকিলেও এ সত্যের সাক্ষাৎ মিলিবে না, কমল তাহা বুঝিল। সেই বুদ্ধির যাচাই, সেই হিতাহিতবোধ, সেই ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের অতি-সতর্ক হিসাব, সেই মজবুত বনিয়াদ গড়ার ইঞ্জিনীয়ার ডাকা। অঙ্ক কষিয়া ইহারা ভালবাসার ফল বাহির করিতে চায়। নিজের জীবনে আশুবাবু পত্নীকে একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। বহুদিন তিনি লোকান্তরিত, তথাপি আজও হয়ত তাহার মূল অন্তরে শিথিল হয় নাই—সংসারে ইহার তুলনা বিরল, এ-সবই সত্য, তবুও ইহারা ভিন্ন-জাতীয়।

ইহার ভাল-মন্দর প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করিবার মত নিষ্ফলতা আর নাই। দাম্পত্য-জীবনে একটাদিনের জন্যও পত্নীর সহিত আশুবাবুর মতভেদ ঘটে নাই, অন্তরে মালিন্য স্পর্শ করে নাই। নির্ব্বিঘ্ন শান্ত ও অবিচ্ছিন্ন আরামে যাহাদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কাটিয়াছে তাহার গৌরব ও মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করিবে কে? সংসার মুগ্ধচিত্তে ইহার স্তবগান করিয়াছে, এমনি দুর্লভ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কবি অমর হইয়াছে, স্বকীয় জীবনে ইহাকেই লাভ করিবার ব্যাকুলিত বাসনায় মানুষের লোভের অন্ত নাই। যাহার নিঃসন্দিগ্ধ মহিমা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠায় চিরদিন অবিচলিত, তাকে তুচ্ছ করিবে কমল কোন স্পর্দ্ধায়? কিন্তু মণি? যে দুঃশীল দুর্ভাগার হাতে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে সে উদ্যত, তাহার সব-কিছু জানিয়াও সমস্ত জানার বাহিরে পা বাড়াইতে আজ তাহার ভয় নাই। দুঃখময় পরিনাম-চিন্তায় পিতা শঙ্কিত, বন্ধুগণ বিষণ্ণ, কেবল সে-ই শুধু একাকী শঙ্কাহীন। আশুবাবু জানেন এ বিবাহে সম্মান নাই, শুভ নাই, বঞ্চনার পরে ভিত্তি, এ স্বল্পকালব্যাপী মোহ যেদিন টুটিবে তখন আজীবন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই রহিবে না—হয়ত সবই সত্য, কিন্তু সব গিয়াও এই প্রবঞ্চিত মেয়েটির যে-বস্তু বাকী থাকিবে সে যে পিতার শান্তি সুখময় দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য-জীবনের চেয়ে বড় এ কথা আশুবাবুকে সে কি দিয়া বুঝাইবে? পরিণামটা যাহার কাছে মূল্য নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড, তাহার সঙ্গে তর্ক চলিবে কেন? কমলের একমাত্র ইচ্ছা হইল বলে, আশুবাবু, মোহমাত্রই মিথ্যা নয়, কন্যার চিত্তাকাশে মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত

তড়িৎ-রেখাও হয়ত পিতার অনির্ব্বাপিত দীপ-শিখাকে দীপ্তি ও পরিমাপে অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু কিছুই না বলিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

পিতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া আশুবাবু উত্তরের অপেক্ষায় অধীর হইয়া ছিলেন, কিন্তু কমল নিরুত্তর নতমুখে তেমনি বসিয়া আছে; বেশ বুঝা গেল এ লইয়া সে আর বাদানুবাদ করিতে চাহে না। কথা নাই বলিয়া নয়, প্রয়োজন নাই বলিয়া। কিন্তু এমন করিয়া একজন মৌনাবলম্বন করিলে তো অপরের মন শান্তি মানে না। বস্তুতঃ এই প্রৌঢ় মানুষটির গভীর অন্তরে সত্যের প্রতি একটি সত্যকার নিষ্ঠা আছে, একমাত্র সন্তানের দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় লজ্জিত, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তাঁহার, মুখে যাই কেন না বলুন, জোর আছে বলিয়াই উদ্ধত স্পর্দ্ধায় জোর খাটানোর প্রতি তাঁহার গভীর বিতৃষ্ণা। কমলকে তিনি যত দেখিয়াছেন ততই তাঁহার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে! লোকচক্ষে সে হেয়, নিন্দিত; ভদ্র-সমাজে পরিত্যক্ত, সভায় ইহার নিমন্ত্রণ জুটে না, অথচ এই মেয়েটির নিঃশব্দ অবজ্ঞাকেই তাঁহার সবচেয়ে ভয়, ইহার কাছেই তাঁহার সঙ্কোচ ঘুচে না!

বলিলেন, কমল, তোমার বাবা য়ুরোপিয়ান, তবু তুমি কখনো সেদেশে যাওনি। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বহুদিন কেটেছে, তাদের অনেক-কিছু চোখে দেখেচি। অনেক ভালবাসার বিবাহ-উৎসবে যখন ডাক পড়েচে, আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েচি, আবার সে-বিবাহ যখন অনাদরে উপেক্ষায় অনাচারে অত্যাচারে ভেঙেচে তখনও চোখ মুছেচি। তুমি গেলেও ঠিক এমনি দেখতে পেতে।

কমল মুখ তুলিয়া বলিল, না গিয়েও দেখতে পাই আশুবাবু। ভাঙার নজির সেদেশে প্রত্যহ পুঞ্জিত হয়ে উঠেচে, ওঠবারই কথা, এও যেমন সত্যি, ওর থেকে তার স্বরূপ বুঝতে যাওয়াও তেমনি ভুল; ওটা বিচারের পদ্ধতিই নয় আশুবাবু।

আশুবাবু নিজের ভ্রম বুঝিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এমন করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলে না, সে থাক, কিন্তু আমার এই দেশটার পানে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি। যে-প্রথা আবহমানকাল ধরে চলে আসচে তার স্রষ্টিকর্ত্তাদের দূরদর্শিতা। এখানে দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীদের 'পরে নেই, আছে বাপ-মা গুরুজনদের 'পরে। তাই বিচার-বুদ্ধি এখানে আকুল-অসংযমে ঘুলিয়ে ওঠে না, একটা শান্ত অবচলিত মঙ্গল তাদের চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

কমল কহিল, কিন্তু মণি তো মঙ্গলের হিসেব করতে বসেনি আশুবাবু, সে চেয়েচে ভালবাসা। একটার হিসেব গুরুজনের সুযুক্তি দিয়ে মেলে, কিন্তু অন্যটার হিসেব হৃদয়ের দেবতা ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু তর্ক করে আপনাকে আমি মিথ্যে উত্ত্যক্ত করচি, যার ঘরে পশ্চিমের জানালা ছাড়া আর সকল দিকই বন্ধ, সে সূর্য্যের প্রত্যূষের আবির্ভাব দেখতে পায় না, দেখতে পায় শুধু তার প্রদোষের অবসান। কিন্তু

সেই চেহারা আর রঙের সাদৃশ্য মিলিয়ে তর্ক করতে থাকলে শুধু কথাই বাড়বে, মীমাংসায় পৌঁছুবে না। আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে, আজ আসি।

নীলিমা বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণে এত কথার মধ্যে একটি কথাও যোগ করে নাই, এখন করিল, আমিও সব কথা তোমার স্পষ্ট বুঝতে পারিনি কমল, কিন্তু এটুকু অনুভব করচি যে, ঘরের অন্যান্য জানালাগুলো খুলে দেওয়া চাই। এ তো চোখের দোষ নয়, দোষ বন্ধ বাতায়নের। নইলে যে-দিকটা খোলা আছে সেদিকে দাঁড়িয়ে আমরণ চেয়ে থাকলেও এ-ছাড়া কোন-কিছুই কোনদিন চোখে পড়বে না।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইতে আশুবাবু ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, যেয়ো না কমল, আর একটুখানি ব'সো। মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই, অবিশ্রাম বুকের ভেতরটায় যে কি করচে সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না। তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখি তোমার কথাগুলো যদি সত্যিই বুঝতে পারি। তুমি কি যথার্থ-ই বলচ আমি চুপ করে থাকি, আর এই কুশ্রী ব্যাপারটা হয়ে যাক?

কমল বলিল, মণি যদি তাঁকে ভালবেসে থাকে আমি তা কুশ্রী বলতে পারিনে।

কিন্তু এইটেই যে তোমাকে একশোবার বোঝাতে চাচ্চি কমল, এ মোহ, এ ভালবাসা নয়, এ-ভুল তার ভাঙবেই।

কমল কহিল, শুধু ভুলই যে ভাঙে তা নয় আশুবাবু, সত্যিকার ভালবাসাও সংসারে এমনি ভেঙে পড়ে। তাই অধিকাংশ ভালবাসার বিবাহই হয়ে যায় ক্ষণস্থায়ী। এই জন্যেই ও-দেশের এত দুর্নাম, এত বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার মামলা।

শুনিয়া আশুবাবু সহসা যেন একটা আলো দেখিতে পাইলেন, উচ্ছ্বসিত আগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, তাই বল কমল, তাই বল। এ যে আমি স্বচক্ষে অনেক দেখেছি।

নীলিমা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমাদের এ-দেশের বিবাহ প্রথা? তাকে তুমি কি বলো—সে যে সমস্ত জীবনে ভাঙে না কমল?

কমল কহিল, ভাঙবার কথাও নয় আশুবাবু। সে ত অনভিজ্ঞ-যৌবনের ক্ষ্যাপামি নয়, বহুদর্শী গুরুজনদের হিসেব-করা কারবার। স্বপ্নের মূলধন নয়—চোখ চেয়ে, পাকা-লোকের যাচাই-বাছাই-করা খাঁটি জিনিস। আঁকের মধ্যে মারাত্মক গলদ না থাকলে তাতে সহজে ফাটল ধরে না। এদেশ-ওদেশ সব দেশেই সে ভারি মজবুত, সারাজীবন বজ্রের মত টিকে থাকে।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, মুখে তাঁর উত্তর যোগাইল না।

নীলিমা নিঃশব্দে চাহিয়াই ছিল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সত্যিকার ভালবাসাও যদি ভুলের মতই সহজে ভেঙে পড়ে, মানুষ তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকী থাকবে কি?

কমল বলিল, যে-স্বর্গবাসের মেয়াদ ফুরুলো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র। আশুবাবুর শান্তি ও সুখের সীমা ছিল না, কিন্তু তার বেশি ওঁর পুঁজি নেই। ভাগ্য যাঁকে ঐটুকুমাত্র দিয়েই বিদায় করচে আমরা তাঁকে ক্ষমা করা ছাড়া আর কি করতে পারি দিদি?

একটুখানি থামিয়া বলিল; লোকে বাইরে থেকে হঠাৎ ভাবে বুঝি সব গেলো। বন্ধুজনের ভয়ের অন্ত থাকে না, দু'হাত দিয়ে পথ আগলাতে চায়, নিশ্চয় জানে তার হিসেবের বাইরে বুঝি সবই শূন্য। শূন্য নয় দিদি। সব গিয়ে যা হাতে থাকে মাণিকের মত তা হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরে। বস্তু-বাহুল্যে পথ-জুড়ে তা দিয়ে শোভাযাত্রা করা যায় না বলেই দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে, বলে ঐ ত সর্ব্বনাশ।

নীলিমা বলিল, বলার হেতু আছে কমল। মণিমাণিক্য সকলের জন্য নয়, সাধারণের জন্যেও নয়। আপাদ-মস্তক সোনা-রূপার গয়না না পেলে যাদের মন ওঠে না, তারা তোমার ঐ একফোঁটা হীরে-মাণিকের কদর বুঝবে না। যাদের অনেক চাই তারা গেরোর ওপর অনেক গেরো লাগিয়েই তবে নিশ্চিন্ত হতে পারে। অনেক ভার অনেক আয়োজন, অনেক জায়গা দিয়েই তবে জিনিসের দামের আন্দাজ তারা পায়। পশ্চিমের দরজা খুলে সূর্য্যোদয় দেখানোর চেষ্টা বৃথা হবে। কমল, আলোচনা বন্ধ থাক্।

আশুবাবুর মুখ দিয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, আস্তে আস্তে বলিলেন, বৃথা হবে কেন নীলিমা, বৃথা নয়। বেশ, চুপ করেই না হয় থাকবো।

নীলিমা কহিল, না, সে আপনি করবেন না। সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে, আর পিতার শুভ-বুদ্ধিতে নেই? এমন হতেই পারে না ওর পক্ষে যা সত্যি, মণির পক্ষে তা সত্যি না-ও হতে পারে। স্ত্রীর দুশ্চরিত্র স্বামী পরিত্যাগ করার মধ্যে যত সত্যিই থাক্, বেলার পক্ষে স্বামী-ত্যাগের মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই, আমি জোর করে বলতে পারি। সত্য স্বামীকে ত্যাগ করার মধ্যেও নেই, স্বামীর দাসীবৃত্তি করার মধ্যেও নেই, ও-দুটো শুধু ডাইনে-বাঁয়ের পথ, গন্তব্য স্থানটা আপনি খুঁজে নিতে হয়, তর্ক করে তার ঠিকানা মেলে না।

কমল নীরবে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা বলিতে লাগিল, সূর্য্যের আসাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে-যাওয়াটাও এমনি বড়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালবাসার সবটুকু হ'তো মেয়ের সম্বন্ধে বাপের দুশ্চিন্তার কথাই উঠত না—কিন্তু তা নয়। আমি বই পড়িনি, জ্ঞান-বুদ্ধি কম, তর্ক করে তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাওনি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস, কাড়াকাড়ি করে এদের

পাওয়া যায় না—অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।

তীক্ষ্ণধী কমল একনিমেষে বুঝিল উপস্থিত আলোচনায় ইহা অগ্রাহ্য। প্রতিবাদও নয়, সমর্থনও নয়, এ-সকল নীলিমার নিজস্ব আপন কথা। চাহিয়া দেখিল উজ্জ্বল দীপালোকে নীলিমার এলো-মেলো ঘন-কৃষ্ণ চুলের শ্যামল ছায়ায় সুন্দর মুখখানি অভাবিত শ্রী ধারণ করিয়াছে এবং প্রশান্ত চোখের সজল দৃষ্টি সকরুণ স্নিগ্ধতায় কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে। কমল মনে মনে কহিল, ইহা নবীন সূর্য্যোদয়, অথবা শ্রান্ত রবির অস্তগমন, এ বৃথা আরক্ত আভায় আকাশের যে-দিকটা আজ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক্-নির্ণয় না করিয়াই সে ইহার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে আশুবাবু সহসা চকিত হইয়া কহিলেন, কমল, তোমার কথাগুলি আমি আর একবার ভাল করে ভেবে দেখব, কিন্তু আমাদের কথাগুলোকেও তুমি এ-ভাবে অবজ্ঞা ক'রো না। বহু বহু মানবেই একে সত্য বলে স্বীকার করেচে; মিথ্যে দিয়ে কখন এত লোককে ভোলানো যায় না।

কমল অন্যমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কিন্তু জবাব দিল সে নীলিমাকে। কহিল, যা দিয়ে একটা ছেলেকে ভোলানো যায়, তাই দিয়ে লক্ষ ছেলেকেও ভোলানো যায়। সংখ্যা বাড়াটাই বুদ্ধি বাড়ার প্রমাণ নয় দিদি। একদিন যারা বলেছিল নর-নারীর ভালবাসার ইতিহাসটাই হচ্চে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পায় সবচেয়ে বেশী, কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল পুত্রের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন তারা মেয়েদের শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেদের বড় হওয়ার পথটাও বন্ধ করেছিল এবং সেই অসত্যের পরেই ভিত পুঁতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হ'লো না।

কিন্তু এ-কথা আমাকে কেন কমল?

কারণ আপনাকে জানানোই আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজন যে, চাটু-বাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বই নারীর চরম সার্থকতা, নারী-জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। জীবনে যে-কোন অবস্থায় অস্বীকার করুন দিদি, এ মিথ্যে নীতিটাকে কখনো যেন মেনে নেবেন না। এ আমার শেষ অনুরোধ। কিন্তু আর তর্ক নয়, আমি যাই।

আশুবাবু শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, এসো। নীচে তোমার জন্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কমল ব্যথার সহিত বলিল, আপনি আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু কোথাও আমাদের মিল নেই।

নীলিমা কহিল, আছে বৈ কি কমল। কিন্তু সে ত মনিবের ফরমাস-কাটা-

ছাটা মানান-করা মিল নয়, বিধাতার সৃষ্টির মিল। চেহারা আলাদা, কিন্তু রক্ত এক, চোখের আড়ালে শিরার মধ্য দিয়ে বয়। তাই বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক, ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ঘোচে না।

কমল কাছে আসিয়া আশুবাবুর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মেয়ের বদলে আমার ওপর কিন্তু রাগ করতে পারবেন না তা বলে দিচ্ছি।

আশুবাবু কিছুই বলিলেন না, শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, ইংরাজিতে emancipation বলে একটা কথা আছে; আপনি তো জানেন, পুরাকালে পিতার কঠোর অধীনতা থেকে সন্তানকে মুক্তি দেওয়াও তার একটা বড় অর্থ ছিল। সেদিন ছেলে-মেয়েরা মিলে কিন্তু এই শব্দটা তৈরী করেনি, করেছিল আপনাদের মত যাঁরা মস্ত বড় পিতা, নিজেদের বাঁধন-দড়ি আলগা করে যারা আপন কন্যা-সন্তানকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাঁরাই। আজকের দিনেও ইম্যান্‌সিপেশনের জন্য যত কোঁদলই মেয়েরা করি না কেন, দেবার আসল মালিক যে পুরুষেরা—আমরা মেয়েরা নই, জগৎ-ব্যবস্থায় এ সত্যটা আমি একটিদিনও ভুলিনে আশুবাবু। আমারও নিজের বাবা প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীর ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল সেদিন মনিবের জাতেরাই, নইলে দাসের দল কোঁদল করে, যুক্তির জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জ্জন করেনি। এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই নিয়ম; শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্ব্বলকে ত্রাণ করে। তেমনি নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব ত তাদেরই। মনোরমাকে মুক্তি দেবার ভার আপনার হাতে। মণি বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে ত সন্তানের মুক্তি থাকে না, থাকে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদের মধ্যে।

আশুবাবু এখনও কথা কহিতে পারিলেন না। এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মেয়েটি সংসারে অসম্মান, অমর্য্যাদার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু জন্মের সেই লজ্জাকর দুর্গতিকে অন্তরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া লোকান্তরিত পিতার প্রতি তাহার ভক্তি ও স্নেহের সীমা নাই।

যে-লোকটি ইহার পিতা তাঁহাকে তিনি দেখেন নাই, নিজের সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করাও কঠিন, তথাপি ইঁহারই উদ্দেশ্যে দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। নিজের মেয়ের বিচ্ছেদ ও বিরুদ্ধতা তাঁহাকে শূলের মত বিঁধিয়াছে, কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াও যে কি করিয়া মানুষকে সর্ব্বকালের মত বাঁধিয়া রাখা যায়, এই পরের মেয়েটির মুখপানে চাহিয়া যেন তাহার একটা আভাস পাইলেন এবং কাঁধের উপর হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, এবার আমি যাই—

আশুবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, এসো।

ইহার অধিক আর কিছু মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইল না

২৫

শীতের সূর্য্য অস্ত গেল। সায়াহ্ন-ছায়ায় ঘরের মধ্যেটা ঝাপ্সা হইয়াছে, একটা জরুরী সেলায়ের বাকীটুকু কমল আলো জ্বালার পূর্ব্বেই সারিয়া ফেলিতে চায়। অদূরে চৌকিতে বসিয়া অজিত। ভাবে বোধহয় কি একটা বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মনোরমা-শিবনাথের ব্যাপারটা বন্ধু-মহলে জানাজানি হইয়াছে। আজিকার প্রসঙ্গটা শুরু হইয়াছে সেই লইয়া। অজিতের গোড়ার বক্তব্যটা ছিল এই যে, এমনি একটা-কিছু যে শেষ পর্য্যন্ত গড়াইবে, তাহা সে আগ্রায় আসিয়াই সন্দেহ করিয়াছিল।

কিন্তু সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে কমল কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না।

তাহার পর হইতে অজিত অনর্গল বকিয়া অবশেষে এমন জায়গায় আসিয়া থামিয়াছে যেখানে অপর পক্ষের সাড়া না পাইলে আর অগ্রসর হওয়া চলে না।

কমল অত্যন্ত মনোযোগে সেলাই করিতেই লাগিল, যেন মাথা তুলিবার সময়টুকু নাই।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিল। আরো কতক্ষণ কাটিবে স্থিরতা নাই, অতএব অজিতকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইল, বলিল, আশ্চর্য্য এই যে, শিবনাথের আচরণ তোমার কাছে ধরাই পড়ল না।

কমল মুখ তুলিল না, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অর্থাৎ তুমি এতই সাদা-সিদে যে কোন সন্দেহ করনি, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

কেউ কি পারে না-পারে জানিনে, কিন্তু আপনিও পারবেন না?

অজিত বলিল, হয়ত পারি, কিন্তু তোমার মুখের পানে চেয়ে, এমনি পারিনে।

এইবার কমল মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, তাহলে চেয়ে দেখুন, বলুন পারেন কি না।

অজিতের চোখের দৃষ্টি জলিয়া উঠিল; কহিল, তোমার কথাই সত্য, তাকে অবিশ্বাস করনি বলেই তার ফল দাঁড়াল এই!

দাঁড়িয়েচে মানি, কিন্তু আপনার তরফে সন্দেহ করার সুফল কি পরিমাণ হাতে পেলেন সেটাও খুলে বলুন? এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কাজে মন দিল।

ইহার পর অজিত সংলগ্ন-অসংলগ্ন নানা কথা মিনিট দশ-পনের অবিচ্ছেদে বলিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া কহিল, কখনো হাঁ, কখনো না।, হেঁয়ালি ছাড়া কি তুমি কথা বলতে জানো না?

কমল হাতের সেলাইটা সোজা করিতে করিতে কহিল, মেয়েরা হেঁয়ালিই ভালবাসে, ওটা স্বভাব।

তা হলে সে-স্বভাবের প্রশংসা করতে পারিনে। স্পষ্ট বলতে একটু শেখো, নইলে সংসারের কাজ চলে না।

আপনিও হেঁয়ালি বুঝতে একটু শিখুন, নইলে ও পক্ষের অসুবিধেও এমনি হয়। এই বলিয়া সে হাতের কাজটা পাট করিয়া টুক্‌রিতে রাখিয়া বলিল, স্পষ্ট করার লোভ যাদের বড্ড বেশী, বক্তা হলে তারা খবরের কাগজে বক্তৃতা ছাপায়, লেখক হ'লে লেখে নিজের গ্রন্থের ভূমিকা, আর নাট্যকার হলে তারাই সাজে নিজের নাটকের নায়ক। ভাবে অক্ষরে যা প্রকাশ পেলে না হাত-পা নেড়ে তাকে ব্যক্ত করা চাই। তারা ভালবাসলে যে কি করে সেইটা শুধু জানিনে। কিন্তু একটু বসুন, আমি আলোটা জেলে আনি। এই বলিয়া সে দ্রুত উঠিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া সে আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া নীচে মেঝেতে বসিল।

অজিত বলিল, বক্তা বা লেখক বা নাট্যকার কোনটাই আমি নই, সুতরাং তাদের হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে পারব না, কিন্তু তারা ভালবাসলে কি করে জানি। তারা শৈব-বিবাহের ফন্দি আঁটে না—স্পষ্ট পরিচিত রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটে। তাদের অবর্ত্তমানে অন্যের খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়, আশ্রয়ের জন্য বাড়িওয়ালার শরণাপন্ন না হতে হয়, অসম্মানের আঘাত যেন না—

কমল মাঝখানে থামাইয়া দিয়া কহিল, হয়েচে, হয়েচে। হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তারা আগাগোড়া ইমারত এমন ভয়ানক নিরেট মজবুত করে গড়ে তোলে যে মড়ার কবর ছাড়া তাতে জ্যান্ত মানুষের দম ফেলবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত রাখে না। তারা সাধু লোক।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অনুরোধ আসিল, আমরা ভেতরে আসতে পারি?

কণ্ঠস্বর হরেন্দ্রর। কিন্তু আমরা কারা?

আসুন, আসুন, বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে কমল দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র এবং সঙ্গে আর একটি যুবক। হরেন্দ্র বলিল, সতীশকে আমাদের আশ্রমে তুমি একটিদিন মাত্র দেখেচ, তবু আশা করি তাকে ভোলোনি?

কমল হাসিমুখে কহিল, না, শুধু সেদিন ছিল কাপড়টা শাদা, আজ হয়েচে হলদে।

হরেন্দ্র বলিল, ওটা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের বাহ্যিক ঘোষণামাত্র, আর কিছু না। ও ৺কাশীধাম থেকে সদ্য-প্রত্যাগত, ঘণ্টা-দুয়ের বেশি নয়। ক্লান্ত, তদুপরি ও তোমার প্রতি প্রসন্ন নয়; তথাপি আমি আসছি শুনে ও আবেগ সংবরণ করতে পারলে না। ওটা আমাদের ব্রহ্মচারীদের মনের ঔদার্য্য, আর কিছু না। এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল, এই যে! আর একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পূর্ব্বাহ্ণেই সমুপস্থিত। যাক্, আর আশঙ্কার হেতু নেই, আমার আশ্রমটি ত ভাঙচে, কিন্তু আর একটা গজিয়ে উঠল বলে। এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দ্বিতীয় চৌকিটা সতীশকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, ব'সো; এবং নিজে গিয়া খাটের উপর বেশ করিয়া জাঁকিয়া বসিল। কমল দাঁড়াইয়া, গৃহে তৃতীয় আসন নাই দেখিয়া সতীশ বসিতে দ্বিধা করিতেছিল; হরেন্দ্র বুঝে নাই তাহা নয়, তবুও হরেন্দ্র সহাস্যে কহিল, ব'সো হে সতীশ, জাত যাবে না। কাশী-ফেরত যত উঁচুতেই উঠে থাকো, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে এ কথাটা ভুলো না।

না, সেজন্য নয়, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখ দেখিয়া কমল হাসিল, বলিল, খোঁচা দেওয়া আপনার মুখে সাজে না হরেন্দ্রবাবু। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও আপনি, মোহান্ত মহরাজও আপনি। ওঁরা বয়সে ছোট, পাণ্ডাগিরিতেও খাটো। ওঁদের কাজ শুধু আপনার উপদেশ ও আদেশ মেনে চলা, সুতরাং—

হরেন্দ্র কহিল, সুতরাংটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হয়ত আমিই, কিন্তু মোহান্ত ও মহারাজ হচ্চেন দুই বন্ধু সতীশ ও রাজেন। একজনের কাজ আমাকে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের কাজ ছিল সাধ্যমত আমাকে না মেনে চলা। একজনের ত পাত্তা নেই, অন্যজন ফিরে এলেন ঢের বেশী তত্ত্ব সঞ্চয় করে; ভয় হচ্চে ওর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়ত আর পেরে উঠবো না। এখন ভাবনা কেবল অর্দ্ধ-অভুক্ত ছেলের পাল নিয়ে। কাশী কাঞ্চী ঘুরিয়ে সেগুলোকেও ফিরিয়ে এনেচে। ইতিমধ্যে আচারনিষ্ঠার যে লেশমাত্র ত্রুটি ঘটেনি তা তাদের পানে চেয়েই বুঝেচি; শুধু ক্ষোভ এই যে, আর একটুখানি চেপে তপস্যা করালে ফিরে আসার গাড়ি-ভাড়াটা আমার আর লাগত না।

কমল ব্যথার সহিত প্রশ্ন করিল, ছেলেরা বুঝি খুব রোগা হয়ে গেছে?

হরেন্দ্র কহিল, রোগা! আশ্রম-পরিভাষায় হয়ত তার কি একটা নাম আছে—

সতীশ জানতেও পারে, কিন্তু আধুনিককালের আঁকা শুক্রাচার্য্যের তপোবনে কচের ছবি দেখেচ? দেখনি? তা হলে ঠিকটি উপলব্ধি করতে পারবে না। দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার তো হঠাৎ মনে হয়েছিল একদল কচ সার বেঁধে বুঝি স্বর্গ থেকে আশ্রমে এসে ঢুকেচে। একটা ভরসা পেলাম, আমাদের আশ্রমটা ভেঙে গেলে তারা না খেয়ে মারা যাবে না, দেশের কোন একটা কলা-ভবনে গিয়ে মডেলের কাজ নিতে পারবে।

কমল কহিল, লোকে বলে আপনি আশ্রম তুলে দিচ্চেন, এ কি সত্যি?

সত্যি। তোমার বাক্যবাণ আমার সহ্য হয় না। সতীশের এখানে আসার সেও একটা হেতু। ওর ধারণা তুমি আসলে ভারতীয় রমণী নও, তাই ভারতের নিগূঢ় সত্য বস্তুটিকে তুমি চিনতেই পারো না। সেইটি তোমাকেও ও বুঝিয়ে দিতে চায়। বুঝবে কি না তা তুমিই জানো; কিন্তু ওকে আশ্বাস দিয়েছি যে, আমি যাই করি না কেন ওদের ভয় নেই। কারণ চতুর্বিধ আশ্রমের কোন্ আশ্রমটি অজিতকুমার নিজে গ্রহণ করবেন সঠিক সংবাদ না পেলেও, পরম্পরায় এ-খবরটুকু পাওয়া গেছে যে, তিনি বহু অর্থ-ব্যয়ে এমন দশ-বিশটা আশ্রম নানা স্থানে খুলে দেবেন। ওঁর অর্থও আছে, দেবার সামর্থ্যও আছে। তার একটার নায়কত্ব সতীশের জুটবেই।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দানশীলতার মত দুষ্কৃতি চাপা দেবার এমন আচ্ছাদন আর নেই। কিন্তু ভারতের সত্য-বস্তুটি আমাকে বুঝিয়ে সতীশবাবুর লাভ কি হবে? আশ্রম তুলে দিতেও আমি হরেনবাবুকে বলিনি, টাকার জোরে ভারতবর্ষময় আশ্রম খুললেও আমি অজিতবাবুকে নিষেধ করব না। আমার আপত্তি শুধু ঐটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়ায়। তাতে কার কি ক্ষতি?

সতীশ বিনীত-কণ্ঠে বলিল, ক্ষতির পরিমাণ বাইরে দেখা যাবে না। কিন্তু তর্কের জন্য নয়, শিক্ষার্থী হিসাবে গোটা-কয়েক প্রশ্ন যদি করি তার কি উত্তর পাবো না?

কিন্তু আজ আমি বড় শ্রান্ত সতীশবাবু।

সতীশ এ আপত্তি কানে তুলিল না, বলিল, হরেনদা এইমাত্র তামাসা করে বললেন, আমি কাশী-ফেরত, যত উঁচুতেই উঠে থাকি, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে। সে এই ঘর। আমি জানি, আপনার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধার অবধি নেই—আশ্রম ভাঙলে ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনার কথায় ওঁর মন যদি ভাঙে সে লোকসান পূর্ণ হওয়া কঠিন।

কমল চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিতে লাগিল, রাজেনকে আপনি ভাল করেই জানেন, সে আমার বন্ধু। মূল বিষয়ে মতের মিল না থাকলে আমাদের বন্ধুত্ব হতে পারত না। তার মত ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির মধ্য দিয়ে স্বজাতির পরম কল্যাণ আমারও কাম্য। এই আশায় ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আমরা গড়ে তুলতে চাই।

নইলে মৃত্যুর পরে কল্প-কাল বৈকুণ্ঠবাসের লোভ আমাদের নেই। কিন্তু নিয়মের কঠোর বন্ধন ছাড়া তো কখন সত্য সৃষ্টি হয় না। আর শুধু ছেলেরাই তো নয়, সে বন্ধন আমরা নিজেরাও যে গ্রহণ করেচি। কষ্ট ওখানে আছে—থাকবেই তো। বহু শ্রম করে বৃহৎ বস্তু লাভ করার স্থানকেই তো আশ্রম বলে। তাতে উপহাসের তো কিছুই নয়।

জবাব না পাইয়া সতীশ বলিতে লাগিল, হরেনদার আশ্রম যাই হোক না কেন, সে-সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব না, কারণ সেটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়বার ভয় আছে। কিন্তু ভারতীয় আশ্রমের মধ্যে যে ভারতের অতীতের প্রতিই নিষ্ঠা ও পরম শ্রদ্ধা আছে এ তো অস্বীকার করা যায় না। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম এ-সকল শক্তিহীন অক্ষমের ধর্ম্ম নয়; জাতিগঠনের প্রাণ ও উপাদান সেদিন এর মধ্যেই নিহিত ছিল, আজ এ-যুগেও সে-উপাদান অবহেলার সামগ্রী নয়। মরণোন্মুখ ভারতকে শুধু কেবল এই পথেই আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। আশ্রমের আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাকেই জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন মন্ত্র-মুখরিত, হোমাগ্নি-প্রজ্বলিত, তপস্যা-কঠোর ভারতের এই আশ্রমই জাতি জীবনের একটা মৌলিক কল্যাণ সফল করবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল; সে প্রয়োজন আজও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, এ-সত্য কোন্ মূর্খ অস্বীকার করতে পারে?

সতীশের বক্তৃতায় আন্তরিকতার একটা জোর ছিল। কথাগুলি ভাল এবং নিরন্তর বলিয়া বলিয়া একপ্রকার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। শেষের দিকে তাহার মৃদু-কণ্ঠ সতেজ ও উদ্দীপনায় কালো-মুখ বেগুনে হইয়া উঠিল। সেইদিকে নিঃশব্দ ও নিষ্পলক-চক্ষে চাহিয়া সুপবিত্র ভাবাবেগে অজিতের আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং হরেন্দ্র তাহার আশ্রমের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে যত মৌখিক আস্ফালনই করিয়া থাক্; আশ্রমের বিগত গৌরবের বিবরণে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে সে ঝড়ের বেগে দোল খাইতে লাগিল। তাহারই মুখের প্রতি সতীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বলিল; হরেনদা, আমরা মরেচি, কিন্তু এই আশ্রমের মধ্যে দিয়েই যে আমাদের নবজন্ম-লাভের বিজ্ঞান আছে, এ সত্য ভুলতে যাচ্ছেন আপনি কোন্ যুক্তিতে? আপনি ভাঙতে চাচ্চেন, কিন্তু ভাঙাটাই কি বড়? গড়ে তোলা কি তার চেয়ে ঢের বেশি বড় নয়? আপনিই বলুন?

কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জীবনে ক'টা আশ্রম আপনি নিজের চোখে দেখেচেন? ক'টার সঙ্গে আপনার যথার্থ নিগূঢ় পরিচয় আছে।

কঠিন প্রশ্ন। কমল বলিল, বাস্তবিক একটাও দেখিনি এবং আপনাদেরটা ছাড়া কোনটার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই।

তবে?

কমল হাসিমুখে কহিল, চোখে কি সমস্তই দেখা যায়? আপনাদের আশ্রমে শ্রম করাটাই চোখে দেখে এলাম, কিন্তু বৃহৎ বস্তু লাভের ব্যাপারটা আড়ালেই রয়ে গেল।

সতীশ কহিল, আপনি আবার উপহাস করচেন।

তাহার ক্রুদ্ধ মুখের চেহারা দেখিয়া হরেন্দ্র স্নিগ্ধস্বরে বলিল, না না সতীশ, উপহাস নয়, উনি রহস্য করচেন মাত্র। ওটা ওঁর স্বভাব।

সতীশ কহিল, স্বভাব! স্বভাব বললেই ত কৈফিয়ত হয় না হরেনদা। ভারতের অতীত দিনের যা নিত্য-পূজনীয়, নিত্য-আচরণীয় ব্যাপার তাকেই অবমাননা, তাকেই অশ্রদ্ধা দেখান হয়। একে তো উপেক্ষা করা চলে না।

হরেন্দ্র কমলকে দেখাইয়া কহিল; এ বিতর্ক ওঁর সঙ্গে বহুবার হয়ে গেছে। উনি বলেন, অতীতের কোন দাম নেই। বস্তু অতীত হয় কালের ধর্ম্মে, কিন্তু তাকে হতে হয় নিজের গুণে। শুধু মাত্র প্রাচীন বলেই সে পূজ্য হয়ে ওঠে না। যে বর্ব্বর জাত একদিন তার বুড়ো বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো, আজও যদি সেই প্রাচীন অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে সে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করতে চায় তাকে তো ঠেকান যায় না সতীশ।

সতীশ ক্রুদ্ধ উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, প্রাচীন ভারতীয়ের সঙ্গে তো বর্ব্বরের তুলনা হয় না হরেনদা।

হরেন্দ্র বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু ওটা যুক্তি নয় সতীশ, ওটা গলার জোরের ব্যাপার।

সতীশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, আপনাকেও যে একদিন নাস্তিকতার ফাঁদে পড়তে হবে এ আমরা ভাবিনি হরেনদা।

হরেন্দ্র কহিল, তুমি জান আমি নাস্তিক নই। কিন্তু গাল দিয়ে শুধু অপমান করা যায় সতীশ, মতের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শক্ত কথাই সংসারে সব-চেয়ে দুর্ব্বল।

সতীশ লজ্জা পাইল। হেঁট হইয়া হাত দিয়া তাহার পা ছুঁইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, অপমান করিনি হরেনদা। আপনি তো জানেন আপনাকে কত ভক্তি করি আমরা; কিন্তু কষ্ট পাই যখন শুনি ভারতের শাশ্বত তপস্যাকেও আপনি অবিশ্বাস করেন। একদিন যে উপাদান যে-সাধনা দিয়ে তাঁরা এই ভারতের বিরাট জাতি বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, সে সত্য কখনো বিলুপ্ত হয়নি। আমি সোনার অক্ষরে স্পষ্ট দেখতে পাই, সেই ভারতের মজ্জাগত ধর্ম্ম, সেই আমাদের আপন জিনিস। সেই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট জাতটাকে আবার সেই উপাদান দিয়েই বাঁচিয়ে তোলা যায় হরেনদা, আর কোন পথ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না-ও যেতে পারে সতীশ। ও তোমার বিশ্বাস এবং তার দাম

শুধু তোমার নিজের কাছে। একদিন ঠিক এই-রকম কথার উত্তরে কমল বলেছিলেন, জগতের আদিম যুগে একদিন বিরাট অস্থি, বিরাট দেহ, বিরাট ক্ষুধা নিয়ে বিরাট জীব সৃষ্টি হয়েছিল ; তাই নিয়ে সে পৃথিবী জয় করে বেড়িয়েছিল—সেইদিন সেই ছিল তার সত্য উপাদান। কিন্তু আর একদিন সেই দেহ, সেই ক্ষুধাই এনে দিল তাকে মৃত্যু। একদিনের সত্য উপাদান আর একদিনের মিথ্যা উপাদান হয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করে সংসার থেকে মুছে দিলে ; এতটুকু দ্বিধা করলে না। সেই অস্থি আজ পাথরে রূপান্তরিত, প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু।

সতীশ হঠাৎ জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, তবে কি আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহদের আদর্শ ভ্রান্ত ? তাঁদের তত্ত্ব-নিরূপণের সত্য ছিল না ?

হরেন্দ্র বলিল, সেদিন ছিল হয়ত, কিন্তু আজ না থাকায় বাধা নেই। সেদিনের স্বর্গের পথ আজও যদি যমের দক্ষিণ দোরে এনে হাজির করে দেয়, মুখ ভার করবার হেতু পাইনে সতীশ।

সতীশ গূঢ় ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া কহিল, হরেনদা, এ-সব শুধু আপনাদের আধুনিক শিক্ষার ফল, আর কিছু নয়।

হরেন্দ্র বলিল, অসম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা যদি আধুনিককালের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে আমি লজ্জার কারণ দেখিনে সতীশ।

সতীশ বহুক্ষণ নির্ব্বাক্ স্তব্ধভাবে বসিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল, লজ্জার, সহস্র লজ্জার কারণ কিন্তু আমি দেখি হরেনদা। ভারতের জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব এই ভারতের বিশেষত্ব এবং প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে দেশকে যদি স্বাধীনতা-অর্জ্জন করতে হয়, তবে সেই স্বাধীনতায় ভারতের তো জয় হবে না, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্য রীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

তাহার বেদনা আন্তরিক। সেই ব্যথার পরিমাণ অনুভব করিয়া হরেন্দ্র মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল এবার কমল। মুখে সুপরিচিত পরিহাসের চিহ্নমাত্র নাই, কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত ও মৃদু ; বলিল, সতীশবাবু নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েচেন, সংস্কারের দিক দিয়েও যদি তাকে এমনি পরিত্যাগ করতে পারতেন, এ-কথা উপলব্ধি করা আজ কঠিন হ'তো না যে, ভাবের জন্য বিশেষত্বের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার সমাদর, মানুষের জন্যই তার দাম। মানুষ যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা-প্রতিষ্ঠায় ? নাই বা হ'লো ভারতের মতের জয়, মানুষের জয় তো হবে ? তখন মুক্তি পেয়ে এতগুলি নর-নারী ধন্য হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন ত নবীন তুর্কীর দিকে। যতদিন সে তার প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পুরুষ-পরম্পরাগত পুরানো পথটাকেই সত্য জেনে আঁকড়ে ধরেছিল, ততদিন তার

হয়েচে বারংবার পরাজয়। আজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সে সত্যকে পেয়েচে, তার সমস্ত আবর্জ্জনা ভেসে গেছে; আজ তাকে উপহাস করে সাধ্য কার? অথচ সেই প্রাচীন মত ও পথই একদিন দিয়েছিল তারে বিজয়, দিয়েছিল ঐশ্বর্য্য, কল্যাণ, দিয়েছিল মনুষ্যত্ব। ভেবেছিল, সেই বুঝি চিরন্তন সত্য। ভেবেছিল তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বিগত গৌরব আবার আজকের দিনেও ফিরিয়ে আনতে পারবে। মনেও করেনি তার বিবর্ত্তন আছে। আজ সেই মোহ গেল মরে, কিন্তু ওদের মানুষগুলো উঠলো বেঁচে। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে, আরও হবে। সতীশবাবু, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-অহঙ্কার এক বস্তু নয়।

সতীশ বলিল, জানি। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরাই যে মানুষের প্রশ্নের শেষ জবাব দিয়েচে এও তো না হতে পারে? তাদের সভ্যতাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এও তো সম্ভব?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ সম্ভব। আমার বিশ্বাস হবেও।

তবে?

কমল বলিল, তাতে ধিক্কার দেবার কিছুই নেই। সতীশবাবু, মন্দ তো ভালর শত্রু নয়, ভালর শত্রু তার চেয়ে যে আরও ভাল সে, সেই আরও ভাল যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে সেদিন তারই হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ওকে সরে যেতে হবে। একদিন শক, হুণ, তাতারের দল ভারতবর্ষ গায়ের জোরে দখল করেছিল, কিন্তু এর সভ্যতাকে বাঁধতে পারেনি, তারা আপনি বাঁধা পড়েছিল। এর কারণ কি জানেন? আসল কারণ তারা নিজেরাই ছিল ছোট। কিন্তু মোগল-পাঠানের পরীক্ষা বাকী রয়ে গেল, ফরাসী ইংরেজ এসে পড়ল বলে। সে মেয়াদ আজও বাজেয়াপ্ত হয়নি। ভারতের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতেই হবে। সে প্রশ্ন থাক্, কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগবে, কিন্তু তার কল্যাণে ঘা পড়বে না আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, না। যাদের আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি যাদের বালির উপর, তাদের কাছে এমনি করে বলতে থাকলেই হবে সর্ব্বনাশ। এই বলিয়া হরেন্দ্রর প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, ঠিক এইভাবেই একদিন বাঙলায়—সে বেশীদিন নয়, বিদেশের বিজ্ঞান, বিদেশের দর্শন, বিদেশের সভ্যতাকে মস্ত মনে করে সত্য-ভ্রষ্ট আদর্শ-ভ্রষ্ট জনকয়েক অসম্পূর্ণ শিক্ষার বিজাতীয় স্পর্দ্ধায় স্বদেশের যা-কিছু আপন তাকে তুচ্ছ করে দিয়ে দেশের মনকে বিক্ষিপ্ত কদাচারী করে তুলেছিল। কিন্তু এতবড় অকল্যাণ বিধাতার সইল না! প্রতিক্রিয়ায় বিবেক ফিরে এলো। ভুল ধরা পড়ল। সেই বিষম দুর্দ্দিনে মনস্বী যাঁরা স্বজাতির কেন্দ্রবিমুখ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে স্ব-গৃহের পানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁরা

শুধু বাঙলাদেশেরই নয়, সমস্ত ভারতের নমস্য। এই বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

কথাটা যে সত্য তাহা সবাই জানে। সুতরাং হরেন্দ্র অজিত উভয়েই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নমস্যদের উদ্দেশে নমস্কার জানাইল তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। অজিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, নইলে খুব বেশী লোকে হয়ত সে-সময় ক্রীশ্চান হয়ে যেতো। শুধু তাঁদের জন্যই সেটা হতে পারেনি, কথাটা বলিয়াই সে কমলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল চোখে তাহার অনুমোদন নাই, আছে শুধু তিরস্কার। অথচ চুপ করিয়াই আছে। হয়ত জবাব দিবার ইচ্ছাও ছিল না। অজিতকে সে চিনিত, কিন্তু হরেন্দ্র যখন ইহার অস্ফুট প্রতিধ্বনি করিল তখন তাহার অনতিকালপূর্ব্বের কথাগুলার সহিত এই সসঙ্কোচ জড়িয়া এমন বিসদৃশ শুনাইল যে সে নীরবে থাকিতে পারিল না। কহিল, হরেনবাবু, এক-ধরণের লোক আছে তারা ভূত মানে না, কিন্তু ভূতের ভয় করে। আপনি তাই। এবং একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। এমন অন্যায় আর কিছু হতেই পারে না। এদেশে আশ্রমের জন্য কখনো টাকার অভাব হবে না এবং ছেলের দুর্ভিক্ষও ঘটবে না, অতএব আপনি ছাড়াও সতীশবাবুর চলে যাবে, কিন্তু ওকে পরিত্যাগ করার মিথ্যাচার আপনাকে চিরদিন দুঃখ দেবে।

একটু থামিয়া বলিল, আমার বাবা ছিলেন ক্রীশ্চান, কিন্তু আমি যে কি সে খোঁজ তিনিও করেননি, আমিও করিনি। তাঁর প্রয়োজন ছিল না, আমার মনেও ছিল না। কামনা করি ধর্ম্মকে যেন আমরণ এমনি ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী বলে এইমাত্র যাদের গঞ্জনা দিলেন এবং নমস্য বলে যাঁদের নমস্কার করলেন, স্বদেশের সর্ব্বনাশের পাল্লায় কার দান ভারী, এ-প্রশ্নের জবাব একদিন লোকে চাইতে ভুলবে না।

সতীশের গায়ে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। তীব্র বেদনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন এঁদের নাম? কখন শুনেচেন কারো কাছে?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তা হলে সেইটে জেনে নিন।

কমল হাসিয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু নামের মোহ আমার নেই। নাম জানাটাকেই জানার শেষ বলে ভাবতে পারিনে।

প্রত্যুত্তরে সতীশ দুই চক্ষে শুধু অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষণ করিয়া ত্বরিত পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে যে রাগ করিয়া গেছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিবার মানসে হরেন্দ্র হাসির ভান করিয়া খানিক পরে বলিল, কমলের আকৃতিটা প্রাচ্যের, কিন্তু প্রকৃতিটা প্রতীচ্যের। একটা পড়ে চোখে, কিন্তু অপরটা

থাকে সম্পূর্ণ আড়ালে। এইখানেই হয় মানুষদের ভুল। ওর পরিবেশন করা খাবার গেলা যায়, কিন্তু হজম করতে গেলে বাধে। পেটের বত্রিশ নাড়িতে যেন মোচড় ধরে। আমাদের প্রাচীন কোন-কিছুর প্রতি ওর না আছে বিশ্বাস, না আছে দরদ। অকেজো বলে বাতিল করে দিতে ওর ব্যথা নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম নিক্তি হাতে পেলেই যে সূক্ষ্ম ওজন করা যায় না—এই কথাটা ও বুঝতেই পারে না।

কমল কহিল, পারি, শুধু দান নেবার বেলাতেই একটার বদলে অন্যটা নিতে পারিনে। আমার আপত্তি ঐখানে।

হরেন্দ্র বলিল, আশ্রমটা তুলে দেব আমি স্থির করেছি। ও-শিক্ষায় মানুষ হয়ে ছেলেরা দেশের মুক্তি—পরম কল্যাণকে ফিরিয়ে আনতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ জন্মেচে। কিন্তু দীন-হীন ঘরের যে-সব ছেলেকে সতীশ ঘর-ছাড়া করে এনেচে তাদের দিয়ে যে কি করব আমি তাই ভেবে পাইনে। সতীশের হাতে তুলে দিতেও ত তাদের পারব না।

কমল কহিল, পেরেও কাজ নেই! কিন্তু এদের নিয়ে অসাধারণ অলৌকিক কিছু একটা করে তুলতেও চাইবেন না। দীন-দুঃখীর ঘরের ছেলে সকল দেশেই আছে; তারা যেমন করে তাদের বড় করে তোলে তেমনি করেই এদের মানুষ করে তুলুন।

হরেন্দ্র বলিল, ঐখানে এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি কমল। মাস্টার-পণ্ডিত লাগিয়ে তাদের লেখা-পড়া শেখাতে হয়ত পারব, কিন্তু যে সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা তাদের আরম্ভ হয়েছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের মানুষ করা যাবে কি না সেই আমার ভয়।

কমল কহিল, হরেনবাবু, সকল জিনিসকেই অমন একান্ত করে আপনারা ভাবেন বলেই কোন প্রশ্নের আর সোজা জবাবটা পান না। সন্দেহ আসে, ওরা দেবতা গড়ে উঠবে, না হয়, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াবে। জগতের সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্রী আর চোখের সামনে থাকে না। পরায়ত্ত মন-গড়া অন্যায়ের বোধের দ্বারা সমস্ত মনকে শঙ্কায় ত্রস্ত মলিন করে রাখেন। সেদিন আশ্রমে যা দেখে এসেচি সে কি সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা? ওরা পেয়েচে কি? পেয়েচে অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা, পেয়েচে অনধিকার, পেয়েচে প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা। চীনাদের দেশে জন্ম থেকে মেয়েদের পা ছোট করা হয়, পুরুষেরাও তাকে বলে সুন্দর, সে আমার সয়, কিন্তু মেয়েদের সেই নিজেদের পঙ্গু, বিকৃত পায়ের সৌন্দর্যে যখন নিজেরাই মোহিত হয় তখন আশা করার কিছু থাকে না। আপনারা নিজেদের কৃতিত্বে মগ্ন হয়ে রইলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবারা কেমন আছ বল তো? ছেলেরা একবাক্যে বললে, খুব ভাল আছি। একবার ভাবলেও না। ভাবাটাও তাদের শেষ হয়ে গেছে, এমনি শাসন! নীলিমাদিদি আমার পানে চেয়ে বোধ করি এর উত্তর চাইলেন, কিন্তু বুক

চাপড়ে কাঁদা ভিন্ন আমি আর এ-কথার উত্তর খুঁজে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, ভবিষ্যতে এরাই আনবে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে।

হরেন্দ্র কহিল, ছেলেদের কথা যাক, কিন্তু রাজেন, সতীশ এরা তো যুবক? এরাও তো সর্ব্বত্যাগী?

কমল বলিল, রাজেনকে আপনারা চেনেন না, সুতরাং সেও যাক। কিন্তু বৈরাগ্য যৌবনকেই তো বেশী পেয়ে বসে। ও যেখানে শক্তি, সেখানে বিরুদ্ধ-শক্তি ছাড়া তাকে বশ করবে কে?

হরেন্দ্র বলিল, রাগ ক'রো না কমল, কিন্তু তোমার রক্তে ত বৈরাগ্য নেই। তোমার বাবা ইয়ুরোপিয়ন, তাঁর হাতে তোমার শিশু-জীবন গড়ে উঠেচে। মা এদেশের, কিন্তু তাঁর কথা না তোলাই ভাল। দেহে রূপ ছাড়া বোধ হয় সেদিক থেকে কিছুই পাওনি! তাই পশ্চিমের শিক্ষায় ভোগটাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় বলে জেনেচ।

কমল কহিল, রাগ করিনি হরেনবাবু। কিন্তু এমন কথা আপনি বলবেন না। কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় করে নিয়ে কোন জাত কখনো বড়ো হয়ে উঠতে পারে না। মুসলমানেরা যখন এই ভুল করলে তখন তাদের ত্যাগও গেলো, ভোগও ছুটলো। এই ভুল করলে ওরাও মরবে। পশ্চিম তো আর জগৎ ছাড়া নয়, সে-বিধান উপেক্ষা করে কারও বাঁচবার জো নেই। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তখন কিন্তু মুচকে হেসে আপনারাও বলবার দিন পাবেন, কেমন! বলেছিলাম তো! দিন-কয়েকের নাচন-কোঁদন ওদের যে ফুরুবে সে আমরা জানতাম। কিন্তু চেয়ে দেখো, আমরা আগাগোড়া টিকে আছি। বলিতে বলিতে স্নিগ্ধ বিমল-হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ বিকশিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র কহিল, সেইদিনই যেন আসে।

কমল কহিল, অমন কথা বলতে নেই হরেনবাবু। অতবড় জাত যদি মাথা নীচু করে পড়ে, তার ধুলোয় জগতের অনেক আলোই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের সেটা দুর্দ্দিন।

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তার এখনো দেরি আছে, কিন্তু নিজে দুর্দ্দিনের আভাস পাচ্চি। অনেক আলোই নিবু নিবু হয়ে আসচে। পিতার কাছে নেবানোর কৌশলটাই জেনেছিলে কমল, জ্বালাবার বিদ্যে শেখোনি। আচ্ছা চললাম। অজিতবাবুর কি বিলম্ব আছে?

অজিত উঠি উঠি করিল, কিন্তু উঠিল না।

কমল বলিল, হরেনবাবু, আলো পথের ওপর না পড়ে চোখের ওপর পড়লে থানায় পড়তে হয়। সে আলো যে নেবায় তাকে বন্ধু বলে জানবেন।

হরেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিল, কহিল, অনেক সময় মনে হয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় কুক্ষণে হয়েছিল। সে প্রত্যয়ের জোর আমার নেই, তবু বলতে পারি, যত বিদ্যে, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পুরুষকারের জৌলুস ওরা দেখাক ভারতের কাছে সে-সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

কমল বলিল, এ যেন ক্লাশে প্রমোশন না পাওয়া ছেলের এম.এ. পাশ করাকে ধিক্কার দেওয়া। হরেনবাবু, আত্ম-মর্য্যাদাবোধ বলে যেমন একটা কথা আছে, বড়াই-করা বলেও তেমনি একটা কথা আছে।

হরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল, কহিল, কথা অনেক আছে। কিন্তু এই ভারতই একদিন সকল দিক দিয়েই জগতের গুরু ছিল, তখন অনেকের পূর্ব্বপুরুষ হয়ত গাছের ডালে ডালে বেড়াতো। আবার এই ভারতবর্ষই আর একদিন জগতে সেই শিক্ষকের আসনই অধিকার করবে। করবেই করবে।

কমল রাগ করিল না, হাসিল। বলিল, আজ তারা ডাল ছেড়ে মাটিতে নেবেছে। কিন্তু কোন্ মহা-অতীতে একজনের পূর্ব্বপুরুষ পৃথিবীর গুরু ছিল এবং কোন্ মহা-ভবিষ্যতে আবার তার বংশধর পৈতৃক পেশা ফিরে পাবে এ আলোচনায় সুখ পেতে হলে অজিতবাবুকে ধরুন। আমার অনেক কাজ।

হরেন্দ্র বলিল, আচ্ছা, নমস্কার! আজ আসি! বলিয়া বিষণ্ণ গম্ভীর-মুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

২৬

আট-দশদিন পরে কমল আশুবাবুর বাটীতে দেখা করিতে আসিল। যাহাদের লইয়া এই আখ্যায়িকা তাহাদের জীবনের এই কয়দিনে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেছে। অথচ আকস্মিকও নয় অপ্রত্যাশিতও নয়। কিছুকাল হইতে এলো-মেলো বাতাসে ভাসিয়া টুকরা মেঘের রাশি আকাশে নিরন্তর জমা হইতেছিল; ইহার পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় ছিল না, ঘটিলও তাই।

ফটকের দরওয়ান অনুপস্থিত। বাটীর নীচের বারান্দায় সাধারণতঃ কেহ বসিত না, তথাপি খানকয়েক চৌকি, মেজ ও দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা বড়লোকের ছবি টাঙান ছিল, আজ সেগুলি অন্তর্হিত। শুধু ছাদ হইতে লম্বমান কালি-মাখান লণ্ঠনটা এখনও ঝুলিতেছে। স্থানে স্থানে আবর্জ্জনা জমিয়াছে, সেগুলি পরিষ্কার

করিবার আর বোধ হয় আবশ্যক ছিল না। কেমন একটা শ্রীহীন ভাব; গৃহস্বামী যে পলায়নোন্মুখ তাহা চাইলেই বুঝা যায়। কমল উপরে উঠিয়া আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেলা অপরাহ্ণের কাছাকাছি, তিনি আগেকার মতই চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়া ছিলেন, ঘরে আর কেহ ছিল না, পর্দ্দা সরানোর শব্দে তিনি চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। কমলকে বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই। একটু বেশীমাত্রায় খুশী হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন, কমল যে এসো—মা এসো।

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কমলের বুকে ঘা লাগিল—এ কি! আপনাকে যে বুড়োর মত দেখাচ্ছে কাকাবাবু?

আশুবাবু হাসিলেন—বুড়ো? সে তো ভগবানের আশীর্ব্বাদ কমল। ভেতরে ভেতরে বয়স যখন বাড়ে, বাইরে তখন বুড়ো না-দেখানোর মত দুর্ভোগ আর নেই। ছেলেবেলায় টাক পড়ার মতই করুণ।

কিন্তু শরীরটাও তো ভাল দেখাচ্চে না।

না। কিন্তু আর বিস্তারিত প্রশ্নের অবকাশ দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন আছ কমল?

ভাল আছি। আমার তো কখনো অসুখ করে না কাকাবাবু।

তা জানি। না দেহের, না মনের। তার কারণ তোমার লোভ নেই। কিছুই চাও না বলে ভগবান দু'হাতে ঢেলে দেন।

আমাকে? দিতে কি দেখলেন বলুন তো?

আশুবাবু কহিলেন, এ তো ডেপুটির আদালত নয় মা, যে ধমক দিয়ে মামলা জিতে নেবে? তা সে যাই হোক, তবু মানি যে দুনিয়ার বিচারে নিজেও বড় কম পাইনি। তাই তো আজ সকালে থলি ঝেড়ে ফর্দ্দ মিলিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম শূন্যের অঙ্কগুলোই এতদিন তহবিল ফাঁপিয়ে রেখেছে—অন্তঃসারহীন থলিটার মোটা চেহারা মানুষের চোখকে কেবল নিছক ঠকিয়েচে ভেতরে কোন বস্তু নেই। লোক শুধু ভুল করেই ভাবে মা, গনিত-শাস্ত্রের নির্দ্দেশে শূন্যের দাম আছে। আমি তো দেখি কিচ্ছু নেই। একের ডানদিকে ওরা সার বেঁধে দাঁড়ালে একই এককোটি হয়, শূন্যর সংখ্যাগুলো ভিড় করার জোরে শূন্য কোটি হয়ে ওঠে না। পদার্থ যেখানে নেই, ওগুলো সেখানে শুধু মায়া। আমার পাওয়াটাও ঠিক তাই।

কমল তর্ক করিল না, তাঁহার কাছে গিয়া চৌকি টানিয়া বসিল। তিনি ডান-হাতটি কমলের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, মা, এবার সত্যিই তো যাবার সময় হ'লো, কাল-পরশু যে চললাম। বুড়ো হয়েচি, আবার যে কখনো দেখা হবে ভাবতে ভরসা পাইনে। কিন্তু এটুকু ভরসা পাই যে আমাকে তুমি ভুলবে না।

কমল কহিল, না ভুলবো না। দেখাও আবার হবে। আপনার থলিটা শূন্য

ঠেকচে বলে আমার থলিটা শূন্য দিয়ে ভরিয়ে রাখিনি কাকাবাবু, তারা সত্যি-সত্যিই পদার্থ—মায়া নয়।

আশুবাবু এ কথার জবাব দিলেন না, কিন্তু বুঝিলেন, এই মেয়েটি একবিন্দুও মিথ্যে বলে নাই।

কমল কহিল, আপনি এখনো আছেন বটে, কিন্তু আপনার মনটা এদেশ থেকে বিদেয় নিয়েচে তা বাড়িতে ঢুকেই টের পেয়েচি। এখানে আর আপনাকে ধরে রাখা যাবে না। কোথায় যাবেন? কলকাতায়?

আশুবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, না ওখানে নয়। এবার একটু দূরে যাবো কল্পনা করেচি। পুরানো বন্ধুদের কথা দিয়েছিলাম, যদি বেঁচে থাকি আর একবার দেখা করে যাবো। এখানে তোমারো ত কোন কাজ নেই কমল, যাবে মা আমার সঙ্গে বিলেতে? আর যদি ফিরতে না পারি, তোমার মুখ থেকে কেউ খবরটা পেতেও পারবে।

এই অনুদ্দিষ্ট সর্ব্বনামের উদ্দিষ্ট যে কে কমলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু এই অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট করিয়া বেদনা দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, বুড়োকে সেবা করতে হবে না। এই অকর্ম্মণ্য দেহটার দাম তো ভারী, এটাকে বয়ে বেড়াবার অজুহাতে আমি মানুষের কাছে ঋণ আর বাড়াবো না। কিন্তু কে জানত কমল, এই মাংস-পিণ্ডটাকে অবলম্বন ক'রেও প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠতে পারে। মনে হয় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। এতবড় বিস্ময়ের ব্যাপারও যে জগতে ঘটে, এ কে কবে ভাবতে পেরেচে!

কমল সন্দেহে চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাদিকে দেখচিনে কেন কাকাবাবু, তিনি কোথায়?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় তাঁর ঘরেই আছেন, কাল সকাল থেকেই আর দেখতে পাইনি। শুনলাম হরেন্দ্র এসে তার বাসায় নিয়ে যাবে।

তাঁর আশ্রমে?

আশ্রম আর নেই। সতীশ চলে গেছে, কয়েকটি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। শুধু চার-পাঁচজন ছেলেকে হরেন্দ্র ছেড়ে দেয়নি, তারাই আছে। এদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, এদের সে নিজের আইডিয়া দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলবে এই তার কল্পনা। তুমি শোননি বুঝি? আর কার কাছেই বা শুনবে।

একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিলেন, পরশু সন্ধ্যাবেলায় ভদ্রলোকেরা চলে গেলে অসমাপ্ত চিঠিখানি শেষ করে নীলিমাকে পড়ে শোনালাম। ক'দিন থেকে সে সদাই যেন অন্যমনস্ক, বড় একটা দেখাও পাইনে। চিঠিটা ছিল আমার কলকাতার কর্ম্মচারীর ওপর, আমার বিলেত যাবার সকল আয়োজন শীঘ্রই সম্পূর্ণ করে ফেলবার

তাগিদ। একটা নতুন উইলের খসড়া পাঠিয়েছিলাম, হয়ত এই আমার শেষ উইল, এটর্নিকে দেখিয়ে নাম সইয়ের জন্য এটাও ফিরে পাঠাতে বলেছিলাম। অন্যান্য আদেশও ছিল। নীলিমা কি একটা সেলাই করছিল, ভাল-মন্দ কোন সাড়া পাইনে দেখে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার হাতের সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে, মাথাটা চৌকির বাজুতে লুটিয়ে পড়েছে, চোখ বোজা, মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত শাদা। কি যে হ'লো হঠাৎ ভেবে পেলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে মেঝেতে শোয়ালাম, গ্লাসে জল ছিল চোখে-মুখে ঝাপ্টা দিলাম, পাখার অভাবে খবরের কাগজটা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম, চাকরটাকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। বোধ করি মিনিট দুই-তিনের বেশী নয়, সে চোখ চেয়ে শশব্যস্তে উঠে বসলো, একবার সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠল, তার পরে উপুড় হয়ে আমার কোলের উপর মুখ চেপে হু হু করে কেঁদে উঠল। সে কি কান্না! মনে হ'লো বুঝি তার বুক ফেটে যায় বা! অনেকক্ষণ পরে তুলে বসালাম, কতদিনের কত কথা, কত ঘটনাই মনে পড়ল, আমার বুঝতে কিছুই বাকী রইল না!

কমল নিঃশব্দে তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

আশুবাবু একমুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করিয়া বলিলেন, খুব সম্ভব মিনিট দুই-তিন। এ অবস্থায় তাকে কি যে বলব আমি ভেবে পাবার আগেই নীলিমা তীরের মত উঠে দাঁড়াল, একবার চাইলেও না, ঘর থেকে বার হয়ে গেল। না বললে সে একটা কথা, না বললাম আমি। তার পরে আর দেখা হয়নি।

কমল জিজ্ঞাসা কবিল, এ কি আগে আপনি বুঝতে পারেন নি?

আশুবাবু বলিলেন, না। স্বপ্নেও ভাবিনি। আর কেউ হলে সন্দেহ হ'তো এ শুধু ছলনা, শুধু স্বার্থ। কিন্তু এঁর সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাও অপরাধ। এ কি আশ্চর্য্য মেয়েদের মন! এই রোগাতুর জীর্ণ দেহ, এই অক্ষম অবসন্ন চিত্ত, এই জীবনের অপরাহ্নবেলায় জীবনের দাম যার কানাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতীর মন আকৃষ্ট হতে পারে, এতবড় বিস্ময় জগতে কি আছে! অথচ এ সত্য, এর এতটুকুও মিথ্যে নয়। এই বলিয়া এই সদাচারী প্রৌঢ় মানুষটি ক্ষোভে বেদনায় ও অকপট লজ্জায় নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই বুদ্ধিমতী নারী আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না। শুধু চায় আমাকে যত্ন করতে, শুধু চায় সেবার অভাবে জীবনের নিঃসঙ্গ বাকী দিন কটা যেন না আমার দুঃখে শেষ হয়। শুধু দয়া আর অকৃত্রিম করুণা।

কমল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বেলা বিবাহ-বিচ্ছেদের যখন মামলা আনে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। কথায় কথায় সেদিন এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় নীলিমা অত্যন্ত রাগ করেছিল। তারপর থেকে বেলাকে ও যেন কিছুতেই

সহ্য করতে পারছিল না। নিজের স্বামীকে এমনি করে সর্ব্বসাধারণের কাছে লজ্জিত অপদস্থ ক'রে এই প্রতিহিংসার ব্যাপারটা নীলিমা কিছুতেই অন্তরে মেনে নিতে পারলে না। ও বলে, তাঁকে ত্যাগ করাটাই তো বড় নয়, তাঁকে ফিরে পাবার সাধনাই স্ত্রীর পরম সার্থকতা। অপমানের শোধ নেওয়াতেই স্ত্রীর সত্যকার মর্য্যাদা নষ্ট হয়, নইলে ও তো কষ্টিপাথর, ওতে যাচাই করেই ভালবাসার মূল্য ধার্য্য হয়। আর এ কেমনতর আত্মসম্মান-জ্ঞান? যাকে অসম্মানে দূর করেচি, তারই কাছে হাত পেতে নেওয়া নিজের খাওয়া-পরার দাম? কেন, গলায় দেবার দড়ি জুটলো না? শুনে আমি ভাবতাম নীলিমার এ অন্যায়, এ বাড়াবাড়ি। আজ ভাবি, ভালবাসায় পারে না কি? রূপ, যৌবন, সম্মান, সম্পদ কিছুই নয় মা, ক্ষমাটাই ওর সত্যিকার প্রাণ! ও যেখানে নেই, সেখানে ও শুধু বিড়ম্বনা। সেখানেই ওঠে রূপ-যৌবনের বিচার-বিতর্ক, সেখানেই আসে আত্মমর্যাদা-বোধের টাগ-অব-ওয়ার!

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তুমি ওর আদর্শ, কিন্তু চাঁদের আলো যেন সূর্য্য-কিরণকে ছাপিয়ে গেল। তোমার কাছে ও যা পেয়েচে, অন্তরের রসে ভিজিয়ে স্নিগ্ধ-মাধুর্য্যে কতদিকেই না ছড়িয়ে দিলে। এই দুটো দিনে আমি দুশো বচ্ছরের ভাবনা ভেবেচি কমল। স্ত্রীর ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম, তার স্বাদ চিনি, স্বরূপ জানি; কিন্তু নারীর ভালবাসার যে কেবল একটিমাত্র দিক, এই নতুন তত্ত্বটি আমাকে যেন হঠাৎ আচ্ছন্ন করেচে। এর কত বাধা, কত ব্যথা, আপনাকে বিসর্জ্জন দেবার কতই না অজানা আয়োজন। হাত পেতে নিতে পারলাম না বটে, কিন্তু কি বলে যে একে আজ নমস্কার জানাবো আমি ভেবেই পাইনে মা।

কমল বুঝিল, পত্নী-প্রেমের সুদীর্ঘ ছায়া এতদিন যে সকল দিক আঁধার করিয়াছিল তাহাই আজ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

আশুবাবু বলিলেন, ভাল কথা। মণিকে আমি ক্ষমা করেচি। বাপের অভিমানকে আর তাকে চোখ রাঙাতে দেব না। জানি সে দুঃখ পাবেই, জগতের বিধিবদ্ধ শাসন তাকে অব্যাহতি দেবে না। অনুমতি দিতে পারব না, কিন্তু যাবার সময় এই আশীর্ব্বাদটুকু রেখে যাবো, দুঃখের মধ্য দিয়ে সে আপনাকে একদিন যেন আবার খুঁজে পায়। তার ভুল-ভ্রান্তি-ভালবাসা—ভগবান তাদের যেন সুবিচার করেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তাঁহার মোটা হাতটির উপর কমল ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অনেকক্ষণ পরে মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, নীলিমাদিদির সম্বন্ধে কি স্থির করলেন?

আশুবাবু অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, কিসে যেন তাঁহাকে ঠেলিয়া

তুলিয়া দিল; বলিলেন, দেখ মা, তোমাকে আগেও বোঝাতে পারিনি, এখনো পারব না। হয়ত আজ আর সামর্থ্যও নেই। কিন্তু কখনো এ-সংশয় আসেনি যে, একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মানুষের সত্য আদর্শ নয়। নীলিমার ভালবাসাকে সন্দেহ করিনি, কিন্তু সেও যেমন সত্যি, তাকে প্রত্যাখান করাও আমার তেমনি সত্যি। কোনমতেই, একে নিষ্ফল আত্মবঞ্চনা বলতে পারব না। এ তর্কে মিলবে না, কিন্তু এই নিষ্ফলতার মধ্যে দিয়েই মানুষ এগিয়ে যাবে। কোথায় যাবে জানিনে, কিন্তু যাবেই। সে আমার কল্পনার অতীত, কিন্তু এতবড় ব্যথার দান মানুষে একদিন পাবেই পাবে। নইলে জগৎ মিথ্যে, সৃষ্টি মিথ্যে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, এই যে নীলিমা—কোন মানুষেরই যে অমূল্য সম্পদ—কোথাও তার আজ দাঁড়াবার স্থান নেই। তার ব্যর্থতা আমার বাকী দিনগুলোকে শূলের মত বিঁধবে। ভাবি সে আর যদি কাউকে ভালবাসত। এ তার কি ভুল!

কমল কহিল, ভুল সংশোধনের দিন তো আর শেষ হয়ে যায়নি কাকাবাবু।

কি-রকম? সে কি আবার কাউকে ভালবাসতে পারে তুমি মনে করো?

অন্ততঃ অসম্ভব তো নয়। আপনার জীবনে যে এমন ঘটতে পারে তাই কি কখনো সম্ভব মনে করেছিলেন?

কিন্তু নীলিমা? তার মত মেয়ে?

কমল বলিল, তা জানিনে। কিন্তু যাকে পেলে না, পাওয়া যাবে না, তাকেই স্মরণ করে সারাজীবন ব্যর্থ নিরাশায় কাটুক এই কি তার জন্য আপনি প্রার্থনা করেন।

আশুবাবুর মুখের দীপ্তি অনেকখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন, না, সে প্রার্থনা করিনে। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝবে না কমল। আমি যা পারি, তুমি তা পার না। সত্যের মূলগত সংস্কার তোমার এবং আমার জীবনের এক নয়, একান্ত বিভিন্ন। এই জীবনটাকেই যারা মানব-আত্মার চরম প্রাপ্তি বলে জেনেচে তাদের উপেক্ষা করা চলে না, তৃষ্ণার শেষবিন্দু জল এ-জীবনেই তাদের নিঃশেষে পান করে না নিলেই নয়; কিন্তু আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করার সময় আমাদের অনন্ত—উপুড় হয়ে শুয়ে খাবার প্রয়োজন হয় না।

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, এ-কথা মানি কাকাবাবু। কিন্তু তাই বলে ত আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মানতে পারব না। আকাশ-কুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তরকাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য্য থাকবে না। যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে-ফলে শোভায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের

আশায় ইহলোককে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। কাকাবাবু, এমনি করেই আপনারা আনন্দ থেকে, সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। ইহকালকে তুচ্ছ করেচেন বলে ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে আজ তুচ্ছ করে দিয়েচে। নীলিমাদিদির দেখা পাবো কি না জানিনে, যদি পাই তাঁকে এই কথাই বলে যাবো।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু সহসা জোর করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—যাচ্চো মা? কিন্তু তুমি যাবে মনে হ'লেই বুকের ভিতরটা যে হাহাকার করে ওঠে।

কমল বসিয়া পড়িল, বলিল, কিন্তু আপনাকে তো আমি কোন দিক থেকেই ভরসা দিতে পারিনে। দেহ মনে যখন আপনি অত্যন্ত পীড়িত, সান্ত্বনা দেয়াই যখন সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন সকল দিক দিয়েই আমি যেন কেবলি আঘাত দিতে থাকি। তবুও কারও চেয়ে আপনাকে আমি কম ভালবাসিনে কাকাবাবু।

আশুবাবু নীরবে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তা ছাড়া নীলিমা, এই কি সহজ বিস্ময়! কিন্তু এর কারণ কি জানো কমল?

কমল স্মিত-মুখে কহিল, বোধ হয় আপনার মধ্যে চোরাবালি নেই, তাই। চোরাবালি নিজের দেহেরও ভার বইতে পারে না, পায়ের তলা থেকে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকেই ডোবায়। কিন্তু নিরেট মাটি লোহা-পাথরেরও বোঝা বয়, ইমারত গড়া তার উপরেই চলে। নীলিমাদিদিকে সব মেয়েতে বুঝবে না, কিন্তু নিজেকে নিয়ে খেলা করবার যাদের দিন গেছে, মাথার ভার নাবিয়ে দিয়ে যারা এবারের মত সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায় তারা ওকে বুঝবে।

হুঁ, বলিয়া আশুবাবু নিজেই নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, শিবনাথ?

কমল কহিল, যেদিন থেকে তাঁকে সত্যি করে বুঝেচি, সেদিন থেকে ক্ষোভ-অভিমান আমার মুছে গেছে—জ্বালা নিবেচে। শিবনাথ গুণী শিল্পী—শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন। এই কথাই তো তাদের সুমুখে দাঁড়িয়ে সেদিন বলতে চেয়েছিলাম। মেয়েরা শুধু উপলক্ষ নইলে ওরা ভালবাসে কেবল নিজেকে। নিজের মনটাকে দুভাগ করে নিয়ে চলে ওদের দুদিনের লীলা, তার পরে সেটা ফুরোয় বলেই গলার সুর ওদের এমন বিচিত্র হয়ে বাজে, নইলে বাজতো না, শুকিয়ে জমাট হয়ে যেতো। আমি তো জানি, শিবনাথ ওকে ঠকায়নি, মণি আপনি ভুলেচে। সূর্য্যাস্ত-বেলায় মেঘের গায়ে যে রঙ ফোটে কাকাবাবু, সে স্থায়ীও নয়, সে তার আপন বর্ণও নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যে বলবে কে?

আশুবাবু বলিলেন, সে জানি, কিন্তু রঙ নিয়েও মানুষের দিন চলে না মা, উপমা দিয়েও তার ব্যথা ঘোচে না। তার কি বল তো?

কমলের মুখ ক্লান্তিতে মলিন হইয়া আসিল, কহিল, তাই তো ঘুরে ঘুরে একটা প্রশ্নই বারে বারে আসচে কাকাবাবু, শেষ আর হচ্চে না, বরঞ্চ যাবার সময় আপনার ওই আশীর্ব্বাদটুকুই রেখে যান, মণি যেন দুঃখের মধ্য দিয়ে আবার নিজেকে খুঁজে পায়। যা ঝরবার তা ঝরে গিয়ে সেদিন যেন ও নিঃসংশয়ে আপনাকে চিনতে পারে। আর আপনাকেও বলি, সংসারের অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা, তার বেশী নয়; ওটাকেই নারীর সর্ব্বস্ব বলে যেদিন মেনে নিয়েচেন, সেইদিনই শুরু হয়েচে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে ট্র্যাজিডি। দেশান্তরে যাবার পূর্ব্বে নিজের মনের এই মিথ্যের শেকল থেকে নিজের মেয়েকে মুক্তি দিয়ে যান কাকাবাবু, এই আমার আপনার কাছে শেষ মিনতি।

হঠাৎ দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই চাহিয়া দেখিল। হরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল, বৌঠাকরুণকে আমি নিয়ে যেতে এসেচি, আশুবাবু, উনি প্রস্তুত হয়েছেন, আমি গাড়ি আনতে পাঠিয়েছি।

আশুবাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিলেন, এখুনি? কিন্তু বেলা তো নেই।

হরেন্দ্র বলিল, দশ-বিশ ক্রোশ দূর নয়, মিনিট-পাঁচেকেই পৌঁছে যাবেন।

তাঁহার মুখ যেমন গম্ভীর, কথাও তেমনি নীরস।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তা বটে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়, আজ কি না গেলেই নয়?

হরেন্দ্র পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনিই বিচার করুন। উনি লিখেচেন, "ঠাকুরপো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার উপায় যদি না করতে পার আমাকে জানিও। কিন্তু কাল ব'লো না যে আমাকে জানাননি কেন?
—নীলিমা।"

আশুবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, নিকট আত্মীয় বলে আমি দাবী করতে পারিনে, কিন্তু ওকে তো আপনি জানেন, এ চিঠির পরে বিলম্ব করতেও আর ভরসা হয় না।

তোমার বাসাতেই ত থাকবেন?

হাঁ, অন্ততঃ এর চেয়ে সুব্যবস্থা যতদিন না হয়। ভাবলাম, এ-বাড়িতে এতদিন যদি ওঁর কেটে থাকে ও-বাড়িতেও দোষ হবে না।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। এ-কথা বলিলেন না যে এতকাল এ যুক্তি ছিল কোথায়? বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল, মেমসাহেবের জিনিসপত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের কুঠি হইতে লোক আসিয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, তাঁর যা-কিছু আছে দেখিয়ে দাও গে।

কমলের চোখের প্রতি চোখ পড়িতে কহিলেন, কাল সকালে এ-বাড়ি থেকে বেলা চলে গেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী ওর বান্ধবী। একটা সুখবর তোমাকে দিতে ভুলেচি কমল। বেলার স্বামী এসেচেন নিতে, বোধ হয় ওদের একটা reconciliation হ'লো।

কমল কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, শুধু কহিল, কিন্তু এখানে এলেন না যে!

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় আত্ম-গরিমায় বাধলো। যখন বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার মামালা ওঠে, তখন বেলার বাবার চিঠির উত্তরে সম্মতি দিয়েছিলুম। ওর স্বামী সেটা ক্ষমা করতে পারেনি।

আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, এতে আশ্চর্য্য হ'চ্চ কেন কমল? চরিত্র-দোষে যে-স্বামী অপরাধী তাকে ত্যাগ করায় আমি অন্যায় দেখিনে। এ অধিকার কেবল স্বামীর আছে, স্ত্রীর নেই এমন কথা আমি মানতে পারিনে।

কমল নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে কাপট্য নাই—অন্তর ও বাহির এক সুরে বাঁধা, এই কথাটাই আর একবার তাহার স্মরণ হইল।

নীলিমা দ্বারের নিকট হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ঘরেও ঢুকিল না, কাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিল না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কমল তেমনিভাবেই তাঁহার হাতের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না। যাবার পূর্ব্বে আস্তে আস্তে বলিল, শুধু যদু ছাড়া এ-বাড়িতে পুরানো কেউ আর রইল না।

যদু?

হ্যাঁ, আপনাদের পুরানো চাকর।

কিন্তু সে তো নেই মা। তার ছেলের অসুখ, দিন-পাঁচেক হ'লো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

আবার অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না। আশুবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই রাজেন ছেলেটির কোন খবর জানো কমল?

না কাকাবাবু।

যাবার আগে তাকে একবার দেখবার ইচ্ছা হয়। তোমরা দুটিতে যেন ভাই-বোন, যেন একই গাছের দুটি ফুল। এই বলিয়া তিনি চুপ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িল, বলিলেন, তোমাদের যেন মহাদেবের দারিদ্র্য। টাকা-কড়ি, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ অপরিমিত, কোথায় যেন অন্যমনস্কে সে-সব ফেলে এসেচ। খুঁজে দেখবারও গরজ নেই, এমনি তাচ্ছিল্য।

কমল সহাস্যে কহিল, সে কি কাকাবাবু! রাজেনের কথা জানিনে, কিন্তু আমি ছু'পয়সা পাবার জন্যে দিনরাত কত খাটি।

আশুবাবু বলিলেন, সে শুনতে পাই। তাই বসে বসে ভাবি।

সেদিন বাসায় ফিরতে কমলের বিলম্ব হইল। যাবার সময় আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, যে আমাকে কখনো ছেড়ে থাকেনি, আজও সে ছেড়ে থাকবে না। নিরুপায়ের উপায় সে করবেই। এই বলিয়া তিনি সুমুখের দেওয়ালে টাঙানো লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

কমল বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল সহজে উপরে যাইবার জো নাই, রাশিকৃত বাক্স তোরঙ্গে সিঁড়ির মুখটা রুদ্ধপ্রায়। বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনমতে একটু পথ করিয়া উপরে গিয়া শুনিল পাশের রান্নাঘরে কলরব হইতেছে। উঁকি মারিয়া দেখিল, অজিত হিন্দুস্থানী মেয়েলোকটির সাহায্যে স্টোভে জল চড়াইয়াছে এবং চা চিনি প্রভৃতির সন্ধানে ঘরের চতুর্দ্দিকে আতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

এ কি কাণ্ড?

অজিত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, চা-চিনি কি তুমি লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখ না কি? জল ফুটে যে প্রায় নষ্ট হয়ে এলো।

কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন কেন? সরে আসুন, আমি তৈরী করে দিচ্ছি।

অজিত সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল কহিল, কিন্তু এ কি ব্যাপার? বাক্স-তোরঙ্গ, পোটলা-পুঁটলি, এ-সব কার?

আমার। হরেনবাবু নোটিশ দিয়েচেন।

দিলেও যাবারই নোটিশ দিয়েচে। এখানে আসবার বুদ্ধি দিলে কে?

এটা নিজের। এতদিন পরের বুদ্ধিতে দিন কেটেচে, এবার নিজের বুদ্ধি খুঁজে বের করেচি।

কমল কহিল, বেশ করেচেন। কিন্তু এগুলো কি নীচেই পড়ে থাকবে? চুরি যাবে যে!

শুনিয়া অজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, যায়নি তো, একটা চামড়ার বাক্সে অনেকগুলো টাকা আছে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব ভাল। এক জাতির মানুষ আছে তারা আশি বচ্ছরেও সাবালক হয় না। তাদের মাথার উপর অভিভাবক একজন চাই-ই। এ ব্যবস্থা ভগবান কৃপা করে করেন। চা থাক, নীচে আসুন। ধরাধরি করে তোলবার চেষ্টা করা যাক।

২৭

বাড়িওয়ালা এইমাত্র পুরামাসের ভাড়া চুকাইয়া লইয়া গেল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের মাঝখানে, বিশৃঙ্খল কক্ষের একধারে ক্যাম্বিশের ইজিচেয়ারে অজিত চোখ বুজিয়া শুইয়া। মুখ শুষ্ক, দেখিলেই বোধ হয় চিন্তাগ্রস্ত মনের মধ্যে সুখের লেশমাত্র নাই। কমল বাঁধা-ছাঁদা জিনিসগুলোর ফর্দ্দ মিলাইয়া কাগজে টুকিয়া রাখিতেছিল। স্থানত্যাগের আসন্নতায় কাজের মধ্যে তাহার চঞ্চলতা নাই, যেন প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যাপার। কেবল একটুখানি যেন বেশী নীরব।

সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল হরেন্দ্রের নিকট হইতে। লোকের হাতে নয়—ডাকে। অজিত চিঠিখানি পড়িল। আশুবাবুর বিদায়-উপলক্ষে এই আয়োজন। পরিচিত অনেককেই আহ্বান করা হইয়াছে। নীচের এক কোণে ছোট্ট করিয়া লেখা—কমল নিশ্চয় এসো ভাই।—নীলিমা।

অজিত সেটুকু দেখিয়া প্রশ্ন করিল, যাবে না কি ?

যাবো বই কি। নিমন্ত্রণ জিনিসটা তুচ্ছ করিতে পারি আমার এত দর নয়। কিন্তু তুমি ?

অজিত দ্বিধার স্বরে বলিল, তাই ভাবচি। আজ শরীরটা তেমন—

তবে কাজ নেই গিয়ে।

অজিতের চোখ তখনো চিঠির 'পরে ছিল। নইলে কমলের ঠোঁটের কোণে কৌতুক-হাস্যের রেখাটুকু নিশ্চয় দেখিতে পাইত।

যেমন করিয়াই হোক, বাঙালী-মহলে খবরটা জানাজানি হইয়াছে যে উভয়ে আগ্রা ছাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু কিভাবে ও কোথায়, এ-সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল এখনো সুনিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছে নাই। অকালের মেঘের মত কেবলি আন্দাজ ও অনুমানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ জানা কঠিন ছিল না—কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত তাহাদের গম্য স্থানটা আপাততঃ অমৃতসর। কিন্তু এটা কেহ ভরসা করে নাই।

অজিতের বাবা ছিলেন গুরুগোবিন্দের পরম ভক্ত। তাই শিখদের মহাতীর্থ অমৃতসরে তিনি খালসা কলেজের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা বাঙ্‌লো-বাড়ি তৈরী করাইয়াছিলেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাড়িটা ভাড়ায় খাটিতেছিল, সম্প্রতি খালি হইয়াছে; এই বাড়িতেই দু'জনে কিছুকাল বাস করিবে। মাল-পত্র যাইবে লরিতে এবং পরে শেষরাত্রে

মোটরে করিয়া উভয়ে রওনা হইবে। সেই প্রথমদিনের স্মৃতি—এটা কমলের অভিলাষ।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রের ওখানে তুমি কি একা যাবে নাকি?

যাই না? আশ্রমের দোর তো তোমার খোলাই রইল, যবে খুশি দেখা করে যেতে পারবে। কিন্তু আমার তো সে আশা নেই, শেষ দেখা দেখে আসি গে, কি বল?

অজিত চুপ করিয়া রহিল। স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেথায় নানা ছলে বহু তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ইঙ্গিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইসারায় আজ শুধু একটিমাত্র দিকেই ছুটিতে থাকিবে, ইহারই সম্মুখে এই একাকিনী রমণীকে পরিত্যাগ করার মত কাপুরুষতা আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু সঙ্গী হইবার সাহস নাই, নিষেধ করাও তেমনি কঠিন।

নূতন গাড়ি কেনা হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু পরে সোফার কমলকে লইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রর বাসায় দ্বিতলের সেই হল-ঘরটায় নূতন দামী কার্পেট বিছাইয়া অতিথিদের স্থান করা হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে অনেকগুলো, কোলাহলও কম হইতেছে না! মাঝখানে আশুবাবু ও তাঁহাকে ঘিরিয়া জন কয়েক ভদ্রলোক। বেলা আসিয়াছেন এবং আরও একটি মহিলা আসিয়াছেন তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী মালিনী। কে একটি ভদ্রলোক এদিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। নীলিমা নাই, খুব সম্ভব অন্যত্র কাজে নিযুক্ত।

হরেন্দ্র ঘরে ঢুকিল এবং ঘরে ঢুকিয়াই চোখে পড়িল এদিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কমল। সবিস্ময়ে কলস্বরে সম্বর্দ্ধনা করিল, কমল যে? কখন এলে? অজিত কই?

সকলের দৃষ্টি একাগ্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কমল দেখিল, যে ব্যক্তি মহিলাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন তিনি আর কেহ নহেন স্বয়ং অক্ষয়। কিঞ্চিৎ শীর্ণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা এড়াইয়াছেন, কিন্তু দেশের ম্যালেরিয়াকে পাশ কাটাইতে পারেন নাই। ভালই হইল যে তিনি ফিরিয়াছেন, নইলে শেষ-দেখার হয়ত আর সুযোগ ঘটিত না। দুঃখ থাকিয়া যাইত।

কমল বলিল, অজিতবাবু আসেননি, শরীরটা ভাল নয়। আমি এসেচি অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ? ছিলে কোথায়?

নীচে। ছেলেদের ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। দেখছিলাম, ধর্ম্মকে তো ফাঁকি দিলেন, কর্ম্মকেও ঐ সঙ্গে ফাঁকি দিলেন কি না? এই বলিয়া সে হাসিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

সে যেন বর্ষার বন্য-লতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া মাটি ফুড়িয়া উর্দ্ধে মাথা তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার ভয়ও

নাই, ভাবনাও নাই, যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাচানোর প্রশ্নই বাহুল্য। ঘরে আসিয়া বসিল, কতটুকুই বা। তথাপি মনে হইল যেন রূপে, রসে, গৌরবে স্বকীয় মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সে সকল জিনিসেই ছড়াইয়া দিল।

ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইল হরেন্দ্রর কথায়। আর দুটি নারীর সম্মুখে শালীনতায় হয়ত কিছু ত্রুটি ঘটিল, কিন্তু আবেগভরে বলিয়া ফেলিল, এতক্ষণে মিলন-সভাটি আমাদের সম্পূর্ণ হ'লো। কমল ছাড়া ঠিক এমনি কথাটি আর কেউ বলতে পারতো না।

অক্ষয় কহিল, কেন? দর্শন-শাস্ত্রের কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বটি এতে পরিস্ফুট হ'লো শুনি?

কমল সহাস্যে হরেন্দ্রকে কহিল, এবার বলুন? দিন এর জবাব?

হরেন্দ্র এবং অনেকেই মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় নীরস-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি কমল, আমাকে চিনতে পার তো?

আশুবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি পারলেই হ'লো। চিনতে তুমি পারচ তো অক্ষয়?

কমল কহিল, প্রশ্নটি অন্যায় আশুবাবু। মানুষ-চেনা ওঁর নিজস্ব বৃত্তি। ওখানে সন্দেহ করা ওর পেশায় ঘা দেওয়া।

কথাটি এমন করিয়া বলিল যে, এবার আর কেহ হাসি চাপিতে পারিল না। কিন্তু পাছে এই দুঃশাসন লোকটি প্রত্যুত্তরে কুৎসিত কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। আজিকার দিনে অক্ষয়কে আহ্বান করার ইচ্ছা হরেন্দ্রর ছিল না, কিন্তু সে বহুদিন পরে ফিরিয়াছে, না বলিলে অতিশয় বিশ্রী দেখাইবে ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সভয়ে সবিনয় কহিল, আমাদের এই শহর থেকে হয়ত বা এদেশ থেকেই আশুবাবু চলে যাচ্চেন; ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে-কোন মানুষেরই ভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্য আমরা পেয়েচি। আজ ওঁর দেহ অসুস্থ, মন অবসন্ন, আজ যেন আমরা সহজ সৌজন্যের মধ্যে ওঁকে বিদায় দিতে পারি।

কথা কয়টি সামান্য, কিন্তু ওই শান্ত, সহৃদয় প্রৌঢ় ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল।

আশুবাবু সঙ্কোচ বোধ করিলেন। বাক্যালাপ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া না প্রবর্ত্তিত হয় এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি নিজেই অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, অক্ষয়, খবর পেয়েচ বোধ হয় হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটা আর নেই? রাজেন আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন সতীশও গেছেন। যে ক'টি ছেলে বর্ত্তমানে আছে, হরেন্দ্রর অভিলাষ জগতের সোজা পথেই তাদের মানুষ করে তোলেন। তোমরা সকলে অনেকদিন অনেক কথাই বলেচ, কিন্তু ফল হয়নি। তোমাদের কর্ত্তব্য কমলকে ধন্যবাদ দেওয়া।

অক্ষয় অন্তরে জ্বলিয়া গিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, শেষকালে ফল ফলল ওর কথায়? কিন্তু যাই বলুন আশুবাবু, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাইনি। এইটি অনেক পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, করবেনই তো। মানুষ চেনাই যে আপনার পেশা।

আশুবাবু বলিলেন, তবুও আমার মনে হয় ভাঙবার প্রয়োজন ছিল না। সকল ধর্ম্মমতই তো মূলতঃ এক সিদ্ধিলাভের জন্য এ কেবল কতকগুলি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে চলা। যারা মানে না বা পারে না, তারা না-ই পারল, কিন্তু পারার অধ্যবসায় যাদের আছে তাদের নিরুৎসাহ করেই বা লাভ কি? কি বল অক্ষয়?

অক্ষয় কহিল, নিশ্চয়।

কমলের দিকে চাহিতেই সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনার তো এ দৃঢ় বিশ্বাসের কথা হ'লো না আশুবাবু, বরঞ্চ হ'লো অবিশ্বাস অবহেলার কথা। এমন করে ভাবতে পারলে আমিও আশ্রমের বিরুদ্ধে একটা কথাও কখনো বলতাম না। কিন্তু তা তো নয়, আচার-অনুষ্ঠানই যে মানুষের ধর্ম্মের চেয়েও বড়—যেমন বড় রাজার চেয়ে রাজার কর্ম্মচারীর দল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, তা যেন হ'লো, কিন্তু তাই বলে কি তোমার উপমাকে যুক্তি বলে মেনে নেবো?

কমল যে পরিহাস করে নাই তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। কহিল, শুধুই কি এ উপমা আশুবাবু, তার বেশী নয়? সকল ধর্ম্মই যে আসলে এক, এ আমি মানি। সর্ব্বলোকে সর্ব্বদেশে ও সেই এক অজ্ঞেয় বস্তুর অসাধ্য সাধনা। মুঠোর মধ্যে ওকে তো পাওয়া যায় না। আলো-বাতাস নিয়ে মানুষের বিবাদ নেই, বিবাদ বাধে অন্নের ভাগাভাগি নিয়ে—যাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল করে বংশধরের জন্য রেখে যাওয়া চলে। তাই তো জীবনের প্রয়োজন ও ঢের বড় সত্যি। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য যে সকল ক্ষেত্রেই এক, এ তো সবাই জানে, কিন্তু তাই বলে কি মানতে পারে? আপনিই বলুন না অক্ষয়বাবু, ঠিক কি না। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ইহার নিহিত অর্থ সবাই বুঝিল, ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠোর কিছু-একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না।

আশুবাবু বলিলেন, অথচ তোমারই যে কমল, সকল আচার-অনুষ্ঠানেই ভারী অবজ্ঞা, কিছুই যে মানতে চাও না? তাই তো তোমাকে বোঝা এত শক্ত।

কমল বলিল, কিছুই শক্ত নয়। একটিবার সামনের পর্দ্দাটা সরিয়ে দিন, আর কেউ না বুঝুক, আপনার বুঝতে বিলম্ব হবে না। নইলে আপনার স্নেহই বা আমি পেতাম কি করে? মাঝখানে কুয়াসার আড়াল যে নেই তা নয়, কিন্তু তবু তো

পেলাম। আমি জানি, আপনার ব্যথা লাগে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে ত চাইনে, চাই শুধু এর পরিবর্ত্তন। কালের ধর্ম্মে আজ যা অচল, আঘাত করে তাকে সচল করতে চাই। এই যে অবজ্ঞা, মূল এর জানি বলেই তো। মিথ্যে বলে জানলে মিথ্যের সুর মিলিয়ে মিথ্যে শ্রদ্ধায় সকলের সঙ্গে সারাজীবন মেনে মেনেই চলতুম—এতটুকুও বিদ্রোহ করতুম না।

একটু থামিয়া কহিল, ইয়ুরোপের সেই রেনেশাঁসের দিনগুলো একবার মনে করে দেখুন দিকি। তারা সব করতে গেল নতুন সৃষ্টি, শুধু হাত দিলে না আচার অনুষ্ঠানে। পুরানোর গায়ে টাটকা রঙ মাখিয়ে তলে তলে দিতে লাগল তার পূজো, ভেতরে গেল না শেকড়, সখের ফ্যাসান গেল দু'দিনে মিলিয়ে। ভয় ছিল আমার হরেনবাবুর উচ্চ অভিলাষ যায় বা বুঝি এমনি করেই ফাঁকা হয়ে। কিন্তু আর ভয় নেই, উনি সামলেচেন। বলিয়া সে হাসিল।

এ হাসিতে হরেন্দ্র যোগ দিতে পারিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল। কাজটা সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে ঠিকমত আজও সায় পায় না, মনের মধ্যেটা রহিয়া রহিয়া ভারী হইয়া উঠে। কহিল, মুস্কিল এই যে, তুমি ভগবান মানো না, মুক্তিতেও বিশ্বাস কর না। কিন্তু যারা তোমার এই অজ্ঞেয় বস্তু-সাধনায় রত, ওর তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যগ্র, তাদের কঠিন নিয়ম ও কঠোর আচার-পালনের মধ্যে দিয়ে পা না ফেললেই নয়। আশ্রম তুলে দেওয়ায় আমি অহঙ্কার করিনে। সেদিন যখন ছেলেদের নিয়ে সতীশ চলে গেল আমি নিজের দুর্ব্বলতাকে অনুভব করেচি।

তা হলে ভাল করেননি হরেনবাবু। বাবা বলতেন, যাদের ভগবান যত সূক্ষ্ম, যত জটিল, তারাই মরে তত বেশি জড়িয়ে। যাদের যত স্থূল, যত সহজ, তারাই থাকে কিনারার কাছে। এ যেন লোকসানের কারবার। ব্যবসা হয় যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক, ক্ষতির পরিমাণ ততই চলে বেড়ে। তাকে গুটিয়ে ছোট করে আনলেও লাভ হয় না বটে, কিন্তু লোকসানের মাত্রা কমে। হরেনবাবু, আপনার সতীশের সঙ্গে আমি কথা কয়ে দেখেচি। আশ্রমে বহুবিধ প্রাচীন নিয়মের তিনি প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তাঁর সাধ ছিল সে-যুগে ফিরে যাওয়া। ভাবতেন, দুনিয়ার বয়স থেকে হাজার-দুই বছর মুছে ফেললেই আসবে পরম লাভ। এমনি লাভের ফন্দি এঁটেছিল একদিন বিলাতের পিউরিটান এক দল। ভেবেছিল, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সতেরো শতাব্দী ঘুঁচিয়ে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে গড়ে তুলবে বাইবেলের সত্যযুগ। তাদের লাভের হিসাবের অঙ্ক জানে আজ অনেকে, জানে না শুধু মঠ-ধারী দল যে বিগত দিনের দর্শন দিয়ে যখন বর্ত্তমানের বিধি-বিধানের সমর্থন, তখনই আসে সত্যিকারের ভাঙার দিন। হরেনবাবু, আপনার আশ্রমের ক্ষতি হয়ত করেচি, কিন্তু ভাঙা আশ্রমে বাকী রইলেন যাঁরা তাদের ক্ষতি করিনি।

পিউরিটানদের কাহিনী জানিত অক্ষয়, ইতিহাসের অধ্যাপক। সবাই চুপ করিয়া রহিল, এবার সে-ই শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

আশুবাবু বলিতে গেলেন, কিন্তু সে যুগের ইতিহাসে যে উজ্জল ছবি—

কমল বাধা দিল, যত উজ্জ্বল হোক, তবু সে ছবি, তার বড় নয়; এমন বই সংসারে আজও লেখা হয়নি আশুবাবু, যার থেকে তার সমাজের যথার্থ প্রাণের সন্ধান মেলে। আলোচনায় গর্ব্ব করা চলে, কিন্তু বই মিলিয়ে সমাজ গড়া চলে না।। শ্রীরামচন্দ্রের যুগেও না, যুধিষ্ঠিরের যুগেও না। রামায়ণ-মহাভারতে যত কথাই লেখা থাক্‌, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মানুষের দেখাও মিলবে না, এবং মাতৃ-জঠর যত নিরাপদই হোক, তাতে ফিরে যাওয়া যাবে না। পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি নিয়েই ত মানুষ? তারা যখন আপনার চারিদিকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে কি বায়ুর চাপকে ঠেকানো যায়?

বেলা ও মালিনী নিঃশব্দে শুনিতেছিল। ইহার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি তাহাদের কানে গেছে, কিন্তু আজ মুখোমুখি বসিয়া এই পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় মেয়েটির বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভরতা দেখিয়া বিস্ময় মানিল।

পরক্ষণে ঠিক এই ভাবটিই আশুবাবু প্রকাশ করিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, তর্কে যাই কেন বলি না কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি। যা পারিনে, তাকেও অবজ্ঞা করিনে। এই গৃহেই মেয়েদের দ্বার রুদ্ধ ছিল, শুনেচি একদিন তোমাকে আহ্বান করায় সতীশ স্থানটাকে কলুষিত জ্ঞান করেছিল। কিন্তু আজ আমরা সবাই আমন্ত্রিত, কারও আসায় বাধা নেই—

একটি ছেলে কবাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণে পরিচ্ছন্ন ভদ্র পোষাক; মুখে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির আভাস; কহিল, দিদি বললেন, খাবার তৈরী হয়ে গেছে, ঠাঁই হবে?

অক্ষয় বলিল, হবে বই কি হে। বল গে, রাতও তো হ'লো।

ছেলেটি চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কহিল, বৌঠাকরুণ আসা পর্য্যন্ত খাবার চিন্তাটা আর কারুকে করতে হয় না, ওঁর তো কোথাও জায়গা ছিল না, কিন্তু সতীশ রাগ করে চলে গেল।

আশুবাবুর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ সতীশেরও অন্য উপায় ছিল না। সে ত্যাগী, ব্রহ্মচারী—এসম্পর্কে তার সাধনার বিঘ্ন। কিন্তু আমারই যে সত্যিই কোন্ কাজটা ভাল হ'লো সব সময় ভেবে পাইনে।

কমল অকুন্ঠিত-স্বরে বলিল, এই কাজটাই হরেনবাবু, এই কাজটাই। সংযম যখন সহজ না হয়ে অপরকে আঘাত করে তখনই সে দুর্ব্বল। এই বলিয়া সে পলকের জন্য আশুবাবুর প্রতি চাহিল, হয়ত কি একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু হরেন্দ্রকেই

পুনশ্চ বলিল, ওরা নিজেকেই টেনে টেনে বাড়িয়ে ওদের ভগবানকেই সৃষ্টি করে। তাই ওদের ভগবানের পুজো বারে বারেই ঘাড় হেঁট করে আত্মপুজোয় নেমে আসে। এ-ছাড়া ওদের পথ নেই। মানুষ শুধু কেবল নরও নয়, নারীও নয়, এ দুয়ে মিলেই তবে সে এক। এই অর্দ্ধেককে বাদ দিয়ে যখনি দেখি সে নিজেকে বৃহৎ করে পেতে চায়, তখন দেখি সে আপনাকেও পায় না, ভগবানকেও ক্ষোয়ায়। সতীশবাবুদের জন্য দুশ্চিন্তা রাখবেন না হরেনবাবু, ওঁদের সিদ্ধি স্বয়ং ভগবানের জিম্মায়।

সতীশকে প্রায় কেহই দেখিতে পারিত না, তাই শেষের কথাটায় সবাই হাসিল। আশুবাবুও হাসিলেন, কিন্তু বলিলেন, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের একটা বড় কথা আছে কমল—আত্মদর্শন। অর্থাৎ আপনাকে নিগূঢ়ভাবে জানা। ঋষিরা বলেন, এই খোঁজার মধ্যেই আছে বিশ্বের সকল জানা, সকল জ্ঞান। ভগবানকে পাবারও এই পথ। এরই তরে ধ্যানের ব্যবস্থা। তুমি মানো না, কিন্তু যারা মানে, বিশ্বাস করে, তাঁকে চায়, জগতের বহু বিষয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে না রাখলে তারা একাগ্র চিত্ত-যোজনায় সফল হয় না। সতীশকে আমি ধরিনে, কিন্তু এ যে হিন্দুর অচ্ছিন্ন-পরম্পরায় পাওয়া সংস্কার, কমল। এই তো যোগ। আসমুদ্র হিমাচল ভারত অবিচলিত শ্রদ্ধায় এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে।

ভক্তি, বিশ্বাস ও ভাবের আবেগে তাঁহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বাহিরের সর্ব্ববিধ সাহেবিয়ানার নিভৃত তলদেশে যে দৃঢ়নিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ হিন্দু-চিত্ত নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় নিঃশব্দে জ্বলিতেছে, কমল চক্ষের পলকে তাহাকে উপলব্ধি করিল। কি একটা বলতে গেল, কিন্তু সঙ্কোচে বাধিল। সঙ্কোচ আর কিছুর জন্য নয়, শুধু এই সত্যব্রত সংযতেন্দ্রিয় বৃদ্ধকে ব্যথা দিবার বেদনা। কিন্তু উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই যখন প্রশ্ন করিলেন, কেমন কমল, এই কি সত্যি নয়? তখন সে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না আশুবাবু, সত্যি নয়। শুধু তো হিন্দুর নয়, এ বিশ্বাস সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই তো কোন-কিছু কখনো সত্যি হয়ে ওঠে না। ত্যাগের জোরেও নয়, মৃত্যু-বরণ করার জোরেও নয়। অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহু প্রাণ বহুবার সংসারে দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। তাদের জিদের জোরকেই তা সপ্রমাণ করেচে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করেনি। যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জ্জনে বসে কেবল আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-চিন্তাই হয় তো এই কথাই জোর করে বলব যে, এই দুটো সিংহদ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেচে, এমন আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।

শুনিয়া শুধু আশুবাবু নয়, হরেন্দ্রও বিস্ময় ও বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

সেই ছেলেটি পুনর্ব্বার আসিয়া জানাইল, খাবার দেওয়া হইয়াছে।

সকলেই নীচে নামিয়া গেল।

২৮

আহারান্তে অক্ষয় কমলকে একমুহূর্ত্ত নিরালায় পাইয়া চুপি চুপি বলিল, শুনতে পেলাম আপনারা চলে যাচ্চেন। পরিচিত সকলের বাড়িতেই আপনি এক-আধবার গেছেন, শুধু আমারই ওখানে—

আপনি! কমল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। শুধু কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনে নয়, 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, সে অভিযোগও করে না, অভিমানও করে না। কিন্তু অক্ষয়ের অন্য কারণ ছিল। এই স্ত্রীলোকটিকে 'আপনি' বলাটা সে বাড়াবাড়ি, এমন কি ভদ্র-আচরণের অপব্যবহার বলিয়া মনে করিত। কমল ইহা জানিত। কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র ইতরতায় দৃকপাত করিতেও তাহার লজ্জা করিত। পাছে একটা তর্কাতর্কি কলহের বিষয় হইয়া উঠে এই ছিল তার ভয়। হাসিয়া বলিল, আপনি তো কখনো যেতে বলেননি।

না। সেটা আমার অন্যায় হয়েচে। চলে যাবার আগে কি আর সময় হবে না?

কি করে হবে অক্ষয়বাবু, আমরা যে কাল ভোরেই যাচ্চি।

ভোরেই। একটু থামিয়া বলিল, এ অঞ্চলে যদি কখনো আসেন আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

কমল হাসিয়া কহিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি অক্ষয়বাবু? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার মত বদলালো কি করে? বরঞ্চ আরও তো কঠোর হবারই কথা।

অক্ষয় কহিল, সাধারণতঃ তাই হ'তো বটে। কিন্তু এবার দেশ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেচি। আপনার ঐ পিউরিটানদের দৃষ্টান্ত আমার ভেতরে গিয়ে লেগেচে। আর কেউ বুঝলেন কি না জানিনে—না-বোঝাও আশ্চর্য্য নয়—কিন্তু আমি অনেক কথাই জানি। আর একটা কথা। আমাদের গ্রামের প্রায় চোদ্দ-আনা মুসলমান, ওরা তো সেই দেড় হাজার বছরের পুরানো সত্যেই আজও দৃঢ় হয়ে আছে। সেই বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান, কিছুই তো ব্যতয় হয়নি।

কমল কহিল, ওঁদের সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানিনে, জানবার কখনো সুযোগও হয়নি। যদি আপনার কথাই সত্যি হয় তো কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, ওদেরও ভেবে দেখবার দিন এসেচে। সত্যের সীমা যে-কোন একটা অতীত দিনেই সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়নি, এ সত্য ওঁদেরও একদিন মানতে হবে। কিন্তু উপরে চলুন।

না, আমি এখান থেকে বিদায় নেবো। আমার স্ত্রী পীড়িত। এত লোককে দেখেচেন, একবার তাঁকে দেখবেন না?

কমল কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেমন দেখতে?

অক্ষয় কহিল, ঠিক জানিনে। আমাদের পরিবারে ও-প্রশ্ন কেউ করে না। বিয়ে দিয়ে ন'বছরের মেয়েকে বাবা ঘরে এনেছিলেন। লেখা-পড়া শেখবার সময় পায়নি, দরকারও হয়নি। রাঁধা-বাড়া, বার-ব্রত, পূজো-আহ্নিক নিয়ে আছেন; আমাকেই ইহকাল-পরকালের দেবতা বলে জানে, অসুখ হলে ওষুধ খেতে চায় না, বলে স্বামীর পাদোদকেই সকল ব্যামো সারে। যদি না সারে বুঝবে স্ত্রীর আয়ু শেষ হয়েচে।

ইহার একটুখানি আভাস কমল হরেন্দ্রের কাছে শুনিয়াছিল, কহিল, আপনি তো ভাগ্যবান, অন্ততঃ স্ত্রী-ভাগ্যে। এতখানি বিশ্বাস এ যুগে দুর্ল্লভ।

অক্ষয় কহিল, বোধ হয় তাই, ঠিক জানিনে। হয়ত একেই স্ত্রী-ভাগ্য বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। আচ্ছা, নমস্কার।

কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

অক্ষয় এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, একটা অনুরোধ?

করুন।

যদি কখনো সময় পান, আর আমাকে মনে থাকে, একখানা চিঠি লিখবেন? আপনি নিজে কেমন আছেন, অজিতবাবু কেমন আছেন, এই-সব। আপনাদের কথা আমি প্রায়ই ভাববো। আচ্ছা চললাম, নমস্কার। এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুত প্রস্থান করিল; এবং সেইখানে কমল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাল-মন্দর বিচার করিয়া নয়, শুধু এই কথাই তাহার মনে হইল যে, এই সেই অক্ষয়! এবং মানুষের জানার বাহিরে এইভাবে এই ভাগ্যবানের দাম্পত্য-জীবন নির্ব্বিঘ্নে শান্তিতে বহিয়া চলিয়াছে। একখানি চিঠির জন্য তাহার কি কৌতূহল, কি সকাতর সত্যকার প্রার্থনা!

উপরে আসিয়া দেখিল নীলিমা ব্যতীত সবাই যথাস্থানে উপবিষ্ট। ইহাই নীলিমার স্বভাব, বিশেষ কেহ কিছু মনে করে না। আশুবাবু বলিলেন, হরেন্দ্র একটি চমৎকার কথা বলছিলেন কমল। শুনলে হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ঠেকে, কিন্তু বস্তুতঃই সত্য।

বলছিলেন, লোকে এইটিই বুঝতে পারে না যে, প্রচলিত সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র-বল ও বিবেক-বুদ্ধির জোরেই সহা যায়। মানুষে বাইরের অন্যায়টাই দেখে, অন্তরের প্রেরণার খবর রাখে না। এইখানেই যত দ্বন্দ্ব, যত বিরোধের সৃষ্টি?

কমল বুঝিল ইহার লক্ষ্য সে এবং অজিত। সুতরাং চুপ করিয়া রহিল। এ কথা বলিল না যে, উচ্ছৃঙ্খলতার জোরেও সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করা যায়। দুর্ব্বুদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধি এক পদার্থ নয়।

বেলা ও মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের যাইবার সময় হইয়াছে। কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা হরেন্দ্র ও আশুবাবুকে নমস্কার করিল। এই মেয়েটির সম্মুখে সর্ব্বক্ষণই তাহারা নিজেদের ছোট মনে করিয়াছে, শেষবেলায় তাহার শোধ দিল উপেক্ষা দেখাইয়া। চলিয়া গেলে আশুবাবু সস্নেহে কহিলেন, কিছু মনে ক'রো না মা, এ-ছাড়া ওদের আর হাতে কিছু নেই। আমিও তো ওই দলের লোক। সবই জানি।

আশুবাবু হরেন্দ্রর সাক্ষাতে আজ এই প্রথম তাহাকে মা বলিয়া ডাকিলেন; কহিলেন, দৈবাৎ ওরা পদস্থ ব্যক্তিদের ভার্য্যা। হাই-সার্কেলের মানুষ। ইংরিজি বলা-কওয়া, চলা-ফেরা বেশ-ভূষায় আপ-টু-ডেট। এটুকু ভুললে যে ওদের একেবারে পুঁজিতে ঘা পড়ে কমল। রাগ করলেও ওদের প্রতি অবিচার হয়।

কমল হাসিমুখে কহিল, রাগ তো করিনি।

আশুবাবু বলিলেন, করবে না তা জানি। রাগ আমাদেরও হ'লো না, শুধু হাসি পেলো। কিন্তু বাসায় যাবে কি করে মা, আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাবো?

বাঃ, নইলে যাবো কি করে?

পাছে লোকের চোখে পড়ে এই ভয়ে সে নিজেদের মোটর ফিরাইয়া দিয়াছিল।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু আর দেরি করাও হয়ত উচিত হবে না, কি বলো?

সকলেরই স্মরণ হইল যে, তিনি আজও সম্পূর্ণ সারিয়া ওঠেন নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং পরক্ষণে সকলে পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল যে, দ্বারের বাহিরে আসিয়া অজিত দাঁড়াইয়াছে।

হরেন্দ্র কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল, হ্যালো। বেটার লেট দ্যান নেভার। একি সৌভাগ্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের!

অজিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, নিতে এলাম। এবং চক্ষের পলকে একটা অভাবিত দুঃসাহসিকতা তাহার ভিতরের কথাগুলো সজোরে ঠেলিয়া গলা দিয়া বাহির করিয়া দিল। কহিল, নইলে তো আর দেখা হ'তো না। আমরা আজ ভোর-রাত্রেই দু'জনে চলে যাচ্ছি।

আজই? এই ভোরে?

হ্যাঁ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত। ঐখান থেকে আমাদের যাত্রা হবে শুরু।

ব্যাপারটা অজানা নয়, তথাপি সকলেই যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীলিমা আসিয়া ঘরের একপাশে বসিল। সঙ্কোচ কাটাইয়া আশুবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কথাটা তাঁর গলায় একবার বাধিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখা হবে না, তোমরা উভয়েই আমার স্নেহের বস্তু, যদি তোমাদের বিবাহ হ'তো দেখে যেতে পেতাম।

অজিত সহসা যেন কূল দেখিতে পাইল, ব্যগ্র-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, এ-জিনিস আমি চাইনি আশুবাবু, এ আমার ভাবনার অতীত। বিবাহের কথা বার বার বলেচি, বার বার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেচে। নিজের যাবতীয় সম্পদ, যা-কিছু আমার আছে, সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সম্মত হয়নি। আজ এঁদের সুমুখে তোমাকে আবার মিনতি করি কমল, তুমি রাজি হও। আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাঁচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই।

নীলিমা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্ব্ব-সমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ সে আপনাকে নিঃস্ব করিয়া দিতে চায়। নিজের বলিয়া হাতে রাখিবার আজ তাহার আর এতটুকু প্রয়োজন নাই।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেন, তোমার এত ভয় কিসের?

ভয় আজ না থাক, কিন্তু—

কিন্তুর দিন আগে তো আসুক।

এলে যে তুমি কিছুই নেবে না জানি।

কমল হাসিয়া বলিল, জানো? তা হলে সেইটেই হবে তোমার সবচেয়ে শক্ত বাঁধন।

একটু থামিয়া বলিল, তোমার মনে নেই একদিন বলেছিলাম, ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিচ্ছিদ্র করে বাড়ি গাঁথতে চেয়ো না। ওতে মরার কবর তৈরী হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।

অজিত বলিল, বলেছিলে জানি। জানি আমাকে বাঁধতে চাও না, কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে আমি বেঁধে রাখবো কমল? কই সে জোর?

কমল বলিল, জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্ব্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো অত নিষ্ঠুর আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান তো মানিনে, নইলে

প্রার্থনা করতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন মরতে পারি।

নীলিমার দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু নিজে বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন, তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই কমল। ঐ একই কথা মা। আত্মসমর্পণই একদিন তোমাকে তাঁর কাছে সগৌরবে পৌঁছে দেবে।

কমল হাসিয়া বলিল, সে হবে আমার উপরি পাওনা। ন্যায্য পাওনার চেয়েও তার দাম বেশি।

সে ঠিক কথা মা। কিন্তু জেনে রেখো, আমার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফলে যাবে না।

হরেন্দ্র কহিল, অজিত, খেয়ে তো আসেনি, নীচে চল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, এমনি তোমার বিদ্যে। ও খেয়ে আসেনি, আর কমল এখানে বসে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'লো—যা ও কখনো করে না!

অজিত সলজ্জে স্বীকার জানাইল, কথাটা তাই বটে। সে অভুক্ত আসে নাই।

এইটি শেষের রাত্রি স্মরণ করিয়া সভা ভাঙিয়া দিবার কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আশুবাবুর স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া উঠিবার আয়োজন করিতে হইল। হরেন্দ্র কমলের কাছে আসিয়া খাটো করিয়া বলিল, এতদিনে আসল জিনিসটি পেলে, কমল, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কমল তেমনি চুপি চুপি জবাব দিল, পেয়েছি? অন্ততঃ সেই আশীর্ব্বাদই করুন। হরেন্দ্র আর কিছু বলিল না। কিন্তু কমলের কণ্ঠস্বরে সেই দ্বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিল না তাহাও কানে ঠেকিল। তবু এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই বিধান।

দ্বারের আড়ালে ডাকিয়া নীলিমা চোখ মুছিয়া বলিল, কমল, আমাকে ভুলো না যেন। ইহার অধিক সে বলিতে পারিল না।

কমল হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, দিদি, আমি আবার আসব, কিন্তু যাবার আগে আপনার কাছে একটি মিনতি রেখে যাব; জীবনের কল্যাণকে কখনো অস্বীকার করবেন না। তার সত্য রূপ আনন্দের রূপ। এই রূপে সে দেখা দেয়, তাকে আর কিছুতেই চেনা যায় না। আর যাই কেন না কর দিদি, অবিনাশবাবুর ঘরে আর বেগার খাটতে রাজি হ'য়ো না।

নীলিমা কহিল, তাই হবে কমল।

আশুবাবু গাড়িতে উঠিলে কমল হিন্দু-রীতিতে পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল। তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আর একবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, তোমার

কাছে থেকে একটি খাঁটি তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি কমল। অনুকরণে মুক্তি আসে না মুক্তি আসে জ্ঞানে। তাই ভয় হয়, তোমাকে যা মুক্তি এনে দিলে, অজিতকে হয়ত তাই অসম্মানে ডোবাবে। তার থেকে তাকে রক্ষা করো মা। আজ থেকে সে ভার তোমার। ইঙ্গিতটা কমল বুঝিল।

পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার কথাই তোমাকে মনে করিয়ে দিই। সেদিন থেকে এ আমি বহুবার ভেবেছি যে, ভালবাসার শুচিতার ইতিহাসই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস; তার জীবন। তার বড় হবার ধারাবাহিক বিবরণ। তবু শুচিতার সংজ্ঞা নিয়ে যাবার বেলায় আর আমি তর্ক তুলবো না। আমি ক্ষোভের নিশ্বাসে তোমাদের বিদায়-ক্ষণটিকে মলিন করে দেব না। কিন্তু বুড়োর এই কথাটি মনে রেখো কমল, আদর্শ, আইডিয়াল শুধু দু-চারজনের জন্যই, তাই তার দাম। তাকে সাধারণ্যে টেনে আনলে সে হয় পাগলামি, শুভ যায় ঘুচে, তার ভার হয় দুঃসহ। বৌদ্ধযুগ থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণবদের দিন পর্য্যন্ত এর অনেক দুঃখের নজির পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সেই দুঃখের বিপ্লবই কি সংসারে তুমি এনে দেবে মা?

কমল মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ যে আমার ধর্ম্ম কাকাবাবু।

ধর্ম্ম? তোমার ধর্ম্ম?

কমল কহিল, যে দুঃখকে ভয় করচেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে; আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, সেই মৃতদেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই তো মানুষের মুক্তির পথ। দেখতে পান না কাকাবাবু, সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজশাসনে বদলালো, কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেমনিই জ্বলচে? তেমনি করেই ছাই করে আনচে? এ নিভবে কি দিয়ে?

আশুবাবু কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, কমল মণির মায়ের বন্ধন আজও কাটাতে পারিনি—তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্ব্বলতা; কি জানি সে কি, কিন্তু এ মোহ যেদিন ঘুচবে, মানুষের অনেকখানি সেইসঙ্গে ঘুচে যাবে মা। মানুষের এ বহু তপস্যার ধন। আচ্ছা আসি। বাসদেও, চল।

টেলিগ্রাফ-পিওন সাইকেল থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। জরুরি তার। হরেন্দ্র গাড়ির আলোতে খাম খুলিয়া পড়িল। দীর্ঘ টেলিগ্রাম, আসিয়াছে মথুরা জেলার একটি ছোট সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে। বিবরণটা এইরূপ—গ্রামের এক ঠাকুরবাড়িতে আগুন লাগে, বহুদিনের বহুলোক-পূজিত বিগ্রহ-মূর্ত্তি পুড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। বাঁচাইবার উপায় আর যখন নাই, সেই

প্রজ্বলিত গৃহ হইতে রাজেন মূর্ত্তিটিকে উদ্ধার করে। দেবতা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু রক্ষা পাইল না তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। দুই-তিন দিন নীরবে অব্যক্ত যাতনা সহিয়া আজ সকালে সে গোবিন্দজীর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। দশ হাজার লোক কীর্ত্তনাদি-সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাহার নশ্বর দেহ যমুনা-তটে ভস্ম করিয়াছে। মৃত্যুকালে এই সংবাদটা আপনাকে সে দিতে বলিয়াছে।

নীল আকাশ হইতে যেন বজ্রপাত হইয়া গেল।

কান্নায় হরেন্দ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ এবং অনাবিল জ্যোৎস্না-রাত্রি সকলের চক্ষেই এক মুহূর্ত্তে অন্ধকারে একাকার হইয়া উঠিল।

আশুবাবু কাঁদিয়া বলিলেন, দু'দিন! আটচল্লিশ ঘণ্টা! এত কাছে? আর একটা খবর সে দিলে না?

হরেন্দ্র চোখ মুছিয়া বলিল, প্রয়োজন মনে করেনি। কিছু করতে পারা তো যেতো না, তাই বোধ হয় কাউকে দুঃখ দিতে সে চায়নি।

আশুবাবু যুক্ত-হাত মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, তার মানে দেশ ছাড়া আর কোন মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকার করেনি। শুধুই দেশ—এই ভারতবর্ষটা। তবু, ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো! তুমি আর যাই করো, এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত ক'রো না। বাসদেও. চালাও।

এই শোকের আঘাত কমলের চেয়ে বেশি বোধ করি কাহারও বাজে নাই, কিন্তু বেদনার বাষ্পে কণ্ঠকে সে আচ্ছন্ন করিতে দিল না। চোখ দিয়া তাহার আগুন বাহির হইতে লাগিল, বলিল, দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে। হরেন্দ্রকে কহিল, কাঁদবেন না হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।

তাহার স্বচ্ছ কঠিন স্বর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত গিয়া সকলকে বুকে বিঁধিল।

আশুবাবু চলিয়া গেলেন। এবং সেই শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কমল অজিতকে লইয়া গাড়িতে গিয়া বসিল। কহিল, রামদীন, চল।

স্বামী

স্বামী

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশী ত তিনি চোখে দেখে যেতে পাননি, তবে এমন করে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি করে? বীজ-মন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত করে গেছেন।

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু না গো না, এ আমার দেমাক নয়, দেমাক নয়। বুক চিরে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্ত্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গৌরব করবার আমার আর বাকী কিছুই নেই, একেবারে—কিছু নেই। আঠারো-উনিশ? হ্যাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তাঁর বেশী প্রাচীন হতে পায়নি। কিন্তু এই বুকের ভিতরটায়! এখানে যে বুড়ী তার উনআশী বছরের শুকনো হাড়-গোড় নিয়ে বাস করে আছে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে আঁৎকে উঠতে।

একলা ঘরের মধ্যে মনে হলেও তা আজও লজ্জায় মরতে ইচ্ছা করে, তবে এ কলঙ্কের কালি কাগজের উপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটাই ত আজ আমাকে বলতে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

সব মেয়ের মত আমি ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবু কেন তাতে আমার মন উঠল না। তাই যে দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি-বড় শক্রর জন্যেও তা একদিনের জন্যে কামনা করিনি। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ত। যিনি সমস্ত পাপ পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ায়-ক্রান্তিতে আদায় করে সর্ব্বস্বান্ত করে যখন আমাকে পথে বার করে দিলেন, লজ্জা-সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না, তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্ব্বনাশী, এ তুই করেচিস্ কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাকে যে তোর পেতেই হবে। এ-জন্ম হোক, আগামী জন্মে হোক, কোটি জন্ম পরে হোক, তাঁকে যে তোর চাই-ই, তুই যে তাঁরই।

জানি, যা হারিয়েচি, তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েচি। কিন্তু তবু যে এ-কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে, এটা আমার নারী-দেহ। আজ আমার আনন্দ

রাখবারও জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাখবারও যে ঠাঁই দেখি না প্রভু! এ-দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যে অহোরাত্র কাঁদছে—ওরে অস্পৃশ্যা, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াস্‌নে, আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার বাঁচি!

কিন্তু থাক্ সে কথা।

বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ি চলে এলেন। মামার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হলেও আমার আদর-যত্নের ত্রুটি হ'ল না; বড় বয়স পর্য্যন্ত তাঁর কাছে বসে ইংরেজী বাংলা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানতেন না। বাড়িতে একটা পূজা-অর্চ্চনা কি বার-ব্রতও কোনদিন হতে দেখিনি, এ-সব তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

নাস্তিক বৈ কি? মামা মুখে বলতেন বটে তিনি Agnostic, কিন্তু সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পিছনে আর একটা আকাশ-পাতাল জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তখন কি ছাই এ-সব বুঝেছিলাম! আসল কথা হচ্ছে, সূয্যির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশি ফোস্কা পড়ে। আমার মামারও হয়েছিল ঠিক সেই দশা।

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে বসে কি-সব করতেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পেত না। তা মা যা খুশি করুন, আমি কিন্তু আমার বিদ্যে ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ দেখবার জন্যে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আনতুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা শুরু করে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেতো না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়তুম। এমনি করেই আমাদের দিন কাটছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারি গোল বাধাতেন। মুখ ভারি করে এসে বলতেন, দাদা, সতুর তো দিন দিন বয়স হচ্ছে, এখন থেকে একটু খোঁজা-খুঁজি না করলে সময়ে বিয়ে দেবে কি করে!

মামা আশ্চর্য্য হয়ে বলতেন, বলিস কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয়নি, এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—

মা কাঁদ কাঁদ গলায় জবাব দিতেন, সাহেবদের কথা কেন তুলচ দাদা, আমরা ত সত্যিই আর সাহেব নই। ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া করতে

আসচেন না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সমাজ ত আছে? তাকে উড়িয়ে দেবে কি করে?

মামা হেসে বলতেন, ভাবিস্‌নে বোন, সে-সব আমি জানি। এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্চি, ঠিক এমনি করে আমাদের নচ্ছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব।

মা মুখ ভার করে বিড় বিড় করে বকতে বকতে উঠে যেতেন। মামা গ্রাহ্য করতেন না বটে, কিন্তু আমায় ভারী ভয় হ'ত। কেমন করে যেন বুঝতে পারতুম, মামা যাই বলুন, মার কাছে থেকে আমাকে তিঁনি রক্ষা করতে পারবেন না।

কেন যে বিয়ের কথায় ভয় হতে শুরু হয়েছিল, তা বলচি। আমাদের পশ্চিম-পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দু'পাড়ে যে দু' ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আমরা, অন্য ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদার-বংশ যেমন ধনী তেমনি দুর্দ্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে-বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এতবড় মিথ্যেটা মুখে আনতে আমার যে কি হচ্চে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানবে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি সত্যি একটা জিনিস—সত্যিই বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি বলতে পারি না। কলকাতায় সে বি. এ. পড়ত, কিন্তু ছুটির সময় বাড়ি এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা করতে প্রায়ই আসত। তখনকার দিনে Agnosticism ছিল বোধ করি লেখাপড়াজানাদের ফ্যাশান। এই নিয়েই বেশীরভাগ তর্ক হত। কতদিন মামা তাঁর গৌরব দেখাবার জন্য নরেনবাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দু'জনের তর্কের কোন মীমাংসা হ'ত না। কিন্তু আমিই প্রায় জিততুম, তার কারণও আজ আর আমার অবিদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিস্ময়ে বলে উঠত, আচ্ছা ব্রজবাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন বলে মনে করেন না?

আমি গর্ব্বে সৌভাগ্যে ঘাড় হেঁট করতুম। ওরে হতভাগী! সেদিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন?

মামা উচ্চ-অঙ্গের একটু হাস্য করে বলতেন, কি জানো নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।

কিন্তু তর্কাতর্কি আমার তত ভাল লাগত না, যত ভাল লাগত তার মুখের

মন্টিক্রিস্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হতে চায় না, আমার অধৈর্য্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙে পর্য্যন্ত সারাদিন একশ'বার মনে করতুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেনবাবু আসবে!

এমনি তর্ক করে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষ গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুল-গাছের তলা ঝরা ফুলে ফুলে একেবারে বোঝাই হয়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হয়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আনতুম। সেদিন বিকালেও, মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা করেই দ্রুতপদে যাচ্ছি, মা দেখতে পেয়ে বললেন, ওলো, ছুটে ত যাচ্ছিস্, জল যে এলো বলে।

আমি বললুম, জল এখন আসবে না মা, ছুটে গিয়ে দুটো কুড়িয়ে আনি।

মা বললেন, পোনের মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামবে সদু, কথা শোন্—যাস্‌নে। এই অবেলায় ভিজে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকোবে না তা বলে দিচ্ছি।

আমি বললুম, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়লে মালীদের ঐ চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব। বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে, দুঃখ দিতে আমাকে কিছুতেই পারতেন না। ছেলেবেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জানতেন, তাই চুপ করে রইলেন। কতদিন ভাবি, সেদিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে মা, এমন করে হয়ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুলফুলে কোঁচড় প্রায় ভর্ত্তি হয়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বললেন, তাই হ'ল। ঝুম্ ঝুম্ করে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাবছি, ঝম্ ঝম্ করে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—ওমা! এ যে নরেনবাবু। কলকাতা থেকে তিনি যে বাড়ি এসেছেন, কৈ সে ত আমি শুনিনি।

আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, সদু যে এখানে?

অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, অনেকদিন তাঁর গলা শুনিনি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কান পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না, মাটির দিকে চেয়ে বললুম, আমি ত রোজই ফুল কুড়াতে আসি। কবে এলেন?

নরেন মালীদের একটা ভাঙা খাটিয়া টেনে নিয়ে বসে বললে, আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, চোখ দুটো তার চাপা হাসিতে নাচচে।

লজ্জা! লজ্জা! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়ল, বললুম, তাই বৈ কি! কষ্ট করে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নরেন ফস্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আর আমি যদি ঐ কুড়ানো ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে?

জানিনে, কেন আমার ভয় হ'ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধরবে। হাতের মুঠা আমার আল্‌গা হয়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝুপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ও কি করলে?

আমি কোন মতে আপনাকে সামলে নিয়ে বললুম, আপনাদেরই ত ফুল, বেশ ত, নিন্ না কুড়িয়ে।

এঁ্যা! এত অভিমান! বলে সে উঠে এসে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে লাগল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার দু'চোখ জলে ভরে গেল, আমি জোর করে মুখ ফিরিয়ে আর একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ করে চেয়ে থেকে বললে, যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না, এত অল্পে রাগ করে, তার ফিলজফি পড়া কেন? আমি কালই গিয়ে ব্রজবাবুকে বলে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডশ্রম না করেন।

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বললুম, কে রাগ করেচে?

যে ফুল ফেলে দিলে?

ফুল ত আপনি পড়ে গেল।

মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে?

আমি ত মেঘ দেখচি।

মেঘ বুঝি এদিকে ফিরে দেখা যায় না?

কৈ যায়? বলে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দু'জনার চোখা-চোখি হয়ে গেল। নরেন ফিক্ করে হেসে বললে, একখানা আরসি থাকলে যায় কিনা দেখিয়ে দিতুম। নিজের মুখে-চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখতে পেতে; কষ্ট করে আকাশে খুঁজতে হ'ত না।

আমি তখন চোখ ফিরিয়ে নিলাম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেচি, কিন্তু

নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত সেদিন আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমার হৃৎপিণ্ড-টাকে যেন সজোরে দুলিয়ে দিলে। এই ত সেই পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সৌদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল।

নরেন বললে, মেঘ কাটলে ব্রজবাবুকে বলে দেব, লেখা-পড়া শেখান মিছে। তিনি আর যেন কষ্ট না করেন।

আমি বললুম, বেশ ত, ভালই ত। আমি ও-সব পড়তেও চাইনে বরং গল্পের বই পড়তে আমার ঢের ভাল লাগে।

নরেন হাততালি দিয়ে বলে উঠল, দাঁড়াও বলে দিচ্ছি, আজকাল নভেল পড়া হচ্চে বুঝি?

আমি বললুম, গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন?

নরেন বললে, সে শুধু তোমাকে গল্প বলার জন্যে। নইলে পড়তুম না। বৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা, এ জল যদি আজ না থামে? কি করবে?

বললুম, ভিজে ভিজে চলে যাব।

আচ্ছা, এ যদি আমাদের পাহাড়ী বৃষ্টি হ'ত, তা হলে?

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালবাসি! একটুখানি গন্ধ পাবামাত্র আমার চোখের দৃষ্টি এক মুহূর্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর নেমে এলো। জিজ্ঞাসা করে ফেললুম, সে-দেশের বৃষ্টির মধ্যে বুঝি বেরোনো যায় না?

নরেন বললে, একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।

আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেচ? পোড়া-মুখ দিয়ে তুমি বার হয়ে গেল। ভাবি, জিভটা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খসে পড়ে যেত!

সে বললে, এর পর যদি একজন আপনি বলে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখবে।

কেন দিব্যি দিলেন? আমি ত কিছুতেই তুমি বলব না।

বেশ, তা হলে মরা-মুখ দেখো।

দিব্যি কিছুই না। আমি মানিনে।

কেমন মান না, একবার আপনি বলে প্রমাণ করে দাও।

মনে মনে রাগ করে বললুম, পোড়ারমুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায়? মুখ দিয়ে ত কিছুতেই বার করতে পারলিনে। কিন্তু দুর্গতির যদি ঐখানেই সেদিন শেষ হয়ে যেত!

ক্রমে আকাশের জল থামল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুলিয়ে একাকার করে দিলে। সন্ধ্যা হয় হয়। ফুল কটি আঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়লুম।

নরেন বললে, চল, তোমাকে পৌঁছে দি।

আমি বললুম, না।

মন যেন বলে দিলে, সেটা ভাল নয়। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাব কি করে? বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ। পার হই কি করে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমাকে চুপ করে দাঁড়াতে দেখে অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেরি হ'ল না। কাছে এসে বললে, এখন উপায়?

আমি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললুম, নালায় ডুবে মরি, সেও আমার ভাল, কিন্তু একলা অতদূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতে যাব না। দেখলে—

কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না।

নরেন হেসে বললে, তার আর কি, চল তোমাকে সেই পিটুলি গাছটার উপর দিয়ে পার করে দিই।

তাই ত বটে। আহ্লাদে মনে মনে নেচে উঠলুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়েনি যে খানিকটা দূরে একটা পিটুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপড়ে নালার ওপর ব্রিজের মত পড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার-ওপার হয়েচি।

খুশী হয়ে বললুম, তাই চল—

নরেন তার চেয়েও খুশী হয়ে বললে, কেমন মিষ্টি লাগল বল ত!

বললুম, যাও—

সে বললে, নির্ব্বিঘ্নে পার না করে দিয়ে কি আর যেতে পারি!

বললুম, তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী?

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কি করেই বা মনে এলো এবং কেমন করেই বা মুখ দিয়ে বার করলুম। কিন্তু সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বললে, দেখি, তাই যদি হতে পারি—আমি ঘেন্নায় যেন মরে গেলুম।

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, তাতে পিটুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল তেমনই উঁচু-নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হু হু শব্দে বয়ে যাচ্ছে, আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই। নরেন খানিকক্ষণ দেখে বললে, আমার হাত ধরে যেতে পারবে?

বললুম, পারব। কিন্তু তার হাত ধরে এমনি কাণ্ড করলুম যে, সে কোনমতে টাল সামলে এদিকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েক মুহূর্ত্ত সে চুপ করে

আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেন ঝক্ ঝক্ করে উঠল। বললে, দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হতে পারি কি না?

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, কি করে?

এমনি করে, বলেই সে নত হয়ে আমার হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমিষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম। নরেন দ্রুতপদে পার হয়ে এপারে চলে এল। কিন্তু নামাবার আগে আমার ঠোঁট দুটোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক্ গে! কম ঘেন্নায় কি আর এ-দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়।

শিউরুতে শিউরুতে বাড়ি চলে এলুম, ঠোঁট দুটো তেমনি জ্বলতেই লাগল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কামরিচখোরের জ্বলুনির মত যত জ্বলতে লাগল জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বললেন, ভালো মেয়ে তুই সদু, এলি কি করে? নালাটা ত জলে জলমগ্ন হয়েছে দেখে এলুম। সেই গাছটায় ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? পড়ে মরতে পারলিনে?

না মা; সে পুণ্য থাকলে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন?

তার পরদিন নরেন মামার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি সেইখানেই বসেছিলুম; তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যে চোরাবালির মত আমার পা দুটোকে একটু একটু করে গিলতে লাগল, আমি নড়তেও পারলুম না, মুখ তুলে দেখতেও পারলুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেকদিন পর্য্যন্ত আর সে কলকাতায় গেল না। রোজই দেখা হতে লাগল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বলতে লাগলেন, ওদের পুরুষমানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্ত্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ করে বসে কি শুনিস্ বল্ ত? যা বাড়ির ভেতরে যা। এতবড় মেয়ের যদি লজ্জা-সরম একটু আছে!

এক-পা এক-পা করে আমার ঘরে চলে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকত তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টানতে থাকত।

আমার মামা আর যাই হোন, তাঁর মনটা প্যাঁচালো ছিল না। তা ছাড়া লিখে পড়ে তর্ক করে ভগবানকে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এমনি

অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘটচে তা দেখতে পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেছি, জগতের সবচেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্চে সবচেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই। তিনি যে এই 'না" রূপেই তাদের পোনর আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না, সপ্রমাণ হোক অপ্রমাণ হোক, তাঁর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, সংসারের মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় বসে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে। আমার মামারও ছিল সেই দশা। তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু মা ত তা নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না। আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ করেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দু'জনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিকটাকে আমি দু'হাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলেচি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হলে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল দওয়া মদে আর তার মনে ওঠে না। নির্জ্জলা বিষের আগুনে, কলজে পুড়িয়ে তালাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

আর একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুলতে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্য্যের চেহারা। ছেলেবেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘর-দোর, ছবি-দেয়ালগিরি, আলমারি, সিন্দুক, আসবাব-পত্রের সঙ্গে কোন্ একটি ভাবী ছোট একতালা শ্বশুরবাড়ির কদাকার মূর্ত্তি কল্পনা করে মনে মনে আমি যে শিউরে উঠতুম।

মাস-খানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান করে বাড়িতে পা দিয়েই দেখি বারান্দার ওপর একজন প্রৌঢ়-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে বসে গল্প করচে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, এইটি বুঝি মেয়ে?

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ মা, আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, নইলে—

স্ত্রীলোকটি হেসে বললে, তা হোক, ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, দু'জনের মানাবে ভাল! আর ঐ শুনতেই দোজবরে, নইলে যেন কার্ত্তিক।

আমি দ্রুতপদে ঘরে চলে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটকঠাকরুণ, আমার সম্বন্ধ এনেচেন।

মা চেঁচিয়ে বললেন, কাপড় ছেড়ে একবার এসে বস মা।

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে

আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেন ঝক্ ঝক্ করে উঠল। বললে, দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হতে পারি কি না?

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, কি করে?

এমনি করে, বলেই সে নত হয়ে আমার হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমিষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম। নরেন দ্রুতপদে পার হয়ে এপারে চলে এল। কিন্তু নামাবার আগে আমার ঠোঁট দুটোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক্ গে! কম ঘেন্নায় কি আর এ-দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়।

শিউরুতে শিউরুতে বাড়ি চলে এলুম, ঠোঁট দুটো তেমনি জ্বলতেই লাগল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কামরিচখোরের জ্বলুনির মত যত জ্বলতে লাগল জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বললেন, ভালো মেয়ে তুই সদু, এলি কি করে? নালাটা ত জলে জলমগ্ন হয়েছে দেখে এলুম। সেই গাছটায় ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? পড়ে মরতে পারলিনে?

না মা; সে পুণ্য থাকলে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন?

তার পরদিন নরেন মামার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি সেইখানেই বসেছিলুম; তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যে চোরাবালির মত আমার পা দুটোকে একটু একটু করে গিলতে লাগল, আমি নড়তেও পারলুম না, মুখ তুলে দেখতেও পারলুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেকদিন পর্য্যন্ত আর সে কলকাতায় গেল না। রোজই দেখা হতে লাগল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বলতে লাগলেন, ওদের পুরুষমানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্ত্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ করে বসে কি শুনিস্ বল্ ত? যা বাড়ির ভেতরে যা। এতবড় মেয়ের যদি লজ্জা-সরম একটু আছে!

এক-পা এক-পা করে আমার ঘরে চলে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকত তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টানতে থাকত।

আমার মামা আর যাই হোন, তাঁর মনটা প্যাঁচালো ছিল না। তা ছাড়া লিখে পড়ে তর্ক করে ভগবানকে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এমনি

অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘটচে তা দেখতে পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেছি, জগতের সবচেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্চে সবচেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই। তিনি যে এই 'না" রূপেই তাদের পোনর আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না, সপ্রমাণ হোক অপ্রমাণ হোক, তাঁর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, সংসারের মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় বসে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে। আমার মামারও ছিল সেই দশা। তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু মা ত তা নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না। আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ করেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দু'জনের মধ্যে যে কত বড ছিল, এ শুধু যে তিনিই জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিকটাকে আমি দু'হাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলেচি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হলে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল দেওয়া মদে আর তার মনে ওঠে না। নির্জ্জলা বিষের আগুনে, কলজে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

আর একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুলতে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্য্যের চেহারা। ছেলেবেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘর-দোর, ছবি-দেয়ালগিরি, আলমারি, সিন্দুক, আসবাব-পত্রের সঙ্গে কোন্ একটি ভাবী ছোট একতালা শ্বশুরবাড়ির কদাকার মূর্ত্তি কল্পনা করে মনে মনে আমি যে শিউরে উঠতুম।

মাস-খানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান করে বাড়িতে পা দিয়েই দেখি বারান্দার ওপর একজন প্রৌঢ়-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে বসে গল্প করচে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, এইটি বুঝি মেয়ে?

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ মা, আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, নইলে—

স্ত্রীলোকটি হেসে বললে, তা হোক, ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, দু'জনের মানাবে ভাল! আর ঐ শুনতেই দোজবরে, নইলে যেন কার্ত্তিক।

আমি দ্রুতপদে ঘরে চলে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটকঠাকরুণ, আমার সম্বন্ধ এনেচেন।

মা চেঁচিয়ে বললেন, কাপড় ছেড়ে একবার এসে ব স মা।

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে

শুনতে লাগলুম। বুকের কাঁপুনি যেন আর থামতে চায় না। শুনতে পেলুম, চিত্তোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ মুখুয্যের ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে না-কি অনেক দুঃখ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্ত্র, সে নাম শুনে সেদিন গা জ্বলে যাবে কেন?

শুনলুম. বাপ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট দুটি ভাই, এক ভায়ের বিয়ে হয়েচে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে, তাই এনট্রান্স পাশ করেই রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়তে হয়েছে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি করে উপায় মন্দ করেন না। তাঁরই উপর সমস্ত-নির্ভর। তা ছাড়া ঘরে নারায়ণশিলা আছেন, দুটো গরু আছে, বিধবা বোন আছে—নেই কি?

নেই শুধু সংসারের বড়বৌ! সাত বছর আগে বিয়ের একমাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তারপর এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাত বছর! ঘটকীকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বললুম, পোড়ারমুখী, এতদিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিলি?

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বসলুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললে, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, এখন দিন স্থির করলেই হ'ল। মায়ের চোখ দুটিতে জল টল্ টল্ করতে লাগল, বললেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা, আর কি বলব।

মামা শুনে বললেন, এনট্রান্স? তবে বলে পাঠা, এখন বছর-দুই সতুর কাছে ইংরিজি পড়ে যাক্, তবে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।

মা বললেন, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত ক'রো না; এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে-থুতে কিছু হবে না—

মামা বললেন, তা হলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দে গে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।

মা বললেন, পনেরয় পা দিলে যে—

মামা বললেন, তা ত দেবেই, পনের বছর বেঁচে রয়েচে যে!

মা রাগে দুঃখে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, তুমি কি ওর তবে বিয়ে দেবে না দাদা? এর পরে একেবারেই পাত্র জুটবে না।

মামা বললেন, সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না!

মা বললেন, ছেলেটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এসো না দাদা, পছন্দ না হয় না দেবে!

মামা বললেন, সে ভাল কথা। রবিবার যাব বলে চিঠি লিখে দিচ্চি।

ভাঙচির ভয়ে কথাটা মা গোপনে রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না, এমন চোখ-কানও ছিল যাকে কোন সতর্কতা ফাঁকি দিতে পারে না।

স্বামী

বাগানে একটুকরো শাকের ক্ষেত করেছিলুম। দিন-দুই পরে দুপুরবেলা একটা ভাঙা খুন্তি নিয়ে তার ঘাস তুলচি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, নরেন। তার সে-রকম মুখের চেহারা অনেকদিন পরে আর একবার দেখেছিলাম সত্যি, কিন্তু আগে কখনও দেখিনি। বুকে এমন একটা ব্যথা বাজলো যা কখনো কোনদিন পাইনি। সে বললে, আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চললে?

কথাটা বুঝেও যেন বুঝতে পারলুম না। বলে ফেললুম, কোথায়?

সে বললে, চিতোর।

স্পষ্ট হ'বামাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল, কোন উত্তর মুখে এল না।

সে পুনরায় বললে, তাই আমিও বিদায় নিতে এসেচি, বোধ হয় জন্মের মতই। কিন্তু তার আগে দুটো কথা বলতে চাই—শুনবে?

বলতে বলতেই তার গলাটা যেন ধরে গেল। তবুও আমার মুখে কথা যোগাল না—কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি! দেখি, তার দু'চোখ বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়চে।

ওরে পতিত! ওরে দুর্ব্বল নারী! মানুষের চোখের জল সহ্য করবার ক্ষমতা ভগবান তোকে যখন একেবারে দেননি, তখন তোর আর সাধ্য ছিল কি! দেখতে দেখতে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেছে। নরেন কাছে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধরে বললে, চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসি গে, এখানে কেউ দেখতে পাবে।

মনে বুঝলুম, এ অন্যায়, একান্ত অন্যায়। কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা ভিজে; তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরা।

বাগানের একপ্রান্তে একটা কাঁটালী-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুর্ দুর্ করছিল, কিন্তু সে নিজেই দূরে গিয়ে বসে বললে, এই একান্ত নির্জ্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেচি বটে, কিন্তু তোমাকে ছোঁব না, এখনও তুমি আমার হওনি।

তার শেষ কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়ল। আঁচলে চোখ মুছে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলুম।

তারপর অনেক কথাই হলো; কিন্তু থাক্ গে সে সব। আজও ত প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত মনে করতে পারি, মরণেও যে বিস্মৃতি আসবে, সে আশা করতেও যেন ভরসা হয় না; একটা কারণে আমি আমার এতবড় দুর্গতিতেও কোনদিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিত্তের মাঝ থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোনদিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে, এ ত তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্ত্তের

উত্তেজনা পরক্ষণের কতবড় অবসাদে যে ডুবে যেত, সে আমি ভুলিনি। যেন কার কত চুরি-ডাকাতি সর্ব্বনাশ করে ঘরে ফিরে এলুম, এমনি মনে হ'ত। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, অন্তর্যামীর এতবড় ইঙ্গিতেও আমার হুঁস হয়নি। হবেই বা কি করে। কোনদিন ত শিখিনি যে, ভগবান মানুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এ সবই তাঁরই নিষেধ।

মামা পাত্র দেখতে যাত্রা করলেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাসা করে গেলেন। মা মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝলেন, এ যাওয়া পণ্ডশ্রম। পাত্র তাঁর কিছুতেই পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেন না। বললেন, হাঁ, ছেলেটি পাশ-টাশ তেমন কিছু করতে পারেনি বটে, কিন্তু মুখ্যু বলেও মনে হ'ল না। তা ছাড়া নম্র, বড় বিনয়ী। আর একটা কি জানিস্ গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি-একটু আছে; ইচ্ছে হয় বসে বসে আরও দু'দণ্ড আলাপ করি।

মা আহ্লাদে মুখখানি উজ্জ্বল করে বললেন, তবে আর আপত্তি ক'রো না দাদা, মত দাও—সত্বর একটা কিনারা হয়ে যাক।

মামা বললেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধরে মনে মনে বললুম, যাক, মামা এখনো মনস্থির করতে পারেননি এখনও বলা যায় না। কিন্তু কে জানত তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার পূর্ব্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার ডাক এসে পড়বে। যাঁকে সারাজীবন সন্দেহ করে এসেচেন, সেদিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চমকে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক লাগল না। মাকে কাছে ডেকে বললেন, আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন, সত্বর সেইখানেই বিয়ে দিস্। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাকবে। অবাক্ কাণ্ড! কিন্তু অবাক হলেন না শুধু মা! নাস্তিকতা তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মরণকালে সবাই ঘুরে-ফিরে হরি বলে। তাই তিনি বলতেন, মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর করবার বেলায় করে শুধু তাকে যে মদ খায় না। জানি না, কথাটা কতখানি সত্যি।

হৃদরোগে মামা মারা গেলেন, পড়লুম অকূল-পাথারে। সুখে দুঃখে কিছু-দিন কেটে গেল বটে, কিন্তু যে-বাড়িতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পনের পার হয়ে যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক করবার সুবিধা থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে বসে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেকদিন অনেক কথা-কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই

আমার বুকে এসে বিঁধল, তখন বয়সও ষোল পার হয়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এমনিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্য জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ করে প্রায়ই ভর্ৎসনা করতেন, হতভাগ্য মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া। একে ত বিয়ের কনের পক্ষে সতের বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তাঁর উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ সে রাতটার জন্যও যদি আমাকে কোনরকম মুচড়ে মাচড়ে একটু খাটো করে তুলতে পারতেন, মা বোধ করি তাতেও পেছুতেন না। কিন্তু সে ত হবার নয়, আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ'ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ্য মর্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি।

ইতিপূর্ব্বে কতদিন সারারাত্রি জেগে ভেবেচি, এমন দুর্ঘটনা যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গেই আমার বিয়ে কোন-মতেই হতে পারবে না। সে-রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি করে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু কৈ কিছুই ত হ'ল না। আরও পাঁচজন বাঙালীর মেয়ের যেমন হয় শুভকর্ম্ম তেমনি করে আমারও সমাধা হয়ে গেল এবং তেমনি করেই একদিন শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পাল্কীর ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালী-চাপার কুঞ্জটায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কতদিনের কত চোখের জল, কত দিব্যি-দিলাশার নীরব সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যেদিন পাকা হয়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চলে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নের তখন আবশ্যক হয়নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত! কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটাদিনও দেখা দিলে না, শুধু যদি খবরটা পেতুম।

শ্বশুরবাড়ি গেলুম, বিয়ের বাকী অনুষ্ঠানও শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্ম্মপত্নীর পদে এইবার পাকা হয়ে বসলুম।

দেখলুম স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়িশুদ্ধ আমার দলে। শ্বশুর নেই, সৎ-শাশুড়ী তাঁর নিজের ছেলে দুটি, একটি বৌ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এতদিন নিরাপদে সংসার করছিলেন, হঠাৎ একটা সতের-আঠার বছরের মস্ত বৌ দেখে তাঁর সমস্ত মন সশস্ত্র জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বললেন,

বাঁচলুম বৌমা, তোমার হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন দু'দণ্ড ঠাকুরের নাম করতে পাব। ঘনশ্যাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী; সে থাকলেই তবে সব বজায় থাকবে, এইটি বুঝে শুধু কাজ কর মা, আর কিছু আমি চাইনে।

তাঁর কাজ তিনি করলেন; আমার কাজ আমি করলুম, বললুম, আচ্ছা। কিন্তু সে ওই কুস্তিগীরের তাল ঠোকার মত; প্যাঁচ মারতে যে দু'জনেই জানি, তা ইসারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিনতে পারে, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁকে জানতে আমারও যেমন দেরি হ'ল না, আমাকেও দু'দিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনই আরামের শ্বাস ফেললেন, বেশ বুঝলেন, স্বামীর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, খরচ-পত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধরে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের তূণে যত-প্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, 'আড়ি-পাতা'টা ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধে পেলে এতে মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, জা-ননদ,—কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর টেনে নিয়ে সারা-রাত্রি পড়ে থাকতুম, এ সুসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হলে সেইদিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই বলে এক শয্যায় শুতেও আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হ'ল না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ মনে রাগ কিংবা অভিমান করে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বললেন, ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় করে নিয়ে কি শুতে পার না?

আমি বললুম, দরকার কি, আমার ত এতে কষ্ট হয় না।

তিনি বললেন, তা হলেও একদিন অসুখ করতে পারে যে।

আমি বললুম, তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিতে পার না?

তিনি বললেন, ছিঃ, তা কি হয়? তাতে কত-রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠবে।

বললুম, ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করিনে।

তিনি একমুহূর্ত্ত চুপ করে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, এতবড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাকবে, এমন কি কথা আছে? বলে একটুখানি হেসে কাজে চলে গেলেন।

আমার মেজদেওর টাকা চল্লিশের মত কোথাও চাকরি করতেন, কিন্তু একটা

পয়সা কখনো সংসারে দিতেন না। অথচ তাঁর আফিসের সময়ে ভাত, আফিস থেকে এলে পা-ধোবার গাড়ু-গামছা, জল-খাবার, পান, তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্ম বাড়িশুদ্ধ সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাকত। দেখতুম, আমার স্বামী, আমার মেজদেওর হয়ত কোনদিন একসঙ্গেই বিকেলবেলার বাড়ি ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্যেই ব্যতিব্যস্ত, এমন কি চাকরটা পর্য্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্যে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্চে। তাঁর একতিল দেরি কিংবা অসুবিধা হলে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখতো না। তিনি আধঘণ্টা ধরে হয়ত এক ঘটি জলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিকে কারও গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্যেই তিনি দিবারাত্রি খেটে মরচেন। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাঁর যেন কিছুতেই শ্রান্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শান্ত, এত ধীর, এতবড় পরিশ্রমী এর আগে কখনও আমি চোখে দেখিনি। আর চোখে দেখেচি বলেই লিখতে পারচি, নইলে শোনা কথা হলে বিশ্বাস করতেই পারতুম না, সংসারে এমন ভালোমানুষও থাকতে পারে। মুখে হাসিটা লেগেই আছে। সবতাতেই বলতেন, থাক্ থাক্ আমার এতেই হবে।

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল। তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়িসুদ্ধ সকলের এতবড় অন্যায় অবহেলায় আমার গা যেন জ্বলে যেতে লাগল।

বাড়িতে গরুর দুধ বড় কম হ'ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোনদিন বা একটু পড়ত, কোনদিন পড়ত না হঠাৎ একদিন সইতে না পেরে বলে ফেলেছিলুম আর কি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছি, ছি, কি নির্লজ্জই আমাকে তা হলে এরা মনে করত! তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়া-মায়া না করে, আমারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? আমি কোথাকার কে? পর বৈ ত না।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে বসে মেজঠাকুরপোর জন্যে চা তৈরী করচি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বার হবার দরকার ছিল, ফিরতে দেরি হবে, মাকে ডেকে বললেন, কিছু খেয়ে গেলে বড় ভাল হ'ত মা, খাবার-টাবার কিছু আছে?

মা বললেন, অবাক করলে ঘনশ্যাম। এত সকালে খাবার পাব কোথায়?

স্বামী বললেন, তবে থাক্, ফিরে এসেই খাব। বলে চলে গেলেন।

সেদিন আমি কিছুতেই আপনাকে আর সামলাতে পারলুম না। আমি জানতুম ও-পাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াই-বাড়ির পাওয়া সন্দেশ-রসগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কাল রাত্রে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুকতেই বলে ফেললুম, কালকের খাবার কিছু ছিল না মা?

তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়ে বললেন, খাবার আবার কে কিনে আনলে বৌমা?

আমি বললুম, সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল?

তিনি বললেন, ও মা, সে আবার কটা যে, আজ সকাল পর্য্যন্ত থাকবে? সে ত কালই শেষ হয়ে গেছে।

বললুম, তা ঘরেই কিছু খাবার তৈরী করে দেওয়া যেত না মা?

শাশুড়ী বললেন, বেশ ত বৌমা, তাই কেন দিলে না? তুমি ত বসে বসে সমস্ত শুনছিলে বাছা?

চুপ করে রইলুম। আমার কি-ই বা বলবার ছিল। স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার টান ত আর বাড়িতে কারো অবিদিত ছিল না।

চুপ করে রইলুম সত্যি, কিন্তু ভেতরে মনটা আমার জ্বলতেই লাগল! দুপুরবেলা শাশুড়ী ডেকে বললেন, খাবে এস বৌমা, ভাত বাড়া হয়েচে।

বললুম, আমি এখন খাব না, তোমরা খাও গে।

আমার আজকের মনের ভাব শাশুড়ী লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, খাবে না কেন শুনি?

বললুম, এখন ক্ষিদে নেই।

আমার মেজজা আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলেন। রান্নাঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে বলে উঠলেন, বট্‌ঠাকুরের খাওয়া না হলে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না, না?

শাশুড়ী বললেন, তাই না কি বৌমা? বলি, এ নতুন ঢঙ শিখলে কোথায়?

তিনি কিছুই মিথ্যে বলেননি, আমার পক্ষে এ ঢঙই বটে, তবু খোঁটা সইতে পারলুম না, জবাব দিয়ে বললুম, নূতন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে?

তবু ভাল, ঘনশ্যামের এতদিনে কপাল ফিরল? বলে শাশুড়ী মুখখানা বিকৃত করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজজায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে শুনিয়েই বললেন, তখনই ত বলেছিলুম মা! বুড়ো শালিক পোষ মানবে না।

রাগ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা করে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল। কেবল মনে হতে লাগল, তাঁর খাওয়া হয়নি বলে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেচি, ফিরে এসে, এ-সব যদি তাঁর কানে যায়? ছি ছি! কি ভাববেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ খাপছাড়া যে নিজের লজ্জাতেই নিজে মরে যেতে লাগলুম।

কিন্তু বাঁচলুম, ফিরে এসে এ-কথা কেউ তাকে শোনালে না।

সত্যিই বাঁচলুম, এর এক বিন্দু মিছে নয়, কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে কি? যদি বলি, সে-রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হতে লাগল, কেউ যদি কথাটা ওঁর কানে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতে খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেচি, তবু মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করিনি, কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হলে তোমাদের দোষ দেব না, হলে বহুভাগ্য বলে মানব। আজ আমার স্বামীর বড় ত বহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বলচি, মানুষের মন পদার্থটার যে অন্ত নেই সেইদিন তার আভাস পেয়েছিলুম। এতবড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন দুটো উল্টো স্রোত একসঙ্গে বয়ে যাবার স্থান হতে পারে দেখে তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

মনে মনে বলতে লাগলুম, এ যে বড় লজ্জার কথা! নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে দিতুম, শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষ হলেই হয় না, কর্ত্তব্য করতে শেখাও দরকার। যে স্ত্রীর তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্যে কি করেচে একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল! খদ্যোৎ চায় সূর্য্যদেবকে আলো ধরে পথ দেখাতে! তাই বলি, হতভাগীর স্পর্দ্ধার কি আর আদি-অন্ত দাওনি ভগবান!

গরমের জন্যে কি না বলতে পারিনে, ক'দিন ধরে প্রায়ই মাথা ধরছিল। দিন-পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছটফট করে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে পাশে বসে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করচে। একবার ঠক করে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে আলো জ্বলছিল, চেয়ে দেখলুম স্বামী।

রাত জেগে বসে পাখার বাতাস করে আমাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন!

হাত দিয়ে পাখাটা ধরে ফেলে বললুম, এ তুমি কি করচ?

তিনি বললেন, কথা কইতে হবে না, ঘুমোও, জেগে থাকলে মাথাধরা ছাড়বে না।

আমি বললুম, আমার মাথা ধরচে, তোমাকে কে বললে?

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, কেউ বলেনি; আমি হাত গুনতে জানি। কারো মাথা ধরলেই টের পাই।

বললুম, তা হলে অন্যদিনও পেয়েচ বল? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।

তিনি আবার একটু হেসে বললেন, রোজই পেয়েচি। কিন্তু এখন একটু ঘুমোবে, না কথা কবে?

বললুম, মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে, আর ঘুমোবো না।

তিনি বললেন, তবু সবুর কর, ওষুধটা তোমার কপালে লাগিয়ে দিই, বলে উঠে

গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘষে দিতে লাগলেন। আমি ঠিক ইচ্ছে করেই যে করলুম তা নয়, কিন্তু আমার ডান হাতটা কেমন করে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা চেপে ধরে রাখলেন। হয়ত একবার একটু জোর করেও ছিলুম। কিন্তু জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। দুরন্ত ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর করে ধরে রাখেন, তখন বাইরে থেকে হয়ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না।

বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে ওইটাই তার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। আমার এই জড়পিণ্ড হাতটারও বোধ করি সে জ্ঞানই ছিল, নইলে কি করে সে টের পেলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে পড়ে থাকবার এমন আশ্রয় তার আর নেই!

তারপর তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলোতে লাগলেন, আমি চুপ করে পড়ে রইলুম। আমি এর বেশি আর বলব না। আমার সেই প্রথম রাত্রির আনন্দ-স্মৃতি—সে আমার, একেবারে আমারই থাক।

কিন্তু আমি ত জানতুম, ভালবাসার যা-কিছু সে আমি শিখে এবং শেষ করে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেচি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল শেখা, এই সোজা কথাটা সেদিন যদি টের পেতাম! স্বামীর কোলের উপর থেকে আমার হাতখানা যে তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ করে এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌঁছে দেবার মত চেষ্টা করছিল, এই কথাটাই যদি সেদিন আমার কাছে ধরা পড়ত!

সকালে ঘুম ভেঙে দেখলুম, স্বামী ঘরে নেই, কখন উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, স্বপন দেখিনি ত? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েচে। কি যেন মনে হ'ল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে রেখে বাইরে এলুম।

শাশুড়ীঠাকরুণ সেদিন থেকে আমার উপর যে কড়া নজর রাখছিলেন সে আমি টের পেতুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক গে, আমি কোন কথায় আর থাকব না। তা ছাড়া দু'দিন আসতে না আসতে স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া—ছি ছি, লোকে শুনলেই বা বলবে কি?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ পড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম সে আমি নিজেই জানতুম না! তাই দুটোদিন যেতে না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া করে ফেললুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়তদার বন্ধু সেদিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ

পাঠিয়েছিলেন। স্নান করতে পুকুরে যাচ্ছি, দেখি বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। কাছে এসে দাঁড়ালুম, মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজজা তরকারি কুটচেন, শাশুড়ী বলে বলে দিচ্ছেন; এটা মাছের ঝোলের কুটনো, এটা মাছের ডালনার কুটনো, ওটা মাছের অম্বলের কুটনো, এমনিই সমস্ত প্রায় আঁশ-রান্না। আজ একাদশী, তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হাঙ্গামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই দেখলুম না। তিনি বৈষ্ণবমানুষ, মাছ-মাংস ছুঁতেন না। একটু ডাল, দুটো ভাজাভুজি, একটুখানি অম্বল হলেই তাঁর খাওয়া হ'ত। অথচ ভাল খেতেও তিনি ভালবাসতেন। এক-আধদিন একটু ভাল তরকারি হলে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাকত না, তাও দেখেচি।

বললুম, ওঁর জন্যে কি হচ্ছে মা?

শাশুড়ী বললেন, আজ আর সময় কৈ বৌমা? ওর জন্যে দুটো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে বলে দিয়েচি, তার পর একটু দুধ দেব'খন।

বললুম, সময় নেই কেন মা?

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখতে তো পাচ্ছ বৌমা! এতগুলো আঁশ-রান্না হতেই ত দশটা-এগারোটা বেজে-যাবে। আজ আমার অখিলের (মেজদেওর) দু-চার জন বন্ধু-বান্ধব খাবে, তারা হ'ল সব অপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হলে পিত্তি পড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর উপর আবার নিরামিষ রান্না করতে গেলে ত রাঁধুনি বাঁচে না! তার প্রাণটাও ত দেখতে হবে বাছা।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ রি রি করে জ্বলতে লাগল। তবু কোনমতে আত্মসংবরণ করে বললুম, শুধু আলু উচ্ছে-ভাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে মা? একটুখানি ডাল রাঁধবারও কি সময় হ'ত না?

তিনি আমার মুখের পানে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে।

এতক্ষণ রাগ সামলেছিলুম, আর পারলুম না। বলে ফেললুম, কাজ সকলেরি আছে মা। তিনি তিরিশ টাকার কেরানীগিরি করেন না বলে, কুলি-মানুষ বলে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারো। কিন্তু আমি ত পারিনে। আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনী রাঁধতে না পারে, আমি যাচ্ছি।

শাশুড়ী খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি ত কাল এলে বৌমা, এতদিন তার কি করে খাওয়া হ'ত শুনি?

বললুম, সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কাল এলেও আমি কচি খুকী নই মা! এখন থেকে সে-সব হতে দিতে পারব না। রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বললুম, বড়বাবুর জন্য নিরামিষ ডাল, ডালনা, অম্বল হবে। তুমি না পার, একটা উনুন

ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধচি; বলে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করে স্নান করতে চলে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই করতুম। এই ধপ্‌ধপে, সাদা বিছানাটার উপর ভেতরে ভেতরে যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ এতদিনের পর আজ বিছানা করবার সময় সে-কথা জানতে পেরে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় মরে গেলুম।

ঘড়িতে বারোটা বাজতে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এত রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে বই পড়েছিলুম, তাঁর পায়ের শব্দ সে-খবর আজ এমনি স্পষ্ট করে আমার কানে কানে বলে দিল যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পারলুম না।

স্বামী বললেন, এখনো শোওনি যে?

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ির পানে তাকিয়ে চমকে উঠলুম—তাই ত, বারোটা বেজে গেছে।

কিন্তু যিনি সব দেখতে পান, তিনি দেখেছিলেন আমি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখেচি।

স্বামী শয্যায় বসে একটু হেসে বললেন, আজ আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছিলে?

বললুম, কে বললে?

তিনি বললেন, সেদিন তোমাকে ত বলেচি, আমি হাত গুনতে জানি।

বললুম, জানলে ভালই! কিন্তু তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?

তিনি বললেন, গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, কিন্তু আমি দিচ্ছি। আচ্ছা জিজ্ঞেসা করি, এত অল্পে তোমার রাগ হয় কেন?

বললুম, অল্প? তুমি কি ভাবো তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা দিয়ে সকলের ওজন চলবে? কিন্তু তাও বলচি, তুমি যে এত বলচ, এ অত্যাচার চোখে দেখলে তোমার রাগ হ'ত।

তিনি আবার একটু হাসলেন, বললেন, আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেচেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হতে হবে।

কেন, আমার অপরাধ?

বৈষ্ণবের স্ত্রী, এইমাত্র তোমার অপরাধ।

বললুম, তা হতে পারে, কিন্তু গাছের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা

সে, যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া যে লোক ভগবান পর্য্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি?

স্বামী হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন, কে ভগবান মানে না? তুমি?

বললুম, হাঁ, আমি।

তিনি বললেন, ভগবান মান না কেন?

বললুম, নেই বলে মানিনে। মিথ্যে বলে মানিনে।

আমি লক্ষ্য করে দেখছিলুম, আমার স্বামীর হাসি-মুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল, এই কথার পরে সে-মুখ একেবারে যেন ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, শুনেছিলুম, তোমার মামা নাকি নিজেকে নাস্তিক বলতেন—

আমি মাঝখানে ভুল শুধরে দিয়ে বললুম, তিনি নিজেকে নাস্তিক বলতেন না, Agnostic বলতেন—

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে আবার কি?

আমি বললুম, Agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই কোন কথাই বলে না।

কথাটা শেষ না হতেই স্বামী বলে উঠলেন, থাক্ এ-সব আলোচনা, আমার সামনে তুমি কোনদিন আর এ-কথা মুখে এনো না।

তবু তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা জোগাল না। ভগবানের ওপর তাঁর অচল বিশ্বাস আমি জানতুম, কিন্তু কোন মানুষ যে আর একজনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুনলে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। এই নিয়ে মামার বসবার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেচি, অপরকেও করতে শুনেচি, রাগারাগি হয়ে যেতে বহুবার দেখেছি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কিন্তু কোন তর্ক না করে এভাবে আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ভাবি, আমার অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সেদিন শেষ হ'ল না।

যে মাদুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটানো থাকত; আজ কে সরিয়ে রেখেছিল বলতে পারিনে। খুঁজে পাচ্ছিনে দেখে, তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোষক তুলে বললেন, আজ এইটে পেতে শোও। এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল?

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূল হয়ে আমার বুকে বিঁধল। রোজ ত আমি নীচেই শুই। সামান্য একখানা

মাদুর পেতে যেমন-তেমনভাবে রাত্রি যাপন করাটাই ত ছিল আমার সবচেয়ে বড় গর্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট দুটি কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল?

অন্যত্র শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু শোবামাত্রই কান্নার ঢেউ যেন আমার গলা পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠল। জানিনে, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হতে না হতেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করচি, তিনি ডেকে বললেন, আজ এত ভোরে উঠলে যে?

বললুম, ঘুম ভেঙে গেল তাই বাইরে যাচ্ছি।

বললে, একটা কথা আমার শুনবে?

রাগে, অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল, বললুম, তোমার কথা কি আমি শুনিনি?

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, শোন, আচ্ছা তা হলে কাছে এস, বলি।

বললুম, আমি ত কালা নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাব।

পাবে না গো, পাবে না, বলেই হঠাৎ তিনি সুমুখে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতটা ধরে ফেললেন আমি জোর করে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারব কেন, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর করে আমার মুখ তুলে ধরে বললেন, যারা ভগবান মানে, তারা কি বলে, জান? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বলতে নেই।

আমি বললুম, কিন্তু যারা ভগবান মানে না তারা বলে, কারও কাছে মিথ্যে বলতে নেই।

স্বামী হেসে বললেন, বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অতবড় মিথ্যে কথাটা কাল কি করে মুখে আনলে বল ত? কি করে বললে ভগবান তুমি মানো না?

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা করে কেউ বুঝি কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি। তাই বলতে মুখে বাধতে লাগল, কিন্তু তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, বলে ফেললুম, ভগবান মানি বললেই বুঝি সত্য কথা বলা হ'ত? আমাকে আটকে রাখলে কেন? আর কোন কথা আছে?

তিনি ম্লানমুখে আস্তে আস্তে বললেন, আর একটা কথা, মায়ের কাছে আজ মাপ চেয়ো।

আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠল; বললুম মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না তার কোন অর্থ আছে?

স্বামী বললেন, অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্ত্তব্য।

বললুম, তোমাদের ভগবান বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্ত্তব্য করুক?

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, ভগবানের নাম নিয়ে তামাসা করতে নেই, এ-কথা ভবিষ্যতে কোনদিন আর যেন মনে করে দিতে আমার না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসিনে—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পার, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেও না।

বললুম, কেন, শুনতে পাইনে?

তিনি বললেন, না। নিষেধ করা আমার কর্ত্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলুম। এই বলে তিনি বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর সইতে পারলুম না, বললুম, কর্ত্তব্যজ্ঞানটা তোমাদের যদি এত বেশি, সে কি আর কারও নেই? আমিও ত মানুষ, বাড়ির মধ্যে আমারও একটা কর্ত্তব্য আছে। তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। থাকলেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্ত্তব্য? সে যদি হয়, যেদিন ইচ্ছে বাপের বাড়ি যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

স্বামী চলে গেলেন, আমি সেইখানেই ধপ্ করে বসে পড়লুম। মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হ'ল, হায় রে! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

সমস্ত সকালটা আমার যে কি করে কাটল, সে আমিই জানি। কিন্তু দুপুরবেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে-কথা শুনলুম তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ি বললেন, কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বৌ নিয়ে ত আমি ঘর করতে পারিনে ঘনশ্যাম! কালকের কাণ্ড ত শুনেচ?

স্বামী বললেন, শুনেচি মা।

শাশুড়ী বললেন, তা হলে যা হোক এর একটা ব্যবস্থা কর।

স্বামী একটুখানি হেসে বললেন, ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই মা।

শাশুড়ী বললেন, তা কি আর পারিনে বাছা, একদিনেই পারি। এতবড় ধাড়ী মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু—

স্বামী বললেন, সে-কথা ভেবে আর লাভ কি মা! আর ভালোমন্দ যাই হোক, বাড়ির বড়বৌকে ত আর ফেলতে পারবে না। ও চায়, আমি একটু ভাল খাই দাই। ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন করে দাও না মা!

শাশুড়ী বললেন, অবাক্ করলি ঘনশ্যাম! আমি কি ভালোমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে? আর তোমারই বা দোষ কি

বাবা। শতবড় বৌ যেদিন এসেচে, সেদিনই জানতে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙল। তা বাছা, আমার গিন্নিপনায় আর না যদি চলে, ওর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্চি। কৈ গা, বড়বৌমা, বেরিয়ে এস গো, চাবি নিয়ে যাও। বলে শাশুড়ী ঝনাৎ করে চাবির গোছাটা রান্নাঘরের দাওয়ার উপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না ; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন, সব মেয়েমানুষের ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি!

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠল। আমি যে কেন ঝগড়া করেচি, তা উনি জানতে পেরেচেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি করে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগলুম। সকালের সমস্ত ব্যথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল।

এখন কতবার মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই পড়ে কত কথাই শিখেছিলুম, কিন্তু এ-কথাটা কোথাও যদি শিখতে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা গুছিয়ে না বলবার দোষে, ছোট একটি কথা মুখ ফুটে না বলবার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই না ছারখার হয়ে যায় হয়ত, তা হলে এ-কাহিনী লেখবার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাই ত, বার বার বলি, ওরে হতভাগী! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিস্‌নি মেয়েমানুষের কার মানে মান! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়!

তবে তোর কপাল পুড়বে না ত পুড়বে কার? সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঘরে খিল্ দিয়ে যদি সাজ-সজ্জাই করলি, অসময়ে ঘুমের ভান করে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পারলি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্ঠরোধ হ'ল! তিনি ঘরে ঢুকে দ্বিধায় সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ করে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরে ফেলতেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ল? সেই ত সারারাত্রি ধরে মাটিতে পড়ে পড়ে কাঁদলি, একবার মুখ ফুটে বলতেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমিশয্যায় না হয় ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, মনে হ'ল যেন জ্বর হয়েচে। উঠে বাইরে যাচ্ছি, স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি মুখ নীচু করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বললেন, তোমাদের গ্রামের নরেনবাবু এসেচেন।

বুকের ভেতরটায় ধ্বক্‌ করে উঠল।

স্বামী বলতে লাগলেন, আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শিকার করবার জন্ত কলকাতায় থাকতে সে বুঝি কবে নেমন্তন্ন করে এসেছিল, তাই এসেচেন। তাঁকে বেশ চেন, না?

উঃ, মানুষের স্পর্দ্ধার কি একটা সীমা থাকতে নেই!

ঘাড় নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্য্যন্ত আমার তেতো হয়ে গেল।

স্বামী বললেন, তোমার প্রতিবেশীর আদর-যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।

শুনে এমনি চমকে উঠলুম যে, ভয় হ'ল হয়ত আমার চমকটা তাঁর চোখে পড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বললেন, কাল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এদিকে নিখিলও বাড়ি নেই, অখিলকে তার অফিস করতে হবে।

মুখ নীচু করে কোনমতে বললুম, তুমি?

আবার কিছুতেই থাকবার জো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিনতে না গেলেই নয়।

কখন্ ফিরবে?

ফিরতে আবার কাল এই সময়। রাত্রিটা সেইখানে থাকতে হবে।

তা হলে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বৌ-মানুষ, শ্বশুরবাড়িতে তাঁর সামনে বার হতে পারব না।

স্বামী বললেন, ছি, তা কি হয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সামনে না বার হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ো। এই বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

সেইদিন পাঁচ মাস পরে আবার নরেনকে দেখলুম। দুপুরবেলা সে খেতে বসেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে বসে কিছুতেই চোখের কৌতূহল থামাতে পারলুম না। কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতৃষ্ণায় ভরে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত। মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকে-বেঁকে চলে যেতে দেখলে সর্ব্বাঙ্গ যেমন করে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরুতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি করে আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি, ছি, ওর ওই দেহটাকে কি করে যে একদিন ছুঁয়েছি, মনে পড়তেই সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি যে খুঁজছিল, সে আমি জানি। আমাদের রাঁধুনি কি একটা তরকারি দিতে গেল, সে হঠাৎ ভারি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা, তোমাদের বড়বৌ যে বড় বেরুলো না?

রাঁধুনী জানত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ির লোক—গ্রামের জমিদার। তাই বোধ করি খুশী করবার জন্যেই হাসির ভঙ্গিতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে তার মন যোগালে। বললে, কি জানি বাবু, বড়বৌমার ভারী লজ্জা, নইলে তিনিই ত আপনার জন্যে আজ নিজে রাঁধলেন। রান্নাঘরে বসে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিচ্চেন। লজ্জা করে কিন্তু কম-সম খাবেন না বাবু, তা হলে তিনি বড় রাগ করবেন, আমাকে বলে দিলেন।

মানুষের শয়তানীর অন্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই। সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বললে, আমার কাছে তোর আবার লজ্জা কি রে সদু? আয় আয়, বেরিয়ে আয়। অনেকদিন দেখিনি, একবার দেখি।

কাঠ হয়ে সেই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজজাও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা করে বললে, দিদির সবটাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত, বিয়ের দিন পর্য্যন্ত সামনে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা! একবার দেখতে চাচ্চেন, যাও না।

এর আর জবাব দেব কি?

বেলা তখন দুটো-আড়াইটে, বাড়ির সবাই যে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বলল, বাবু পান চাইলেন মা।

কে বাবু?

নরেনবাবু।

তিনি শিকার করতে যাননি?

কই না, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।

তা হলে শিকারের ছলটাও মিথ্যে।

পান পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বসলুম। এ-বাড়ি আসা পর্য্যন্ত এই জানালাটিই ছিল সবচেয়ে আমার প্রিয়। নীচেই ফুল-বাগান, একঝাড় চামেলী ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা; এখানে বসলে বাইরের সমস্ত দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

আমি মানুষের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি যে, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ে এসে পড়ে তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা করতে বসে যায়। বাইরে পান পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাবতে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু কখন্ কোন্ ফাঁকে যে আবার স্বামী এসে আমার মন জুড়ে বসে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখছিলুম ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলুম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হ'তুম তাঁর ক্ষমা করবার ক্ষমতা দেখে। আগে আগে মনে হ'ত এ তাঁর দুর্ব্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন করবার সাধ্য নেই বলেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলুম তিনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেচেন, সে ত আমি অসংশয়ে অনুভব করতে পারি, কিন্তু সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, আচ্ছা, তুমিই বাড়ির সর্ব্বস্ব, কিন্তু তোমাকে যে বাড়িশুদ্ধ সবাই অযত্ন অবহেলা করে, এমন কি অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছা করলে শাসন করে দিতে পার না?

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, কৈ, কেউ ত অযত্ন করে না!

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না। বললুম, আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক, তুমি কি সব মাপ করতে পার?

তিনি তেমনি হাসিমুখে বল্‌লেন, যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে করতেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো।

তাই এক-একদিন চুপ করে বসে ভাবতুম, ভগবান যদি সত্যি নেই, তা হলে এত শক্তি এত শান্তি ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য একদিনের জন্যে করিনে, তবু ত তিনি কোনদিন স্বামীর জোর নিয়ে আমার অমর্য্যাদা অপমান করেন না?

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি শ্বেত-পাথরের গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেচি, স্বামী বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর দু'চক্ষু দিয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আসত, মনে হত, অমনি করে একটাদিনও কাঁদতে পারলে বুঝি মনের অর্দ্ধেক বেদনা কমে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খানকয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি বলে বিশ্বাস করতুম তা নয়, তবুও এমন কতদিন হয়েচে, কখন্ পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন্ বেলা বয়ে গেছে, কখন্ দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের উপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাওর পাইনি। কতদিন হিংসে পর্য্যন্ত হয়েচে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি বলেই ভাবতে পারতুম!

কিছুদিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্যে, তা কিছুতে হাতড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাবতুম, মায়ের জন্যেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন-কেমন করে, তাই কতদিন ঠিক করেচি, কালই

পাঠিয়ে দিতে বলব, কিন্তু যেই মনে হ'ত এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি না, অমনি সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে করলুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজকাল এই বইখানা হয়েছিল আমার দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু উঠতে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধরে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চেঁচিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! সে কখন্ এসেচে, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু কি করে যে সেদিন আপনাকে সামলে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এখানে এসেচ কেন? শিকার করতে?

নরেন বললে, ব'স বলচি।

আমি জানালার ওপর বসে পড়ে বললুম, শিকার করতে যাওনি কেন?

নরেন বললে, ঘনশ্যামবাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় বলে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ি থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।

চক্ষের নিমেষে স্বামীগর্ব্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠল। তিনি কোন কর্ত্তব্য ভোলেন না, সেদিকে তাঁর একবিন্দু দুর্ব্বলতা নেই। মনে মনে ভাবলুম, এ লোকটা দেখে যাক, আমার স্বামী কত বড়।

বললুম, তা হলে বাড়ি ফিরে গেলে না কেন?

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে খপ্ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, সদু, টাইফয়েড জ্বরে মরতে মরতে বেঁচে উঠে যখন শুনলুম তুমি পরের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বার বার করে বললুম, ভগবান, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে?

বললুম, তুমি ভগবান মানো?

নরেন থতমত খেয়ে বলতে লাগল, না হ্যাঁ, না, মানিনে, কিন্তু সে-সময়ে —কি জানো?

থাক্ গে, তার পরে?

নরেন বলে উঠল, উঃ, সে আমার কি দিন, যেদিন শুনলুম, তুমি আমারই আছ, শুধু নামেই অন্যের, নইলে, আমারই চিরকাল, শুধু আমারই। আজও একদিনের জন্যে আর ক রও শয্যায় রাত্রি—

ছি, ছি, চুপ কর। কিন্তু কে তোমাকে এ-খবর দিলে? কার কাছে শুনলে?

তোমাদের যে দাসী তিন-চারদিন হ'ল বাড়ি যাবার নাম করে চলে গেছে, যে—

মুক্ত কি তোমার লোক ছিল ? বলে জোর করে তার হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু এবারেও সে তেমনি সজোরে ধরে রাখলে। আর চোখ দিয়ে ফোঁটা-দুই জলও গড়িয়ে পড়ল। বললে, সদু, এমনি করেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে ? অমন অসুখে না পড়লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা করে রাখতে পারত না। যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্য এতবড় শাস্তি ভোগ করব ? লোক ভগবান ভগবান করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাকলে কি বিনা দোষে এতবড় সাজা আমাদের দিতেন ? কখন না। তুমিই বা কিসের জন্য একজন অজানা-অচেনা মুখ্যু-লোকের—

থাক্, থাক্, ও-কথা থাক্।

নরেন চমকে উঠে বললে, আচ্ছা, থাক্, কিন্তু যদি জানতুম, তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েচ, তা হলে হয়ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম, কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই, আমি বাঁচব কি করে ?

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার নিজের চোখের জল মুছে বললে, এমন কোন সভ্য দেশ পৃথিবীতে আছে— যেখানে এতবড় অন্যায় হতে পারত! মেয়েমানুষ বলে কি তার প্রাণ নেই, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন করে তাকে সারাজীবন দগ্ধ করবার অধিকার সংসারে কার আছে ? কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে না পারে ?

এ-সব কথা আমি সমস্তই জানতুম। আমার মামার ঘরে নব্য-যুগের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকী ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুলতে লাগল। বললুম, তুমি আমাকে কি করতে বল ?

নরেন বললে, আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাব যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্য্যন্ত আমি এই আজকের দিনের প্রতীক্ষা করেই পথ চেয়েছিলুম। তার পরে হয়ত একদিন শুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেচি, তার কাছেই ফিরে চলে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই শেষ নিবেদন রইল সদু, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু' ফোঁটা জল পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রইল, চুপ করে বসে রইলুম। এখন ভাবি, সেদিন যদি ঘুণাগ্রেও জানতুম, মানুষের মনের দাম এই, একেবারে উল্টো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকুমাত্র সময়, এইটুকুমাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হলে যেমন করে হোক, সেদিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা বন্ধ করে দিতুম, কিছুতেই তার একটা কথাও কানে ঢুকতে দিতুম না। ক'টা কথা, ক'ফোঁটা চোখের জলই বা তার

খরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পাতাশুদ্ধ শরগাছ যেমন করে কাঁপতে থাকে, তেমনি করে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপতে লাগল, মনে হতে লাগল, নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙুলের ভেতর দিয়ে পাঁচশ বিদ্যুতের ধারা আমার সর্ব্বাঙ্গে বইয়ে দিয়ে আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত অবশ করে আনচে। সেদিন মাঝখানের সেই লোহার গরাদগুলো যদি না থাকত, আর সে যদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে পালাত, হয়ত আমি একবার চেঁচাতে পর্য্যন্ত পারতুম না—ওগো, কে আছ আমায় রক্ষা করো!

দু'জনে কতক্ষণ এমন স্তব্ধ হয়ে ছিলুম জানিনে, সে হঠাৎ বলে উঠল, সদু!

কেন?

তুমি ত বেশ জান, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র। যেমন করে হোক আটকে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দী। সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলায়, পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি! আত্মা আত্মা যে করি, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্যে?

বৌমা, বলি কথা তোমাদের শেষ হবে না বাছা?

মাথার ওপর বাজ ভেঙ্গে পড়লেও বোধ হয় মানুষে এমন করে চমকে ওঠে না, আমরা দু'জনে যেমন করে চমকে উঠলুম। নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী।

বললেন, বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন করে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্না-কাটি করতে দেখলে হয়ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখতে-শুনতে সবদিকে বেশ হ'ত।

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভটা আমার আড়ষ্ট রইল, একটা কথাও ফুটল না।

তিনি একটুখানি হেসে বললেন, বলতে পারিনে বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বৌমাটি কেন আমার এত কষ্ট সয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন। তা বেশ! বাবুটি নাকি দুপুর-বেলা চা খান! চা তৈরীও হয়েছে, একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর দেখি বৌমা, চায়ের পিয়ালাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না, ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে খাবেন?

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পারলুম, বললুম, তুমি কি রোজ এমনি করে আমার ঘরে আড়ি পাত মা?

শাশুড়ী মাথা নেড়ে বললেন, না না, সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ করেই ত সামলে পারিনে! এই দেখ না বাছা, বাতে মরচি, তবু চা তৈরী করতে রান্নাঘরে

ঢুকতে হয়েছিল। তা এ-ঘরেই না হয় পাঠিয়ে দিচ্চি, বাবুটির আবার ভারি লজ্জার শরীর, আমি থাকতে হয়ত খাবেন না। তা যাচ্ছি আমি—বলে তিনি ফিক্ করে একটু মুচকি হেসে চলে গেলেন। এমনি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাশুড়ী-বধূর মান্য সম্বন্ধের কোন উঁচু-নীচুর ব্যবধানই রাখলেন না।

সেইখানেই মেঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম, সর্ব্বাঙ্গ বয়ে ঝর্ ঝর্ করে ঘাম ঝরে সমস্ত মাটিটা ভিজে গেল।

শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ তিনি আসবেন না, আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ করে পড়ে থাকতে পাব, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

কতবার ভাবলুম উঠে বসি, কাজ-কর্ম্ম করি—যেন কিছুই হয়নি, কিন্তু কিছুতেই পারলুম না, সমস্ত শরীর যেন থর্ থর্ করতে লাগল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ-ঘরে কেউ আলো দিতে এলো না।

রাত্রি প্রায় আটটা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কানে আসতেই বুকের সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল। তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, বঙ্কু, নরেনবাবু হঠাৎ চলে গেলেন কেন রে? চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন নিজেই বললেন, খুব সম্ভব শিকার করতে বারণ করেছিলুম বলে। তা উপায় কি!

অন্দরে ঢুকতেই, শাশুড়ীঠাকরুণ ডেকে বললেন, একবার আমার ঘরে এস ত বাবা!

তাঁর যে একমুহূর্ত্ত দেরি সইবে না সে আমি জানতুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আঘাত প্রতীক্ষা করেই যেন সর্ব্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত করে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি, শাশুড়ী তাঁকে যেন এইমাত্র একটা কথাও বলেননি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারারাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকালবেলা সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, মেজজা বললেন, হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই দিদি, আজ আমিই আছি।

বললুম, তুমি থাকলে কি আমাকে থাকতে নেই মেজদি?

কাজ কি, মা কি জন্যে বারণ করে গেলেন, বলে তিনি যে ঘাড় ফিরিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বা'র হ'ল না, আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলুম।

দেখলুম বাড়িসুদ্ধ সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, শুধু যার মুখ সবচেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য প্রসন্ন মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন।

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু সমস্ত লোকের এই বিচারহীন শাস্তি আর সহ্য হয় না। কিন্তু সে ত কোনমতেই পারলুম না। তবুও এই বাড়িতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল।

এ কেমন করে আমার দ্বারা সম্ভব হতে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি। যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্য্যন্ত হাল্‌কা করে দেয়,সে যে এই পাপিষ্ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু করে দেবে, সে আর বিচিত্র কি। যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, আর একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেলতে পারলে বাঁচে। কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যতই অস্পষ্ট, যত লঘু হয়ে আসতে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে! এই ত মানুষের মন! এই ত তার গঠন! তাকে অনিশ্চিত সংশয়ে মরিয়া করে তোলে। একদিন, দুদিন করে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখনই কেবলই মনে হতে লাগল, এতই কি দোষ করেচি যে স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা না করে নির্ব্বিচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন। তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন করে যাচ্চেন, এ বুদ্ধি কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি।

সেদিন সকালে শুনলুম, শাশুড়ী বলচেন, ফিরে এলি মা মুক্ত। পাঁচদিন বলে কতদিন দেরি করলি বল্ ত বাছা?

সে কেন ফিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝলুম।

নাইতে যাচ্ছি, দেখা হ'ল। মুচকি হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন একটুকরো জলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে। ইচ্ছে হ'ল তখ্‌খুনি কুটি কুটি ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি! না পড়েই যদি ছিঁড়ে ফেলতে পারব, তা হলে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কৌতূহল জমা হয়ে রয়েচে কিসের জন্যে? নির্জ্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বসলুম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও পড়তে পারলুম না। চিঠি লাল কালিতে লেখা, মনে হতে লাগল তার রাঙা অক্ষরগুলো যেন একপাল কেন্নোর বাচ্চার মত গায়ে জড়িয়ে কিল্‌বিল্ করে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। তার পরে পড়লুম—একবার, দু'বার, তিনবার পড়লুম। তার

পরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান করে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে? সংসারে যা সবচেয়ে অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোপা বললে, মাঠাকরুণ, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।

জামার পকেটগুলো সব দেখে দিতে গিয়ে একখানা পোস্টকার্ড বেরিয়ে এল, হাতে তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেচেন। তারিখ দেখলুম, পাঁচদিন আগের, কিন্তু আজও আমি পাইনি।

পড়ে দেখি সর্ব্বনাশ! মা লিখেচেন, শুধু রান্নাঘরটা ছাড়া আর সমস্ত পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোনমতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন।

দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল, কিন্তু একফোঁটা জল বেরুল না। কতক্ষণ যে এভাবে বসেছিলুম জানিনে, ধোপার চীৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। এইবার চোখের জলে বালিস ভিজে গেল। কিন্তু এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দু সাহায্য করতে অনুরোধ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্য্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এতবড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হতে পারত!

আজ তিনি ঘরে আসতে কথা কইলুম। বললুম, আমাদের বাড়ি পুড়ে গেছে?

তিনি মুখপানে চেয়ে বললেন, কোথায় শুনলে?

গায়ের উপর পোস্টকার্ডখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলুম, ধোপাকে কাপড় দিতে গিয়ে তোমার পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক বলে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়িসুদ্ধ লোকের কি এই ব্যবসা?

যে লোক নিজের অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মুখের এই কথা! কিন্তু আমি নিশংসয়ে বলতে পারি, এতবড় স্পর্দ্ধিত আঘাত আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারতো না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয় কবচের মতই যে তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষে করত, আমার এমন তীক্ষ্ণ শূল খান্ খান্ হয়ে পড়ে গেল।

একটুখানি ম্লান হেসে বললেন, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ফেলেছিলুম সদু, আমাকে মাপ কর।

এই প্রথম তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন।

বললুম, মিথ্যে কথা। তা হলে আমার চিঠি আমায় দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েচ, তাও জানি।

তিনি বললেন, শুধু দুঃখ পেতে বৈ ত না। তাই ভেবেছিলাম কিছুদিন পরে তোমাকে জানাব।

বললুম, কেমন করে তুমি হাত গোনো, সে আমার জানতে বাকী নেই। তুমিই কি বাড়িশুদ্ধ সবাইকে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েচ? স্পাই! ইংরেজ-মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখে না, তা জানো?

ওরে হতভাগী! বল্ বল্, যা মুখে আসে বলে নে। শাস্তি তোর গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল!

স্বামী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্ষমা করতেও মানুষে পারে!

কিন্তু আমার ভিতরে যত গ্লানি, যত অপমান এতদিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল,একবার মুক্তি পেয়ে তারা আর কোনমতেই ফিরতে চাইল না।

একটু থেমে আবার বললুম, আমি হেঁসেলে ঢুকতে—

তিনি একটুখানি যেন চমকে উঠে মাঝখানেই বলে উঠলেন, উঃ, তাই বটে! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—

বললুম, সে নালিশ আমার নয়। বাঙালীর ঘরে জন্মেচি বলে যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল করে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতেই দেব না, তা নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়িতে এখনও রান্নাঘরটা বাকি আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাব। কাল আমি যাচ্ছি।

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, যাওয়াই উচিত বটে। কিন্তু তোমার গয়নাগুলো রেখে যেয়ো।

শুনে অবাক হয়ে গেলুম। এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি! পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এল। বললুম, সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত, বেশ, আমি রেখেই যাব।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন সাদা হয়ে গেল। বললেন, না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনটন, তাই বাঁধা দেব।

কিন্তু এমন পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বললুম, বাঁধা দাও, বেচে ফেল, যা ইচ্ছে কর, তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই। বলে, তখুনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। যে দু'গাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই দুটি ছাড়া গা

থেকে পর্য্যন্ত গয়না খুলে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, বেনারসী কাপড় জামা প্রভৃতি যা কিছু এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার করে টান মেরে ফেলে দিলুম।

স্বামী পাথরের মত স্থির নির্ব্বাক্ হয়ে বসে রইলেন। আমার ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা এমনি বিষিয়ে উঠল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকাও অসহ্য হয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় একধারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। মনে হ'ল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগল, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।

কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি, ভোর হয় হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, দু-একখানা ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়না নিয়ে তিনি কখন্ বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ি এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নাই।

তন্দ্রার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলুম। রাত্রি দুটোর পর বাগানের দিকেই সেই জানলাটার গায়ে খট্ খট্ শব্দ শুনেই বুঝলুম, এ নরেন! কেমন করে যেন আমি নিশ্চয় জানতুম, আজ রাত্রে সে আসবে। স্বামী ঘরে নেই, এ-খবর মুক্ত দেবেই এবং এ-সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়বে না। কোথাও কাছা-কাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভারী অমঙ্গলের মত অনুভব করতুম। নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে অনায়াসে বললে, দেরি ক'র না, যেমন আছ বেরিয়ে এসো, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বাগান পার হয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলুম। মা বসুমতি! গাড়িসুদ্ধ হতভাগীকে গ্রাস করলে না কেন?

কলকাতায় বৌবাজারের একটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে যখন উঠলুম তখন বেলা সাড়ে-আটটা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্ম চলে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আশ্চর্য্য যে, যে-কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে তখন সেই কথাই আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক যত্ন-চেষ্টার পরে জ্ঞান হলে মায়ের হাত ধরে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। মা শিয়রে বসে এক হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, এক হাতে পাখার বাতাস করেছিলেন—মায়ের মুখ, আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাতনাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বললে, বৌমা, কলের জল চলে যাবে, উঠে চান করে নাও।

স্নান করে এলুম, উড়ে-বামুন ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলুম,

কিন্তু উঠতে না উঠতে সমস্ত বমি হয়ে গেল। তার পর হাত-মুখ ধুয়ে নির্জ্জীবের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়বামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্ন দেখলুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করচি। তিনি তেমনি নীরবে বসে আছেন। আর আমি গায়ের গয়না খুলে তাঁর গায়ে ছুঁড়ে ফেলচি, কিন্তু গয়নাগুলোও আর ফুরোয় না, আমার ছুঁড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি ততই যেন কোথা থেকে গহনায় সর্ব্বাঙ্গ ভরে উঠে।

হঠাৎ হাতের ভারি অনন্ত ছুঁড়ে ফেলতেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন, আর সেই ফাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকতে লাগল।

এমন করে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাটতে পারত, বলতে পারিনে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন চোখের জলে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে।

চোখ চেয়ে দেখি, তখন অনেক বেলা আছে, আর নরেন পাশে বসে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্চে।

সে বললে, স্বপন দেখছিলে? ইস্, এ হয়েচে কি! বলে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে।

স্বপন! একমুহূর্ত্তে মনটা যেন স্বস্তিতে ভরে গেল।

চোখ রগড়ে উঠে বসে দেখলুম সুমুখেই মস্ত একটা কাগজে-মোড়া পার্শ্বেল।

ও কি?

তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আনলুম।

তুমি কিনতে গেলে কেন?

নরেন একটু হেসে বললে, আমি ছাড়া আর কে কিনবে?

এত কান্না আমি আর কখনও কাঁদিনি। নরেন বললে, আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে ব'স্ বোন, আমি দিব্যি করচি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাই-বোন। তোকে যত ভালই বাসিনে কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে তোকে চিরকাল রক্ষে করব।

চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চলে এস নরেনদাদা, আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হোক! কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখতে না পেলে যে আমি মরে যাব ভাই।

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপরে বসে বললে, মুক্তর কাছে আমি সমস্ত শুনেচি। কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাসতে, কোনদিন একসঙ্গে ত—

তাড়াতাড়ি বললুম, তুমি আমার বড় ভাই, এ-সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেস ক'র না।

নরেন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললে, আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আসতে পারি, কিন্তু তিনি কি তোমাকে নেবেন? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল ত?

বুকের ভেতরটা কে যেন দু'হাতে পাকিয়ে মুচড়ে দিলে। কিন্তু তখ্‌খুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, ঘরে নেবেন না সে জানি, কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপমান হোক, সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার জো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি ভাই। আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এস নরেনদাদা, ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায়মনে বলচি।

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেলব না, কিন্তু কিছুতেই ধরে রাখতে পারলুম না, আবার ঝর্ ঝর্ করে পড়তে লাগল। নরেন মিনিট-খানেক চুপ করে থেকে বললে, সদু, তুমি কি সত্যিই ভগবান মানো?

আজ চরম দুঃখে মুখ দিয়ে পরম সত্য বার হয়ে গেল, বললুম, মানি। তিনি আছেন বলেই ত এত করেও ফিরে যেতে চাইচি। নইলে এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম নরেনদাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আনতুম না।

নরেন বললে, কিন্তু আমি ত মানিনে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আমি বলচি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মানবে।

সে তখন বোঝা যাবে! বলে নরেন গম্ভীরমুখে বসে রইল। মনে মনে কি যেন ভাবছে বুঝতে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। আমার এক মিনিট দেরি সইছিল না, বললুম, আমাকে কখন্ রেখে আসবে নরেনদাদা?

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, সে কখ্‌খনো তোমাকে নেবে না।

সে চিন্তা কেন করচ ভাই? নিন না নিন সে তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ-কথা নিশ্চয় বলতে পারি।

ক্ষমা! না নিলে ক্ষমা করা, না-করা দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কতবড় একটা বিশ্রী হৈ-চৈ গণ্ডগোল পড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি!

ভয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললুম, সে ভাবনা এতটুকু ক'রো না নরেনদাদা; তখন তিনি আমার উপায় করে দেবেন।

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আর তোমারই না হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না! তখন?

এ-কথার কি যে জবাব দেব ভেবে পেলুম না। বললুম, তাতেই বা তোমার ভয় কি?

নরেন ম্লানমুখে জোর করে একটু হেসে বললে, ভয়? এমন কিছু না, পাঁচ-সাত বছরের জন্যে জেল খাটতে হবে। শেষকালে এমন করে তুমি আমাকে ডোবাবে জানলে, আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থিরতা নেই; এ কি ছেলেখেলা?

আমি কেঁদে ফেলে বললুম, তবে আমার কি উপায় হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না করে ত আমি কিছুতে বাঁচব না!

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, শুধু নিজের কথাই ভাবচ, আমার বিপদ ত ভাবচ না? এখন সবদিক না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না।

ও কি, বাসায় যাচ্চ না কি?

হুঁ।

রাগে, দুঃখে, হতাশ্বাসে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটে কাঁদতে লাগলুম—তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় করে দাও, আমি একলা ফিরে যাব! ওগো, আমি তাঁর দিব্যি করে বলচি আমি কারুর নাম করব না, কাউকে বিপদে জড়াব না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব। তোমার দুটি পায়ে পড়ি নরেনদা, আমাকে আটকে রেখে আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না।

মুখ তুলে দেখি, সে ঘরে নেই, পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সদর দরজায় দেখি তালা বন্ধ। উড়ে-বামুন বললে, বাবু চাবি নিয়ে চলে গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।

ঘরে ফিরে এসে আর একবার মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললুম, ভগবান! কখনো তোমাকে ডাকিনি, আজ ডাকচি, তোমার একান্ত নিরুপায়, মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি করে দাও।

আমার সে-ডাক কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কত দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাতদিন কেটে গেল। কিন্তু কেমন করে যে কাটল, সে ইতিহাস বলবার আমার সামর্থ্যও নেই, ধৈর্য্যও নেই। সে যাক।

বিকেল বেলায় আমার ওপরের ঘরের জানলায় বসে নীচে গলির পানে তাকিয়ে ছিলুম। অফিসের ছুটি হয়ে গেছে, সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়িমুখো হন্ হন্ করে চলেচে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ির ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে এখন সবচেয়ে কারা বেশী ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরী করতে সবচেয়ে কারা বেশি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। মনে পড়ল, তিনিও সমস্তদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায়

গামছা, কোথায় জল! ডাকাডাকির পর কেউ হয়ত সাড়া দিলে না। তার পরে, হয়ত মেজদেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জলখাবারের যোগাড় মেজবৌ করে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে। আমি ত আর নেই, ভুলতে ভয়ই বা কি! হয়ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন। তার পরে, রাত-দুপুরে দুটো শুক্‌নো ঝরঝরে ভাত, একটু ভাতে-পোড়া। ওবেলার একটুখানি ডাল হয়ত বা আছে, হয়ত বা উঠে গেছে। সকলের দিয়ে-থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য। নিরীহ ভালমানুষ, কাউকে কড়া-কথা বলতে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতকি! এতবড় নিষ্ঠুর মহাপাপ তোর চেয়ে বেশি সংসারে কেউ কি কোনদিন করেচে? ইচ্ছে হ'ল এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার এইখানেই শেষ করে দিই।

বোধ করি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনদিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চমকে উঠে দেখি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নিজের বিছানায় উঠে এসে বস্‌লুম; সেইদিন থেকে নরেন আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় পড়ে আছে সে নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিল বলে ভয়ে এদিক মাড়াত না। তার নিজের ধারণা জন্মেছিল, বিপদে পড়লে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি তার কোন উপকারেই লাগব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়েই দু'জনে একসঙ্গে চমকে উঠল, নরেন বললে, তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার বামুনটা ত আমার বাসা চেনে?

ঝি দালান ঝাঁট দিচ্ছিল, সে খপ্‌ করে বলে বসল, অসুখ করবে কেন? শুধু জল খেয়ে থাকলে মানুষ রোগা হবে না বাবু? দুটি বেলা দেখচি ভাতের থালা যেমন বাড়া হয় তেমনি পড়ে থাকে। অর্দ্ধেক দিন ত হাতও দেন না।

শুনে দু'জনে স্তব্ধ হয়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চলে গেলে, মুক্তকে নীচে টেনে নিয়ে বললুম, কেমন আছেন তিনি।

মুক্ত কেঁদে ফেললে। বললে, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বৌমা, নইলে এমন সোয়ামীর ঘর করতে পেলে না!

তুই ত ঘর করতে দিলি না মুক্ত!

মুক্ত চোখ মুছে বললে, মনে হলে বুকের ভেতরটায় যে কি করতে থাকে, সে আর তোমাকে কি বলব? বাবু ছাড়া আর সবাই জানে, তুমি বাড়ি-পোড়ার

খবর পেয়ে রাত্তিরেই রাগারাগি করে বাপের বাড়ি চলে গেছ। তোমার শাশুড়ীও তাঁর হুকুম নেওয়া হয়নি বলে রাগ করে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তাই বন্ধ করে দিয়েচে। মাগী কি বজ্জাত মা, কি বজ্জাত! যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্ছে, দেখলে পাষাণেরও দুঃখ হয়। সাধে কি আর তুমি ঝগড়া করতে বৌমা!

ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্য ঘুচে গেল! বলতে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম আটকে এল।

আজ মুক্তর কাছে শুনতে পেলুম, আমাদের পোড়া-বাড়ি আবার মেরামত হচ্ছে, তিনি টাকা দিয়েচেন। হয়ত সেইজন্যই আমার গয়নাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

বললুম, বল্ মুক্ত, সব বল্। যত-রকমের বুক-ফাটা খবর আছে সমস্ত আমাকে একটি একটি করে শোনা, এতটুকু দয়া তোরা আমাকে করিস্‌নে।

মুক্ত বললে, এ-বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন।

শিউরে উঠে বললুম, কি করে?

মাস-খানেক আগে যখন এ-বাড়ি তোমার জন্যেই ভাড়া নেওয়া হয় তখন আমি জানতুম।

তার পর?

একদিন নদীর ধারে নরেনবাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।

তার পর?

বামুনের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বলতে পারলুম না বৌমা—চলে আসবার দিন এ বাসার ঠিকানা বলে ফেললুম।

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরেই চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বললে, বৌমা!

কেন মুক্ত?

যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?

প্রাণপণ বলে উঠে বসে মুক্তর মুখ চেপে ধরলুম—না মুক্ত, ও-কথা তোকে আমি বলতে দেব না! আমার দুঃখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল করে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ করে দিস্‌নে?

মুক্ত জোর করে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৌমা? টাকার সঙ্গে ত ওকে ওজন করে ঘরে তুলতে পারব না।

এ-কথায় আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম। মনে মনে বললুম,

ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবী আছে। আকাশ-কুসুমের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজও চোখে দেখেনি।

ঘণ্টা-খানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে ফিরে এল, তখন রাত্রি দশটা। ঘরে ঢুকেই বললে, মাথার আঁচলটা তুলে দাও বৌমা, বাবু আসচেন, বলেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বসতেই দেখলুম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়, আমার স্বামী।

বললেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ি চল।

মনে মনে বললুম, ভগবান! এত যদি দিলে, তবে আর একটু দাও, ওই দুটি পায়ে মাথা রাখবার সময়টুকু পর্য্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো।

একাদশী বৈরাগী

একাদশী বৈরাগী

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অনার্স-সমেত বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না। গ্রামের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ একটা হাইস্কুল ছিল—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যেই ইহাতে পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়িয়া দিয়া দশ-আনা ছ'আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা প্রত্যাগত এই গ্রাজুয়েট ছোকরার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নধর টিকির সংস্থান দেখিয়া শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবাদের পর্য্যন্ত বিস্ময়ে তাক লাগিয়া গেল।

সহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব্ব সনাতন হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্ত-কণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্ম্মের মত এমন সনাতন ধর্ম্ম আর নাই; কারণ ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞান-সম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহরক্ষা-ব্যাপারে সন্ধ্যাহ্নিকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়ো নির্ব্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকাল মধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, একাদশী, পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের ঘটায় বাড়ির মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনা-কল্পনায় যুবক-মহলে একেবারে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। বুড়ারা বলিতে লাগিল, হাঁ, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেমনি। না হইলে আজকালকার কালে এতগুলো ইংরাজী পাশ করিয়াও এই বয়সে এমনি ধর্ম্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায়! সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব্ব একটা অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী, ধূমপান-নিবারণী ও দুর্নীতি-দলনী—এই তিন তিনটা সভার আস্ফালনে গ্রামে চাষাভূষার দল পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাঁচকড়ি তেওর তাড়ি খাইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া অপূর্ব্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনি শাসিত করিয়া দিল যে পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ি পলাইয়া গেল। ভগা কাওরা অনেক রাত্রিতে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে গাঁজার ঝোঁকে নাকি

বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায়, সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল। দুর্গা ডোমের চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল; অপূর্ব্বর দলের ছোকরার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর জলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোস্কা তুলিয়া দিল। এমনি করিয়া অপূর্ব্বর হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সদ্য-সদ্যই ফুলে-ফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! এইবারে গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্ব্বর চোখে পড়িল যে, স্কুলের লাইব্রেরীতে শশীভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই দীনতার জন্য সে হেডমাস্টারকে অশেষরূপে লাঞ্ছিত করিয়া অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিস্ট তৈরী হইতে বিলম্ব হইল না।

এতদিন ছেলেদের ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল। কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যেই তাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামের ধর্ম্ম-প্রচার দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা চোখে পড়িল। স্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্ব্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একাদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা, নাপিত, মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্ব্বে উদ্বাস্ত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা নাকি টাকার কুমীর; কিন্তু তাঁহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না—হাঁড়ি-ফাটার ভয়ে বহুদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগীমহাশয় সুপ্রসিদ্ধ! অপূর্ব্ব তাল ঠুকিয়া কহিল, টাকার কুমীর! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্দ্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য। না হইলে সেখানে ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বারুইপুরের জমিদার ত দিদির মামাশ্বশুর।

ছেলেরা মাতিয়া উঠিল এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগীর নামের পিছনে একটা মস্ত অঙ্কপাত হইয়া গেল। একাদশীর কাছে টাকা আদায় করা

হইবে, না হইলে অপূর্ব্ব তাহার দিদির মামাশ্বশুরকে বলিয়া বারুইপুরেও ধোপা নাপিত বন্ধ করিবে, সংবাদ পাইয়া রসিক স্মৃতিরত্ন লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থে উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা টাকা না দিলে মহাপাপী ব্যাটা কালীদহে বাস্তু কি করিয়া রক্ষা করে, দেখিতে হইবে। কারণ, বাস না করিলেও এই বাস্তুভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্মৃতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যে-হেতু বছর-দুই পূর্ব্বে এই জমিটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁর প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু ব্যক্তির ন্যায় কানে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, এমন অনুমতি করবেন না ঠাকুরমশাই, ঐ একফোঁটা জমির বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগবে, এ ত আমার সাত-পুরুষের ভাগ্যি। স্মৃতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিত-চিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধার লক্ষকোটি সুখ্যাতি করিয়া অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করার পরে, একাদশী করজোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট ঠাকুরমশাই যে, সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতেই হাতছাড়া করবার জো নাই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস বাবা, বাস্তুভিটে কখনো ছাড়িস্‌নে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আক্রোশ স্মৃতিরত্ন বিস্মৃত হন নাই।

দিন-পাঁচেক পরে, একদিন সকালবেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটি মাটির, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মীশ্রী আছে। অপূর্ব্ব কিংবা তাহার দলের আর কেহ একাদশীকে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই; সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ-লোক টাকার কুমীরই হোক, হাঙ্গরই হোক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যে পুঁটি মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা। দাড়ি-গোঁফ কামান, মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্যই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙড়াইয়া বিসর্জ্জন দিয়া মহাজন হইয়া বসিয়া আছে। তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব্ব মনে মনে দমিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের উপর ঢালা বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাত-বাক্স এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসাবের খাতাপত্র। একজন বৃদ্ধ-গোছের গোমস্তা খালি-গায়ে পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া শ্লেটের উপর সুদের হিসাব করিতেছে; এবং সম্মুখে, পার্শ্বে, বারান্দায় খুঁটির

আড়ালে নানা বয়সের নানা অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ ম্লান-মুখে বসিয়া আছে। কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সুদ দিতে, কেহ-বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে, কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য কেহ যে বসিয়াছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া একাদশী বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিয়া রহিল। গোমস্তা শ্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, কোত্থেকে আসচেন?

অপূর্ব্ব কহিল, কালীদহ থেকে।

মশায় আপনারা?

আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ঝুঁকাইয়া প্রণাম করিল; কহিল, বসতে আজ্ঞা হোক!

সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গোমস্তা প্রশ্ন করিল, আপনাদের কি প্রয়োজন?

অপূর্ব্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা? সুদ ত হয়েচে কুল্লে সাত টাকা দু'আনা; তার দু'আনাই যদি ছাড় করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন?

তাহার পরে উভয়ে এমনি ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করিয়া দিল, যেন এই দু'আনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর মাও যেমন স্থিরসঙ্কল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেরি হইতেছে দেখিয়া অপূর্ব্ব উভয়ের বাগ-বিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা—

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, আজ্ঞে, এই যে শুনি;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস্ রে! সে দু'টাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে এসেচিস্ কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি সুদ-টুদ কিছু এনেচিস্?

নফর ট্যাঁক খুলিয়া এক আনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল, তিন মাস হয়ে গেল না রে? আর দু'টো পয়সা কই।

নফর হাত-জোড় করিয়া বলিল, আর নেই কর্ত্তা; ধাড়ার পোর কত হাতে-পায়ে পড়ে পয়সা চারটি ধার করে আনচি, বাকী দুটো পয়সা আসচে হাট-বারেই দিয়ে যাব।

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, দেখি তোর ওদিকের ট্যাঁকটা?

নফর বাঁ-দিকের ট্যাঁকটা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, দুটো পয়সার জন্য মিছে

কথা কইচি কর্ত্তা? যে শালা পয়সা এনেও তোমাদের ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক, এই বলে দিলুম।

একাদশী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তুই চারটে পয়সা ধার করে আনতে পারলি, আর দুটো এমনি ধার করতে পারলিনে?

নফর রাগিয়া কহিল, মাইরী দিলাসা করলুম না কর্ত্তা! মুখে পোকা পড়ুক—

অপূর্ব্বর গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা লোক তুমি মশায়!

একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগ্দী সম্মুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল। একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, পরাণ, নফ্‌রার কাছাটা একবার খুলে দেখত রে, পয়সা দুটো বাঁধা আছে নাকি?

পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাঁধা পয়সা দুটো খুলিয়া একাদশীর সুমুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একাদশী এই বেয়াঁদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর-মুখে পয়সা ছয়টা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া গোমস্তাকে কহিল, ঘোষালমশাই, নফ্‌রার নামে সুদ আদায় জমা করে নেন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার করবি রে?

নফর কহিল, আবশ্যক না হলেই কি এসেচি মশাই?

একাদশী কহিল, আট আনা নিয়ে যা না! গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় করে ফেলবি রে।

তার পরে অনেক কষা-মাজা করিয়া নফর মোড়ল বারো আনা পয়সা কর্জ্জ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অপূর্ব্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটা একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, যা দেবেন দিয়ে দিন মশাই, আমরা আর দেরি করতে পারিনে।

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পোনর মিনিট ধরিয়া আগাগোড়া তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে আবার চাঁদা কেন?

অপূর্ব্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, বুড়োমানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোট-ছেলেতে টাকা দেবে? তারা পাবে কোথায় শুনি?

বুড়ো সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, ইস্কুল ত হয়েচে কুড়ি-পঁচিশ বছর; কৈ, এতদিন ত কেউ লাইব্রেরীর কথা তোলেনি বাবু? তা যাক, এ ত আর মন্দ কাজ নয়, আমাদের ছেলেপুলে বই পড়ুক আর না পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়বে ত! কি বল ঘোষালমশাই? ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল, বোঝা গেল না। একাদশী কহিল, তা বেশ, চাঁদা দেব আমি, একদিন এসে নিয়ে যাবেন চার

আনা পয়সা। কি বল ঘোষাল, এর কমে আর ভাল দেখায় না। অতদূর থেকে ছেলেরা এসে ধরেচে, যা হোক একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত। আরও ত লোক আছে, তাদের কাচে ত চাইতে যায় না, কি বল হে?

ক্রোধে অপূর্ব্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অনাথ কহিল, এই চার আনার জন্যে আমরা এতদূরে এসেচি? তাও আবার আর একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে?

একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, দেখলেন ত অবস্থা, ছ'টা পয়সা হকের সুদ আদায় করতে ব্যাটাদের কাছে কি ছ্যাচড়াপনাই না করতে হয়? তা. এ পাট-টা বিক্রী হয়ে না গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে—

অপূর্ব্বর রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; বলিল, সুবিধে হবে এখানেও ধোপা নাপিত বন্ধ হলে। ব্যাটা পিশাচ সর্ব্বাঙ্গে ছিটে ফোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েচেন, আচ্ছা!

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটি আঙ্গুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, বারুইপুরের রাখালদাসবাবু আমাদের কুটুম্ব, মনে থাকে যেন বৈরাগী।

বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব্ব বলিল, গরীবের রক্ত শুষে সুদ খাওয়া তোমার বার করব তবে ছাড়ব।

নফর তখনও বসিয়াছিল; তাহার কাছায় বাঁধা পয়সা দুটো আদায় করার রাগে মনে মনে ফুলিতেছিল; সে কহিল, যা কইলেন কর্ত্তা, তা ঠিক। বৈরাগী ত নয়, পিচেশ। চোখে দেখলেন ত কি করে মোর পয়সা দুটো আদায় নিলে!

বুড়ার লাঞ্ছনায় উপস্থিত সকলেই মনে মনে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, তোমরা ত ভেতরের কথা জানো না, কিন্তু আমাদের গাঁয়ের লোক, আমরা সব জানি। কি গো বুড়ো, আমাদের গাঁয়ে কেন তোমার ধোপা-নাপতে বন্ধ হয়েছিল বলব?

খবরটা পুরাতন। সবাই জানিত। একাদশী সদ্‌গোপের ছেলে, জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্র ছোটবোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল। আবার অল্প

বয়সে বিধবা হইয়া গেলে, দাদার ঘরেই সে আদর-যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে এই ভগিনীর এতবড় পদস্খলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা, একান্ত অনুতপ্তা, দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল। কথাটা সবাই জানিত; তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক-কাহিনীর মাধুর্য্যটা উপভোগ করিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু একাদশী লজ্জায় ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। নিজের জন্য নয়, ছোট বোনটির জন্য। প্রথম যৌবনের অপরাধ গৌরীর বুকের মধ্যে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলার্দ্ধও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভালরূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও তাহার কানে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণ-মুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার এই সকরুণ দৃষ্টির নীরব মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু অপূর্ব্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

বিপিন বলিতে লাগিল, আমরা কি ভিখারী যে দু'কোশ পথ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগণ্ডা পয়সা ভিক্ষে চাইতে এসেচি? তাও আবার আজ নয়, কবে ওঁর কোন্ খাতকের পাট বিক্রী হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁটতে হবে—তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু লোকের রক্ত শুষে সুদ খাও বুড়ো, মনে করেচ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাড়ির হাল করি ত আমার নাম বিপিন ভট্‌চায্যিই নয়। ছোট-জাতের পয়সা হয়েচে বলে চোখে কানে আর দেখতে পাও না? চল হে অপূর্ব্ব আমরা যাই, তার পরে যা জানি করা যাবে। বলিয়া সে অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া টান দিল।

বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া, অপূর্ব্বর অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ-বিবাদে সে কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহার তৃষ্ণার জল এক হাতে এবং অন্য হাতে রেকাবিতে গুটি-কয়েক বাতাসা লইয়া একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পাশের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল। গৌরীকে ছোটজাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতে

মনে হয় না। পরণে গরদের কাপড় ; স্নানের পর বোধ করি এইমাত্র আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল, ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে, চাকরের কাছে শুনিয়া সে আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে?

বিপিন কহিল, পাটের শাড়ি পরে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল খাব আমরা? অপূর্ব্ব, ইনিই সে বিশ্বেশ্বরী হে!

চক্ষের নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবটা ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কনুইয়ের গুঁতো মারিয়া কহিল, এ-সব কি বাঁদরামি হচ্ছে? কাণ্ডজ্ঞান নেই?

বিপিন পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ। সে অপূর্ব্বর খোঁচা খাইয়া আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল, চোখ রাঙাইয়া হাঁকিয়া কহিল, কেন, মিছে কথা বলচি নাকি? ওর এতবড় সাহস যে, বামুনের ছেলের জন্য জল আনে। আমি হাটে হাড়ি ভেঙে দিতে পারি জানো?

অপূর্ব্ব বুঝিল আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। কহিল, আমি আনতে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া ক'রো না। চল, আমরা এখন যাই।

গৌরী রেকাবিটা কুড়াইয়া লইয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে কহিল, দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েচ?

একাদশী এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের ন্যায় বসিয়াছিল, ভগিনীর আহ্বানে চকিত হইয়া বলিল, না, এই যে দিই দিদি!

অপূর্ব্বর প্রতি চাহিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, বাবুমশাই, আমি গরীব-মানুষ, চার আনাই আমার পক্ষে ঢের, দয়া করে নিন।

বিপিন পুনরায় কি একটা কড়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল ; কিন্তু এত কাণ্ডের পর সেই চার আনার প্রস্তাবে তাহার নিজের অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, থাক বৈরাগী, তোমায় কিছু দিতে হবে না।

একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা ; একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কলিকাল! বাগে পেলে কেউ কি কারও ঘাড় ভাঙতে ছাড়ে! দাও ঘোষালমশাই, পাঁচ গণ্ডা পয়সাই খাতায় খরচ লেখ। কি আর করব বল। বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্ব্বর এবার হাসি পাইল। এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চার আনার এবং পাঁচ আনার মধ্যে কত বড় যে প্রকাণ্ড

প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল ; মৃদু হাসিয়া কহিল, থাক্ বৈরাগী, তোমার দিতে হবে না। আমরা চার-পাঁচ আনা পয়সা নিইনে। আমরা চললুম।

কি জানি কেন, অপূর্ব্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচ আনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে। তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব যথার্থ-ই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচ আনা পয়সার অধিক ইহাদের ধারণা নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না এমন কাজ সংসারে নাই।

অপূর্ব্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই একটি বছর-দশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটির গলায় উত্তরীয়, বোধ করি পিতৃবিয়োগ কিংবা এমন কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়াছিল। অনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটে, তুই যে এখানে ?

পুঁটে আঙুল দেখাইয়া কহিল, আমার মা বসে আছেন। মা বললেন, আমাদের অনেক টাকা ওঁর কাছে জমা আছে। বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল।

কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ইহার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য অপূর্ব্ব নিজের আকণ্ঠ পিপাসা সত্ত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, তোমার নামটি কি বাবা ? বাড়ি কোথায় ?

ছেলেটি কহিল, আমার নাম শশধর ; বাড়ি ওঁদের গাঁয়ে—কালীদহে।

তোমার বাবার নামটি কি ?

ছেলেটির হইয়া অনাথ জবাব দিল ; কহিল, এর বাপ অনেকদিন মারা গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ; সাত বৎসর পরে মাস-খানেক হ'ল ফিরে এসেছিলেন। পরশু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবোতে গিয়ে বৃদ্ধ মারা পড়েচেন। আর কেউ নেই, এই নাতিটিই শ্রাদ্ধাধিকারী।

কাহিনী শুনিয়া সকলে দুঃখ প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই প্রশ্ন করিল, টাকার হাতচিটা আছে ? যাও তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এস।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, কাগজ-পত্র কিছু নেই, সব পুড়ে গেছে।

একাদশী প্রশ্ন করিল, কত টাকা ?

এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব দিল, ঠাকুর মরবার আগে বলে গেছেন, পাঁচশ টাকা তিনি জমা রেখে তীর্থ-যাত্রা করেন। বাবা,

আমরা বড় গরীব; সব টাকা না দাও, কিছু আমাদের ভিক্ষে দাও, বলিয়া বিধবা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘোষালমশাই এতক্ষণ খাতা লেখা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন, তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বলি কেউ সাক্ষী-টাক্ষী আছে?

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না! আমরাও জানতুম না। ঠাকুর গোপনে টাকা জমা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘোষাল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, শুধু কাঁদলেই ত হয় না বাপু! এ-সব মবলগ টাকাকড়ির কাণ্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিটা নেই, তা হলে কি-রকম হবে বল দেখি?

বিধবা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু কান্নার ফল যে কি হইবে তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। একাদশী এবার কথা কহিল; ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার মনে হচ্চে, যেন পাঁচশ' টাকা কে জমা রেখে আর নেয়নি। তুমি একবার পুরানো খাতাগুলো খুঁজে দেখ দিকি, কিছু লেখা-টেখা আছে নাকি?

ঘোষাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কে এতবেলায় ভূতের ব্যাগার খাটতে যাবে বাপু? সাক্ষী নেই, রসিদ-পত্তর নেই—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আসিল, রসিদ-পত্তর নেই বলে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে নাকি? পুরানো খাতা দেখুন, আপনি না পারেন আমাকে দিন, দেখে দিচ্চি।

সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল, কিন্তু যে হুকুম দিল তাহাকে দেখা গেল না।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, কত বছর হয়ে গেল মা! এতদিনের খাতা খুঁজে বার করা ত সোজা নয়। খাতা-পত্তরের আণ্ডিল! তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি। বিধবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তুমি বাছা কেঁদো না, হকের টাকা হয় ত পাবে বৈকি! আচ্ছা, কাল একবার আমার বাড়ি যেয়ো; সব কথা জিজ্ঞেস করে খাতা দেখে বার করে দেব। আজ এতবেলায় ত আর হবে না।

বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, কাল সকালেই আপনার ওখানে যাব।

যেয়ো, বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখের খোলা খাতা সেদিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়িতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, আট বছর আগের—তাহলে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার খুলে দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না?

ঘোষাল কহিলেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের মা।

গৌরী কহিল, আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের মেয়ে দু'কোশ হেঁটে এসেচেন—দু'কোশ এই রৌদ্রে হেঁটে যাবেন, আবার কাল আপনার কাছে আসবেন; এত হাঙ্গামায় কাজ কি ঘোষাল কাকা?

একাদশী কহিল, সত্যিই ত ঘোষালমশাই; ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছামিছি হাঁটান কি ভাল? বাপ রে! দাও, দাও, চটপট্ দেখে দাও।

ক্রুদ্ধ ঘোষাল উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। মিনিট দশেক পাতা উল্টাইয়া হঠাৎ ভয়ানক খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বাঃ! আমার গৌরীমায়ের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! ঠিক এক সালের খাতাতেই জমা পাওয়া গেল। এই যে রামলোচন চাটুর্য্যের জমা পাঁচশ'—

একাদশী কহিল, দাও, চট্‌পট্ সুদটা কষে দাও ঘোষালমশাই।

ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, আবার সুদ?

একাদশী কহিল, বেশ, দিতে হবে না! টাকা এতদিন খেটেচে ত, বসে ত থাকেনি! আটবছরের সুদ, এই ক'মাস সুদ বাদ পড়বে।

তখন সুদে-আসলে প্রায় সাড়ে-সাতশ' টাকা হইল। একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বার করে আনো। হাঁ বাছা, সব টাকাটাই একসঙ্গে নিয়ে যাবে ত?

বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন, চোখ মুছিয়া প্রকাশ্যে কহিল, না বাবা, অত টাকায় আমার কাজ নেই; আমাকে পঞ্চাশটি টাকা এখন শুধু দাও।

তাই নিয়ে যাও মা। ঘোষালমশাই, খাতাটা একবার দাও, সই করে নেই; আর বাকী টাকার তুমি একটা চিঠি করে দাও।

ঘোষাল কহিল, আমি সই করে নিচ্চি। তুমি আবার—

একাদশী কহিল, না না, আমাকেই দাও না ঠাকুর, নিজের চোখে দেখে দিই। বলিয়া খাতা লইয়া অর্দ্ধ মিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, ঘোষালমশাই, এই যে, একজোড়া আসল মুক্তা ব্রাহ্মণের নামে জমা রয়েছে। আমি জানি কি না, ঠাকুরমশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখতে পায় না, বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। এতগুলি লোকের সুমুখে মনিবের সেই ব্যঙ্গোক্তিতে ঘোষালের মুখ কালি হইয়া গেল।

সেদিনের সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে অপূর্ব্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তপ্ত পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলিতেছিল। ঘোষাল সঙ্গে ছিল, সে সবিনয়ে আহ্বান করিয়া কহিল, আসুন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেয়ে যেতে হবে।

অপূর্ব্ব কোন কথা না কহিয়া নীরবে অনুসরণ করিল। ঘোষালের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে একাদশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দেখলেন, ছোটলোক ব্যাটার আস্পর্দ্ধা? আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পায়ের ধূলো পড়েচে, হারামজাদার সোত পুরুষের ভাগ্যি! ব্যাটা পিচেশ কিনা পাঁচ-গণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখারী বিদেয় করতে চায়।

বিপিন কহিল, দু'দিন সবুর করুন না; হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা-নাপতে বন্ধ করে পাঁচ-গণ্ডা পয়সা দেওয়া বার করে দিচ্চি। রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখবেন ঘোষালমশাই।

ঘোষাল কহিল, আমি ব্রাহ্মণ। দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে জল-গ্রহণ করিনে, দুটো মুক্তোর জন্যে কি-রকম অপমানটা দুপুরবেলায় আমাকে করলে চোখে দেখলেন ত। ব্যাটার ভাল হবে? মনেও করবেন না। সে-বেটি—যারে ছুঁলে নাইতে হয়, কিনা বামুনের ছেলের তেষ্টার জল নিয়ে আসে, টাকার গুমরটা কি রকম হয়েচে, একবার ভেবে দেখুন দেখি!

অপূর্ব্ব এতক্ষণ একটা কথাতেও কথা যোগ করে নাই; সে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, অনাথ আমি ফিরে চললুম ভাই, আমার ভারি তেষ্টা পেয়েচে।

ঘোষাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, আপনি এদের নিয়ে যান, আমি যাচ্ছি ঐ একাদশীর বাড়িতেই জল খেতে।

একাদশীর বাড়িতে জল খেতে! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, চল, চল—দুপুর-রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর ঢং করতে হবে না। তুমি সেই পাত্রই বটে। তুমি খাবে একাদশীর বোনের ছোঁয়া জল।

অপূর্ব্ব হাত টানিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, সত্যিই আমি তার দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্য ফিরে যাচ্ছি। তোমরা ঘোষালমশায়ের ওখান থেকে খেয়ে এস, ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা করে থাকব।

তাহার শান্ত স্থির কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা জানেন?

অনাথ কহিল, ক্ষেপে গেলে নাকি?

অপূর্ব্ব কহিল, তা জানিনে? কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সে তখন ধীরে-সুস্থে করা যাবে। কিন্তু এখন ত পারলাম না, বলিয়া সে এই খর-রৌদ্রের মধ্যে দ্রুতপদে একদশীর বাড়ির উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

নারীর মূল্য

নারীর মূল্য

মণি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন না তাহা দুষ্প্রাপ্য! এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটি নিত্য-প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি এক ফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি—ঈশ্বর না করুন, যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।

কিন্তু দাম যাচাই করিবারও একটা পথ পাওয়া গেল। অর্থাৎ পুরুষের কাছে নারী কখন, কি অবস্থায়, কোন্ সম্পর্কে কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করিতে পারিলে নগদ আদায় হোক আর না হোক, অন্ততঃ কাগজে-কলমে হিসাব-নিকাশ করিয়া ভবিষ্যতে একটা নালিশ-মোকদ্দমারও দুরাশা পোষণ করিতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দিয়া বলি। সাধারণতঃ বাটীর মধ্যে বিধবা ভগিনীর অপেক্ষা স্ত্রীর প্রয়োজন অধিক বলিয়া স্ত্রীটি বেশী দামী। আবার এই বিধবা ভগিনীর দাম কতকটা চড়িয়া যায় স্ত্রী যখন আসন্ন-প্রসবা, যখন রাঁধা-বাড়ার লোকাভাব, যখন কচি ছেলেটাকে কাক দেখাইয়া বক দেখাইয়া দুধটা খাওয়ান চাই। তাহা হইলে পাওয়া যাইতেছে—নারী ভগিনী-সম্পর্কে বিধবা অবস্থায়, নারী ভার্য্যাসম্পর্কীয়ার অপেক্ষা অল্প মূল্যের। ইহা সরল স্পষ্ট কথা। ইহার বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। একটা শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিলে নারীর বিশেষ অবস্থার বিশেষ মূল্য বোধ করি আঁক কষিয়া কড়া-ক্রান্তি পর্য্যন্ত বাহির করা যায়। কিন্তু কথা যদি উঠে, ইহার অবস্থা-বিশেষের মূল্য না হয় একরকম বোঝা গেল, কিন্তু নারীত্বের সাধারণ মূল্য ধার্য্য করিবে কি করিয়া, যখন ইহার জন্য সোনার লঙ্কা নিপাত হইয়াছিল, ট্রয়-রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল; আরও ছোট-বড় কত রাজ্য হয়ত ইতিপূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস সে-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। এখানে এতবড় প্রয়োজন নারীতে কি ছিল যে সাম্রাজ্য ভাসাইয়া দিতেও মানুষ পরাঙ্মুখ হয় নাই, প্রাণ দিতেও দ্বিধা করে নাই। তোমার শ্লেটখানিতে জায়গা কত যে ইহার দাম তুমি কষিয়া বাহির করিয়া দিবে? কথাটা

বাহিরের দিক হইতে অস্বীকার করি না, কিন্তু ভিতরের দিকে চাহিয়া আমি যদি প্রশ্ন করি, মানুষ রাজ্যের দিকে চাহিয়া দেখে নাই সত্য, কিন্তু তাহা কতটা যে নারীর দিকে চাহিয়া, আর কতটা যে নিজের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির দিকে চাহিয়া—সে জবাব আমাকে কে দিবে ?

নারীত্বের মূল্য কি ? অর্থাৎ, কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে-কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন। দাম কষিবার এ-ছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে-কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।

ইয়োরোপ এ-দেশীয়কে চোখ রাঙাইয়া বলে, "তোমরা নারীর মূল্য জানো না, মর্য্যাদা বোঝ না, আমোদ-আহ্লাদে তাহাকে যোগ দিতে দাও না, ঘরের কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখো—তোমরা বর্ব্বর।" মনু প্রভৃতি হইতে 'পূজার্হা' ইত্যাদি শ্লোক তুলিয়া পাল্টা জবাব দিয়া আমরা বলি, "না, আমরা মা-বোনের মুখে রঙ মাখাইয়া শ্যাম্পেন-ক্লারেট পান করাইয়া উত্তেজিত করিয়া সভা-সমিতিতে নাচাইয়া লইয়া ফিরি না, আমরা ঘরের কোণে পূজা করি। তোমাদের ঐ বল-ডান্সের পোষাক দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হই, নাচ দেখিয়া চোখ বুজি। আমরা বরং বর্ব্বর হইয়া চিরদিন মা-বোনকে ঘরের কোণে বদ্ধ করিয়া রাখিব, কিন্তু তাঁহাদের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য প্রকাশ্যে ভিড়ের মধ্যে নাচাইতে পারিব না।" সাহেবরা অবশ্য এ তিরস্কার গ্রাহ্য করে না। প্রসিদ্ধ আচার্য্য Prof. Maspero সাহেব প্রাচীন মিশরে নারীর সভ্যতা প্রসঙ্গে তাঁহার Dawn of Civilisation গ্রন্থে এক স্থানে লিখিয়াছেন, মিশরীয় মহিলারা বক্ষ প্রায় অনাবৃত রাখিয়া রাজপথে বাহির হইতেন—সুতরাং, নিশ্চয়ই তাঁহারা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিলেন। যেহেতু "like Europeans they must have coveted public admiration." ফন্দিটা অব্যর্থ, তাহা অস্বীকার করা চলে না। নিজেদের মহিলা-সম্বন্ধে তিনি অসঙ্কোচে একথা বলিয়া গেলেন, কিন্তু এই admiration কথাটার ঠিক বাঙলা তর্জ্জমা করিতেও আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। যাহা হৌক, আমাদের উত্তরটাও নেহাৎ মন্দ শুনাইল না। "ভিড়ের মধ্যে নাচাইতে পারিব না"; এবং "ঘরের কোণে পূজা করি।" সুতরাং কথার লড়াইয়ে তখনকার মত একরকম জিতিয়া যাই এবং মনু-পরাশর মাথায় করিয়া পরস্পরের পিঠ ঠুকিয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসি। অবশ্য সাহেবদের কাছে আমি হটিতে বলি না, কিন্তু ঘরে ফিরিয়া দুই ভায়ে যদি বলাবলি করি, "ভায়া, পূজা ত করি, কিন্তু কিভাবে করি বল ত ?" তখন কিন্তু এমন অনেক

কথাই বাহির হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা যাহা বাহিরের লোকের কানে কিছুতেই তোলা চলে না। অতএব, আমাদের এটা নিভৃত আলোচনা।

প্রথম, সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুণ নাই। সব দেশের পুরুষই এ-কথা বোঝে, কেন না, এটা পুরুষের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় সামগ্রী। এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়া,—তিনি অতি পাষণ্ড হইলেও—তাঁহাকে মনে মনে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মত দোষ আর নাই। একটা অপরটার corollary; এই সতীত্ব যে নারীর কতবড় ধর্ম্ম হওয়া উচিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে সে-কথার পুনঃপুনঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এ-দেশে এ তর্ক এত অধিক হইয়াছে যে, এ-সম্বন্ধে আর বলিবার কিছু নাই। এখানে স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত সতীত্বের দাপটে কতবার অস্থির হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত তর্কই একতরফা—একা নারীরই জন্য। পুরুষের এ-সম্বন্ধে যে বিশেষ কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল, তাহা কোথাও খুঁজিয়া মেলে না, এবং এতবড় একটা প্রাচীন দেশে পুরুষের সম্বন্ধে একটা শব্দ পর্য্যন্তও যে নাই এ-কথা খুলিয়া বলিলে হাতাহাতি বাধিবে, না হইলে বলিতাম। ইংরাজ বলে, chastity, তবুও ইহার দ্বারা তাহারা নর-নারী উভয়কেই নির্দ্দেশ করে, কিন্তু এ-দেশে ও কথাটার বাঙলা করিলে 'সতীত্ব' দাঁড়ায়; সেটা নিছক নারীরই জন্য। শাস্ত্রকারেরা বনে জঙ্গলে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সমাজ চিনিতেন। তাই একটা শব্দ তৈরী করিয়াও তাঁর জাত-ভাইকে অর্থাৎ পুরুষকে inconvenient করিয়া যান নাই। তাহার প্রবৃত্তি নারী সম্বন্ধে যত রকমে হাত পা ছড়াইয়া খেলিতে পারে, তাহার জায়গা রাখিয়া গিয়াছেন। পৈশাচ বিবাহটাও বিবাহ! এমনি সহানুভূতি! এতই দয়া! আর এত দয়া না থাকিলে কি পুরুষ শাস্ত্রকারকে মানিত, না, আজ বিংশ শতাব্দীতেও বিধবা-বিবাহ উচিত কি না, জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইত! কবে কোন্ যুগে সে-সব পুঁথিপত্র দরিয়ায় ভাসাইয়া দিয়া মনের মত শাস্ত্র বানাইয়া লইয়া ছাড়িত। যাহাই হোক, নারীর জন্য সতীত্ব, পুরুষের জন্য নয়। এ সতীত্বের চরম দাঁড়াইয়াছিল—সহমরণে। কবে এবং কি হইতে ইহার সূত্রপাত, সে-কথা ইতিহাস লেখে না। রামায়ণে স্বামীর মৃত্যুতে কৌশল্যা বোধ করি একবার রাগ করিয়া সহমরণে যাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। দশরথকে একাই দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। এ গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। তাই অনুমান হয়, ব্যাপারটা লোকের জানা থাকিলেও কাজটা তেমন প্রচলিত হইয়া পড়ে নাই। মহাভারতে মাদ্রী ভিন্ন আর যে কেহ এ-কাজ করিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কুরুক্ষেত্রের লড়াইয়ের পর কতক কতক ঘটিয়া থাকিলেও তাহা কম। অন্ততঃ, পুরুষ যে তখনও উঠিয়া পড়িয়া লাগে নাই, তাহা নিশ্চিত; অথচ দেখা যায়,

অসভ্য জাতির মধ্যে এ-প্রথার বেশ প্রচলন। দাক্ষিণাত্যে সতীর কীর্ত্তিস্তম্ভ যথেষ্ট, এবং আফ্রিকায় ও ফিজি দ্বীপে ভাগ্যে কীর্ত্তিস্তম্ভের বালাই নাই, না হইলে ওদেশগুলায় বোধ করি এতদিনে পা ফেলিবার স্থানটুকুও থাকিত না। এক একটা ড্যাহোমি সর্দ্দারের মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার শতাবধি বিধবাকে সমাধিস্থানের আশপাশে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। অর্থাৎ পরলোকে সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইত। পরলোকের ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট নয়, বলা যায় কি, যদি লোকাভাবে সেখানে কষ্ট হয়! সাবধানের বিনাশ নাই, তাই সময় থাকিতে একটু হুঁসিয়ার হওয়া! আমাদের এ-দেশেও মূল কারণ বোধ করি, ইহাই। যাহারা অশোক রাজার রাজত্ব দেখিয়াছিল, তাহারা বলে, সে সময় বিধবাকে দগ্ধ করার প্রথাটা আর্য্যাবর্ত্তে ছিল না, দাক্ষিণাত্যে ছিল। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যেরা যেই খবর পাইলেন, অসভ্যেরা অসভ্য হোক, যাই হোক, বড় মন্দ মতলব বাহির করে নাই —ঠিক ত! পরলোক যদি সত্যই কিছু থাকে ত সেখানে সেবা করে কে? অমনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, এবং এত বিধবা দগ্ধ করিলেন যে, স্পেনের ফিলিপেরও বোধ করি লোভ হইত।

এমনি করিয়া মহাভাগার পূজার উপকরণ সজ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু একদিন যাহাকে বংশের হিতকামনায় ঘরের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, যাহার জন্য হয়ত যুদ্ধ করিয়াছি, ছলনা, মিথ্যা কথা, এমন কি চুরি পর্য্যন্ত করিয়াছি, এমন এতবড় উপকারী জীবটাকে এখন হত্যা করি কেন? কারণ আছে। প্রথম, পরলোকে সেবা করে কে, দ্বিতীয়, ভাগ্যদোষে যে স্ত্রী বিধবা হইয়া গেল, তাহার দ্বারা আর কি বিশেষ কাজ পাওয়া যাইবে? বরং, ভবিষ্যতে অশান্তি-উপদ্রবের সম্ভাবনা, অতএব সময়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এখানে যদি মনে রাখা যায়, নারী ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে সম্বন্ধ-বিশেষেই দামী, অন্যথা নহে, তাহা হইলে অনেক কথা আপনিই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তবে, আর একটা সম্বন্ধের কথা উঠিয়া আপত্তি হইতে পারে, তাহা জননীর সম্বন্ধে। সে আলোচনা পরে হইবে।

যাঁহারা ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বিধবা-বিবাহ জগতের কোন দেশে কোনদিন সমাদর পায় নাই। কম-বেশী ইহাকে সকলেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় যেদেশে এ প্রথা একেবারেই নিষিদ্ধ, সেদেশে পুড়াইয়া মারা যে বিশেষ হিতকর অনুষ্ঠান বলিয়াই বিবেচিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়! অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে অনেকেরই লজ্জা হইবে, কিন্তু পতিহীনা নারীর এখানে যখন আর তত আবশ্যক নাই, তখন কোনমতে ও-পারে রওনা করাইয়া দিতে পারিলে স্বামী মহাশয়ের কাজে লাগিবার সম্ভাবনা, এই ইচ্ছাই যে এ-প্রথার মূলে এ কথা অস্বীকার করা এক গায়ের জোর ভিন্ন আর কিছুতেই পারা যায় না। তা ছাড়া

দেখা যায়, যে সমস্ত অসভ্য দেশে স্বামীর মৃত্যুর সহিত স্ত্রী বধ হইত, তাহাদের ঐ বিশ্বাস একান্ত দৃঢ়! তাহারা মনে করে, মৃতের আত্মা কাছাকাছি, ঝোপে-ঝাপে, গাছ-পালায় বসিয়া থাকে, সুতরাং সঙ্গিনীকে পাঠাইয়া দিলে উপকার হইবে। কিন্তু আমাদের সুসভ্য এই প্রাচীন দেশ, যেদেশে আত্মার স্বরূপ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়া গিয়াছিল, ঈশ্বরের দীর্ঘ-প্রস্থ মাপিয়া শেষ করা হইয়াছিল, সেদেশের পণ্ডিতেরাও যে বিশ্বাস করিতেন, বধ করিয়া সঙ্গে পাঠান যায়, ইহাই আশ্চর্য্য! তবে এ যদি নারী-পূজার একটা বিশেষ পদ্ধতি হইয়া থাকে, ত সে আলাদা কথা! পুরুষ বুঝাইয়াছে সহমৃতা হওয়া সতীর পরম ধর্ম্ম! মনুও বলিয়াছেন, এক পতি-সেবা ব্যতীত স্ত্রীলোকের আর কোন কাজ নাই। সে ইহকালে পুরুষের সেবা করিয়াছে, পরকালে গিয়াও করিবে। কিন্তু কখন করিবে, কতদিন পরে করিবে, এত ঝঞ্ঝাটে সে যাইতে চাহে নাই। তাহার বিলম্ব সহে না, তাই মরণ সম্বন্ধে একটু সত্বর ও সতর্ক হওয়াই সে আবশ্যক মনে করিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এক মাতৃত্বের কারণেই সে পূজার্হা, সুতরাং সে সুযোগ না থাকিলে তাহাকে লইয়া আর কি হইবে? তারপর ছোট-বড় কীর্ত্তি-স্তম্ভ উঠিয়াছে, গল্পের মধ্যে, দৃষ্টান্তের মধ্যে তখন সে স্ত্রীর দাম চড়িয়া গিয়াছে। পুরুষ যে কেবলমাত্র নিজের সুখ ও সুবিধা ব্যতীত—সেটা সত্যই হৌক আর কাল্পনিকই হৌক—আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, সে-কথা চাপা দিয়া গর্ব্ব করিয়া প্রচার করিয়াছে, "যেদেশে নারী হাসিতে হাসিতে চিতায় গিয়া বসিত, স্বামীর পাদপদ্ম ক্রোড়ে লইয়া প্রফুল্ল-মুখে নিজেকে ভস্মসাৎ করিত! ইত্যাদি ইত্যাদি—"

কিন্তু তাই যদি হয়, তবে স্বামীর মৃত্যুর পরই তাহার বিধবাকে একবাটি সিদ্ধি ও ধুতুরা পান করাইয়া মাতাল করিয়া দেওয়া হইত কেন? শ্মশানের পথে কখন-বা সে হাসিত, কখন কাঁদিত, কখন বা পথের মধ্যেই ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিত। এই তার হাসি, এই তার সহমৃতা হইতে যাওয়া! তার পর চিতায় বসাইয়া কাঁচা বাঁশের মাচা বুনিয়া চাপিয়া ধরা হইত, পাছে সতী দাহ-যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারে। এত ধুনা ও ঘি ছড়াইয়া অন্ধকার ধুঁয়া করা হইত যে, কেহ তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া যেন ভয় না পায়। এবং এত রাজ্যের ঢাক-ঢোল কাঁশি ও শাঁখ সজোরে বাজানো হইত যে, কেহ যেন তাহার চীৎকার, কান্না বা অনুনয়-বিনয় না শোনে! এই ত সহমরণ! আমি জানি, এখানে অনেক রকমের আপত্তি উঠিবে। প্রথমেই উঠিবে, দেশের লোকের সত্যই যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, সহমৃতা সতী পরলোকে স্বামীর সহিত বাস করিতে পায় এবং সেইজন্যই এ অনুষ্ঠান,—তাহা হইলেও আমার এই উত্তর যে, দেশের অশিক্ষিত ইতর লোক কি বিশ্বাস করিত, না করিত, সে আলোচনায় লাভ নাই, কারণ তাহারা শুধু ভদ্র ও শিক্ষিতের অনুকরণ ও

অনুগমন করিত মাত্র। কিন্তু যেদেশে তখনো টোল করিয়া মহামহোপাধ্যায়েরা সাংখ্য বেদান্ত পড়াইতেন, জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন, কর্ম্মফলে জীবের স্থাবর জঙ্গম পশু জন্ম প্রচার করিতেন, দেবযান পিতৃযান প্রভৃতি পথের নির্দ্দেশ করিতেন, তাঁহারা যে সত্যই বিশ্বাস করিতেন, পৃথিবীতে কর্ম্মফল যাহার যাহা হোক, দুইটা প্রাণীকে এক-সঙ্গে বাধিয়া পোড়াইলেই পরলোকে একসঙ্গে বাস করে—এ-কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন।

লেকি সাহেব লিখিয়াছেন, এই প্রথা ইংরাজেরা যখন তুলিয়া দেন, তখন টোলের পণ্ডিত-সমাজ চেঁচামেচি করিয়া, সভাসমিতি করিয়া, রাজা-রাজড়ার নিকট চাঁদা তুলিয়া বিলাত পর্য্যন্ত আপীল করিয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছিল, এ প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া গেলে হিন্দু-ধর্ম্ম বনিয়াদ সমেত বসিয়া হিন্দু একেবারে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া যাইবে। নারী-পূজা বটে!

তার পর আপীল যখন নিতান্তই নামঞ্জুর হইয়া গেল, এবং বেশ বুঝা গেল, অতঃপর ঢাক ঢোল কাঁশি শাঁকের শব্দে পিয়াদার কান ঢাকা পড়িবে না, এবং ধুনা পোড়াইয়া সমস্ত নদীর কিনারাটা অন্ধকার করিয়া ফেলিলেও দারোগার দৃষ্টি এড়াইবে না, তখন ধর্ম্মধ্বজেরও বুঝিতে বিলম্ব হইল না, যে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের বনিয়াদ ইঞ্চি-কয়েক বসিয়া গেলেও যদি বা চলে, পুলিশের হাঙ্গামায় পড়িলে চলিবে না। সুতরাং অন্য পথের সন্ধান দেখিতে হইল! রাজার কাজ রাজা করিয়া গেলেন, কিন্তু সমাজ-রক্ষকের কাজ বাড়িয়া গেল। এ দুর্দ্দিনে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা কহিলেন, ম্লেচ্ছ আমাদের ধর্ম্ম বুঝিল না,- আইন করিয়া বসিল; আমরা কিন্তু হাল ছাড়িব না। এইখানে বসিয়াই আমাদের বিধবাকে দেবী বানাইয়া তুলিব। তাহার পর শাস্ত্রের পুরাতন শ্লোক এতদিন যাহা অব্যবহারে কোথায় পড়িয়াছিল, তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া লোকাচারের দোহাই দিয়া, সুনীতির দোহাই দিয়া, যত রকমের কঠোরতা কল্পনা করা যাইতে পারে, সমস্তই সদ্য-বিধবার মাথায় তুলিয়া দিয়া তাহাকে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া দেবী করা হইতে লাগিল। সে নিরাভরণা, সে একবেলা খায়, সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, থান-ফাড়া কাপড় পরে, কেন না সে দেবী! চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিতে লাগিল, আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে! অথচ দেবীটিকে বিবাহের ছাদনা-তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না—পাছে দেবীর মুখ দেখিলেও আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে! মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না, দেবীর ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিণ্ড রাঁধিতে।

তার মা তাহাকে দেখিয়া হয়ত বা সহ্য করিতে পারিলেন না, অসুখে পড়িয়া মারা গেলেন। বাপ পঞ্চাশ বছর বয়সে 'দায়ে পড়িয়া' 'নিতান্ত অনিচ্ছায়'

'লোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া' তার চেয়ে ছোট একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন। ঘরের বিধবা মেয়ের উপর হুকুম হইয়া গেল, একটু সকাল সকাল, অর্থাৎ বেলা দশটার মধ্যে রাঁধিয়া বাড়িয়া তাহার বৌমাকে যেন খাওয়াইয়া দেওয়া হয়। না হইলে ছোট মেয়ে, হয়ত বা পিত্ত পড়িবে! এ-বাড়িতে বিধবা-মেয়ে ও নববধূর মূল্য যে এক বাটখারায় ধার্য্য হইতে পারে না, সে-কথা বোধ করি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাপ ত বিবাহ করিয়া আনিলেন,—ইনি প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত, টোলের অধ্যাপক, শাস্ত্রজ্ঞানেরও নাকি সীমা নাই, বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে একখানা বইও লিখিয়াছেন,—কিন্তু সে যাই হোক, যে-লোক এক বাটীর মধ্যে বাস করিয়াও তাহার নিজের মেয়ের চেয়ে ছোট একটি মেয়েকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারে, সে যে কেমন করিয়া মুখে আনে, ঘরের কোণে নারীজাতিকে পূজা করি, এ আমার বুদ্ধির অগোচর! অথচ যে পুরুষ এ-রকমটি করে নাই, সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিবে, যে করে সে করে, আমরা ত পারি না! অর্থাৎ সে ভাবিতে চায় না, এ অবস্থায় সে নিজে কি করিবে। অবশ্য, ও দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে কাহাকেও স্বীকার করিতে বাধ্য করা যায় না, কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন পুরুষ যে ঠিক এমনটিই করে, তাহা নিঃসন্দেহ। এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেও পুরুষ ঘরের মধ্যে আরও একশত স্ত্রী আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইলেও তাহাকে দেবী হইতেই হইবে, এই ব্যবস্থা এদেশের সমস্ত নারীজাতিকে যে কত হীন, কত অগৌরবের স্থানে টানিয়া আনিয়াছে, সে-কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

থাক্ এ-কথা। আমাদের সহমরণের কথা হইতেছিল। এবং সেই সূত্রে পুরুষের নারী-পূজার উদ্যমের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে যদি কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এদেশে সমস্ত সতীকেই কি জোর করিয়া সহমরণে বাধ্য করা হইত? স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন কি ছিল না? রাজপুতের জহর-ব্রতের কথা কি জগৎ শুনে নাই? এই ত সেদিনও বাঙালীর ঘরে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনিবামাত্রই স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন ঢালিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে। এমন পতিভক্তি, এমন গৌরবের কথা আর কোন্ দেশে শোনা যায়? শোনা যদি নাও যাইত, তাহাতেও পুরুষের যশঃ কিছুমাত্র বৃদ্ধি করিত না, কিংবা নারীর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা-ভক্তিও সপ্রমাণ করিত না। তদ্ভিন্ন, বলপূর্ব্বক হোক, কৌশল করিয়াই হোক, কিংবা মাতাল করিয়াই হোক, একটিমাত্র নারীকেও দগ্ধ করা কি একটা দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

সেদিন ঐ কেরোসিনে আত্মহত্যা করায় দেশের অনেকেই বাহবা দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ সতী বটে! অর্থাৎ, আরো দুই-চারিটি এমন ঘটিলে তাহারা খুশী হয়। এ ঘটনায় এ-দেশের পুরুষের মনের গতি যে কোন্‌দিকে, শুধু যে ইহাই

বুঝিতে পারা গিয়াছিল তাহা নয়, এমন দেশে একসঙ্গে বাস করিয়া নারীর মনের গতিও যে স্বভাবতঃ কোন্‌দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, তাহাও বুঝিতে পারা গিয়াছিল। যে যাহার আশ্রিত, সে তাহাকে সুখী করিতেই চায়। আমি যদি বাটীর মধ্যে সকলকেই একবাক্যে ঐ প্রশংসা করিতে শুনি, আমারো ঐ অবস্থায় সুখ্যাতি ও বাহবা-লাভের লোভ যে প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। ইহার উপর ধর্ম্মের গন্ধ আছে। সে-বেচারার হাতে নাকি গীতা ছিল। গীতায় কি ওই কথা বলে? কিন্তু সে ভাবিল, গীতা হাতে থাকিলে আরো ভাল। এখানে অশোভন উদাহরণ দিবার ইচ্ছা আমার না হইলে এই গৌরবান্বিত কেরোসিন আত্মহত্যায় এমন মেয়ের কথাও বলা যাইতে পারিত, যে সতীও নয়, এবং ঠিক স্বামীর শোকেও এ-কাজ করে নাই। তা ছাড়া, শাশুড়ীর গঞ্জনায়, সময়ে বিবাহ না হইবার লাঞ্ছনায়,—ইত্যাদি আরও অনেক সংবাদ খবরের কাগজে লিখে,—কিন্তু সে সব থাক্। আমাদের সতী-সাধ্বীর কথাই চলুক।

স্বামীর মৃত্যুতে কাহারও কাহারও আত্মহত্যা করিবার কি যে একটা প্রবল ঝোঁক হয়, তাহা যাহারা চোখে দেখিয়াছে তাহারাই জানে। আমি একজনকে তেতালার ছাদ হইতে পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছি, আর একজনকে গলায় দড়ি দিতে দেখিয়াছি—বিষ খাইয়া মরিতে অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া এ মরা, আর চিতায় বসিয়া একটু একটু করিয়া দগ্ধ হওয়া এক বস্তু নয়। একটায় ঝোঁকের মাথায় মরা, কিন্তু আর একটায় আগুনের তাপে সে ঝোঁক বহুপূর্ব্বেই কাটিয়া যায়; তখন আত্মবিসর্জ্জন খুনে পরিণত হয়। টাইলার সাহেব বলেন, আফ্রিকার সর্দ্দার-পত্নীরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই গলায় দিবার দড়ি নিজে মনোনীত করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখে। হারবার্ট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, ফিজি দ্বীপে সদ্য-মৃত সর্দ্দারের পত্নীরা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করা অত্যন্ত সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করে, এবং কেহ বাধা দিলে তাহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হয়। তিনি লিখিয়াছেন, The wives of the Fijian chiefs consider it a sacred duty to suffer strangulation on the deaths of their husbands. A woman who has been rescued by Williams escaped during the night, and, swimming across the river, and presenting herself to her own people, insisted on the completion of the sacrifice which she had in a moment of weakness reluctantly consented to forego; and Wilkes tells of another who loaded her rescuer, with abuse, and ever afterwards manifested the most deadly hatred towards him. ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় যে সহমরণ গৌরবের

কাজ হইলে আর্য্যজাতি ভিন্ন আরো অনেক নীচ জাতি আছে, যাহারা তুল্য গৌরবের অধিকারী। আরো একটা কথা এই, পুরুষেরা যাহা ইচ্ছা করে, যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে, নারী তাহাই বিশ্বাস করে এবং পুরুষের ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বলিয়া ভুল করে এবং ভুল করিয়া সুখী হয়। হইতে পারে ইহাতে নারীর গৌরব বাড়ে, কিন্তু সে গৌরবে পুরুষের অগৌরব চাপা পড়ে না। যেই প্রশ্ন করা হয়, এত নিষ্ঠুর প্রথা কেন? উত্তর তৎক্ষণাৎ মুখে আসিয়া পড়ে, পরলোকে গিয়া স্বামীর সেবা করিবে। অথচ পরলোক যে কি, তাহা কয়টা পুরুষ জানে? আশ্চর্য্য, এত অত্যাচার, অবিচার, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা সহ্য করা সত্ত্বেও নারী চিরদিন পুরুষকে স্নেহ করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভক্তি করিয়াছে, এবং বিশ্বাস করিয়াছে। যাহাকে সে পিতা বলে, ভ্রাতা বলে, স্বামী বলে, সে যে এত নীচ, এমন প্রবঞ্চক, এ-কথা বোধ করি সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। বোধ করি এইখানেই তার মূল্য।

বিল্বমঙ্গল একখানা প্রসিদ্ধ নাটক। বহুদিন হইতে ইহা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। বাঙালী আপত্তি করে না, কারণ ইহাতে ধর্ম্মের কথা আছে। সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বণিক লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিয়া নিজের সহধর্ম্মিণীকে লম্পট অতিথির শয্যায় প্রেরণ করে। দর্শক অর্থ ব্যয় করিয়া দেখে এবং খুব তারিফ দিতে থাকে; বণিকের বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এই বাড়িতে অতিথি বিমুখ করিবে না। পাছে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, পাছে অধর্ম্ম হয়, পাছে মৃত্যুর পর যমদূতে ডাঙস্ মারে, এই তার ভয়। তাহার মনের ভাবটা এই যে, আমার পায়ে তৃণাঙ্কুরও না বিদ্ধ হয়—তোমার যা হয় তা হোক। তা ছাড়া, শাস্ত্রে আছে, সর্ব্বস্ব দিয়াও অতিথি-সৎকার করিবে। অর্থাৎ ধন-দৌলৎ, হাতি-ঘোড়া, গরু-বাছুর, যা-কিছু সম্পত্তি আছে সমস্তই। কিন্তু অতিথিটা যখন ও-সব চায় না, তখন তুমিই যাও। আমার কাছে সে তোমাকে চাহিয়াছে এবং তুমি আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে। স্বামীর কাছে পতিব্রতা স্ত্রীর সম্মান এই! অপরিচিত পাপিষ্ঠ অতিথির সেবার তুলনায় স্ত্রীর মূল্য এই! যাহারা বিল্বমঙ্গলের ভক্ত, তাহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, অতিথির জন্য হিন্দু প্রাণ দিতে পারে—কর্ণ পুত্রহত্যা করিয়াছিল। এ-সব কথা আমিও জানি। দাতাকর্ণ মস্ত কাজ করিয়াছিলেন, বণিকও মস্ত কাজ করিয়াছে! কিন্তু কথা সে নয়। প্রাণটা তোমার নিজের, ইচ্ছা হয় সেটা না হয় দিতে পার, কিন্তু এই যে ধারণা,—স্ত্রী তোমার সম্পত্তি, তুমি স্বামী বলিয়া ইচ্ছা করিলে, এবং প্রয়োজন বোধ করিলে, তাহার নারী-ধর্ম্মের উপরও অত্যাচার করিতে পার, তাহাকে রাখিতেও পার, মারিতেও পার, বিলাইয়া দিতেও পার,—তোমার এই অনধিকার, এই স্বেচ্ছাচার তোমাকে

এবং তোমার পুরুষজাতিকে হীন করিয়াছে, এবং তোমার সতী স্ত্রীকে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করিয়াছে। অতিথি-সেবা খুব মস্ত ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য যেমন তুমি চুরি-ডাকাতি করিতে পার না, এটাও ঠিক তেমনি পার না। ইহুদীরা যখন পশুর মত ছিল, তখন তাহারা সম্পত্তির সঙ্গে স্ত্রীর বখরা করিত। এখনও অনেক অসভ্য জাতি বাড়ি-ঘর জমি-জমা গরু-বাছুরের সঙ্গে বাড়ির স্ত্রীগুলিকেও ভায়ে ভায়ে ভাগ করিয়া লয়। স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে বণিকের ধারণাও প্রায় এমনি। আর অতিথি-সৎকার যদি এতবড় ধর্ম্মই হয়, যার কাছে সতী স্ত্রীর সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া ফেলাও ধর্ম্মপালন, তবে এখনো যাহারা এই ধর্ম্ম রাখিয়া চলে তাহাদের নীচ বলা শোভা পায় না।

আমেরিকার অসভ্য ছিনুক জাতির সম্বন্ধে কাপ্তেন লুইস্ বলিয়াছেন, ইহারা অতিথির শয্যায় বাটীর শ্রেষ্ঠ কন্যাটিকে, না হয়, স্ত্রীকে পাঠাইয়া দেওয়া অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মপালন বলিয়া মনে করে। এশিয়ার চুকচি জাতি সম্বন্ধে অর্ম্যান সাহেব লিখিয়াছেন,—The Chuckchi offer to travellers, who chance to visit them, their wives, and also what we should call their daughters' honour. কাপ্তেন লায়ন এবং সার জন লবক, এসকুইমো, কামস্কট্‌কা-নিবাসী ও কালমুখদের সম্বন্ধেও ঠিক এমনি অতিথি-সেবার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। হারবার্ট স্পেন্সর তাঁর Descriptive Sociology গ্রন্থে এমনি বহুতর দয়ার কাহিনী প্লস্ ও প্যালাস্ সাহেবদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, ইহাদের সহিত আমাদের ধার্ম্মিক বণিকটির প্রভেদ কোন্‌খানে? সে-দেশের পুরুষেরাও যাহা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহাই পালন করিয়াছে—ইনিও তাই; অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা উভয়েরই সমান, উভয়েই মনে করিয়াছে অতিথি সন্তুষ্ট না হইলে আমার পাপ হইবে, আমি কষ্ট পাইব। কথাটাকে যেমন ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেও ওই একটা 'আমি' ছাড়া আর কিছুই পাইবার জো নাই। ওই 'আমি'টার মধ্যে নারীর প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, নরকের দ্বার নারী। বাইবেল বলিয়াছেন, root of all evil, অর্থাৎ সমস্ত অহিতের মূল। ইউরোপ-প্রসিদ্ধ লাটিন ধর্ম্মযাজক টারটুলিয়ান নারীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Thou art the devil's gate, the betrayer of the tree, the first deserter of the Divine law. ধর্ম্মযাজক সেণ্ট অগস্টীন, যিনি সেণ্ট পদবী পাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীকে শিখাইতেছেন, What does it matter whether it be in person of mother or sister; we have to be beware of Eve in every woman.

সেন্ট অ্যাম্‌ব্রোস্—ইনিও সেন্ট—তর্ক করিয়া গিয়াছেন, Remember that God took a rib out of Adam's body not a part of his soul to make her.

৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আহূত ওসিয়ার ক্রীশ্চান ধর্ম্ম সভ্যে নাকি স্থির হইয়াছিল, স্ত্রীলোকের আত্মা নাই। ধর্ম্মের জন্যে যে নারীজাতি মরে বাঁচে, যে ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষরের প্রতি নারীর অচলা ভক্তি, সেই ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিবার সময় পুরুষ নারীজাতিকে কি শ্রদ্ধাই দেখাইয়া গিয়াছে! মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ সেন্ট বার্ণার্ড (ইনিও সেন্ট) জননীর উদ্দেশে পত্র লিখিয়াছেন, What have I to do with you ? What have I received from you but sin and misery ? Is it not enough for you that you have brought me into this miserable world ; that you being sinners have begotten me in sin···

আজ ইউরোপবাসীরা অহঙ্কার করিয়া বলে, তাহারা যেমন নারীর dignity বোঝে, এমন আর কেহ নাই। অথচ নারীজাতিকে গত ১৩।১৪ শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ অসহ্য ঘৃণা করিয়াছে, যত ক্লেশ দিয়াছে, যত অবনত করিয়াছে, তত আর কোন জাতি করিয়াছে কি-না সন্দেহ। ইহাদের sacredotal celibacyর ইতিহাস, চার্চ্চের ইতিহাস প্রভৃতির পাতায় পাতায় যে পুণ্য-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, তৎসত্ত্বেও ইহাদের মুখের শ্রদ্ধা ভক্তির কথা উপহাস ব্যতীত যে আর কি হইতে পারে জানি না।

যে ধর্ম্ম বনিয়াদ গড়িয়াছে, আদিম জননী ইভার পাপের উপর, যে ধর্ম্ম সংসারের সমস্ত অধঃপতনের মূলে নারীকে বসাইয়া দিয়াছে, সে ধর্ম্ম সত্য বলিয়া যে কেহ অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার সাধ্য নয় নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাহার শ্রদ্ধা শুধু ততটুকুই হইতে পারে যতটুকুতে নিজের স্বার্থ জড়িত হইয়া আছে। তাহার অধিক শ্রদ্ধাই বল, ন্যায্য অধিকারই বল, সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও পুরুষে দেয় নাই, সহস্র বৎসর পরেও দিবে না। মিল সাহেব তাঁহার Subjection of Women গ্রন্থে 'isolated fact' বলিয়া মিথ্যা দুঃখ করিয়া গিয়াছেন।

শুনিতে পাই, এক মহানির্ব্বাণতন্ত্রের "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" আদেশ ছাড়া আর কোন শাস্ত্রেই নারীকে শিক্ষা দিবার হুকুম নাই। স্বর্গীয় অক্ষয় দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থের উপক্রমণিকা খণ্ডে ইহার বিরুদ্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক বেদ পর্য্যন্ত তৈরী করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ-সমস্ত তর্ক কোন কাজেই লাগে না, পুরুষ যখন শাস্ত্রের "ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" শ্লোকের সন্ধান পাইয়াছে। ইউরোপের কোন এক প্রাচীন ধর্ম্মযাজক লিখিয়া গিয়াছেন Shall the maid Olympias

learn philosophy ? By no means, Woman's philosophy is to obey laws of marriage. মার্টিন লুথার সর্ব্বদাই বলিতেন, No gown worse becomes a woman than the desire to be wise. চীনদের দেশে একটা প্রচলিত বাক্য আছে, জ্ঞান যেমন পুরুষের শোভা বৃদ্ধি করে, অজ্ঞান তেমনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ইহার পর সে আর পুরুষের হাত হইতে কি মঙ্গল আশা করিতে পারে ? কবে উর্ব্বশী বেদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কেন শ্রৌতসূত্রে পত্নীকে বেদ প্রদান করিবার কথা ছিল, স্বামী প্রবাসে থাকিলে কি-হেতু দশ পৌর্ণ-মাস ব্রতে স্ত্রীর হোম করিবার অধিকার হইয়াছিল, বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী ; যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী-সংবাদ কেন রচিত হইয়াছিল, এ-সব আলোচনা অরণ্যে রোদন। ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার দিনে নারীর অধিকার সম্বন্ধে-মাস্‌পেরো 'husband a privileged guest', 'she inherited equally with her brothers', 'mistress of the house' 'judicially equal of man', 'having the same rights and being treated in the same fashion' ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়াছেন। এই সভ্যতার আলো রোম পাইয়াছিল বলিয়া তাহার নারীজাতিও এ-সময় যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। এই pagan law পরবর্ত্তী সুসভ্য আইন-কানুনের মধ্যে কোথায় ডুবিয়াছে, কেন ডুবিয়াছে, মেম সাহেব তাঁহার Ancient Law গ্রন্থে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

সার্ হেনরীর এই অধ্যায়টা আমি সকল শিক্ষিতা রমণীকেই পড়িয়া দেখিয়া অনুরোধ করি।

ইউরোপের আইন-কানুনের মধ্যে প্রাচীন রোমের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হইলেও, নারী সম্বন্ধে ইহুদীদের ব্যবস্থাই অধিক স্থান পাইয়াছে। কেন না, এইগুলাই পুরুষের ভাল লাগিয়াছে এবং মনের সঙ্গে মিলিয়াছে। প্রথমে মনে হয় বটে, ধর্ম্মের নৈকট্য হেতু ইহাই ত স্বাভাবিক! কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠতা হেতুই স্বাভাবিক নয়, তাহা পুরুষের মনোনীত হইয়াছে বলিয়াই স্বাভাবিক হইয়াছে। অবশ্য ধর্ম্মের চাপ ত আছেই। যীশুখ্রীষ্ট অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী-জাতীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া একটি কথাও কোথাও বলিয়া যান নাই। জগৎ-বিখ্যাত সেণ্ট পল শিখাইয়াছেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে নারী পুরুষের মত কোন প্রশ্ন করিতে পারিবে না। সে সর্ব্বদাই তাহার স্বামীর অধীন। যেহেতু ঈশ্বর নারীকে পুরুষের জন্যই সৃজন করিয়াছেন, পুরুষকে নারীর জন্য সৃজন করেন নাই। আরও বলিয়াছেন, নারী কোন দিন পুরুষকে শিক্ষা দিতে পারিবে না। সে-ই সংসারে পাপ প্রবেশ করাইয়াছে। তাহারা অনন্ত নরকে ডুবিবে, সদ্‌গতির কোন উপায় নাই। তবে

সদ্গতি হইতে পারে, গর্ভে সন্তান ধারণ করিতে পারিলে। ঈশ্বর-জানিত পর্স ঠাকুরের উক্তি কি সুন্দর! নারীর মুক্তির কি সোজা পথ! এবং এই পথের পরিচয় বিলাতের যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ খুলিলেই চোখে পড়ে। আমাদের শাস্ত্রের সন্তানের জন্যই নারী মহাভাগা, এবং পুত্রের জন্যই ভার্য্যাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। এবং সংসারের যে-কোন দেশের ইতিহাস, ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিলে কম-বেশী এই রকমের ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়।

নারীর সম্মান তাহার নিজের জন্য নহে, তাহার সম্মান নির্ভর করে পুত্র প্রসবের উপর। পুরুষের কাছে এই যদি তাহার নারী-জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, ইহা কোনমতেই তাহার গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু সত্যই তাই। এ-ছাড়া তাহার কাছে সংসার আর কিছুই আশা করে না, এবং সে যত-কিছু সম্মান দিয়া আসিয়াছে তাহা এই জন্যই। আমাদের শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি আছে। কুন্তীকে পঞ্চপাণ্ডবের, অম্বিকা-অম্বালিকাকে পাণ্ডু-ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম দিতে হইয়াছিল। সতী নারীর পক্ষে ইহা শ্লাঘার কথা নহে। প্রাচীন ইহুদী সমাজে অপুত্রক বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সন্তান-কামনায় দেবরের উপপত্নী হইয়া থাকিতে হইত। নারীর জন্য যে-সকল শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা ডুটরনমির পঁচিশ অধ্যায়ের গোড়ার দিকে লিপিবদ্ধ করা আছে, পড়িলে ঘৃণা জন্মিয়া যায়। মনে হয়, সন্তান-কামনায় ইহাদের সমাজে নারীকে কি না করিতে হইত! এমনি আফ্রিকাতেও সন্তানের জন্য নারীকে বাধ্য হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে হইত। হারবার্ট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, Dahoman *like all other semi-barbarians* considers a numerous family the highest blessing. আফ্রিকার পূর্ব্ব অঞ্চলে it is no disgrace for an unmarried woman to become the mother of numerous family; woman's irregularities are easily forgiven if she bears many chidren. ওটিয়াক্স্‌দিগের মধ্যে it is honourable for a girl to have children. She then gets a wealthier husband and her father is paid a higher halym for her. ওল্ড টেস্টামেন্ট বাইবেলের মতে স্ত্রীর সন্তান না হওয়া মহাপাপ। নারীর মূল্য কি দিয়া যে ধার্য্য হয় সে কথা বুঝইবার জন্য আর বেশী নাজির তুলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। পুরুষের এই স্বার্থের জন্যই যে তার মান, এই জন্যই যে মর্য্যাদা, আবশ্যক হইলে এ সত্য আরও সহস্র প্রকারে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু সে প্রয়োজন বোধ করি নাই। কিন্তু স্বার্থের জন্যেই যে পুরুষ তাহাকে চিরদিন নির্য্যাতন এবং অপমান করিয়া আসিয়াছে, এ-সম্বন্ধে আরো কিছু বলা আবশ্যক। কেন না, এ-কথা পুরুষে বুঝিলেও স্ত্রীলোক বুঝে না, বোধ করি বুঝিতে চাহে না। সংসারে ছোট খাটো সুখ-শান্তির মধ্যে থাকিয়া স্বামীর

মুখের দিকে চাহিয়া কি করিয়া সে মনে করিবে, স্বামী তাহার আন্তরিক মঙ্গল কামনা করে না! পিতার কাছে দাঁড়াইয়া কি করিয়া সে ভাবিবে, এই পিতা তাহার মিত্র নহে। বাস্তবিক পৃথক্‌ভাবে একটি একটি করিয়া দেখিলে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য, কিন্তু সমগ্রভাবে সমস্ত নারীজাতির সুখ-দুঃখের, মঙ্গল-অমঙ্গলের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর সমস্ত হীনতা সমস্ত ফাঁকি একমুহূর্ত্তেই সূর্য্যের আলোর মত ফুটিয়া উঠে। একটু বুঝাইয়া বলি। কোন একটা বিশেষ নিয়ম যখন দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহা যে একদিনেই হইয়া যায়, তাহা নহে, ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাঁহারা সম্পন্ন করেন, তাঁহারা পুরুষের অধিকার লইয়া করেন। তখন তাঁহারা পুরুষ—পিতা নন, ভ্রাতা নন, স্বামী নন। যাঁহাদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হয়; তাঁহারাও আত্মীয়া নহে, নারীমাত্র। পুরুষ তখন পিতা হইয়া কন্যার দুঃখের কথা ভাবে না; সে তখন পুরুষ হইয়া পুরুষের কল্যাণ চিন্তা করে—নারীর নিকট হইতে কতখানি কিভাবে আদায় করিয়া লইবে, সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। তার পর মনু আসেন, পরাশর আসেন, মোজেজ আসেন, পল আসেন, শ্লোক বাঁধেন, শাস্ত্র তৈয়ার করেন—স্বার্থ তখন ধর্ম্ম হইয়া সুদৃঢ় হস্তে সমাজ শাসন করিবার অধিকার লাভ করে। দেশের পুরুষ-সমাজ, ব্যাসদেব, শাস্ত্রকারেরা গণেশ-ঠাকুর মাত্র। সকল দেশের শাস্ত্রই অনেকটা এইভাবেই প্রস্তুত। তার পর শাস্ত্র মানিয়া চলিবার দিন আসে। ধর্ম্মের আসন জুড়িয়া বসিতে তাহার বিলম্ব ঘটে না, এবং সেই ধর্ম্ম-পালনের মুখে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ স্নেহ-মমতা ভালো-মন্দর বন্যার তৃণের মত ভাসিয়া যায়। দেশের সহমরণেও তাহা দেখিয়াছি, অন্যান্য দেশের অধিকতর নিষ্ঠুর ব্যাপারের মধ্যেও তাহা দেখিয়াছি। ইহুদীরা ঠাকুরের সম্মুখে পুত্র-কন্যা বলি দিতে কুণ্ঠিত হইত না। সন্তান-হত্যার কত নিষ্ঠুর ইতিহাস যে তাহাদের ধর্ম্ম-পুস্তকের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে তাহার সংখ্যা হয় না। তাহাদের মলেক দেবতাটি ত শুধু এইজন্যই অমর হইয়া আছেন। মেক্সিকো-বাসী পিতা-মাতার তেজকাটালি-পোকা ঠাকুরের সম্মুখে তাদের শ্রেষ্ঠ কন্যাটিকে হত্যা করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে লেশমাত্র দ্বিধা করিতে হয় না। দাতা কর্ণের মত ধর্ম্মের নামে পুত্রহত্যা করিতে অনেক দেশে অনেক রাজাকেই দেখা যায়। মেবারের রাজা পুত্র বলি দিয়াছিল, কার্থেজের রাজা দেবতার সম্মুখে কন্যা বধ করিয়াছিল। প্রাচীন দিনের বোধ করি এমন একটি দেশেও বাকী নাই, যেখানে ধর্ম্মের নামে সন্তান-হত্যা ঘটে নাই। তবে কি, তখনকার দিনে পিতা-মাতারা সন্তানকে ভালবাসিত না? বাসিত নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথায় ছিল তখন স্নেহ-মমতা? থাকিতে পায় না। প্রথা যখন একবার ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়, দেবতা প্রসন্ন হন, পরকালের কাজ হয়, তখন কোন নিষ্ঠুরতাই আর অসাধ্য হয় না। বরঞ্চ,

কাজ যত নিষ্ঠুর, যত বীভৎস হয়, পুণ্যের ওজনও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সন্তান বলিয়া পিতা-মাতা আর তখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায় না।

কোন কোন ক্ষেত্রে মায়া-মমতা হয়ত বাধা দিতেও আসে, কিন্তু তখন আর উপায় থাকে না। স্বার্থের জন্য পুরুষ সাধারণভাবে একবার যে প্রথাকে ধর্ম্মের অনুশাসন বলিয়া প্রতিষ্ঠা করে, পিতা হইয়া আর সেই প্রথাকে নিজের সন্তানের বেলা অতিক্রম করিতে পারে না।

পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত যখন তাহাকে বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে হয়, হয়ত তাহার ক্ষণকালের জন্য বুকে বাজে, কিন্তু উপায়ও সে খুঁজিয়া পায় না। তাহাকে জাত বাঁচাইতে হইবে। ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে। যে প্রথা, সে পুরুষ হইয়া, সমাজের একজন হইয়া নিজের হাতে গড়িয়াছে, এখন সেই প্রথা তাহাকে এক হাতে চোখ মুছায়, আর একহাতে সম্প্রদান করিতে বাধ্য করে। স্নেহের এত বড় জোর নাই যে, তাহাকে এই নির্দ্দয় কর্ম্ম হইতে বিরত করিতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, স্নেহ-মায়া, দয়া থাকা সত্ত্বেও লোকে অমঙ্গল করিতে পারে, এবং পরম আত্মীয় হইয়াও পরম শত্রুর মতই ক্লেশ দিতে পারে। আজ সে স্বার্থের কথা মনে করিতে পারিবে না জানি, এখন সে ধর্ম্মের দোহাই পাড়িয়াই আপনাকে শান্ত করিবে, কিন্তু কোথায় ইহার সুদূর মূল নিহিত আছে, ইহা যদি সে তলাইয়া দেখিতে চাহে, সেখানে অখণ্ড স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই সে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এ দেখা কঠিন। পিতার পক্ষেও কঠিন, তাহার কন্যার পক্ষেও কঠিন। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম পালনের মধ্যে মানুষ যখন একান্ত মগ্ন থাকে, চোখের দৃষ্টিও তখন তাহার রুদ্ধ হইয়া যায়। সে কোনমতেই দেখিতে পায় না, কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম। বৈদিক যজ্ঞের অগণিত পশু-হত্যার মধ্যে কোথায় অন্যায় ছিল, মানুষ তখনই শুধু দেখিতে পাইয়াছে বুদ্ধদেব যখন তাহাকে পৃথক্ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সহমরণ আজ রহিত হইয়া গিয়াছে তাই আজ সে-কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠি। গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করার মধ্যে কত পাপ গোপন ছিল, আজ তাহা দেখিতে পাইয়া ইংরাজের আইনকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি। অথচ সে-সময় কত না লড়াই করিয়াছি। গাঁটের পয়সা অপব্যয় করিয়া বিলাত পর্য্যন্ত আপীল করিয়াছি। যাহারা প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিল, আপীল করিতে, বাধা দিতে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে পরম মিত্র বলিয়া আহ্বান করিয়াছি, স্বর্গীয় রামমোহনকে ধর্ম্মদ্বেষী রাক্ষস বলিয়া গালি-গালাজ দিয়াছি। আজ সে ভ্রম বোধকরি ধরা পড়িয়াছে,—তথাপি চৈতন্য হয় নাই। আজও সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিতে টোলের ভট্‌চায্যির নিকট ছুটিয়া যাই। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তাহাদিগকে গিয়া প্রশ্ন করি। কারণ, তাহারা শাস্ত্রবিৎ। কিন্তু এ-কথাটা একবারো ভাবি না, তাহারা শাস্ত্রের শ্লোকই জানে—আর কিছু

জানে না। বিদ্যার চরম উদ্দেশ্য যদি হৃদয় প্রশস্ত করা হয়, তাহাদের অধিকাংশের পড়াশুনা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা একবারও চিন্তা করি না। মেয়ের কত বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শাস্ত্র আওড়ায়, বিধবা-বিবাহ উচিত কিনা, জানিতে চাহিলে পুঁথি খুলিয়া বসে। মিলাইয়া দেখিতে চায়, শ্লোকে কি বলে, শাস্ত্র তাহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রের বাহিরে তাহারা দেখিতেও পায় না, শাস্ত্রের বাহিরে তাহারা পা বাড়াইতেও পারে না। ইহারা মুখস্থ করিবার ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলিয়া মনে করে, এই মুখস্থ করাটাকেই জ্ঞান বলিয়া জানে। এই জ্ঞান ইহাদের অধিকাংশ অবস্থাতেই যে অনুস্বর-বিসর্গকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার শ্রীগোপাল মল্লিক ফেলোশিপের দ্বিতীয় লেক্‌চারে নামকরণ-প্রণালীর মধ্যে বলিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন, মেরুতন্ত্রে লণ্ডন নগরের উল্লেখ আছে, অতএব উহা নিতান্ত আধুনিক। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, পুরণাদিতে অনেক ভবিষ্যদুক্তি আছে। মেরুতন্ত্রেও ভবিষ্যদুক্তি স্থলেই লণ্ডন নগরের উল্লেখ আছে। সুতরাং তদ্দ্বারা মেরুতন্ত্রের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। উহা যে ভবিষ্যদুক্তি তাহা দেখাইবার জন্য মেরুতন্ত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

> "পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং যড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতা
> ফিরিঙ্গি ভাষয়া মন্ত্রা যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
> অধিপামণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
> ইংরেজা নবষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপিভাবিনঃ।"

অথচ, স্বর্গীয় অক্ষয় দত্ত মহাশয় ছদ্ম শাস্ত্রকারগণের জুয়াচুরি সপ্রমাণ করিতে মেরুতন্ত্রে এই শ্লোকটাই তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের পাণ্ডিত্যই অতি গভীর ছিল, অথচ একজন যে শ্লোকের অস্তিত্বে শ্লাঘা বোধ করিয়াছেন, আর একজন তাহাকেই ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিয়াছেন। এস্থলে কাহার বিচার সমীচীন, তাহা বুঝিতেও যেমন বিলম্ব হয় না, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতচূড়ামণির মুখে এমন কথা, সংস্কৃত শ্লোকের উপর এত বড় অন্ধবিশ্বাস দেখিয়াও আর আশা-ভরসার স্থান থাকে না। পণ্ডিতমহাশয় আবার নিজেই বলিয়াছেন—মেরুতন্ত্রের প্রামাণ্য সন্দেহ করিবার অন্য কারণ আছে। তাহা এই—পারস্য ভাষায় ও ফিরিঙ্গি ভাষায় যে সকল মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, তত্তদ্ভাষাবিদেরা জানেন যে বস্তুগত্যা উহাদের অস্তিত্ব নাই।

এইখানে অতি অনিচ্ছায় তাঁহার মনে একটু খটকা বাজিয়াছে। তা সে কিছুই না। পুরাণাদিতে যখন যোগবলে হাত গনিয়া ভবিষ্যৎ বলা হইয়াছে, মেরুতন্ত্রের

গ্রন্থকারও তেমন হাত গুনিয়া লণ্ডন নগরের এবং কলিকালের মন্ত্রসিদ্ধ ইংরাজের পরাক্রমের কথা বলিলেন, ইহা বিচিত্র কি? এইজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ-কারীকে সতর্ক করিয়া পুরাণাদির ভবিষ্যদুক্তির কথা পাড়িয়াছেন। ধন্য বিশ্বাস! ধন্য যুক্তি! আমি জানি, আমার কথাগুলা অনেকেরই ভাল লাগিতেছে না এবং বিরুদ্ধ তর্ক করিবার ইচ্ছা থাকিলে অনেক রকমেই করা যাইবে। কিন্তু ইহা তর্কের কথা নহে, বিবাদ-বিসম্বাদের বস্তু নহে; ভাবিবার বিষয়, কাজ করিবার সামগ্রী। স্বদেশ-বিদেশের শাস্ত্রে, ইতিহাসে, যাবতীয় জাতির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আমার চেয়ে যাঁহার পড়াশুনা অধিক, তর্ক করিবার ইচ্ছা করিলে আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন জানি, কিন্তু যে সত্য আমি হৃদয়ের ব্যথার ভিতর দিয়া বাহির করিলাম, সে সত্যকে কোন মহামহোপাধ্যায় যে উড়াইয়া দিতে সক্ষম হইবে না, তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি। বাস্তবিক আমার হার-জিৎ যাহাই কেন-না হোক, একথাটা কিন্তু নিশ্চয়ই করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে, যথার্থ সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসার ভার সমাজের কাহাদের হাতে থাকা উচিত। যাঁহারা জোর করিয়া এতদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও করুন। দুর্গাপূজার মহাষ্টমী দুই দণ্ড আগে বসিবে, কি পরে বসিবে, বিড়াল মারার প্রায়শ্চিত্তে এক কাহন কিংবা পাঁচ কাহন কড়ি প্রশস্ত, মহান্ত মহারাজেরা বেশ্যা রাখিলে স্বর্গে যায় কিংবা বিবাহ করিলে পতিত হয়, এ-সব মীমাংসা তাঁহারাই করিতে থাকুন, কিছুমাত্র আপত্তি করি না; কিন্তু সমাজের ভাল-মন্দ কিসে হয় না-হয়, কোন্ নিয়ম রাখিলে বা পরিবর্ত্তন করিলে আধুনিক সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে, স্বদেশের কাজে বিলাতে গেলে জাতি যাইবে কি যাইবে না, এ-সমস্ত দুরূহ বিষয়ে তাঁহাদের হাত দিতে যাওয়া অনধিকার-চর্চ্চা। এ-সমস্ত প্রশ্ন নিষ্পত্তি করার অধিকার দেশের শুধু তাঁহাদেরই জন্মিয়াছে, শিক্ষা যাঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত করিয়া সার্থক হইয়াছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের মত যাঁহাদিগকে সমাজের ভালো-মন্দ স্থির করিয়া দিতে ভগবান নিজের হাতে গড়িয়া পাঠাইয়াছেন। যাঁহাদিগকে দেশের লোক বড় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, এ-সমস্ত সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসার ভারও দেশের সেইসমস্ত মহৎ লোকের উপর, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উপর নহে। কেমন করিয়া জানিবে ইহারা শাস্ত্র, কেন শাস্ত্র? কোন্‌টা সত্যকার শাস্ত্র? কোন্‌টা প্রতারণা? কি করিয়া বুঝিবে ইহারা তখন কি দোষ-গুণ সমাজে বিদ্যমান ছিল, এখন কি দোষ-গুণ আছে? কোন টোলে এ আলোচনা হয়? কোন্ স্মৃতিরত্নের এ আলোচনা করিবার ধৈর্য্য এবং সাহস আছে? নিজের দলটি ছাড়া ইহাদের কাছে সবাই ম্লেচ্ছ, সবাই অশুচি! নিজেদের মতটি ছাড়া সমস্তই অশাস্ত্রীয়। নিজেদের আচার-ব্যবহার ভিন্ন জগতের সমস্ত আচার-ব্যবহারই কদর্য্য এবং হীন। এক কথায় নিজেরা ছাড়া আর কেহ মানুষই নয়। কালের সঙ্গে সঙ্গে যে নিয়মও বদলায়, এ সত্যের ইহারা কোন

ধার ধারে না। তাই সময়োপযোগী কোন একটা নূতন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা হইবামাত্রই ইহারা ভয়ে সারা হইয়া যায়। কাঁদ-কাঁদ হইয়া জানায় শাস্ত্রের শ্লোকে খুঁজিয়া মিলিতেছে না, এবং প্রাণপণে বাধা দিয়া মনে করে দেশের উপকার হইতেছে—শাস্ত্র বজায় হইতেছে।

অথচ ইহারাই কি সমস্ত শাস্ত্র মানিয়া চলে? শাস্ত্রে আছে, রাক্ষস-বিবাহ। শাস্ত্রে আছে, অসুর বিবাহ। শাস্ত্রে আছে, ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি। আধুনিক সমাজে এইগুলো শুরু হইয়া গেলে ইহারাই কি ভাল মনে করে? অথচ কেন করে না, জিজ্ঞাসা করিলেও ঠিক মত জবাব দিতে পারে না, তখন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানারকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, দেশাচারে নয়—তেমন আবশ্যকও নয়—ভাল নয়—মানুষের নৈতিক বুদ্ধি অনুমোদন করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এ-কথা শাস্ত্রে থাকে থাক, আর একটা শাস্ত্রের উল্টা শ্লোকও ত আছে। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, ক্ষেত্রজ সন্তানাদি নিজেদের সংসারে যখন কোনমতেই পছন্দ করি না, তখন আর কেহ করিলেও যত পারিব তত গালি দিব।

'পছন্দ করি না' এইটাই আসল কথা। বাস্তবিক কোন শাস্ত্রই পুরুষে অধিক দিন মানিয়া চলে না, যদি না তাহা তাহাদের আন্তরিক অভিপ্রায়ের সহিত মিশ খায়। মিশ খাইলে তখনই সেটা টিকসই হয়, অন্যথা স্বয়ং ভগবান রাস্তায় দাঁড়াইয়া নিজের মুখে চেঁচাইয়া বলিয়া গেলেও হয় না। হইতে পারে, অবস্থা-বিশেষে এই শাস্ত্র কাহারও বা দুঃখ উপস্থিত করে, কিন্তু সাধারণ ইচ্ছার চাপে এ দুঃখ স্থায়ী হইতে ত পায়ই নাই, পরন্তু দুঃখ উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মের আকার ধরিয়া পরলোকে শতগুণ সুখের আশ্বাস দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়া যায়। পুরুষের ক্ষণিক দুঃখ ক্ষণিকেই শেষ হয়, কিন্তু চির-দুঃখ যাহাকে সহিতে হয়, সে নারী!

আমাদের দেশে পূজার্হা নারীর পূজার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। তথাপি ইহাকেই আদর্শ বলিয়া যে পুরুষ শ্লাঘা বোধ করেন, তাঁহাকে আমার কিছুই বলিবার নাই। বিদেশের ব্যবস্থাও দেখিয়াছি, সেখানেও ঐ ব্যাপার। চার-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার লুপ্ত আইন-কানুনের একটা ধারায় সামাজিক ব্যবস্থা লেখা আছে—"if a wife hates her husband and says, 'thou art not my husband' into the river they shall throw her." আর একটা ধারায় লেখা আছে 'if a husband says to his wife, 'thou are not my wife,' half a mina of silver he shall weigh out to her and let her go." অর্থাৎ স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে, তাহা হইলে তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ কর, আর পুরুষ যদি পছন্দ না করেন তাহা হইলে আধ মিনা ওজনের রূপা দিয়া বিদায় করিয়া দাও। কি সূক্ষ্ম বিচার! আধ মিনা রূপা কতখানি, অবশ্য সে কথা বলিতে পারি না,

কিন্তু যতই হোক, জলে ডুবাইয়া মারার সঙ্গে এক নিক্তিতে যে ওজন হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি। প্রাচীন বেবিলনের ১৩৭ হইতে ১৪৮ ধারায়ও ঠিক এই মত ব্যবস্থাই আছে, অথচ এই বেবিলন ইহুদীদিগের অপেক্ষা সহস্র-গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। অল্পদিন পূর্ব্বেও ইউরোপের নারী-সম্বন্ধে অনেকেই লিখিয়াছেন, "She was sold into slavery to her husband by her father and was treated with a different legal code from her brothers"; "wife of the labourer a chattel of the estate, her life an unceasing drudgery." তবে কোথাও বা বাহিরের চাকচিক্য আছে, স্বীকার করি, এবং কোথাও বা ভিতর হইতে সংশোধনের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে সংশোধনের ভার লইয়াছে নারী। পুরুষ উপযাচক হইয়া কোনদিন ভাল করিতে আসে নাই, কোনদিন আসিবেও না। যিনি বড় ভাল, তিনি দয়া করিয়া বই লিখিয়া গিয়াছেন, যেমন মিল, কনডোরসেট। কিন্তু মুখ্যতঃ তাহা বই লেখা গৌরবের জন্যই। প্রাচীনকালে প্লেটোও রিপাবলিকে লিখিয়া গিয়াছেন, "the sex which we keep in obscurity and domestic work, is it not fitted for nobler and more elevated functions? Are there no instances of courage, wisdom, advances in all the arts? May hap these qualities have a certain debility, and are lower than in ourselves, but, does it follow that they are, therefore, useless to the country?" এ লেখার সূক্ষ্ম বিচার করিতে চাহি না, এবং 'may hap' কথাটারও ব্যাখ্যা করিতে চাহি না; তবে সৎ অভিসন্ধি যে ইহাদের একেবারেই ছিল না, এ-কথা বলিলেও অন্যায় বলা হইবে, কিন্তু বিশেষ কোন ফলও ইহাতে ফলে নাই—বোধ করি, সত্যকার প্রয়াস ছিল না বলিয়াই।

বই লেখা ছাড়া পুরুষ কোথাও যে যথার্থ সম্মান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অবগত নহি, তবে এ-কথা জানি যে, যদি কোন দেশে রমণী যথার্থ শ্রদ্ধা-সম্মান লাভ করিয়া থাকে ত সে শুধু নিজের চেষ্টাতেই লাভ করিয়াছে। প্রাচীন মিশরে এই চেষ্টা একবার হইয়া গিয়াছিল এবং সেই চেষ্টার স্রোত রোম পর্য্যন্ত আসিয়া আঘাত করিয়াছিল। আমাদের এদেশেও একদিন এ চেষ্টা হইয়াছিল, যখন নারী বেদ রচনা করিবারও স্পর্দ্ধা রাখিত। এখন তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাহার নাই। যখন নারী পুরুষের মুখের দেবী সম্বোধন শুনিয়া গলিয়া পড়িত না, সে মুখের কথা কাজে পরিণত করিতে বাধ্য করিত, তখন ছিল নারীর মূল্য।

আর এখনকার দিনের একটা দৃষ্টান্ত দিই। একসময়ে এদেশে যখন বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে-বিপক্ষে ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল, সে সময়ে যাহারা বিধবা-

বিবাহের স্বপক্ষে, তাঁহারা নানাবিধ সুযুক্তি, কুযুক্তির মধ্যে এই একটা অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন যে, অল্পবয়স্কা বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ না হওয়াতেই বঙ্গদেশে কুলত্যাগিনীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে! সুতরাং, বিধবা-বিবাহের অনুকূলে ইহাও একটা হেতু হওয়া উচিত। মোটের উপর, বিধবা-বিবাহ উচিত, কিংবা উচিত নয়, এ লইয়া উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই চলিতে লাগিল, কিন্তু পুনর্ব্বিবাহ না হওয়ার দরুণই যে বিধবারা কুলত্যাগ করে, এই কথাটা বিধবা-বিবাহের শত্রু-পক্ষীয়েরাও অস্বীকার করিল না। অর্থাৎ পুরুষমাত্রেই মানিয়া লইল যে, হাঁ, কথা বটে! কুলত্যাগিনীর সংখ্যা যখন বাড়িয়াই চলিতেছে, তখন বিধবা ভিন্ন কে আর কুলত্যাগ করিতে সম্মত হইবে! সুতরাং কিরূপ বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করিলে, কিরূপ শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চার মধ্যে সদ্য-বিধবাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিলে, কিরূপে তাহার নাক চুল কাটিয়া লইয়া বিশ্রী করিয়া দিতে পারিলে এবং কিরূপ খাটুনির মধ্যে ফেলিয়া তাহার অস্থিচর্ম্ম পিষিয়া লইতে পারিলে এই অমঙ্গলের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে! স্বপক্ষ, বিপক্ষ উভয়েই তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। আজও এ মীমাংসার শেষ হয় নাই। এখনও থাকিয়া থাকিয়া মাসিক পত্রে প্রবন্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কি করিলে সদ্য-বিধবাকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়, এবং এতদর্থে পিতা-মাতারই বা কর্ত্তব্য কি। বস্তুতঃ শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুরুষের এই ভয়টাই চোখে পড়ে যে, নারীকে আটকাইয়া রাখিতে না পারিলেই সে বাহির হইবার জন্য পা তুলিয়া থাকে। কেহ বলিলেন, 'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যম্' কেহ আর এক ধাপ চড়াইয়া বলিলেন, 'অঙ্কে স্থিতাপি', কেহ বা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রচার করিলেন, 'দেবা ন জানন্তি'। বলা বাহুল্য, ইহাতে পূজার্হা নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় নাই। এবং পুরুষের কোন সংস্কারের উপর যে এতগুলো বিধি-নিষেধ ডাল-পালা ছড়াইয়া বড় হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, সে-সম্বন্ধেও বোধ করি দুই মত নাই।

বিধবা-বিবাহ ভাল কিংবা মন্দ, সে তর্ক তুলিব না। কিন্তু এ বিবাহ যদি শুধু এই বলিয়াই উচিত হয় যে, অন্যথা তাহাকে সুপথে রাখা শক্ত হইবে, তাহা হইলে আমি বলি, বিধবা-বিবাহ না হওয়াই উচিত।

কিন্তু কথাটা কি সত্য? পুরুষ নির্ব্বিচারে মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু যাচাই করিয়া দেখিয়াছে কি, বিধবা বাহিরে আসিবার জন্য নিশিদিন উদ্যত হইয়া থাকে কি না? কথাটা প্রচার করিবার সময়, বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া লইবার সময়, একবারও সে মনে করিয়াছে কি, কী গভীর কলঙ্কের ছাপ সে নারীত্বের উপর বিনা দোষে চালিয়া দিতেছে? বিলাতের একজন বড় দার্শনিক বলিয়াছেন, দাস-ব্যবসায় যেমন 'sum of all villainy' বেশ্যাবৃত্তি তেমনি 'sum of all degradation'. আমি বিদেশের কথা বলিলাম, কারণ দেশের কথা তুলিতে সাহস হয় না। দেবতাদের মত এ-দেশের

স্বর্গেও এরা থাকেন, এবং রাগ করিয়া শাপ-সম্পাত করিলে মুনি-ঋষিদের চেয়ে বড় কম করে না। যাই হোক, বিদেশীর কথায়, এই এতবড় হীনতার মধ্যে ডুব দিয়া পড়িবার জন্যই কি নারী অহরহ উন্মুখ হইয়া থাকে? এবং এতবড় পাশবিকতাই কি নারীর স্বাভাবিক চরিত্র? পুরুষ তাহার গায়ের জোর লইয়া বলিবে, 'হাঁ'। নারী তাহার সঙ্কীর্ণ অভিমান লইয়া বলিবে, 'না'। বাস্তবিক যাচাই না করিয়া শুধু একটা কাল্পনিক উত্তর দিবার চেষ্টা করিলে, তর্কই চলিতে থাকিবে। কিন্তু যাচাই করিয়া দেখিলে কি জবাব পাওয়া যায়, তাহাই দেখাইতেছি। বার-তের বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাঙলাদেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গরমণীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলার বহুসহস্র হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল। বইখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়াছে—বোধ করি, ভালই হইয়াছে—সুতরাং কেহ সঠিক প্রমাণ চাহিলে দিতে পারিব না সত্য, কিন্তু ইহার আগাগোড়া কাহিনীই আমার মনে আছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম যে, এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তরজন সধবা। বাকী ত্রিশটি মাত্র বিধবা। ইহাদেরই প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অত্যধিক দারিদ্র্য ও স্বামী প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন। সধবাদিগের প্রায় সবগুলিই নীচজাতীয়া এবং বিধবাদিগের প্রায় সবগুলিই উচ্চজাতীয়া। নীচজাতীয়া সধবারা এই বলিয়া জবাবদিহি করিয়াছিল যে, খাইতে-পরিতে তাহারা পাইত না,—দিনে উপবাস করিত, রাত্রে স্বামীর মার-ধোর খাইত। সৎ-কুলের বিধবারাও কৈফিয়ৎ দিয়াছিল, কেহ-বা ভাই ও ভাতৃজায়ার, কেহ-বা শ্বশুর-ভাসুরের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই কাজ করিয়াছে। ইহাদের সকল কথাই যে সত্য তাহা নয়, তথাপি সমস্ত ব্যাপারটা একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই চোখে পড়ে,—এমনিই বটে।

ভদ্র-কুলের বিধবারা স্বামীর অবর্ত্তমানে যেমন নিরুপায়, নিচজাতীয়া সধবারা স্বামীর বর্ত্তমানে ঠিক তেমনি নিরুপায়। কিন্তু তাহাদের বিধবার অবস্থা ভাল। কারণ, নীচ-ঘরে স্ত্রীলোকেরা বিধবা হইলে আর বড় কাহাকেও মিথ্যা ভয় করিয়া চলে না—অনেকটা স্বাধীন। তাহারা হাটে-বাজারে যায়, পরিশ্রম করে, ধান ভানে, প্রয়োজন হইলে দাসীবৃত্তি করে। সুতরাং সৎ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করা তাহাদের পক্ষে সহজ,—তাহারা তাই করে, কুলত্যাগ করিবার আবশ্যক হয় না, করেও না। অথচ, তাহাদের সধবার পক্ষে সে পথ বন্ধ। স্বামী বিদ্যমানে, সে না পায় দুঃখ-মেহন্নত করিতে, না পায় খাইতে পরিতে। স্বামী ভাত-কাপড় যোগাইতে পারে না, যাহা পারে তাহা শুধু মার-ধোর করিয়া শাসন করিতে। ঐ যে কথা আছে, "ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই"। কথাটা বাঙলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে

কতদূর সত্য, এবং কত বড় দুঃখেই যে ছড়াটার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। আবার ভদ্র-ঘরের বিধবার অবস্থা ঠিক নীচজাতীয়া সধবার অনুরূপ। তাহাকেও স্বাধীনভাবে কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহাতে পিতৃকুলের বা শ্বশুরকুলের মর্য্যাদা হানি হয়, অথচ বাড়ির মধ্যে ভদ্র-বিধবার অবস্থা কাহারো অবিদিত নাই। আমিও ইতিপূর্ব্বে তাহা একাধিকবার বলিয়াছি। অতএব দেখিতে পাওয়া যায়, শতকরা সত্তরজন হতভাগিনী অন্ন-বস্ত্রের অভাবে এবং আত্মীয়-স্বজনের অনাদর, উপেক্ষা, উৎপীড়নেই গৃহত্যাগ করে, কামের পীড়নে করে না। এবং এই জন্যই কুলত্যাগিনীদের মধ্যে বিধবা অপেক্ষা সধবার সংখ্যাই অধিক। অথচ কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়াই পুরুষ ধরিয়া লইয়াছে, কুলত্যাগ শুধু বিধবাতেই করে, অতএব অদ্ভুত বিধি-নিষেধের দ্বারা তাহাকে শাসন করাই ঠিক কাজ। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে কুলত্যাগ যে পতিযুক্তারাই অধিক করে, এবং তাহা পুরুষেরই অত্যাচার-উৎপীড়নের ফলে, এ-কথা কোন্ পুরুষ স্বীকার করিতে সম্মত হইবে? একদিকে পুরুষ যেমন দারিদ্র্য ও কল্পনাতীত উৎপীড়নে নারীর স্বাভাবিক শুভবুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, অন্যদিকে তেমনি তাহাকেই আপাতমধুর সুখের প্রলোভনে প্রতারিত করিয়া ঘরের বাহির করিয়া আনে। পুরুষের ভয় নাই, সে যদিচ্ছা সুখ ভোগ করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারে। তাই সে ফিরিয়া গিয়া দিন-দুই ঘরের কোণে অনুতপ্তভাবে বসিয়া থাকে, আত্মীয়-স্বজন তাহার পুনরাগমনে খুশী হইয়া সাহস দিয়া বলিতে থাকে, "তার আর কি? ও অমন হইয়া থাকে,—পুরুষের দোষ নেই। এস বাহিরে এস।" সেও তখন হাসিমুখে বাহির হয় এবং গলা বড় করিয়া প্রচার করিতে থাকে, নারীর পদস্খলন কিছুতেই মার্জ্জনা করা যাইতে পারে না।

ঠিক ত! যে কারণেই হোক, যে নারী একটিবার মাত্রও ভুল করিয়াছে, হিন্দু তাহার সহিত কোন সংশ্রব রাখে না। ক্রমশঃ ভুল যখন তাহার জীবনে পাপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তিল তিল করিয়া যখন তাহার সমস্ত নারীত্ব নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া যায়—যখন সে বেশ্যা—তখন, আবার তাহার অভাবে হিন্দুর স্বর্গও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। এতই তাহার প্রয়োজন। দেশের লোক আদর করিয়া যেমন শ্রীকৃষ্ণের 'কালো সোনা,' 'কালো মানিক' প্রভৃতি অষ্টোত্তর-শতনাম দিয়াছিল, সংস্কৃত-সাহিত্যেও বোধ করি বেশ্যার আদরের নাম তার চেয়ে কম নয়। এই সকল হইতেই বুঝিতে পারা যায়, স্বার্থপরতা ও চরিত্রগত পাপ-বুদ্ধি নর-নারী কাহার অধিক। এবং সমাজ হইতে এই পাপ বহিষ্কৃত করিতে হইলে শাস্ত্রের কড়া আইন-কানুন কাহার সম্বন্ধে অধিক থাকা উচিত, এবং সামাজিক জীবন বিশুদ্ধ রাখা উদ্দেশ্য হইলে নর-নারীর কাহাকে অধিক চোখে-চোখে রাখা কর্ত্তব্য, এবং শাস্তি কাহাকে অধিক দেওয়া

আবশ্যক। অথচ, সমাজ নারীর ভুল-ভ্রান্তি এক পাইও ক্ষমা করিবে না, পুরুষের ষোল-আনাই ক্ষমা করিবে। হেতু? হেতু শুধু গায়ের জোর। হেতু শুধু সমাজ অর্থে 'পুরুষ', 'নারী' নয় বলিয়া। কাজটা ঘৃণার কাজ, তাই পুরুষ নারীকে ঘৃণা করে। তাহাকে ঘৃণা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু নারীকে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। পুরুষ যতই ঘৃণ্য হউক, সে স্বামী! স্বামীকে ঘৃণা করিবে স্ত্রী কি করিয়া? শাস্ত্র যে বলিতেছেন, তিনি যেমনই হউন না, সতী স্ত্রীর তিনি দেবতা। এবং এই দেবতাটির মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পদপঙ্কজ ক্রোড়ে করিয়া অনুগমন করা আবশ্যক। অন্ততঃ এ-যুগে তাঁহারই পদপঙ্কজ স্মরণ করিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকাতেই যথার্থ নারীত্ব।

কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক তর্কের অবতারণা করিয়া বলেন, ভবিষ্যৎ বংশধরের ভালো-মন্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে নারীর ভুল-ভ্রান্তিতেই ক্ষতি হয়, পুরুষের হয় না। অথচ চিকিৎসকেরাই বিদিত আছেন, কত কুলস্ত্রীকেই না অসতীর পাপ ও কুৎসিত ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এবং কত শিশুকেই না চিররুগ্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং সারা-জীবন ধরিয়া পিতৃ-পিতামহের দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। অথচ, শাস্ত্র এ-সম্বন্ধে অস্পষ্ট, লোকাচার নির্ব্বাক্, সমাজ মৌন! তাহার প্রধান কারণ এই যে, শাস্ত্র-বাক্যগুলা সমস্তই প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। পুরুষের ইচ্ছা এবং অভিরুচিই আসল কথা, এবং তাহাই সমাজের যথার্থ সুনীতি। মনু, পরাশর, হারীত, মিথ্যাই ইহাদের দোহাই পাড়া। এই যে পুরুষ চোখের উপরেই অন্যায় অধর্ম্ম করিবে, অথচ সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহার স্ত্রী কথাটি মাত্র বলিতে পারিবে না (শাস্ত্র-বাক্য!), এমন কি, তাহার বীভৎস জঘন্য ব্যাধিগুলা পর্য্যন্ত জানিয়া শুনিয়া নিজ দেহে সংক্রমিত করিয়া লইতে হইবে, এর চেয়ে নারীর অগৌরবের কথা আর কি হইতে পারে?

তথাপি অন্যান্য দেশে আছে, divorce—তথাকার রমণীর কতকটা উপায় আছে, কিন্তু আমাদের এই যে স্বয়ং-ভগবানের দেশ, যে দেশের শাস্ত্রের মত শাস্ত্র নাই, ধর্ম্মের মত ধর্ম্ম নাই, যেখানে জন্মাইতে না পারিলে মানুষ মানুষই হয় না, সে দেশের নারীর জন্য এতটুকু পথ উন্মুক্ত রাখা হয় নাই। এ-দেশের পুরুষ রমণীকে হাত-পা বাঁধিয়া ঠেঙ্গায়, সে বেচারী নড়িতে চড়িতে পারে না। তাই পুরুষ বাহিরে আস্ফালন করিয়া বলিতে পায়, এ-দেশের নারীর মত সহিষ্ণু জীব জগতের আর কোথায় আছে?

নাই, তাহা মানি। কিন্তু যেজন্য নাই, সে কারণটা কি পুরুষের বড়াই করিবার মত? বিদেশের সংবাদ-পত্রে যেই খবর বাহির হয়, অমুক অমুকের সহিত স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ছেদ করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে, স্বদেশী কাগজওয়ালার

তখন আর আহ্লাদ ধরে না—চেঁচাইয়া সে গলা ফাটাইতে থাকে, দেখ, চেয়ে দেখ, বিলাতী সভ্যতা!

তাহাদের মনের ভাব এই যে, পরের দোষগুলা প্রচার করিতে পারিলেই নিজেদের গুণগুলা মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবে। Divorce জিনিসটা যে বাঞ্ছনীয় নয়, সে কথা তাহারাও বোঝে, কিন্তু মার খাইয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে না—মারামারি করে। মারামারি জিনিসটা নিঃশব্দে হইবার বস্তু নয়, তাই সে-কথা বাহিরের লোকে শোনে, এবং তাই শত্রুপক্ষ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিবার অবকাশ পায়। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে-কারণে ও-অঞ্চলে এ মোকদ্দমা রুজু হয়, সে-কারণ কি হিন্দুর ঘরে ঘটে না? আমার বিশ্বাস, যে অতিবড় নির্লজ্জ, সেও বোধ করি না বলিবে না। যদি তাই হয়, তবে আহ্লাদ করিবার হেতু কোনখানে থাকে? মোকদ্দমাই কি আসল বস্তু, কারণটা কিছু নয়? ও-দেশেও এক সময় divorce ছিল না, কিন্তু মধ্য-যুগের অকথ্য হীনতার মধ্যে পড়িয়াই এক সময় তাহাদের চৈতন্য হইয়াছিল। Church's irrational rigidity as regards divorce tended to foster disorder and shame. Sexual disorder increased. Woman became cheaper in the esteem of men, and the narrowing of her interest to domestic work the desire to please men proceeded apace. শাস্ত্রের এই গোড়ামি নারীজাতিকে যে কত দুঃখে, কত নীচে নামাইয়া আনিয়াছিল, আচার্য্য K. Pearson তাঁহার Ethic of Free Thought গ্রন্থে অনেক রকমে তাহার আলোচনা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন—নারী মাত্রকেই একবার তাহা পড়িতে অনুরোধ করি।

কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে যেন এমন ভুল না বুঝা হয় যে, আমি divorce বস্তুটাকেই ভাল বলিতেছি। মারামারি জিনিসটাও ভাল জিনিস নয়, সমাজের মধ্যে ওটা ঘটিতে থাকে এ কামনা নিশ্চয়ই কেহ করে না, কিন্তু স্ত্রী-ত্যাগ বলিয়া একটা ব্যাপার যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন উভয় পক্ষেই ও জিনিসটা কেন থাকা উচিত নয়, তাহা বলিতে পারি না।

অবশ্য পুরুষ এ-কথা কিছুতেই মানিবে না যে, তাহার মত ত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাহার স্ত্রীরও থাকে! কিন্তু কেন থাকিবে না, কেন অন্যান্য দেশের নারীর মত এই ন্যায্য অধিকার তাহাকে দেওয়া হইবে না, ইহারও সে কোন সঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না, শুধু জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব দিবে, "দূর,—এও কি একটা কথা!"

এটা কথা নয়, কারণ তাহার অপরাধ করিবার অবাধ স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়, ইহা

সে চাহে না। বিশেষ করিয়া এ-দেশের পুরুষ, যে নিজে কাপুরুষ, ভীরু,—অন্যান্য দেশের পুরুষের তুলনায় যে নারীর মতই নিরুপায়, যে নারীর কাছে পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যথার্থ ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত, সে কাপুরুষের মত তাহার অপেক্ষা দুর্ব্বল ও নিরুপায়কেই পীড়ন করিয়া কর্ত্তৃত্ব করায় আনন্দ উপলব্ধি করিতে চাহিবে, তাহা স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার নহে। সে যে মরিয়া গেলেও স্বেচ্ছায় এ অধিকারের এক পাইও ছাড়িয়া দিতে চাহিবে না, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। সে যে শাস্ত্র আওড়াইবে, বিজ্ঞানের দোহাই পাড়িবে, সুনীতির ছদ্ম অভিনয় করিবে, তাহাও জানা কথা। কিন্তু নারীরও বুঝিয়া দেখার সময় হইয়াছে। যে পুরুষ স্ত্রীকে পথে রক্ষা করিতে পারিবে না জানিয়াই শাস্ত্র বানাইয়াছে, 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা,' তাহার শাস্ত্রের ততটুকু মূল্যই দেওয়া উচিত এবং ইহাই সুবিচার।

আমার মনে হইতেছে, আমার কথাগুলা পুরুষদিগের ভাল লাগিতেছে না, এবং অন্তঃপুরেও এগুলা পৌঁছায়, ইহাও তাহাদিগের ইচ্ছা হইতেছে না। কিন্তু যেদেশে অর্থশূন্য অত্যাচার-অবিচারের একটা সীমা পর্য্যন্ত নাই, সেদেশে কোন-না-কোনদিন নারী কারণ জানিতে চাহিবেই, পুরুষ তাহা পছন্দ করুক, আর নাই করুক। ফ্রান্সের নেপোলিয়নও একদিন ম্যাডাম কন্‌ডোরসেটকে বলিয়াছিলেন, I do not like woman to meddle with politics. তাহাতে ম্যাডামও জবাব দিয়াছিলেন, You are right General, but in a country where it is the custom to cut off the heads of women, it is natural that they should wish to know the reason, why.

মানুষ যখন মানুষ হইয়া উঠে নাই, তাহার পূর্ব্বেও সে যে কার্য্য-কারণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের আভাস পাইয়াছিল, আজকাল পণ্ডিতেরা তাহা আর অস্বীকার করেন না। সে যখন শামুক ছিল, তখনই অকস্মাৎ মেঘের ছায়ায় সূর্য্যের আলো মলিন দেখিয়া ভয়ে মুখ বুজিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল,—সে টের পাইয়াছিল ছায়া শুধু ছায়া নয়, তার সঙ্গে আর কিছু একটা আসিতেছে। যে আসিতেছে সে প্রবল, সে সন্নিকটবর্ত্তী, হয়ত অপকার করিবে এই তার ভয়। ছায়ার কারণ দেখিয়া সে কার্য্য অনুমান করিয়াই দুর্গদ্বার আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেই জীবের ক্রমোন্নতি-ব্যাপার জগতে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবার পরে মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যতগুলি পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই একটা কথা পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে যে, মানুষের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি ঠিক তাহার শরীরের মত ধীরে ধীরে উন্নত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ পশু অপেক্ষা যদিচ সব বিষয়ে মানুষ খুবই বড় হইয়াছে, তবুও একটা সম্পর্কের টান যে রহিয়াই গিয়াছে তাহাকে কোনমতেই না করিবার পথ নাই। এই পার্থক্য পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নহে। সেই সত্যটা বুঝিয়া লইয়া যদি সন্ধান করা যায়,

যাহাকে আমরা পশু বলি তাহাদের মধ্যে নারীর মূল্য আছে কি, না? দেখা যায় আছে। দুটো সিংহ প্রাণান্তকর যুদ্ধ করিতে থাকে, সিংহীটা চুপ করিয়া লড়াই দেখে। যে জয়ী হয়, ধীরে ধীরে তাহার সহিত প্রস্থান করে, একবার ফিরিয়াও চাহে না অপরটা মরিল কি বাঁচিল। অতঃপর এই সিংহমিথুন কিছু কাল এক সঙ্গে বাস করে, তার পর সিংহী যখন আসন্নপ্রসবা তখন ইহারা পৃথক হয়—সন্তান লালন-পালন ও রক্ষা করার ভার একা জননীর উপরই পড়ে। সিংহ মহাশয় সন্তানের কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেন না, বরঞ্চ সুবিধা পাইলে সংহার করিবার চেষ্টাতে ফিরিতে থাকেন। বাঁদর ও গেরিলার মধ্যেও প্রায় অনুরূপ প্রথা দেখা যায়। ইহাতে লাভ এই হয় যে, এমন জাতি ধ্বংসের মুখেই অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে অনুকূল কারণ না থাকিলে, গহন-বনে বা অতি নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরে সন্ততি-রক্ষার আশ্রয় না মিলিলে আমরা বোধ করি এই পশুগুলোর নাম পর্য্যন্তও জানিতে পারিতাম না। তাহারা বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই ঘটনাটা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই একটা আশ্চর্য্য আত্মঘাতী ব্যাপার চোখে পড়ে। এই পশু বংশবৃদ্ধির নৈসর্গিক তৃষ্ণা ও উত্তেজনার বশে লড়াই করিয়া প্রাণ দেয়, অথচ ইহারই শেষ সফলতার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখে না। তা ছাড়া আরো একটা কথা এই, যে জন্তুটা প্রাণ দেয়, সে নিজের অসহ্য প্রবৃত্তির যূপকাষ্ঠেই কণ্ঠচ্ছেদ করে, নারীর জন্য নারীর পদমূলে আত্মবিসর্জ্জন করে না। অতএব মূল্য যদি এখানে কিছু থাকে ত সে তাহার নিজের প্রবৃত্তির, নারীর নয়। এই দুটো কথা মনে রাখিয়া পশুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া মানুষের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াও এই ব্যাপারের অসদ্ভাব ঘটে না, এবং আজ এই পাশব প্রবৃত্তিকে নিজেদের সমাজে যত ইচ্ছা বড় বলা হউক না কেন, এবং নর-নারীর স্বর্গীয় প্রেমের জন্মভূমি যতবড় স্বর্গেই নির্দ্দেশ করা থাক্ না কেন, তাহা সত্য নয়, নিছক কল্পনা মাত্র। আমি গোটা-দুই দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই বলিতেছি। কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে এ-কথাটাও বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখি যে, ক্রমোন্নতির ফলে নর-নারী সহস্রমুখী স্নেহ-প্রেমের যে মধুর চিত্র বাল্মীকির হৃদয়ে, ব্যাসের হৃদয়ে, কালিদাসের হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বজগতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় বস্তু অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়। নীচ-কুলে জন্ম বলিয়া আর তাহাকে উপেক্ষা করা যায় না। কোহিনুরকে পাথুরে কয়লার খোঁটা দিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকে ভূতের ভয়ের লজ্জা দিয়া তাহার যথার্থ মূল্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা কিছুতেই চলে না। এ-সকল আমি জানি। এবং জানি বলিয়াই ইহার জন্মের কথা তুলিয়াছি, এবং ধীরে ধীরে এই মূল্য যে আজ যথার্থ কতবড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা মানবের আদিম-যুগের ইতিহাসের দিকে চাহিয়া পরিমাণ করিতে আহ্বান করিতেছি। কি করিয়া

পাশব বৃত্তি অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় প্রেমে, পাতিব্রত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে, কি করিয়া নরের প্রবৃত্তির মানদণ্ডে প্রথম পরিমিত নারীর মূল্য একদিন ভাবুকের হৃদয়ে অপরিমেয় দেবতার মূল্যে এক আসন পাতিয়াছে এবং সেই তাহার যথার্থ স্থান কি না, তাহা দেখিতে গেলে সাহসপূর্ব্বক গোড়া হইতে দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। চোখ বুজিয়া যাহা অভিরুচি হয় বলিব, যাহা খুশি শাস্ত্র বানাইব, যথা ইচ্ছা দাম দিব, এই শুধু বলবানের গায়ের জোরে করা যায়, সত্যের জোরে, ন্যায়ের জোরে করা যায় না। মূল্যের একটা নৈসর্গিক নিয়ম আছে, সেও যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় ও একমাত্র নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে বাড়াইলে-কমাইলে শেষ পর্য্যন্ত যে সুফল ফলে না, সেন-রাজার কৃত্রিম কুলীন-করা বামুনের দাম যে ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে নাই, পেরুর ইঙ্কার জোর-করা আভিজাত্য যে তাহাকে ধ্বংস না করিয়া ছাড়ে নাই, এই সত্য যে-কেহ লোক বা যে-কোন জাতি, আলস্য অজ্ঞান বা দম্ভের জোরে অস্বীকার করিবে, সে-ই যে কক্ষভ্রষ্ট উপগ্রহের মত অনিবার্য্য মৃত্যুর পথেই দিন দিন ধাবিত হইবে, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই।

এই সত্য সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় জগতের আদিম মানবজাতির রীতি-নীতির দিকে চাহিয়া দেখিলে। ইতিপূর্ব্বে আমি মুখ্যতঃ সভ্য-জাতির সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি; তাহারা নারীর মূল্য কোথায় ধার্য্য করিয়াছে, তাহাই নিরূপণ করিবার প্রয়াস করিয়াছি, এইবার দেখিতে চাহি, যে মানুষ এখনও সুসভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারা নারীর মূল্য কি দিয়াছে।

মূল্য কি করিয়া দেওয়া যায়? আমেরিকার অসভ্য চিপিওয়ানদের সম্বন্ধে হারবার্ট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, "men wrestle for any woman to whom they were attached." বেশ কথা। আবার ইহাদের সম্বন্ধেই হার্ন সাহেব শত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-মহাসমুদ্র ভ্রমণ-কাহিনীর একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, ইহারা নিজের জননীকে (বিমাতা নয়) সুন্দরী বিবেচনা করিলে পিতার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করে। এবং ইহাদের সম্বন্ধেই হারবার্ট স্পেন্সরের (Descriptive Sociology) সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে এক স্থানে লেখা আছে, "in the Chippewayan tribes divorce consists of neither more nor less than a good drubbing and turning the woman out of doors." অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা 'fight with spears for possession of a woman.' আমেরিকার ডগ্‌রিব জাতিরা 'fight just like stags.' আমেরিকার মন্ত্র জাতিরা 'fight like natural enemies.' অথচ ডগ্‌রিব জাতিরা স্ত্রীকে 'use like beast of burden'; এবং এক একজন মন্ত্র জীবনে ৪০।৫০ বার বিবাহ করে। অতএব দেখা যায়, এই অসভ্যদিগের স্ত্রী-লাভের যুদ্ধ ও বন্য পশুর নৈসর্গিক প্রবৃত্তি, ত্যাগ করার

প্রয়োজনও ঠিক তাহাই। নারীর মূল্য এখানে এক কানাকড়িও নাই। নারীও তেমনি। স্বামী যুদ্ধে শেলবিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইবামাত্রই তাহার পতিব্রতা স্ত্রী নিজের জিনিস-পত্র মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে বিজেতার অনুসরণ করে। এখানে বন্য পশুর মত নর-নারীর বিশেষ কোন সম্পর্কও নাই; কাহারো কাছে কাহারো মূল্যও নাই। উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু যখন নিজের জননীকে অপরিচিত ব্রাহ্মণের দ্বারা বলপূর্ব্বক আকর্ষিত হইতে দেখিয়া পিতাকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে, মাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? ইহাও সমাজের সেই অবস্থা। এই অবস্থায় স্ত্রীলোক-মাত্রেই পুরুষের সম্পত্তি—যে যতক্ষণ জোর করিয়া দখল রাখিতে পারে, ততক্ষণই, আবার ভাল না লাগিলে ছাড়িয়া দেয়,—ভাবটা, যাও, চরিয়া খাও। ইহার পরের অবস্থা পলিনেসিয়া, নিউ কালিডোনিয়া এবং ফিজিদ্বীপের অসভ্যদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। স্ত্রী-লাভের জন্য ইহারা লড়াই করে, এবং নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করিয়াও যাহাকে পছন্দ হয় তাহাকে ঘরে আনে। কিন্তু পছন্দ গত হইবার পরে, অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হইলে আর তাড়াইয়া দেয় না—এডমিরাল ফিজরয়, হম্বোল্ট, উইল্কেস্ প্রভৃতি অনেকেই বলিয়াছেন, মারিয়া খাইয়া ফেলে। যাক, ইহাকে নিতান্ত মন্দ ব্যবস্থা বলা যায় না। তাহার পরের অবস্থা যখন হইতে স্ত্রীলোক সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—Spencer সাহেবের Principles of Sociology হইতে তুলিয়া দিতেছি—a Chippewayan chief said to Hearne. "women were made for labour, one of them can carry, or haul as much as two men can do." ঐ গ্রন্থে ব্যারো সাহেবের Interior of Southern Africa হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, "the woman is her husband's ox, as a kaffir once said to me—she has been bought, he argued, and must therefore labour. স্টার সাহেব লিখিয়াছেন, "a Kaffir who kills his wife can defend himself by saying I have bought her once for all." একটু সামান্য উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় অসভ্য মাপুচি জাতির মধ্যে, "a Mapuchi widow by the death of her husband becomes her own mistress unless he may have left grown-up sons by another wife, in which case she becomes their common concubine, being regarded as 'a chattel naturally belonging to the heirs of the estate." জগতের অধিকাংশ স্থানে ইহাই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অবস্থা। Old Testament-এর লেভির চিনাদের বিধবা পুত্রবধূকে অপরের কাছে বিক্রয় করা (কন্যার পিতা বিক্রয়লব্ধ মূল্য ফিরাইয়া দিতে অক্ষম হইলে), হিন্দুর বিধবা পুত্রবধূর উপর শ্বশুরকুলের সম্পূর্ণ অধিকার ইত্যাদি সম্পত্তিবাচক। Vera Paz-এর আদিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে ইনিই লিখিয়াছেন, "the brother of the

deceased at once took her (the widow) as his wife even if he was married and if he did not, *another relation had a right to her.*" অর্থাৎ সম্পত্তি কিছুতেই বেহাত হইতে পায় না। সংসারে শতকরা নব্বইটা জাতির সম্বন্ধে কম-বেশি এই উক্তি বর্ণে বর্ণে প্রয়োগ করা যায়। আমেরিকার বোস্টন সহরের মত স্থানেও ১৮৫০ অব্দ পর্য্যন্ত নারীর স্থান কোথায় ছিল, History of Women's Suffrage হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; উক্ত গ্রন্থে নারী বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাহার সমস্ত সম্পত্তি ভাবী স্বামীকে লিখিয়া দিবার পরেও 'she was not a person,' 'not recognised as a citizen', 'was little better than a domestic servant.' "By the English common law her husband was her lord and master," "he could punish her with a stick," "the common law of the state of Massachusets held man and wife to be one person, but that person was the husband," "she had no personal rights, and could hardly call her soul her own," অথচ আমেরিকার নারীজাতির আশ্চর্য্য স্বাধীনতার কথা কতই না শোনা যায়! সেদেশেও এদেশের মত লাঠিবাজি ছিল এবং নালিশ করিয়াও প্রতিকার হইত না।

এইখানে একটা প্রশ্ন মনে উঠে; সংসারে মানবজাতির কোন্ অবস্থায় নারীর উপর প্রথম নির্য্যাতন শুরু হইয়াছিল? মানুষ যখন পশুর মত ছিল,—তখন হইতে, না কতক মানুষের মত হইবার পর হইতে? এ-সম্বন্ধে কোন সমাজতত্ত্ববিদ্ই ঠিক কিছু বলিতে পারেন না। পারিবার কথাও নয়। কারণ প্রত্যেক জাতির মধ্যেই, তিনি সুসভ্যই হোন, আর অসভ্যই হোন, নর-নারীর সম্বন্ধটা এতই জটিল, এতই রহস্যে ঢাকা যে, বাহিরের লোকের বাহির হইতে দেখিয়া কিছুতেই তাহা ঠিক করিয়া বলিবার জো নাই। স্পেন্সর যখন প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত অসভ্যেরাই নারীজাতিকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেয়, তখন তিনি নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছিলেন, এবং তখন অনেকেই সে কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি অনেক পণ্ডিতই তাহাতে ধীরে ধীরে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। বস্তুতঃ নর-নারীর সম্বন্ধটা কিছুতেই এমন হইতে পারে না যাহাতে extreme and unmitigated opression, constantly subjected to unimaginable cruelty and violence by the savage খাঁটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়। এমন হইলে সংসারে মানবজাতিই লোপ পাইত। এই সত্যটা সমস্ত আলোচনার মধ্যে মনে করিয়া না রাখিলেই ভুল হইবে। তবে তাঁহারও কথাটা যে বারো-আনা সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরন্তু, Hoddon সাহেব যে জোর করিয়া তাঁহার Head Hunters গ্রন্থে বলিয়াছেন, by no means down-trodden

or ill-used, সে-কথাটাও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। যদিও তাঁহার এই কথাটার অনুকূলে কয়েটা অসভ্য জাতির মধ্যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা, ভারতের খাসিয়া রমণীরা বিরক্ত হইলে স্বামীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নিকারাগুয়া ও টাহিটির স্ত্রীলোকেরাও স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় বিবাহ করে। আপাচ জাতিরা লড়াইয়ে হারিয়া আসিলে স্ত্রীরা স্বামীদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না। ডায়েক যুবকেরা এবং আমাজনের পাশীরা যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পায় না। নর-মাংসাহারী কাবির-জাতিরা পুরুষ মারিয়া খাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের মাংস খাইতে পায় না। আরবদেশের শেখেরা স্ত্রীলোকের সুমুখে দাঁড়াইয়া তীব্র চাবুকের আঘাত দাঁত বাহির করিয়া সহ্য করিতে না পারিলে যুবতীর হৃদয় অধিকার করিতে পারে না, এবং আরো কয়েকটা জাতির মধ্যে, যথা, সুমাত্রা-দ্বীপের বাটা প্রদেশে, আফ্রিকার সুবর্ণ উপকূলের নিগ্রোদের মধ্যে, আমেরিকার পেরুর অসভ্য জাতির মধ্যে এবং আরও কয়েকটা আদিম জাতির মধ্যে, বোধ করি আমাদের দেশের টোডাদের মধ্যেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার রমণীর দিক দিয়াই হয়, পুরুষের দিক দিয়া হয় না। এ-সকল উদাহরণ থাকা সত্বেও রমণীরা চিরদিন যে নিপীড়িত হইয়াই আসিতেছে, তাহা সহস্র প্রকারের উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায়। রমণীরা যে সম্পত্তির মধ্যেই পরিগণিত হইত, তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেক প্রকারে বলিয়াছি, এবং এইজন্যই সম্পত্তির উত্তরাধিকার নারীর দিক দিয়াই আসিয়াছিল। একটা স্ত্রীকে লইয়া চার-পাঁচবারেরও অধিক কাড়াকাড়ি হইয়া যাইত, সুতরাং তাহার গর্ভের সন্তান যে কোন্ বংশের তাহা স্থির করিবার উপায় ছিল না; এই হেতুই নিজের স্ত্রীর সন্তান বিষয় পাইত না, বিষয় পাইত ভগিনীর সন্তান। তাহাকে লইয়াও যে কাড়াকাড়ি হইত না তাহা নহে, কিন্তু হাজার কাড়াকাড়ি হইয়া গেলেও ভগিনীটি যে অন্ততঃ নিজের বংশের এবং তাহার গর্ভের সন্তান যে কতকটা নিজের বংশেরই হইবে সে-বিষয়ে তাহারা নিঃসন্দেহ ছিল। এই হেতু ভাগিনেয় বিষয় পাইত, পুত্র পাইত না। বিষয় যেই পাক, উত্তরাধিকার স্থির করিত পুরুষেরা, নারীর তাহাতে কিছুমাত্র হাত ছিল না। মানুষের বুদ্ধির তারতম্য-হিসাবে ছাগলের গলা ডান দিক ঘেঁসিয়াই কাটা হোক, কিংবা বাঁ দিক ঘেঁসিয়াই হোক, ছাগলের ভালোমন্দ তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হয় না। বোধ করি এই কারণেই টাইলার সাহেব সুবর্ণ উপকূলের নিগ্রোদের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন যে, বাহির হইতে নারীর অবস্থা 'officially superior' দেখাইলেও 'practically very inferior.' আমার মনে হয়, সব জাতির মধ্যেই এই ইঙ্গিত খাটে। Crawley সাহেব সম্প্রতি তাঁহার Mystic Rose গ্রন্থে নারীর উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে পাপুয়ানদের কথা তুলিয়া এই যে একটা তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন যে, ইহাদের নারী-নির্য্যাতন করা সম্বন্ধে যথেষ্ট দুর্নাম থাকিলেও, এই যে একটা প্রথা

আছে, নারীরাই স্বামী মনোনীত করে এবং বিবাহের প্রস্তাব তাহারাই করিতে পারে, পুরুষে পারে না, এই প্রথাটাই তাহাদিগের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। কথাটা বাহির হইতে মন্দ না শুনাইলেও বিপক্ষে বলিবারও বিস্তর আছে। প্রথম এই যে, মনোনীত করে বলিয়াই যে পুরুষের কাছে নিপীড়িত হয় না, তাহার কোন সঙ্গত হেতু নাই। যাহাদের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ের কিছুমাত্র ধারণা নাই, যাহারা কথায় কথায় স্ত্রী-হত্যা করে, তাহাদের মধ্যে নারীর এই একটুখানি ক্ষমতা পরিশেষে তাহাদিগের যে বিশেষ কোন কাজে আসে বলিয়া মনে হয় না। রেভারেণ্ড স্টার সাহেব বলেন, নারীর অনেকটা মান-মর্য্যাদা আফ্রিকার কঙ্গো এবং উগাণ্ডা প্রদেশে আছে। বস্তুতঃ সেদেশে রমণী রাণী পর্য্যন্ত হয়। অথচ Captain Speke তাঁহার Discovery of the Source of the Nile গ্রন্থে কঙ্গো ও উগাণ্ডা দেশের ওয়াহুমা বড় লোকেরা কি করিয়া কথায় কথায় প্রায় বিনা অপরাধে স্ত্রী-হত্যা করে, নিজের হাতে আঁকিয়া তাহার ছবি পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছেন; ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হাতে দড়ি বাঁধিয়া স্ত্রীগুলিকে বধ্যভূমিতে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহারা যেভাবে উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে যায়, শুনিলে অতি বড় পিশাচেরও দয়া হয়, অথচ সে-দেশের পুরুষগুলি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। গ্রন্থকারের তাঁবুর পার্শ্বের পথের উপর দিয়া তাই প্রায়ই বামা-কণ্ঠে কান্না উঠিত—"হে মিয়াঙ্গি, হে বাকা!" "ও আমার স্বামী! ও আমার রাজা!" স্বামী এবং রাজাটি বোধ করি তখন মৃদু-মধুর হাস্য করিতেন। সেই দেশের রাজা কিনেরার মৃত্যুর অব্যবহিত পরের ঘটনাগুলি যাহা কাপ্তেন স্পিক তাঁহার পুস্তকে চোখে দেখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, শিশুরা মাটির পুতুলের যে মূল্য দেয় সে মূল্যও তথাকার পুরুষেরা নারীকে দেয় না। একস্থানে লেখা আছে, মৃত পিতার সমস্ত কন্যাগুলিকেই ছোট রাজা বিবাহ করিলেন, এবং সাতদিন পরে তাহার তিনটিকে ঠিকমত ওাজিগ (সেলাম) না করার অপরাধে জীবন্ত দগ্ধ করিলেন। প্রায় পর্য্যটকই পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ভালবাসার ব্যাপার অধিকাংশ অসভ্য জাতিরাই অবগত নহে। মনটেরো বলেন, "The Negro knows not love, affection or jealousy, they have no words or expression in their language indicative of affection or love." সার জন লবক ঐ-দেশেরই সম্বন্ধে বলেন, 'are so cold and indifferent to one another that you would think there was no such thing as love between them." কাফ্রিদের সম্বন্ধে "no feeling of love in marriage." আরিবনের সম্বন্ধে "affection between man and wife out of the question." অথচ ইহাদিগের মধ্যেই নারীর পতিপ্রেম, স্বামী-সেবার

কথা শোনা যায় না, তাহা নহে। হইতে পারে জবরদস্তির চোটে, সে যাই হোক, অতিশয় নিষ্ঠুর ডাহোমান, মালগাসি, ফিজিয়ান, ছিপা, বেচুয়ানা, ইহাদের সকলের মধ্যেই পতিব্রতা স্ত্রী পাওয়া যায়। ডাহোমি ও ফিজি-দ্বীপে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা আত্মহত্যা করে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমেরিকার মণ্ডান জাতির বিধবারা মৃত স্বামীর কপাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গলায় মালা করিয়া গাঁথিয়া রাখে, রাত্রে মুণ্ডটাকে বিছানায় লইয়া শয়ন করে, স্নান করাইয়া দেয়, আহার করায়, শীতের দিনে কাঁথা চাপা দিয়া রাখে, এমন কি গান গাহিয়াও তাহাকে ঘুম পাড়ায়। অথচ পুরুষেরা জীবিত অবস্থায় কি কীর্তিই না করিয়া যান! তবে এমন কথাও বলিতেছি না যে, সর্ব্বত্রই পুরুষেরা ক্রমাগত অত্যাচার করিয়াই চলে, এবং তৎপরিবর্ত্তে রমণীরা কেবল ভালবাসিতে, সেবা করিতেই থাকে। এমন কথা বলিলে মানবের স্বভাবের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়; তবে কোন কোন স্থানে দারুণ অত্যাচার-অবিচারের পরিবর্ত্তেও যদি স্নেহ-প্রেম সম্ভবপর হয়, তাহা রমণীতেই হয়, এবং সে দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে নির্ম্মম অসভ্য মানব-সমাজেও যে দুর্লভ নয়, তাহাই গোটা-দুই দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলাম মাত্র। নারীর এই মূল্য পুরুষ স্বীকার করিতে চাহে না এবং করে না, তাহা বহুবিধ প্রকারেই বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য ইহার প্রতিকূলেও কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে, তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইলেও এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য তিলার্দ্ধও বিচলিত হয় না।

সে যাই হোক, আমি এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা এই যে, প্রায় কোন দেশেই পুরুষ নারীর যথার্থ মূল্য দেয় নাই, এবং তাহাকে নির্য্যাতন করিয়াই আসিতেছে। নির্য্যাতন করিয়া যে আসিতেছে সে-কথা অস্বীকার করিবার পথ নাই, কিন্তু ন্যায্য মূল্য হইতে যে চিরদিন বঞ্চিত করিয়াই আসিতেছে, এই কথাটার উপরেই তর্ক বাধিতে পারে। কারণ, কি তাহার সত্য মূল্য তাহা স্থির না করার পূর্ব্বে বলা চলে না, নারী যথার্থ মূল্য পাইয়াছে কি না। পুরুষ এমন কথাও বলিতে পারে যে, যেদেশে নারী যে মূল্য লাভ করিয়া আসিতেছে, হয়ত সেই দেশে সেই তাহার প্রাপ্য মূল্য। অতএব, এই কথাটা আলোচনা করা আবশ্যক। করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নর-নারীর সম্বন্ধের বিচারই করিতে হয়। সম্বন্ধ মুখ্যতঃ চারিটা। স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা ও জননী,—তাহাই আমি পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা করিতেছি। আদিম মানব কি করিয়া স্ত্রী লাভ করিত, তাহার অনেক তথ্য John F. M'Lennan তাঁহার প্রসিদ্ধ Primitive Marriage গ্রন্থে নানা দেশ হইতে আহরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মানুষ যখন পশুর মত ছিল, তখন কি করিয়া স্ত্রী লাভ করিত, আমি এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই সে ইঙ্গিত একাধিকবার করিয়াছি। সবল দুর্ব্বলের নিকট হইতে কাড়িয়া লইত এবং সখ

মিটিলে ত্যাগ করিত; তাহার সখের কাছে, তাহার স্ত্রী লাভের প্রয়োজনের কাছে সে কিছুই বিচার করিত না; কোন সম্বন্ধই তাহাকে বাধা দিতে পারিত না। M' Lennan একস্থানে বলিয়াছেন, "men must originally have been free of any prejudice against marriage between relations." তাঁহার এ-কথাটা বড় সত্য কথা। Primitive instinct বলিয়া তখন কোন বস্তু ছিল না। মা মেয়ে ভগিনী কিছুই না মানিবার অনেক উদাহরণ শুধু যে অসভ্য আদিম মানবের কাছেই পাওয়া যায় তাহা নহে, অর্দ্ধ-সভ্য ও সুসভ্যের মধ্যেও যাওয়া যায়। অতিশয় সভ্য সমাজেও যে মাঝে মাঝে বীভৎস গোপন কলঙ্কের কথা শোনা যায়, এ-ও যে সেই আদিম মানবের খেলা, তাহা heredity সম্বন্ধে যে-কেহ কিছু আলোচনা করিয়াছেন তিনিই অবগত আছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অসভ্য ছিপিওয়েনরা জননীকে বিবাহ করে। অর্দ্ধ-সভ্য আফ্রিকার গেবুন (Gaboon) প্রদেশের রাণী কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্য হারাইবার আশঙ্কায় নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনের দাবী বজায় রাখিয়াছিলেন। পারস্যের সম্রাট আর্টজারাক্সস্ নিজের রূপবতী দুই কন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুসভ্য প্রাচীন মিশরের ফারাওরা সহোদরাকে বিবাহ করিতেন। সভ্য পেরু প্রদেশের রোকা ইঙ্কার বংশধর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম ইঙ্কা আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য দ্বিতীয় পুত্রের সহিত কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ঋষিও তাঁহার ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লঙ্কা-দ্বীপের অসভ্য ভেদ্দারা ছোট বোনকে বিবাহ করা সবচেয়ে গৌরবের ব্যাপার বলিয়া মনে করে। সমাজে কুলীন বলিয়া তখন তাহার মান বাড়ে। বৈমাত্র ভগিনী ও বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা ত প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। অথচ ইহাদের কেহই এক অসভ্য ভেদ্দা ছাড়া একটিমাত্র স্ত্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না। সকলেই বহুবিবাহ করে। অর্থাৎ, মানুষ ঘরেরটাও পরকে দেয় না, এবং পরেরটাও কাড়িয়া আনে। এখানে যদি মনে করা যায়, উপরে যে-সব কথা বলা হইল, তাহা শুধু ওই-সব দেশ ও জাতির সম্বন্ধে খাটে, অন্যান্য দেশে খাটে না, তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে। সব দেশে এবং সব জাতির সম্বন্ধেই যে ওই কথা খাটে, কোথাও ও-প্রথা লুপ্ত হইয়াছে, কোথাও আজিও প্রচলিত আছে। আমাদের এ-দেশে আজ বড় ভাই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু এই দেশের পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এবং ঠিক স্মরণ হইতেছে না, দীর্ঘতমা ঋষিরাও সাত ভাই বুঝি এক স্ত্রী লইয়াই ঋষি-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এবং ইহাকেই মহাভারতের আদিপর্ব্বে সনাতন প্রথা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং যাহাকে অসভ্যদিগের 'marriage by capture' বলা হয়, তাহার যে বহুল প্রচলন এই সভ্য ভারতভূমেও ছিল, সে

দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নাই। নারী লইয়া এই যে ঘরে-বাইরে টানাটানি, কাড়াকাড়ি, অথচ দুই দিন পরে তাহার কোন দাম নাই—এইটা বুঝাইবার জন্যই নারীর আদিম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আবিসিনিয়ার লোকেরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে সর্দ্দারকে নিজের মাথার পরিবর্ত্তে যুবতী কন্যা কিংবা স্ত্রী দান করিত, এই মূল্যবান উপহার আবার সর্দ্দার দুই দিন পরে যাহাকে ইচ্ছা বিলাইয়া দিতেন। Captain Speke এই দেশের রাজার সম্বন্ধে একটা দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন—"next the whole party (King and Queens) took a walk winding through the trees and picking fruit, enjoying themselves amazingly, till, by some unluckey chance, one of the royal wives, a most charming creature, and truly one of the best of the lot, plucked a fruit and offered to the king, thinking doubtless to please him greatly, but he, like a mad man flew into a towering passion, said it was the first a woman ever had the impudence to offer him anything and ordered the pages to seize, bind and lead her off to execution." তাহার পরে স্পিক লিখিতেছেন,—"It was too much for my English blood to stand ; and of course I ran imminent risk of losing my own in trying to thwart the capricious tyrant but I saved the woman's life." নারী লইয়া পুরুষের এই যে পুতুল-খেলা, এই যে স্বার্থপরতা, পাশবপ্রবৃত্তির এই যে একান্ত উন্মত্ততা, সে শুধু নারীজাতিকেই অপমানিত ও অবনমিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পুরুষ যে, সমাজকে এবং সমস্ত মাতৃভূমিকে ঐ-সঙ্গে টানিয়া নামাইয়া আনিয়াছে। বিভিন্ন দেশের নজির দিয়া দেখাইবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই, তাই আমি শুধু কাপ্তেন স্পিকের আর একটা কথা বলিয়াই থামিব। তিনি বলিয়াছেন, আফ্রিকার এতবড় দুর্দ্দশার বারো-আনা হেতু পুরুষের এই উচ্ছৃঙ্খলতা। তথায় সর্দ্দারদিগের এবং ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের মৃত্যুর পরেই একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ ওলোটপালট অনিবার্য্য। সেখানে কে যে কার বৈমাত্র ভাই নয়, কাহার সম্পত্তিতে কাহার যে অধিকার নাই, তাহা গায়ের জোরে এবং বল্লমের ফলা ভিন্ন প্রতিপন্ন করার দ্বিতীয় পথ নাই। আরো একটা কথা। ঐ কাপ্তেন সাহেব যখন তাঁহার একজন ওয়াবিখি নিগ্রো ভৃত্যের মুখে শুনিলেন যে, তাহারা নরমাংস আহার করে এবং বড় ভালবাসে, তখন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "বাপু নরমাংস এত পাও কোথায়? নিজেদের লোক মারিয়া আহার কর কি?" সে লোকটা জবাব দিয়াছিল, "না, নিজেদের লোক মারি না, আশ-পাশের গাঁ হইতে কিনিয়া আনি।" "অর্থাৎ?" লোকটা বলিল, "যে-সব ছেলে-মেয়েদের বাপ নাই, তাহারা খাইতে না পাইয়া প্রায়ই

পীড়িত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের জননীরা একটা ছাগল পাইলেই শিশুগুলিকে দিয়া দেয়, আমরা ঘরে আনিয়া মারিয়া খাই।" সুসভ্য দেশেও বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার দ্বিতীয় পক্ষের শিশুগুলির তুলনায় প্রথম পক্ষের সন্তানগুলির উপরে যেমন অনেক সময়েই নির্দ্দয় হইয়া উঠেন, এ ক্ষেত্রে জননীরাও বোধ করি সেইরূপই হয়, তবে অসভ্য বলিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করে এবং করাই বোধ করি স্বাভাবিক! আন্দামান দ্বীপে অসভ্যদিগের একটা প্রথা আছে, শিশুর দাঁত না ওঠা পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকে, তার পর যে যাহার পথ দেখে। পুরুষটি আর একটি স্ত্রী খোঁজে, তাহার স্ত্রীটিও তাই। সে সময়ে জননীরা প্রায়ই তাহাদের দাঁত-ওঠা শিশুটিকে কোন একটা জলাশয়ের ধারে ফেলিয়া দিয়া দ্বিতীয় সংসার করিতে যায়। সেইজন্যই ডাক্তার Francis Day রিপোর্ট দিয়াছিলেন, আন্দামান দ্বীপবাসীরা 'are fast dying out' এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তিনি এমন একটি জননী খুঁজিয়া পান নাই যাহার একসঙ্গে তিনটি সন্তানও জীবিত আছে। আমেরিকার কুচিন জননীরা সন্তান পীড়িত হইয়া পড়িলেই বনের ভিতর ফেলিয়া দিয়া আসে। হারবার্ট স্পেন্সর Savage Life and Scenes in Australia and New zealand (by G. F. Angas)-এর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, Angas সাহেবের কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, সত্যই অস্ট্রেলিয়ার অসভ্যেরা, অভাবে নিজেদের জীবন্ত ছেলেমেয়েদের বঁড়সিতে গাঁথিয়া কুমীর হাঙ্গর ধরিবার টোপ (bate) প্রস্তুত করে এবং চর্ব্বি লইয়া মাছ ধরে। কিন্তু তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ হেতু নাই। কারণ, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে-কোন দেশে যে-কোন জাতির মধ্যে সমাজে নারীর স্থান নীচে নামিয়া আসিবার সঙ্গেই শিশুর স্থান আপনি নামিয়া আসে। এ শুধু মানবের নিম্নস্তরের কথা নহে। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরেও চোখ ফিরাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নারী যেখানে উপেক্ষার পদার্থ, জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ শিশুরাও সেখানে উপেক্ষা অবহেলার জিনিস। একথার সত্যতা উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সে-জাতির ভবিষ্যৎ উত্তরোত্তর অন্ধকার হইয়াই আসিতে থাকে। কিন্তু নর-নারীর শিথিল বন্ধনই তাহার একমাত্র হেতু বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভুল করেন। নারী উপেক্ষিত, ক্রীড়ার সামগ্রী, —এইটিই সর্ব্বপ্রধান হেতু। হারবার্ট স্পেন্সর তাঁহার Sociology গ্রন্থে আদিম মানবের strong emotion-এর দোহাই পাড়িয়া কি করিয়া এই বিষয়টার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। রাগের মাথায় "will slay a child for letting fall something it was carrying" 'ইমোশন' হইতে পারে, কিন্তু "kill their children *without remorse* on various occasion." মাছ ধরিবার টোপের জন্ত ছেলে মারিয়া ধীরে ধীরে চর্ব্বি বাহির করা, কিংবা desert

sick children কি করিয়া ঠিক 'ইমোশন' হইতে পারে বলিতে পারি না। আর তাহাও যদি হয়, তাহাতেও আমার কথাটা অস্বীকৃত হয় না। আদিম মানবের যত-কিছু দোষ থাকিবার তাহা ত আছেই, নর-নারীর বন্ধন প্রায় সর্ব্বত্রই শিথিল, সে-কথা ত বটেই, কিন্তু তাহাতেও তাহার সামাজিক অবস্থা উত্তরোত্তর নামিয়া আসে না, দিন দিন সে সংসার হইতে অপসৃত হইয়া যায় না, যদি না সে তাহার নারীর অবস্থা নামাইয়া আনে। টাহিটির কথা দৃষ্টান্তের মত উল্লেখ করিতেছি। কাপ্তেন কুক তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহাদের দাম্পত্য বন্ধন অতি কদর্য্য very low, very degraded, এমন কি, যে স্ত্রী সুন্দরী, তাহার কিছুতেই একটা স্বামীতে মন ওঠে না; বাপের বাড়ির অবস্থা শ্বশুর-বাড়ির অবস্থা হইতে ভাল হইলে, স্ত্রী "as a right demand and obtain more husbands" এবং পরবর্ত্তী পর্য্যটকেরাও এ-সব কথা সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, এ-সমস্ত থাকা সত্ত্বেও ঐ-দেশের পুরুষেরা নারীকে শ্রদ্ধা-সম্মানের চোখে দেখে। বোধ করি এইজন্যই এ-দেশের শিশু-সন্তানেরা অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রতিপালিত হয়; এবং সেদিনেও সকলে এ-কথাটা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইহাদের মত শান্ত, সুশীল, অতিথি-বৎসল এবং সৎ অনেক সভ্য-সমাজেও দেখা যায় না। চুরি-ডাকাতি ইহারা জানিত না। সামাজিক অবস্থা তাহাদের অনুকরণীয় এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাহারা কোনদিন নারীর অসম্মান করে নাই, অন্যান্য অসভ্যদের মত রমণীর স্থান টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে নাই বলিয়াই ১৯০৬ সালে C. L. Wragge, The Romance of the South Seas গ্রন্থে টাহিটি দ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে লিখিয়া গিয়াছেন—"And what are the duties of women ? To look after the house and mind the children ; to be good wives, good mothers, to leave politics alone and darn the clothes. Tahitian woman, in *woman's sphere*, are superior by far, in my opinion, to their sisters in the Bois, and few Belgraviennes can give them points"

সিলোনের অতি অসভ্য ভেদ্দারা, যাহারা নারীজাতিকে অতিশয় শ্রদ্ধা-সম্মান করে, প্রাণান্তেও এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে না, এবং কিছুতেই স্ত্রী ত্যাগ করে না, তাহাদের সম্বন্ধে জার্ম্মান বিজ্ঞানাচার্য্য হেকেল বলিয়া গিয়াছেন, সততা ও ন্যায়পরায়ণতায় ইহারা য়ুরোপের অনেক সভ্য জাতিকেই শিক্ষা দিতে পারে। ইহাদের অপত্যস্নেহের মত মধুর বস্তু জগতে দুর্ল্লভ। ডায়েক ও টোডাদের সম্বন্ধেও প্রায় এই কথা খাটে। তিব্বতের রমণীদের চরিত্র-বিষয়ে খুব সুনাম নাই। শুধু যে তাহারা সব কয়টি ভাইকেই স্বামীত্বে বরণ করে তাহা নহে, করুণা হইলে পাড়া-প্রতিবেশীর আবেদন-নিবেদনও অগ্রাহ্য করে না। তথাপি দেশের পুরুষেরা তাহাদের

নারীকে অত্যন্ত সম্মান করে। বোধ করি এইজন্যই রাজা রামমোহন রায় এই তিব্বতী রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, "বিপদের দিনে এই তিব্বতের রমণীদের দয়াতেই প্রাণ যায় নাই এবং আজিও চল্লিশ বৎসর পরে সেই রমণীগণের কথা স্মরণ করিলে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়"; এবং ইহাদের কাছেই তিনি সারাজীবন ধরিয়া নারীজাতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে শিখিয়াছিলেন, এ-কথা তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এইখানে আমার পাঠকের কাছে একটা অতি বিনীত নিবেদন আছে। এই-সব দৃষ্টান্ত হইতে আমাকে যেন এমন ভুল না বোঝা হয় যে, আমি অসচ্চরিত্রার গুণ গাহিতেছি। আমি গুণ গাহিতেছি না,—শুধু কথাটা বুঝাইয়া বলিতে চাহিতেছি যে, এমন অবস্থাতেও পুরুষ নারীকে সম্মান দিয়া, তাহার একটা মূল্য দিয়াও ঠকে নাই। তাহার একটা স্বাভাবিক সত্য মূল্য আছে বলিয়াই এমন অবস্থাতেও পুরুষ জিতিয়াছে বই হারে নাই। এইবার একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত লইয়া দেখি। ফিজিদ্বীপের রমণী। এমন পবিত্রতা স্ত্রী আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ—স্বামীর গোরের উপর ইহারা স্বেচ্ছায় উদ্বন্ধনে প্রাণ দেয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পুরুষেরা শুধুই বহুবিবাহ করে না, কথায় কথায় স্ত্রী-হত্যা করে—নারীর স্থান এখানে গৃহপালিত পশুর সমান, বরং নীচে। জননীরা প্রার্থনা করে, তাহাদের সন্তান যেন প্রসিদ্ধ চোর ডাকাত এবং খুনে হয়। পুত্ররাও অনেক সময়ে জননীর প্রাণ বধ করিয়া হাতে-খড়ি দেয়। বাপ শুনিয়া হাসে, বলে, ছেলে আমার বীরপুরুষ হইবে। কিন্তু রমণীগুলির নিষ্ঠুর অন্তঃকরণের উল্লেখ করিয়া অনেক পর্য্যটকই বলিয়া গিয়াছেন, পুরুষেরা লড়াই করিয়া কাহাকেও বন্দী করিয়া আনিলে তাহাকে আহার করিবার পূর্ব্বে মেয়েদের আমোদের জন্য অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেয়। তাহার হাত-পা বাঁধা—স্ত্রীলোকদিগের সবচেয়ে বড় আমোদ খোঁচা দিয়া তাহার চোখ তুলিয়া ফেলা। স্ত্রীলোকেরা সেই হতভাগাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কেহ-বা চোখ তুলিতে থাকে, কেহ ছুরি দিয়া পেট কাটিয়া নাড়ি বাহির করিতে থাকে, কেহ পাথর দিয়া দাঁত ভাঙিতে থাকে; সে যত চেঁচায়, ইহারা ততই আমোদ পায়। এই সে-দেশের নারী, অথচ, অসভ্য কেন, সুসভ্যের মধ্যেও তাহাদের মত পতিভক্তি ও সতীত্ব পাওয়া কঠিন। তবে, কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল? সতীত্বে যাহাদের প্রায় সমকক্ষ নাই, কি দোষে, কাহার পাপে সেই নারী-হৃদয় এমন পাথরের মত হইয়া গেল।

নারী-সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিতে গিয়া অনেক নজির এবং অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আর বলিতে চাহি না। কারণ, ইহাতেও যদি যথেষ্ট না হইয়া থাকে, ত আর হইয়াও কাজ নাই। অতঃপর আর দুই-একটা মূল কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। আগে নর-নারীর নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ

করিয়া প্রথমেই দাম্পত্য সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছি। তাহার হেতু শুধু ইহাই নহে যে, যেখানে অন্যান্য সম্বন্ধ অস্পষ্ট, সেখানেও ইহা স্পষ্টতর, অপিচ, জীবমাত্রেরই সমস্ত সম্বন্ধ হইতে ইহার আকর্ষণও যেমন দৃঢ়তর, স্পৃহা ও মোহও তেমনি দীর্ঘকাল-ব্যাপী।

আমাদের দেশের বিজ্ঞজনেরাও বলিয়াছেন, ছয়টা রসের মধ্যে মধুর রসটাই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ রসের উৎপত্তি মানবের যৌন বন্ধন হইতে। বস্তুতঃ সামাজিক মানব যত প্রকারের সম্বন্ধে রস-ভোগ করিতে শিখিয়াছে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই মধুর রসের মধ্যেই যাবতীয় রসের সমাবেশ ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এইজন্যই একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই চোখে পড়ে, যে-কোন দেশে এই রসের ধারণা যত ক্ষীণ, বন্ধন যত ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গপ্রবণ, নর-নারীর অপরাপর সম্বন্ধও সেখানে সেই অনুপাতে হীন। জগতের যে-কোন দেশ বা জাতির সম্বন্ধে স্ত্রী অপেক্ষা জননী বা ভগিনী প্রিয়তর, এমন কথাটা বলিতে পারিলে হয়ত ভালই শোনায়, কিন্তু সেটা মিথ্যা বলা হয়। তবে এইখানে একটা বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করাও আবশ্যক। যেহেতু এমন কয়েকটা দৃষ্টান্ত আছে যেখানে তলাইয়া না দেখিলেই উল্টা ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। কয়েকটা অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য জাতির মধ্যে একদিকে নারীর যেমন দুর্দ্দশার সীমা-পরিসীমা নাই, অন্যদিকে তেমনি ইহাকেই বাটীর, এমন কি সমাজের কর্ত্রী হইতেও দেখা যায়। অসভ্য ফিউজিয়ানদের মধ্যে 'oldest women exercise great authority', মেক্সিকোর আদিম জাতির মধ্যেও তাই, হায়দাদিগের মধ্যেও তাই। চীনাদের মধ্যে বৃদ্ধা পিতামহী বাটীর কর্ত্রী। সুমাত্রা, ম্যাডাগাস্কার এমন কি কঙ্গোতেও রমণীকে রাণী হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু, তাহাতে কি? একটুখানি ভিতরে প্রবেশ করিলেই সংশয় জাগিয়া উঠে, যে-দেশে রমণী ভারবাহী জীব, বিবাহের সময় যাহার মূল্য গরু-বাছুরের তুলনায় নিরুপিত হয়, সন্তান-প্রসবে অক্ষম হইলে যাহাকে পুনরায় বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়, slave বলিতে যেখানে শুধু নারীই বুঝায়, সেই নারীর কর্তৃত্ব কেমন করিয়া একটা বাস্তব ব্যাপার হইতে পারে! ঠিক এই কথাটার উপরেই Boncroft একস্থানে বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কর্তৃত্ব বোধ করি নামমাত্র। আমি নিজেদের ঘরের কথা ভাবিতেছিলাম। এদেশেও কর্তার অবর্ত্তমানে বৃদ্ধা জননী বা পিতামহীকেও কর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু তার পরে? মনের অগোচরে পাপ নাই,—কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে চাহি না। এদেশেই সম্পত্তির লোভে গুরুজনকে বাঁধিয়া পোড়ানো হইত। অথচ পুরুষের নানাবিধ জবাবদিহির মধ্যে একটা চমৎকার জবাবদিহি Spencer সাহেবের পুস্তকে লেখা আছে, "It was adopted as a remedy for the practice of poisoning their husbands, which had become common among Hindu women!" খবরটি কোন্ পণ্ডিত তাঁহাকে

দিয়াছিল জানি না, কিন্তু পোড়ানোর ধরণ-ধারণ দেখিয়া সে-বেচারা বিদেশীর চোখে বোধ করি নারীর এমনি একটা কিছু গুরুতর অপরাধের কথাই সম্ভবপর বলিয়া ঠেকিয়াছিল। হায় রে, পুড়িয়া মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই! যাই হোক, কথাটা মিথ্যা,—সে নিজেই বানাইয়াছিল। কারণ, এদেশের টুলো পণ্ডিতদের তরফ হইতে পোড়াইয়া মারার স্বপক্ষে বিলাতে যে আপীল রুজু করা হইয়াছিল, তাহাতে বিধবার বিরুদ্ধে এ অভিযোগের উল্লেখ নাই। যাক এ কথা।

কথা হইতেছিল, ঐ কয়েকটি স্থানে অবস্থাবিশেষে নারীর কর্তৃত্বের বস্তুগত্যা অস্তিত্ব আছে কিনা। থাকিলেও কিভাবে থাকা অধিক সম্ভবপর। কিন্তু নর-নারীর যাবতীয় সম্বন্ধের ন্যায়সঙ্গত দাবী নারীর যাহাই হোক, পুরুষ স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে যে-মূল্য তাহাকে দিয়া আসিতেছে, সেই তাহার প্রাপ্য মূল্য কি না! কারণ, পুরুষ এই বলিয়া একটা বড়-রকমের উত্তর করিতে পারে যে, অবস্থা-ভেদে সে যে-মূল্য রমণীকে দিয়া আসিয়াছে তাহা ঠিক হইয়াছে। যেমন, এদেশের কোন এক পণ্ডিত তাঁহার বইয়ে লিখিয়াছেন যে, মনুর সময়ে ব্যাভিচার-স্রোত অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই অমন হাড়-ভাঙ্গা আইন-কানুন নারীর উপর জারি করা হইয়াছিল। বোধ করি ইঁহার ধারণা যে, ব্যাভিচারের জন্য শুধু নারীই দায়ী—পুরুষের তাহাতে নামগন্ধও ছিল না। সে যাই হোক, এই উত্তরটারও কোন বনিয়াদ আছে কি না, তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে এ প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছি, সংসারে নারী যদি বিরল হইতেন, তবেই নারীর যথার্থ মূল্য স্থির করা সহজ হইত; কিন্তু 'যদি'র কথা ছাড়িয়া দিয়া ইহার বর্ত্তমান অবস্থার ঠিক দামটি পুরুষ দিয়াছে কি না, তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিতেছি।

আডাম স্মিথ যখন প্রথম প্রচার করেন, জগতের সমস্ত বস্তুই যেমন নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, তাহাদের মূল্যও সেই নিয়মেরই অধীন। তখন সরল লোকে বুঝিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল, তাহাদের জিনিস তাহারা যদৃচ্ছা বেচিবে কিনিবে—সে মূল্য ধার্য্য করিয়া দিবার মালিক তাহারা ছাড়া আর কেহ নাই। এই অহঙ্কারে মানুষ প্রায় শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত এই সত্যকে অস্বীকার করিয়া চলিয়াছিল। এখনই যে সকলে একবাক্যে মানিয়া লইয়াছে তাহা বলি না, কিন্তু যাহারা মানিয়াছে তাহারা এটা বেশ দেখিতে পাইয়াছে, এই স্বাভাবিক-নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিলে শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই সুফল ফলে না। তাহাদেরও না, আর পাঁচজনেরও না; ধান-চালের বাজারেও না, ছেলে-মেয়ে বেচাবেচির বাজারেও না। এই অজ্ঞতার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত, গায়ের জোরে দাম বাড়ানোর একটা জীবন্ত সাক্ষী আমাদের দেশের কৌলিন্য বংশগত করাটা। তা যদি না হইত, তাহা হইলে আজ কুলীন বামুন বলিলে লোকে গালাগালি মনে করিত না। বামুনের ছেলে শ্বশুরবাড়ি গিয়া পয়সা লইয়া

রাত্রি যাপন করে, এবং পরদিন সেই পয়সায় গাঁজা-গুলি খায়, এটা হইতে পারিত না। মানুষ, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান, কতটা হীন হইবার পরে তবে যে এই কাজ করিতে সমর্থ হয় তাহা বুঝাইয়া বলিতে যাওয়াই বাড়াবাড়ি। এই কুলীনের ছেলে কুলীনকে ভ্রান্ত সমাজ যে মূল্য দিতেছিল, সে তাহার যথার্থ প্রাপ্য মূল্য হইলে কিছুতেই তাহারও এতবড় অবনতি ঘটিত না, সমাজও এমন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অগণিত নিরুপায় বঙ্গ-রমণীর নিষ্পাপ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, তাহাদের ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘশ্বাস ও অভিসম্পাত বহিয়া, ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া এমন পঙ্গু এমন মিথ্যা হইয়া পড়িতে পারিত না। আজ বোধ করি কতকটা চক্ষু খুলিয়াছে। যাহার সত্য মূল্য নাই, রাজাজ্ঞাতেই হৌক, বা সমাজের ইচ্ছাতেই হৌক, তাহার মূল্য অযথা বাড়াইয়া তুলিলে পরিণামে মঙ্গল হয় না। এই সত্য অপরদিকেও ঠিক এমনি প্রযোজ্য। যাহার যতটা মূল্য তাহাকে ঠিক ততটা দিতেই হইবে, অজ্ঞানেই হৌক বা অহঙ্কারেই হৌক, বঞ্চিত করিয়া কিছুতেই কল্যাণ লাভ করা যাইবে না। মিথ্যা কখনও জয়ী হইবে না। এই হিসাবে যাচাই করিয়া যদি দেখা যায়, পুরুষ নারীকে যে মূল্য দিয়া আসিয়াছে তাহাতে উত্তরোত্তর ভালই হইয়াছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাই তাহার প্রাপ্য মূল্য, অন্যথা স্বীকার করিতেই হইবে, বঞ্চনা করিয়াছে, পীড়ন করিয়াছে, এবং সেইসঙ্গে সমাজে অকল্যাণ টানিয়া আনিয়াছে। প্রথমে একটা অবান্তর কথা বলিব। আমার এই প্রবন্ধের কতকটা পাঠ করিয়াই সেদিন আমার এক আত্মীয় 'morbid mind'-এর পরিচয় পাইয়াছেন; আর এক আত্মীয় নর-নারীর বিসদৃশ সম্বন্ধের আলোচনা করার অপরাধে এমনিই কি একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষেরা যে এ-কথা বলিবেন তাহা জানিতাম। কিন্তু এ-সকল কথার উত্তর দিতে আমার লজ্জা বোধ হয়।

আগে আদিম ও অসভ্য মানব-জাতির সামাজিক ও সাংসারিক আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করিতে গিয়া এমন অনেক কথা বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইয়াছে যাহা পাঠ করিলেও মানুষ শিহরিয়া উঠে। কিন্তু ও-সব উল্লেখের প্রয়োজন শুধু যে পুরুষের দোষ দেখাইবার জন্যই হইয়াছিল তাহা নহে। সামাজিক মানব-সম্বন্ধে এই যে একটা উক্তি আছে যে, perhaps in no way is the moral progress of mankind more clearly shown than by contrasting the position of *women* among savages with their position among the most advanced of the civilized, ইহা সত্য বলিয়া মনে করি বলিয়াই ঐ-সব দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক হইয়াছিল। বস্তুতঃ মানবের নৈতিক উন্নতি-অবনতি বুঝিয়া লইবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আছে কি না জানি না বলিয়াই অত কথা বলিয়াছি, তা আমার আত্মীয় দুটি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

আর একবার মধুর রসের কথাটা পাড়িব। কারণ, এই রস মানুষকে কতভাবে কত দিক দিয়া যে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। সুতরাং একবার যাহা বলিয়াছি পুনরায় তাহার আবৃত্তি করিতেছি,—এই রসবোধ যেখানে যত কম, এদিকে দৃষ্টি যাহার যত ক্ষীণ, সে ততই অমানুষ। এই রস অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসেই মানবের অজ্ঞাতসারে সতীত্বের সৃষ্টি, এই রস-মাহাত্ম্য গাহিয়াই মানুষ কবি। এই রসের অবমাননা করিয়াই ভারতের যুগ-বিশেষ, এবং মধ্যযুগের ইউরোপ, নারীকে peculiar representative of sexuality বলিয়া ভুল করিয়া যে অধঃপথে গিয়াছিল্ তাহা অস্বীকার করা চলে না। এই রস-বোধের প্রধান উপাদান নারীর সৌন্দর্য্য। পুরুষ যত বর্ব্বরই হোক, রূপের সম্মান সে না করিয়াই পারে না, এমন কি পুটুয়ারা, যাহারা গরুর অভাবে স্ত্রীলোকদিগের কাঁধে লাঙ্গলের জোয়াল তুলিয়া দিয়া জমি চাষ করে, তাহাদের মধ্যেও দেখা যায় যে, যে রমণীগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দরী তাহারা লাঙ্গল কম টানে। আবার সৌন্দর্য্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকেই বেশী করিয়া লাঙ্গল টানিতে হয়। রেভঃ জন রস্ কোরিয়ার ইতিহাসে, কোরিয়াবাসীদের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ব্যবহার অনেকস্থানেই লিখিয়া গিয়াছেন।

তবেই দেখা যায়, তা যত অল্পই হউক, রূপের একটু সুবিধা আছেই, এবং এই সুবিধা শুধু তাহার একার নহে, পুরুষেরও হৃদয়-বৃত্তি উচ্চ করিবার পক্ষেও ইহা যথেষ্ট সাহায্য করে। নিজের নিষ্ঠুরতা সে দুটোদিনের জন্যও দমন করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু এই শিক্ষা তাহার নিজের দোষেই অধিকদূর অগ্রসর হইতে পায় না। দেখা যায় সমাজ যার যত নীচ, নারীর সৌন্দর্য্যও সেখানে তত অল্প, এবং ততোধিক ক্ষণস্থায়ী। নজির তুলিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না, কিন্তু প্রায় পর্য্যটকই লিখিয়া গিয়াছেন, যাহাদের মধ্যেই নারীর status অত্যন্ত low, তাহাদের মধ্যেই পুরুষেরা বরং দেখিতে ভাল, কিন্তু রমণীরা এতই কুৎসিত কদাকার যে চাহিয়া থাকিতেও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু ইহাই কি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত নয়? নিদারুণ পরিশ্রম, দিনের অধিকাংশ সময় রুদ্ধ দুষ্ট বায়ুতে চলা-ফেরা, অতি অল্প বয়সেই সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন করা, পুরুষের ভুক্তাবশিষ্ট কদর্য্য আহার্য্য ভক্ষণ করা,—কেমন করিয়া তাহার রূপ দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে? আবার, রূপ মানে শুধু রূপ নহে, রূপ মানে স্বাস্থ্য। তাহার রূপ যায়, স্বাস্থ্য যায়, যৌবন দু'দিনেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে; অতঃপর এই দুর্ব্বল, বিগতযৌবনা রমণীর নিকট হইতে পুরুষ যা-কিছু বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া লইতে থাকে, তাহাতে চারিদিকেই অমঙ্গল বাড়িয়া যায়। স্থান ও সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই নর-নারীর উভয়েরই বাঁচিয়া থাকিবার মিয়াদও কেমন করিয়া কমিয়া আসে। এইজন্যই বোধ করি সমস্ত অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্যেরাই অল্পায়ু। এই প্রসঙ্গে আমরা যদি নিজেদের ঘরের দিকে

চোখ ফিরাইয়া দেখি, এবং দেখিতে পাই উহাদের সহিত আমাদের কিছুই মিলে না, উহাদের মত আমাদের রমণীরা অল্পদিনেই স্বাস্থ্য ও যৌবন হারান না, তাঁহাদের গর্ভের সন্তানও রুগ্ন বা অল্পায়ু হয় না, অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখীর সংসার আরো ভারাক্রান্ত করেন না, এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের সৎ ও স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের পথ-ঘাট আমরা বন্ধ করিয়া দিই নাই, তাহা হইলে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, যে মূল্য আমরা নারীকে দিয়া আসিতেছি তাহাই ঠিক হইয়াছে। অন্যথা বলিতেই হইবে আমাদের ভুল হইয়াছে এবং ধর্ম্মতঃ সে ভুল অপনোদন করিতে আমরা বাধ্য। শুধু এই কথাটা একটু সাহস করিয়া দেখিলে অনেক সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে যে, যে-সব বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল নারী-দেহে পরাইয়া রাখিয়া আমরা নিজেদের সুখ্যাতি নিজেরাই গাহিয়া বেড়াইতেছি তাহাতে সুফল ফলিতেছে কি না। ভালো-মন্দ দেখিতে পাওয়া শক্ত কাজ নয়, স্বীকার করিতে পারাই শক্ত কাজ। এই শক্ত কাজটাই নির্ভয়ে স্বীকার করিয়া ফেলিতে আমি দেশের পুরুষকে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই কি বিধি-নিষেধ থাকিবে, বা থাকিবে না, কোন্‌টা সময়োপযোগী, এবং তখন কিসে বর্ত্তমানকালে কল্যাণ হইবে তাহা আপনিই স্থির হইয়া যাইবে। তখন মনুর সময়ে ব্যাভিচার-স্রোত প্রবল ছিল কি না, এ-তর্কের মীমাংসা না হইলেও চলিবে। মধুর রসের সমস্ত রসটুকু নারীর নিকট হইতেই নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইব, নিজেরা কিছুই দিব না, এটা চালাকি হইতে পারে, কিন্তু এ চালাকি চিরদিন চলে না, বিশ্বেশ্বরের অলঙ্ঘ্য আদালতে একদিন ধরা পড়েই। তখনো রসটা মধুর থাকিতে পারে, কিন্তু ফলটা আর মধুর হয় না।

আরো একটা কথা। সামাজিক নিয়ম-সম্বন্ধে যাঁহারাই আলোচনা করিয়া তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এ সত্যটাও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, সমাজে নারীর স্থান অবনত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের স্থান আপনি নামিয়া আসে। কেন হয়, এবং হওয়া স্বাভাবিক কি না, এ-কথা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। আমিও ইতিপূর্ব্বে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি, শিশুর জননীর সহিত যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, পিতার সহিত তত নয়। এই কারণেই সংসারে কৃতী লোকের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই এমন মা পাইয়াছিলেন যাহাতে সংসারে উন্নত করা অসম্ভব হইয়া উঠে নাই। কিন্তু এই মায়ের অবস্থাটা সাধারণতঃ যদি দিন দিন নামিয়া পড়িতে থাকে, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে দেশের কৃতি সন্তানের সংখ্যা কমিয়া আসিতেই থাকে, এই প্রতিযোগিতার দিনে সে জাতি আর জাতির মত জাতি হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তবে এতকাল টিকিয়া রহিল কিরূপে? এই বলিয়া জবাবদিহি করিতে যাঁহারা চান তাঁহাদের শুধু এইটুকুমাত্রই বলিতে চাই যে, কোনমতে কেবল প্রাণধারণ করিয়া থাকাটাই, মানুষের বাঁচা নয়।

নারীর মূল্য

সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিলে নর-নারী উভয়েরই অনিষ্ট ঘটে, সে-সম্বন্ধে বোধ করি মতভেদ থাকিতে পারে না, এবং এই অনিষ্টের অনুসরণ করিলেই যে নারীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন ব্যাপার নয়। সমাজ মানে নর-নারী। শুধু নরও নয়, শুধু নারীও নয়! উভয়েরই কর্ত্তব্য সম্যক্ প্রতিপালিত হইতেছে কি না। কর্ত্তব্য বলিতে শুধু নিজের কাজটাই বুঝায় না, অপরকেও ঠিক ততটা কাজ করিবার অবকাশ দেওয়া হইতেছে কি না, তাহাও বুঝায়। সেইটুকুই বুঝিতে বলিতেছি।

আরও একটা কথা এই যে, পুরুষের সমস্ত কাজ নারী করিতে পারে না, নারীর সমস্ত কাজও পুরুষেরা করিতে পারে না; কিংবা যে কর্ত্তব্য দু'জনে মিলিয়া করিলে সুসম্পন্ন হয়, তাহাও শুধু একার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। অতএব, সমস্ত সমাজেরই দেখা উচিত তথায় নারীর কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইতেছে কি না! এবং কাজ করিবার ন্যায্য স্বাধীনতা ও প্রশস্ত স্থান তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কি না। জেলের কয়েদীদিগের কাছেও ভাল কাজ আদায় করিয়া লইতে হইলে তাহাদের শৃঙ্খলের ভার লঘু করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিবার কথা বলিতেছি না—তাহাতে আমেরিকার মেয়েদের দশা ঘটে! তাহাদের অবাধ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। একদিন প্রাচীন রোমে আইন পাশ করিতে হইয়াছিল, "to prevent great ladies from becoming public prostitutes" কোথায় একবার পড়িয়াছিলাম, তিব্বতের এক স্ত্রীর বহু স্বামীত্বের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বোধ করি একটুখানি পরিহাস করিয়াই বলিয়াছেন—এ-সব কথা লিখিতে ভয় হয়, পাছে আমেরিকার নারীরাও খেয়াল ধরিয়া বসে, আমরাও ওই চাই। তাহাদের ব্যাপার দেখিয়া প্রায় সমস্ত পুরুষেরই হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইবার মত হইয়াছে। তাই কতকটা শৃঙ্খলের প্রয়োজন। অপরপক্ষে শৃঙ্খল একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলে পুরুষেরাও যে কত অবিচারী, উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, এই ভারতবর্ষেই সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

যাই হোক, কথা হইতেছিল কাজ করিবার ন্যায্য স্বাধীনতা এবং ন্যায্য স্থান ছাড়িয়া দেওয়া, এবং কোন্ কাজটা কাহার, এবং কোন্ কাজটা উভয়ের এই মীমাংসা করিয়া লওয়া। মানব-সমাজের যত নিম্নস্তরে অবতরণ করা যায়, ততই চোখে পড়িতে থাকে এই ভুলটাই তাহারা ক্রমাগত করিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাতে কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকাংশ স্থলেই পুরুষ শুধু লড়াই করে, এবং শিকার করে,—আর কিছু করে না। জীবন-ধারণের বাকী কাজগুলো সমস্তই একা নারীকে করিতে হয়। তাহারা জল তোলে, কাঠ কাটে, মোট বয়, জমি চাষ করে, সন্তান প্রসব করে, রাঁধা-বাড়া সমস্তই করে। এমন কি, শিকারলব্ধ পশুটাকেও বহিয়া

আনিবার জন্য বনে-জঙ্গলে পুরুষের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এবং ইহার অনিবার্য্য ফলও যাহা হইবার ঠিক তাই হয়। অবশ্য স্বীকার করি, সব দেশেই কিছু নর-নারীর কাজের ধারণা এক হইতে পারে না,—হয়ও না। কিন্তু একটু মনোযোগ করিলেই টের পাওয়া যায় সভ্যতার অনুপাতে কর্ত্তব্য বিভাগের একটা সাদৃশ্য আছে, এবং এই অনুপাত যত বাড়িতে থাকে সাদৃশ্যও তত কমিয়া আসিতে থাকে। যেমন ব্যবহারের নিমিত্ত দূর হইতে জল আনিবার আবশ্যক হইলে একজন ফরাসী কিংবা ইংরাজ হয়ত তাহা নিজেরাই করিবেন, কিন্তু আমারা লজ্জায় মরিয়া যাইব; এবং তাহার পরিবর্ত্তে গর্ভবতী স্ত্রীর কাঁকালে একটা মস্ত ঘড়া তুলিয়া দিয়া জলাশয়ে পাঠাইয়া দিয়া লজ্জা নিবারণ করিব। পেরুর উন্নত অবস্থার দিনে পুরুষ চরকা কাটিত এবং কাপড় বুনিত, স্ত্রীলোক লাঙ্গল ঠেলিত। এখনো সামোয়ার অধিবাসীরা রাধা-বাড়া করে, স্ত্রীলোক হাটে-বাজারে যায়। আবিসিনিয়ার পুরুষদের বাজারে যাইতে মাথা কাটা যায়, কিন্তু প্রফুল্ল-মুখে ঘাট হইতে নর-নারী উভয়েরই কাপড় কাচিয়া আনে। এইরূপ কাজ-কর্ম্মের ধারণা সব দেশে এক নয়, এবং ছোট-খাটো বিষয়ে এক না হইলেও বেশী কিছু আসিয়া যায় না সত্য, কিন্তু এই ধারণা স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করিয়া গেলে অমঙ্গল অনিবার্য্য! অর্থাৎ, পুরুষ সর্ব্ববিষয়ে স্ত্রীলোকের কাজ করিতে গেলে যেমন কয়ডোদের মত অকর্ম্মণ্য হীন হইয়া পড়ে, তেমনি ডাহোমি রাজার স্ত্রী-সৈন্যও যথার্থ unsexed হইয়াই তবে লড়াই করিতে পারে। তাহাতে নিজের কল্যাণ হয় না, দেশেরও না। কিন্তু, এই সমস্ত পুরুষোচিত কাজ-কর্ম্মের দরুণই একদল পণ্ডিতের এমন বিশ্বাসও জন্মিয়া গিয়াছে যে, আদিম যুগে নর-নারীর মধ্যে নারীর স্থানই উচ্চে ছিল। তাহারাই leader of civilization; অথচ কেন সংসারে নারীর স্থান এমন উত্তরোত্তর নামিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া স্পেন্সর সাহেব স্থির করিয়াছেন, দেশের লোক যত যুদ্ধপ্রিয়, অন্ততঃ আত্মরক্ষার জন্য যাহাদিগকে ঘরে-বাহিরে যত বেশী লড়াই করিতে হইয়াছে তাহারাই তত বেশী নারীর উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, তত বেশী গায়ের জোর খাটাইয়াছে। নারী যে স্বাভাবিক কোমলতা ও নম্রতার জন্যই স্বেচ্ছায় এত নির্য্যাতন এবং অধীনতা স্বীকার করিয়াছে তাহা নয়। তাহারা গায়ের জোরে পারিয়া উঠে নাই বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে, পারিলে স্বীকার করিত না। কারণ, দেখা গিয়াছে যেখানে সুবিধা এবং সুযোগ মিলিয়াছে সেখানে নারী পুরুষ অপেক্ষা একতিলও কম নিষ্ঠুর বা কম রক্তপিপাসু নয়। এখানে এইটাই দেখিবার বিষয় যে, পুরুষ যদি এই বলিয়া জবাবদিহি করে, সে দুর্ব্বলের উপর গায়ের জোর খাটাইয়া কর্ত্তৃত্ব করে নাই, বুঝিয়া-সুঝিয়া ধীর-স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য এবং মঙ্গলের খাতিরেই বাধ্য হইয়া নারীর এই নিম্নস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে সে কথা সত্য নয়।

অবশ্য স্পেন্সরের এই মত সকলেই যে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু যতগুলা বিভিন্ন প্রতিবাদ অন্ততঃ আমার চোখে পড়িয়াছে তাহাতে স্পেন্সরের মতটাই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "militancy implies predominance of compulsory co-operation" এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলের উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "Hence the disregard of women's claims shown in stealing and buying them ; hence the inequality of *Status* between the sexes entailed by polygamy, hence the use of women as labouring *Slaves* ; hence the life-and-death power over wife ane child ; and hence that constitution of the family which subjects all its members to the eldest male. Conversely, the type of individual nature developed by voluntary co-operation in societies that are predominantly industrial, whether they by peaceful, simple tribes, or nations that have in great measure outgrown militancy, is a relatively—altruistic nature."

বাস্তবিক এই compulsory co-operation যেখানে এত 'binding', তা লড়ায়ের জন্য হৌক, আর পরকালের জন্যই হৌক, নারীর অবস্থা সেখানেই তত হীন। ধর্ম্মের গোঁড়ামী, অধর্ম্মের অত্যাচার নারীকে যে কত নীচু করিয়াছিল, ইউরোপের মধ্যযুগ তাহার বড় প্রমাণ। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তাহার কতকটা ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে আরও শত-সহস্র দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু সে আবশ্যক, আশা করি, নাই। ধর্ম্মের গোঁড়ামি কেন নারীকে হীন করিল, সে আলোচনা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, সুতরাং তাহাতে বিরত রহিলাম। শুধু এই স্থূল কথাটা বলিয়া রাখিব যে, ধর্ম্মের বাড়াবাড়ির প্রধান উপাদান বিরক্তি। যা-কিছু সাংসারিক লোকের প্রার্থিত তাহাতেই আসক্তি নাই, এই ভাবটা দেখানো। বিষয়-আশয় টাকা-কড়ি অতি বদ্ জিনিস—নারীও তাই। 'The devil's gate' 'নরকস্য দ্বারো নারী' এইজন্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মচর্চ্চার বীজমন্ত্র। অর্থাৎ, যদি পরকালের কাজ করিতে চাও ত তাহাকে নরকের দ্বারস্বরূপ কাজ কর, আর যদি ইহকালের কাজ করিতে চাও ত, আমাদের দেশে যে ব্যবস্থা ছিল তাই কর। যতগুলা পার বিবাহ কর,—তার আট-দশ রকম পথ আছে এবং মরিলে যেমন করিয়া পার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। না পার অন্ততঃ জুজুর ভয় দেখাইয়া তাহাকে জড়ভরত করিয়া রাখিয়া যাও। Monogamy যাহা নারীর যথার্থ সম্মানের ঠাঁই, এবং যাহা একমাত্র নর-নারীর প্রকৃত স্বাভাবিক বন্ধন, সে ধারণাই প্রায় এদেশে নাই। অথচ, সতীত্বের এত অপর্য্যাপ্ত রীতি-নীতি, এটা বজায় রাখিবার এত অদ্ভুত ফন্দি আর কোন দেশে কোনদিন

উদ্ভাবিত হয় নাই। মনে হইতেছে, কোন এক মস্তবড় লেখায় পড়িয়াছি, আমাদের দেশ সমস্ত রকম সামাজিক প্রশ্নের যে একটা বড় রকম উত্তর দিয়াছেন, তাহা এখনও জগতের সম্মুখে আছে, এবং তাহার সফলতা অনিবার্য্য, না, কি এমনি একটা কথা। কি জানি আমাদের দেশ কি বড় উত্তর দিয়াছিল, এবং জগতের কাহারা সে-জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু ফল যে তাহার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা টের পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার দেখাদেখি আরো অনেকে—যাঁহারা সামাজিক ইতিহাসের কোন ধার ধারে না, তাঁহারাও এই সমস্ত কল্পনার ধূয়া গাহিতে শুরু করিয়াছেন। 'বড় রকম উত্তর দিয়াছিল,' 'সমস্ত সামাজিক প্রশ্ন,' 'জগতের সম্মুখে আছে,' ইত্যাদি বুলির অর্থ বোঝাও যেমন শক্ত, এই-সব সাহিত্যিক verbiage এর প্রতিবাদ করিতে পারাও ততোধিক কঠিন। অন্যান্য জাতি চোখের উপর দিন দিন বড় হইয়া যাইতেছে, নর-নারী মিলিয়া পতিত সমাজটাকে দুই দিনে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া ধরিতেছে, যে যাহার ন্যায্য অধিকারের মধ্যে চলা-ফেরা করিয়া উন্নত হইয়া উঠিতেছে —তবু সে-সব কিছুই নয়। আর আমাদের দেশের সেই অবোধ্য বড় উত্তরটাই মস্তবড় এবং তাহার ভবিষ্যৎ কাল্পনিক সফলতাটাই সর্ব্বোপরি বাঞ্ছনীয়। সেই জাতিভেদের অসংখ্য সঙ্কীর্ণতা, বালিকা-বিবাহ, বিবাহ না দিলে জাত যাওয়া, বারো বছরের বিধবা মেয়েকে দেবী করার বাহাদুরি, পঞ্চাশ বছরের বুড়ার সহিত এগারো বছরের মেয়ের বিবাহ এবং তাহার বছর-দুই পরেই তাহার গর্ভের সন্তান—এই-সমস্তই বড়-রকমের উত্তর। অথচ কথাটি বলিবার জো নাই। পণ্ডিতেরা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিবেন, "তুমি আমাদের মুনি-ঋষিদের চেয়ে বেশি বোঝ?" মনে পড়ে, সেই আম কেনার কথা। লোকটা বলিল, "চেখে নিন—মিষ্টি গুড়"। খেয়ে দেখি তত টক আমার জীবনে খাই নাই। কিন্তু লোকটাকে কিছুতেই স্বীকার করাইতে পারিলাম না। সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "টক বললেই শুনব? আমার গাছের আম আমি জানিনে!" এর আর উত্তর কি?

ইংরাজীতে যাহাকে ethics বলে, তাহার একটা গোড়ার কথা এই যে বিসদৃশ হেতু না থাকিলে আমার স্বাধীনতাটা কেবল ততদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে পারি যতক্ষণ না তাহা আর একজনের তুল্য স্বাধীনতায় আঘাত করে। এই দুটো কথার দ্বারা মানুষের প্রায় সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে, এবং আমার বিশ্বাস, যে-কোন সামাজিক প্রশ্নের স্থানও ইহারই মধ্যে সঙ্কুলান হয়। ইহাকে যে সমাজ যত বেশী অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে, সে তত বেশী নারীর উপর অন্যায় করিয়াছে, এবং তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নারীকেও নত করিয়াছে, নিজেরাও অবনত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। একটি কন্যা হয়ত রুগ্না, দুর্ব্বল, অশিক্ষিতা

এবং অপটু, তত্রাচ একটা বিশেষ বয়সে তাহার বিবাহ দিতে হইবে, অর্থাৎ মাতৃত্বের গুরুভার তাহাকে মাথায় তুলিতেই হইবে ; অথচ আর একটি বিধবা মেয়ে হয়ত সবল, সুস্থ, শিক্ষিতা এবং মাতৃত্বের সম্পূর্ণ উপযোগিনী—আদর্শ জননীর সমস্ত সদ্‌গুণে হয়ত ভগবান তাহাকে ভূষিত করিয়াছেন, তবুও তাহাকে তাহার স্বাভাবিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। ইহাতে শাস্ত্রকারের মর্য্যাদা যদি বা বজায় থাকে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা যে বজায় থাকে না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। প্রথমটাতেও না, পরেরটাতেও না।

সুসভ্য মানবের সুস্থ সংযত শুভ-বুদ্ধি যে অধিকার রমণীজাতিকে সমর্পণ করিতে বলে, তাহাই মানবের সামাজিক নীতি এবং তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়। কোন একটা জাতির ধর্ম্মপুস্তকে কি আছে না আছে, তাহাতে হয় না। নারীর মূল্য বলিতে আমি এই নীতি ও অধিকারের কথাই এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি। Supply এবং demand এর মূল্যও বলি নাই, কবে পুরুষ বাড়িয়া উঠিবে, কবে নারী বিরল হইবে, সে আশাও করি নাই। নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ, সহানুভূতি ও ন্যায়-ধর্ম্মের উপরে। ভগবান তাহাকে দুর্ব্বল করিয়াই গড়িয়াছেন, বলের সেই অভাবটুকু পুরুষ এইসমস্ত বৃত্তির মুখের দিকে চাহিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে, ধর্ম্মপুস্তকের খুঁটিনাটি ও অবোধ্য অর্থের সাহায্য পারে না। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জাপান। সে কেবল তাহার নারীর স্থান উন্নত করিতে পারিয়াছে সেইদিন হইতে, যেদিন হইতে সে তাহার সামাজিক রীতি-নীতির ভালো-মন্দর বিচার ধর্ম্মের এবং ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর আঁচড়-কামড়ের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও সেখানে চীনাদের মত নারীর দুর্দশার সীমা-পরিসীমা ছিল না। শুধু ইউরোপ সম্বন্ধেই "The clergy have been the worst enemies of women, women are their best friends" নয়, অনেক দেশের সম্বন্ধেই ঠিক তাই। নারীর স্থান অবনত করিবার জন্য ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর স্পর্দ্ধা যে কতদূর বাড়িতে পারে, তাহা St. Ambroseএর একটা উক্তি হইতে জানা যায়। তিনি অসংশয়ে প্রচার করিয়াছিলেন, "marriage could not have been God's original theme of creation ;" 'গডে'র অভিপ্রায়টুকু পর্য্যন্ত তাহাদের অগোচর থাকে না, কিন্তু কাহার সাধ্য তাহাকে অবিশ্বাস করে।

ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মে। যদিও নারীর স্থানটি কোরানের মতে ঠিক কোন্‌খানে, তাহা বুঝাইয়া বলা অতি কঠিন, তথাপি মহম্মদ নারীজাতিকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, পুত্র-কন্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তুলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বিধবাকে—যাহার অবস্থা আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় ও নিরুপায়

ছিল—তাহাকে দয়া ও ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখিতে হুকুম করিয়া গিয়াছেন, এ-সব কথা অস্বীকার করা যায় না; বস্তুতঃ তদানীন্তন আরব-রমণীর ভয়ঙ্কর অবস্থার তুলনায় আরবের নব-ধর্ম্ম যে নারীকে সহস্র গুণে উন্নত করিয়াছে তাহাতে লেশমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। Hronbeck, Ricaut প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা কি ভাবিয়া যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মুসলমানদের মতে নারীর আত্মা নাই এবং নারীকে তাহারা পশুর মত মনে করে, তাহা বলিতে পারি না। আমি ত কোরানের কোথাও এমন কথা দেখিতে পাই নাই। বরং কোরানের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে এই যে একটা উক্তি আছে, মৃত্যুর পর দুষ্কৃতকারীকে ঈশ্বর শাস্তি দেন—তিনি নর-নারীর প্রভেদ করেন না—তাহা দেখিয়া মনে হয়, মহম্মদ নারীর আত্মা অস্বীকার করেন নাই। কোরানের চতুর্থ অধ্যায়ে এবং আরও অনেক স্থানেই নারীর প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা ও তাহার ন্যায্য অধিকারের বিষয় এই ধর্ম্মগ্রন্থে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে। তথাপি অনেকের বিশ্বাস, ইসলাম-ধর্ম্মে নারীর স্থান বড় নীচে; এটা বোধ করি পুরুষের বহু-বিবাহের অনুমতি আছে বলিয়াই। চতুর্থ অধ্যায়ের গোড়াতেই আদেশ আছে, "take in marriage of such other women as please you, two or three or four and no more." এ-ছাড়া বিশ্বাসী এবং সাধু লোকেরা স্বর্গে গিয়া কিরূপ সুখ-সম্পদ আমোদ-আহ্লাদ ভোগ করিতে পাইবেন, সে-সম্বন্ধে মহম্মদ অনেক আশা দিয়া গিয়াছেন। স্বর্গে প্রতি বিশ্বাসীর নিমিত্ত কিরূপ ও কতগুলি করিয়া হুরানি নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা আছে, কিন্তু মর্ত্ত্যের মানবীর অবস্থাটা স্বর্গে কিরূপ দাঁড়াইবে এবং সেইরূপ দাঁড়ান বাঞ্ছনীয় কিনা তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। Sale সাহেব তাঁহার কোরানের অনুবাদের একস্থানে লিখিয়াছেন, "but that good women will go into a separate place of happiness, where they will enjoy all sorts of delights ; but whether one of those delights will be the enjoyment of agreeable paramours created for them, to complete the economy of the Mahamadan system, is what I have found no-where decided." এই যদি হয়, এত করা সত্ত্বেও যে নারীর যথার্থ অবস্থা-সম্বন্ধে লোকের দারুণ সংশয় ও মতভেদ ঘটিবে, তাহা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া মহম্মদ নিজেও একস্থানে বলিয়াছেন, "when he took a view of paradise, he saw the majority of its inhabitants to be the poor, and when he looked down into hell, he saw the greater part of the wretches confined there to be women !"

যাহারা মনে করেন সংসারে নারী প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকায় জন্যই স্বভাবতঃ তাহার হীন মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা যে সম্পূর্ণ ভুল করেন এ-কথা বলি না।

কারণ, যে-দেশেই মানুষ লড়াই করাটাই পুরুষের পরম গৌরবের বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে এবং সেই হিসাবে লড়াই করিয়াছে এবং লোকক্ষয় করিয়া বাহ্যতঃ নিজেদের নারীর অনুপাত বৃদ্ধি করিয়াছে, সেই দেশেই নারীর মূল্য হ্রাস হইয়াছে। এ-কথা সত্য হইলেও এই কথাটাও বুঝিয়া দেখিবার বিষয়, বাস্তবিক নারীর অনুপাত তাহাতে বৃদ্ধি হয় কি না। কারণ, এই কথাটা অনেকেই গণনার মধ্যে আনেন না যে, প্রায় সমস্ত যুদ্ধপ্রিয় জাতিই নিজেদের নারীর অনুপাত বৃদ্ধি না পাইবার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। প্রধান উপায় নিজেদের শিশু-কন্যা হত্যা করিয়া। প্রায় সমস্ত আদিম অসভ্য জাতিরা শিশু-কন্যা বধ করিয়া ফেলিত। রাজপুতেরা করিত, আরব শেখেরা কন্যা জন্মিবামাত্রই গর্ত্ত কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলিত, কেঁধা প্রদেশের আরবেরা শিশু-কন্যার পাঁচ বৎসর বয়সে তাহাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে কন্যার জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "এইবার মেয়েকে গন্ধ মাখাইয়া দাও, সাজাইয়া দাও, আজ সে তার মায়ের ঘরে যাইবে।" অর্থাৎ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। কোরিশের লোকেরা মক্কার নিকটবর্ত্তী আবুদেলামা পাহাড়ে নিজেদের কন্যা বধ করিত। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক স্ট্রাবো বলিয়া গিয়াছেন, "the practice of exposing female infants and putting them to death being so common among the ancients, that it is remarked as a thing very extra-ordinary in the Egyptians, that they brought up all their children." চীনাদের মধ্যে শুনিয়াছি এ-প্রথা আজও আছে। গ্রীকদের সম্বন্ধে Posidipppus এর একটা প্রচলিত উক্তি Sale উদ্ধৃত করিয়াছেন, "a man, though too poor, will not expose his son but if he is rich, will scarce preserve his daughter."

সুতরাং লড়াই করিয়া নিজেরা মরিলে বা কন্যা হত্যা করিলে নারীর অনুপাত বাড়ে না, কমেও না, অনুপাতের উপর নারীর সম্মান বা অসম্মান (মূল্য) নির্ভরও করে না। করে পুরুষের এই ধারণার উপর—নারী সম্পত্তি, নারী শুধু ভোগের বস্তু। তাই নিজেদের কন্যা বধ, তাই পরের কন্যা হরণ করিয়া আনিবার প্রথা! নিজেদের কন্যা পরে লইয়া গেলে মহা অপমান, পরের মেয়ে কাড়িয়া আনিতে পারিলে মহা গৌরব! এইজন্যই এক পুরুষের বহু স্ত্রী সম্মান ও বলের চিহ্ন। Burckhardt বলিয়াছেন, এই ধারণা ওয়াহাবিদের মধ্যে আজও এত প্রবল যে, তাহারা ইউরোপের এক পুরুষের একটিমাত্র স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হাঁ করিয়া থাকে। কথাটা সত্য বলিয়া তাহারা মনের মধ্যে বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

আর না। এ প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া গেল, এইবার শেষ করি। জানি না, পুরুষে এ প্রবন্ধ পড়িয়া কি মনে করিবেন, কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া অকপটে বিশ্বাস করিয়াছি, নারীর মূল্য কেন হ্রাস পাইয়াছে এবং বাস্তবিক পাইয়াছে কি না, এবং

মূল্য হ্রাস পাইলে সমাজে কি অমঙ্গল প্রবেশ করে এবং নারীর উপর পুরুষের কাল্পনিক অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলে কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা নিজের কথায় ও পরের কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি—এইমাত্র। তাহাতে শাস্ত্রের অসম্মান করা হইয়াছে, কি হয় নাই, দেশাচারের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, কি হয় নাই—এ কথা মনে করিয়া কোথাও থামিয়া যাইতে পারি নাই। যাহা সত্য তাহাই বলিব এবং বলিয়াছিও, অবশ্য ফলাফলের বিচার-ভার পাঠকের উপর।

নর-নারীর পবিত্র বন্ধনের সীমা ও পরিণতি সম্ভবতঃ একদিন কি হইবে এবং কি হওয়া উচিত উপসংহারে শুধু সেই কথাটাই হারবার্ট স্পেন্সারের ভাষায় ব্যক্ত করিব। "As monogamy is likely to be raised in character by a public sentiment requiring that the legal bond shall not be entered into unless it represents the natural bond ; so, perhaps it may be, that maintenance of legal bond will come to be held improper if the natural bond ceases. Already increased facilities for divorce point to the probability that whereas, while permanent monogamy was being evolved, the union by law (originally the act of purchase) was regarded as the essential part of marriage and the union by affection as non-essential, and whereas at present the union by law is thought to be more important; and the union by affection the less important, there will come a time when the union by law as of secondary moment ; whence reprobation of marital relations in which the union by affection has dissolved. That this conclusion will be at present unacceptable is likely—I may say, certain..... Those higher sentiment accompanying union of the sexes, which do not exist among primitive men and were less developed in early European times than now, may be expected to develop still more as decline of militancy and growth of industrialism foster altruism ; for sympathy which in the root of altruism, is a chief element in these sentiments."

অপ্রকাশিত রচনাবলী

ক্ষুদ্রের গৌরব

সে-রাত্রে চাঁদের বড় বাহার ছিল। শুভ্র, স্নিগ্ধ, শান্ত কৌমুদী স্তরে স্তরে দিগ্‌-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশ বড় নির্ম্মল, বড় নীল, বড় শোভাময়। শুধু সুদূর প্রান্তস্থিত দুই-একটা খণ্ড শুভ্র মেঘ মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। সেগুলা বড় লঘু-হৃদয়; কাছে আসিয়া, আশে-পাশে ছুটিয়া বেড়াইয়া চাঁদকে চঞ্চল করিয়া দেয়। আজ তাহা পারে নাই, তাই চন্দ্রমা কিছু গম্ভীর-প্রকৃতি। সে স্থির গাম্ভীর্য্যের যে কি সৌন্দর্য্য তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

আকাশে স্থান গ্রহণ করিলেই তাঁহার এ শোভা হয় না। তবে মনে হয় যেদিন কবি তাঁহার রূপ দেখিয়া প্রথম আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, আজ বুঝি তাঁহার সেই রূপ! যে রূপ দেখিয়া বিরহী তাঁহার পানে চাহিয়া প্রিয়তমের জন্য প্রথম অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন, আজ বুঝি তিনি সেই রূপে গগনপটে উদিত হইয়াছিলেন; আর যে রূপের মোহে ভ্রান্ত চকোরী সুধার আশায় প্রথম পথে ছুটিয়া গিয়াছিল—আজ বুঝি তিনি সেই সুধাকর! নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া সত্যই মনে হয়, কি শান্ত, কি স্নিগ্ধ, কি শুভ্র। শুভ্র জ্যোৎস্না উন্মুক্ত বাতায়নপথে সদানন্দের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছে। গৃহে দীপ নাই। শুধু সদানন্দ নীচে বসিয়া গাঁজার কলিকায় দম দিতেছে ও অদূরে রোহিণীকুমার মুখপানে চাহিয়া আছে। আর অদূরে কে একজন গাহিয়া চলিতেছে, "যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী"। সদানন্দ ধীরে ধীরে গাঁজার কলিকা নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আহা"।

তাহার পর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আর একবার সে মাথা নাড়িয়া মনে মনে সেই অসম্পূর্ণ পদটি আবৃত্তি করিয়া লইল—"কাঁদে রাধা বিনোদিনী"।

কবে কোন্ স্নেহ-রাজ্যে বিরহ-ব্যথায় রাধা বিনোদিনী যমুনা-পুলিনে বসিয়া প্রিয়তমার জন্য অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন সে-কথা ভাবিয়া আজ সদানন্দের চক্ষে জল আসিয়াছে। সে গাঁজা খাইতেছে—কাঁদিতে বসে নাই। শুধু একটা গ্রাম্য, অতি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ পদ অসময়ে তাহার চক্ষে জল টানিয়া আনিয়াছে।

সদানন্দের মুখে ঈষৎ চাঁদের আলো পড়িয়াছিল। সে আলোকে রোহিণীকুমার সদানন্দের চক্ষের জল দেখিতে পাইল। একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, "সদা, তোর নেশা হয়েচে, কাঁদচিস্ কেন?"

সদানন্দ গাঁজার কলিকা জানলা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। এবার রোহিণী বিরক্ত হইল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "ঐ ত তোর দোষ—মাঝে মাঝে বেঠিক হয়ে

পড়িস!" সদানন্দ কথা কহিল না দেখিয়া বিরক্ত অন্তঃকরণে রোহিণী নিজেই কলিকার অন্বেষণে বাহিরে আসিল। আর একবার জানলা দিয়া দেখিল—সদানন্দ পূর্ব্বের মত মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এ-ভাব রোহিণীর নিকট নূতন নহে—সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল আজ অন্য আশা নাই। তাই গম্ভীরভাবে কহিল, "সদা শুগে যা—কাল সকালে আবার আসব।"

রোহিণী একটু বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পথে আসিয়াই তাহার মনে পড়িল—সেই কোমল করুণ 'আহা!' তখন সে হাততালি দিয়া গান ধরিল, "যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী—বিনে সেই, বিনে সেই—"

কিছুক্ষণ বিরামের পর আবার সেই গান সদানন্দের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে যুক্তকরে উর্দ্ধ্বনেত্রে কাঁদিয়া কহিল—"দয়াময় তুমি ফিরিয়া এস।"

রাধার দুঃখ সে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, তাই কাঁদিয়াছে; ক্ষুদ্র কবিতার ক্ষুদ্র একটি চরণ তাহার সমস্ত হৃদয় মন্থন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। সেই নির্ম্মল নীল যমুনা; সেই বিককুহরিত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সখী-পরিবৃত কুঞ্জবন, সেই বকুল, তমাল, কদম্বমূল; সেই মৃত-সঞ্জীবনী বংশী-স্বর; মান অভিমান মিলন, তাহার পর শতবর্ষ-ব্যাপী সেই সর্ব্বগ্রাসী বিরহ! আর ছায়ার মত সেই ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃপ্রেম—দয়া, ধর্ম্ম, পুণ্য—এবং তাহার সর্ব্বনিয়ন্তা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ!

এত কথা, এত দীপ্ত অথচ স্নিগ্ধভরা, এত মাধুরী প্রাণোদিত করিবার গৌরব কি এই অসম্পূর্ণ নিতান্ত সাধারণ পদটির? রচয়িতার, না গায়কের? কিন্তু পদটি যদি 'যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী, না হইয়া—'কাঁদে শরৎ-শশী' হইত, তাহা হইলে সদানন্দের চক্ষে এত শীঘ্র এমনি করিয়া জল আসিত কি না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ। সে হয়ত বিরহ-বেদনাটা ছাড়িয়া দিয়া প্রথম শরৎ-শশীর বাস্তব নির্ণয় করিতে বসিত। শরৎ-শশী রাধার বিশেষণ হইতে পারে কি না তাহা বেশ করিয়া আলোচনা করিয়া পরে অশ্রুজল সম্বন্ধে মীমাংসা করিত। কিন্তু গায়ক যদি গাহিতেন 'ঘরের কোণেতে বসে কাঁদে শরৎ-শশী', তাহা হইলে অনুমান হয় করুণ রসের পরিবর্তে হাস্য-রসেরই উদ্রেক হইত। যেন ঘরের কোণেতে বসিয়া ক্রন্দনটা ক্রন্দন নামের যোগ্য হইতে পারে না, কিংবা শরৎ-শশীর বিরহ হইতে নাই—অথবা হইলেও কান্নাকাটি করা তাহার পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। তাহা হইলে দেখা গেল যে, বিরহ-বেদনাজনিত দুঃখই সদানন্দের অশ্রুজলের পূর্ণ হেতু নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে শরৎ-শশীর দুঃখে তাহাকে অশ্রুজল লইয়া এরূপ মারামারি করিতে হইত না।

কিন্তু রাধারই জন্য এত মাথা-ব্যথা কেন? একটু কারণ আছে, তাহা ক্রমে বলিতেছি।

উত্তুঙ্গ হিমালয়-শিখরের ধবল নগ্ন শোভা কেবল চক্ষুষ্মান অনুভব করিতে পারে—অন্ধে পারে না। অন্ধের নিকট হিমাচল শরীর সঙ্কুচিতও করে না, সম্পদ্-শোভাও আবৃত রাখে না। তথাপি অন্ধ সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। এ অক্ষমতার কারণ তাহার চক্ষুহীনতা। যে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে হিমালয়-শিখর কি উচ্চ, কি মহান্, কি গম্ভীর, কি সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, সে তাহার নাই। তাহার পর যে-কেহ পর্ব্বতের শোভা হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে সে-ই কেবল দুই-চারিখানা শিলাখণ্ডের কৃত্রিম সন্নিবেশ দেখিয়া আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে। যে কখন দেখে নাই সে পারে না। যে দেখিয়াছে তাহাকে এই দুই-চারটি শিলাখণ্ডই স্মৃতি-মন্দিরের রাজদ্বার উন্মোচিত করিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট পর্ব্বতের সন্নিকটে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, অতীত জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। এই সক্ষমতাই ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের গৌরব। সে যে শ্লাঘ্যের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, মহতের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্বের ইহাই শ্লাঘা—ছায়ার ইহাই মহত্ত্ব।

ভক্তের নিকট বৃন্দাবনের একবিন্দু বালুকণাও সমাদরে মস্তকে স্থান পায়, সে কি বালুকণার বস্তুগত গুণ, না বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য? তাহারা মহত্ত্বের স্মৃতি লইয়া, ভক্ত বাঞ্ছিতের ছায়াস্বরূপিনী হইয়া মর্ম্মে উপস্থিত হয়, তাই তাহাদের এত সম্মান, এত পূজা।

সন্তানহারা জননীর নিকট তাঁহার মৃত শিশুর পরিত্যক্ত হস্তপদহীন একটা মৃৎপুত্তলিকার হয়ত বক্ষে স্থান-প্রাপ্তি ঘটে। কেন যে তুচ্ছ মৃৎপিণ্ডের এতটা গৌরব, সে-কথা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে? বক্ষে স্থান দিবার সময় জননী মনে করেন না যে, ইহা একটা তুচ্ছ মাটির ঢেলা। তাঁহার নিকট সে তাঁহার মৃত পুত্রের ছায়া। যদি কখন পুত্তলিকার কথা মনে হয়—সে মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার পর সমস্ত প্রাণমন, গত জীবন, পুত্রের স্মৃতিতে ভরিয়া উঠে। তুচ্ছ মৃৎপিণ্ডর ইহার অধিক আর কি উচ্চাশা থাকিতে পারে? সে একটি হৃদয়েও সুখ দিয়াছে ইহাই তাহার শ্লাঘা।

আর রাধার বিরহ-ব্যথায় সদানন্দের অশ্রুজল! যমুনাতীরে বসিয়া যখন বিরহবিধুরা শ্রীরাধা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় হৃদয়ের প্রতি শিরা সঙ্কুচিত করিয়া তপ্ত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহার কি মনে হইয়াছিল কবে কোন্ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া, তাঁহার দুঃখে সমদুঃখী হইয়া সদানন্দ চক্ষুজল বিসর্জ্জন করিবে? যিনি ধ্যেয়, যিনি নিত্য উপাসিত, তাঁহারই ছায়া শ্রীরাধার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। অন্যের তাহাতে স্থান হয় না, তাহাই সদানন্দের অশ্রুজলের কারণ, আকর, মূল—কিন্তু সোপান বা পথ নহে। অগাধ সমুদ্র ঝঞ্ঝাবতের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু ঘোষণা করিয়া বেড়ায় না। শুধু ক্ষুদ্র তরঙ্গের দল তটপ্রান্তে আসিয়া ঘাতপ্রতিঘাতে পৃথিবীর বক্ষস্থল পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া বলিয়া যায়—"দেখ আমাদের কত প্রতাপ!" কূপের জল তাহা পারে না। সাগর-ঊর্ম্মির ইহাই গর্ব্ব যে, সে অগাধ শক্তিশালী সমুদ্রের

আশ্রিত। সূর্য্যের তেজ জননী বসুমতী প্রতিফলিত করেন, তাই তাঁহার রুদ্র প্রতাপ বুঝিতে পারি। আর সেই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী বিশ্বপ্লাবিনী রাধাপ্রেমের কথা বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, প্রভৃতি সখিবৃন্দ ব্যতীত আর কেহ জানিত না। যাহারা জানিতে পারিয়াছিল তাহারা মহৎ হইয়াছিল, যাহারা শুনিয়াছিল তাহারা ধন্য হইয়াছিল। তার পর কালক্রমে লোকে হয়ত সে-কথা ভুলিয়া যাইত। একেবারে না ভুলিলেও তাহাতে এমন জীবন্ত মোহিনী শক্তি থাকিত না। এত মাধুরী যাহারা ধরিয়া রাখিয়াছেন, এ মহত্ত্ব নশ্বর জগতের অসার বস্তু যাহাঁরা পৃথিবীর ন্যায় প্রতিফলিত করিয়া জনসাধারণকে উচ্চে তুলিয়াছে,—তাঁহারা, ঐ অজর চিরপ্রিয় বৈষ্ণব কবিগণ। সে রাধাপ্রেমের ছায়া তাঁহারা হৃদয়ে ধরিতে পারিয়াছেন এবং সরস প্রেমপূর্ণ সুধামাখা ছন্দোবন্দে জগৎসমক্ষে প্রতিভাত করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিয়াছেন—'এ জগতে বিশেষণের বাহুল্য'। এ-কথা বড় সত্য। বিশেষণ না থাকিলে বিশেষ্যকে কে চিনিত! তাই মনে হয় এই অমর কবিতাগুলি রাধাপ্রেমের বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাকে দেখিলে তাহার বিশেষ্যকে মনে পড়ে. বিশেষ্যের সেইটিই বিশেষণ, সেইটিই প্রতিবিম্ব, সেইটিই ছায়া।

যে বিরহ—শোকগাথা গাহিয়া অতীত দিবসের বৈষ্ণব-কবিগণ আপামর সকলকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন, তাহারই একটি হস্তপদহীন পরিত্যক্ত মৃৎপুত্তলিকার মত, মৃত পুত্রের ছায়ার মত, এই ক্ষুদ্র 'যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী' পদটি সদানন্দের অশ্রু টানিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। ক্ষুদ্র কবির ইহাই গৌরব,—ক্ষুদ্র কবিতার ইহাই মহত্ত্ব। ক্ষুদ্র ছায়া সদানন্দকে বশ করিতে পারিবে, কিন্তু রোহিণী-কুমারের নিকটেও হয়ত যাইতে পারিবে না। তাহাতে ছায়ার অপরাধ কি?

মলিন বর্ষার দিনে আকাশের গায় নিবিড় জলদজাল বায়ুভরে চালিত হইতে দেখিলে মনে পড়ে সেই যক্ষের কথা। মনে হয় আজও বুঝি তেমনি করিয়া উন্মত্ত যক্ষ ঐ মেঘপানে চাহিয়া প্রণয়িনীর সহিত কথা কহিতে চাহিতেছে। স্মরণ হয়, যেন যক্ষ-বঁধূর বিরহক্লিষ্ট, ম্লান মুখশোভা কোথায় কোন্ মায়ার দেশে দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু যে মনস্বী এই জীবন্ত মূর্ত্তিময় মানসপটে গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, জলদজাল সেই মহান্ প্রতিভার ছায়ামাত্র। আপনার শরীরে সেই উজ্জ্বল জ্যোতির প্রতিবিম্ব বহিয়া লইয়া বেড়ায়, মেঘের ইহাই গর্ব্ব। তাহার আনন্দ যে, সে মহতের আশ্রিত।

তাই পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, সমুদ্রের জল যাহা পারে কূপের জল তাহা পারে না। যে-দুঃখে সদানন্দ রাধার জন্য কাঁদিতে পারিয়াছিল, সে-দুঃখে হয়ত শরৎ-শশীর জন্য কাঁদিতে পারিত না। ইহাতে সদানন্দের দোষ দিই না—শরৎ-শশীর অদৃষ্টের দোষ দিই। শরৎ-শশীর দুঃখে কাঁদাইতে হইলে আর কোন মনস্বীর-প্রয়োজন—ক্ষুদ্র ছায়ার

কর্ম্ম নহে। ছায়ার নিজের মহত্ত্ব কিছুই নাই, সে যখন মহতের আশ্রিত হইতে পারিবে তখনই তাহার মহত্ত্ব। হইতে পারে সে রাজপথের ধূলা, কিন্তু বৃন্দাবনের পবিত্র রজঃ হইবার আকাঙ্ক্ষা যে তাহার একেবারে দুরাশা তাহাও মনে হয় না।

কিন্তু কথায় কথায় দরিদ্র সদানন্দের কথা ভুলিয়াছি। সে-রাত্রে সে আর উঠে নাই। প্রভাত হইলে রোহিণীকুমার জানালায় আসিয়া দেখিল, সদানন্দ তেমনি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাবিল, সদানন্দ কি বসিয়া ঘুমাইতে পারে? তাহার পর ডাকিল, "সদা—ও সদানন্দ!"

সদানন্দ জাগ্রত ছিল, উত্তর দিল, "কি?"

"জেগে আছ?"

"আছি।"

"সমস্ত রাত?"

"বোধ হয়।"

রোহিণীকুমার বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিল, এ কিরূপ নেশা? তাহার পর একটু থামিয়া—একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "সদানন্দ, মনে করিতেছি এ কু-অভ্যাসটা ছাড়িয়া দিব। তুমি শোও গে—আমি যাই। আর একদিন দেখা হবে।"*

* শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'দীপালি' সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'শরৎ-স্মৃতি' নিবন্ধে [৩রা চৈত্র, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ] শরৎচন্দ্রের লিখিত 'ক্ষুদ্রের গৌরব' নামক রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'ক্ষুদ্রের গৌরব' রচনাটি ভাগলপুর সাহিত্য-সভায় হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'ছায়া'র [শ্রাবণ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ] জন্য লেখা হইয়াছিল। ইহা আবার ৺ফণীন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত 'যমুনা' মাসিক পত্রিকার ১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশ হয়। 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হয় নাই, উহাতে লেখকের নামের স্থানে লেখা ছিল 'শ্রী—চট্টোপাধ্যায়'।

সত্য ও মিথ্যা

১

পিতলকে সোনা বলিয়া চালাইলে সোনার গৌরব ত বাড়েই না, পিতলটারও জাত যায়। অথচ সংসারে ইহার অসদ্ভাব নাই। জায়গা ও সময়-বিশেষে হ্যাট মাথায় দিয়া খাতির আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু চোখ বুজিয়া একটুখানি দেখিবার চেষ্টা করিলেই দেখা অসম্ভব নয় যে, একদিকে এই খাতিরটাও যেমন ফাঁকি, মানুষটার লাঞ্ছনাও তেমনি বেশী। তবুও এ চেষ্টার বিরাম নাই। এই যে সত্য গোপনের প্রয়াস, এই যে মিথ্যাকে জয়যুক্ত করিয়া দেখানো, এ কেবল তখনই প্রয়োজন হয় মানুষ যখন নিজের দৈন্য জানে। নিজের অভাবে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু এমন বস্তু কামনা করে যাহাতে তাহার যথার্থ দাবী-দাওয়া নাই। এই অসত্য অধিকার যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়া পড়িতে থাকে, অকল্যাণের স্তূপও ততই প্রগাঢ় ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। আজ এই দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার জো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা 'সিডিশন'। অ চ দেখিতে পাই, বড়লাট হইতে শুরু করিয়া কনেস্টবল পর্য্যন্ত সবাই বলিতেছেন—সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা – এমন কি তীব্র ও কটু হইলেও নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই যাহাতে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়, চিত্তের কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয়,—এমনি। অর্থাৎ, অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই যাহাতে প্রজাপুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, অন্যায়ের বর্ণনায় প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের দুঃখ-দৈন্যর ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ঠিক এমনিটি না ঘটিলেই তাহা রাজ-বিদ্রোহ। কিন্তু এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব করি? দুইজন পাকা ও অত্যন্ত হুঁশিয়ার এডিটারকে একদিন প্রশ্ন করিলাম। একজন মাথা নাড়িয়' জবাব দিলেন,—ওটা ভাগ্য। অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকিলে 'সিডিশন' হয় না—ওটা বিগড়াইলেই হয়। আর একজন পরামর্শ দিলেন,—একটা মজা আছে। লেখার গোড়ায় 'যদি' এবং শেষে 'কি না' দিতে হয়, এবং এই দুটা কথা নির্ব্বিচারে সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে পারিলে আর সিডিশনের ভয় থাকে না। হবেও বা, বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম; কিন্তু আমার পক্ষে একের পরামর্শ যেমন দুর্ব্বোধ্য, অপরের উপদেশও তেমনি অন্ধকার ঠেকিল। লিখিয়া লিখিয়া নিজেও বুড়া হইলাম, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক-মতই কোন একটা বিষয় ন্যায়সঙ্গত কি না স্থির করিতে পারি, কিন্তু যাহার আলোচনা করিতেছি তাহার রুচি ও বিবেচনার

সহিত কাঁধ মিলাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কি করিয়া যে লেখার আগাগোড়ায় 'যদি' ও 'কি না' বিকীর্ণ করিয়া 'সিডিশন' বাঁচাইব, ইহাও যেমন আমার বুদ্ধির অতীত, জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য যাচাইয়া তবে লেখা আরম্ভ করিব, সেও তেমনি সাধ্যের অতিরিক্ত। অতএব সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টায়, ইহার কোনটাই আমি সম্প্রতি পারিয়া উঠিব না। তবে প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করিব না।

এই প্রবন্ধটা বোধ করি কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, সুতরাং ভূমিকায় এই কথাটাই আরও একটু বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। একদিন এ দেশ সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ ইহার দুর্দ্দশার অন্ত নাই। সত্য-বাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন। সত্য লেখা যদি-বা কেহ লেখে, ছাপা-ওয়ালারা ছাপিতে চায় না ;—প্রেস তাহাদের বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লেখা যাঁহাদের পেশা, জীবিকার জন্য দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকতা যাঁহাদের করিতে হয়, অসংখ্য আইনের শত-কোটি নাগপাশ বাঁচাইয়া কি দুঃখেই না তাঁহাদের পা ফেলিতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহারা শিহরিতে শিহরিতে লিখিয়াছেন। মনে হয়, রাজ-রোষে প্রত্যেক ছত্রটির উপর দিয়া যেন তাঁহাদের ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত কলমটার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করিতে করিতেই অগ্রসর হইয়াছে। তবুও সেই অতি সতর্ক ভাষার ফাঁকে ফাঁকে যদি কদাচিৎ সত্যের চেহারা চোখে পড়ে, তখন তাহার বিক্ষত বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকের চোখ দুটাও যেন জলে ভরিয়া আসে। ভাষা যেখানে দুর্ব্বল, শঙ্কিত, সত্য যেদেশে মুখোস না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এতবড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সেদেশে রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, সমাজনীতি সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নীচের দিকেই নামিতে থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? যে ছেলে অবস্থার বশে ইস্কুলে কাগজ-পেন্সিল চুরি করিবার ফন্দি শিখিতে বাধ্য হয়, আর একদিন বড় হইয়া সে যদি প্রাণের দায়ে সিঁদ কাটিতে শুরু করে, তখন তাহাকে আইনের ফাঁদে ফেলিয়া জেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আইন প্রয়োগ করে, তাহার মহত্ত্ব বাড়ে না, এবং ইহার নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রতায় দর্শকরূপে লোকের মনের মধ্যেও যেন সূঁচ বিঁধিতে থাকে।

দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোধ করি আর একটু পরিস্ফুট হইবে।

২

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে থিয়েটার জিনিসটা কেবল আনন্দ নয়, লোক-শিক্ষারও সাহায্য করে। বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর বইখানা একসময় বাঙলার স্টেজে প্লে হইত। লরেন্স ফস্টর বলিয়া এক ব্যক্তি ইংরাজ নীলকর অতিশয় কদাচারী বলিয়া ইহাতে লেখা আছে। কর্ত্তাদের হঠাৎ একদিন চোখে পড়িল ইহাতে 'ক্লাস হেট্রেড' না কি এমনি একটা ভয়ানক বস্তু আছে যাহাতে অরাজকতা ঘটিতে পারে। অতএব অবিলম্বে বইখানা স্টেজে বন্ধ হইয়া গেল। থিয়েটার-ওয়ালারা দেখিলেন ঘোর বিপদ। তাঁহারা কর্ত্তাদের দ্বারে গিয়া ধর্না দিয়া পড়িলেন, কহিলেন, হুজুর, কি অপরাধ? কর্ত্তারা বলিলেন, লরেন্স ফস্টর, নামটা কিছুতেই চলিবে না, ওটা ইংরাজী নাম। অতএব, ওটা 'ক্লাস হেট্রেড'। থিয়েটারের ম্যানেজার কহিলেন, যে আজ্ঞা প্রভু! ইংরাজী নামটা বদলাইয়া এখানে পর্ত্তুগীজ নাম করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি ডিক্রুজ, না ডিসিলভা, না কি এমনি একটা—যা মনে আসিল, অদ্ভুত শব্দ বসাইয়া দিয়া কহিলেন, এই নিন।

কর্ত্তা দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন, আর এই জন্মভূমি কথাটা কাটিয়া দাও—ওটা 'সিডিশন'।

ম্যানেজার অবাক্ হইয়া বলিলেন, সে কি হুজুর, এদেশে যে জন্মিয়াছি!

কর্ত্তা রাগিয়া বলিলেন, তুমি জন্মাইতে পার, কিন্তু আমি জন্মাই নাই। ও চলিবে না।

'তথাস্তু' বলিয়া ম্যানেজার শব্দটা বদলাইয়া দিয়া প্লে পাশ করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিলেন। অভিনয় শুরু হইয়া গেল। 'ক্লাস হেট্রেড' হইতে আরম্ভ করিয়া মায় 'সিডিশন' পর্য্যন্ত বিদেশী রাজ-শক্তির যত-কিছু ভয় ছিল দূর হইল, ম্যানেজার আবার পয়সা পাইতে লাগিলেন। যাহারা পয়সা খরচ করিয়া তামাসা দেখিতে আসিল, তাহারা তামাসার অতিরিক্ত আরও যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিল—বাহির হইতে কোথাও কোন ত্রুটি লক্ষিত হইল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত বস্তুটা ছলনায় ও অসত্যের কালিতে কালো হইয়া রহিল। লরেন্স ফস্টর বলিয়া হয়ত কেহ ছিল না, ম্যানেজারের কল্পিত অদ্ভুত পর্ত্তুগীজ নামটিও মিথ্যা। ব্যাপারটাও তুচ্ছ, কিন্তু ইহার ফল কোনমতেই তুচ্ছ নয়। স্বর্গীয় গ্রন্থকারের বোধ করি ইচ্ছা ছিল, সে-বাঙলাদেশে ইংরাজ নীলকরের দ্বারা যে-সকল অত্যাচার ও অনাচার অনুষ্ঠিত হইত তাহারই একটু আভাস দেওয়া। ইহারই অভিনয়ে 'ক্লাস হেট্রেড' জাগিতে পারে, রাজ-শক্তির ইহাই আশঙ্কা। আশঙ্কা অমূলক বা সমূলক এ

আমার আলোচ্য নয়, কিংবা ইংরাজ নামের পরিবর্ত্তে পর্ত্তুগীজ নাম বসাইলে 'ক্লাস হেট্রেড' বাঁচে কি না সেও আমি জানি না,—ইংরাজের আইনে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে—কিন্তু যে আইন ইহারও উপরে, যাহাতে 'ক্লাস' বলিয়া কোন বস্তু নাই, তাহার নিরপেক্ষ বিচারে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করিলে যে বস্তু মরে, তাহার দাম 'ক্লাস হেট্রেডে'রও অনেক বেশী। সেদিন দেখিলাম, এই ছোট ফাঁকিটুকু হইতে ছোট ছেলেরাও অব্যাহতি পায় নাই। তাহাদের সামান্য পাঠ্য পুস্তকেও এই অসত্য স্থান লাভ করিয়াছে। নূতন গ্রন্থকার আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—এই আশ্চর্য্য নামটি আপনি সংগ্রহ করিলেন কিরূপে? গ্রন্থকার সলজ্জে কহিলেন—প্রাণের দায়ে করিতে হয়, মশায়! জানি সব, কিন্তু গরীব, পয়সা খরচ করিয়া বই ছাপাইয়াছি, তাই ওই ফন্দিটুকু না করিলে কোন স্কুলে বই চলিবে না।

তাঁহাকে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু মনে মনে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিলাম—যে রাজ্যের শাসন-তন্ত্রে সত্য নিন্দিত, যেদেশের গ্রন্থকারকে জানিয়াও মিথ্যা লিখিতে হয়,—লিখিয়াও ভয়ে কণ্টকিত হইতে হয়, সে-দেশে মানুষে গ্রন্থকার হইতে চায় কেন? সেদেশের অসত্য-সাহিত্য রসাতলে ডুবিয়া যাক না! সত্যহীন দেশের সাহিত্যে তাই আজ শক্তি নাই, গতি নাই, প্রাণ নাই। তাই আজ সাহিত্যের নাম দিয়া দেশে কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইতেছে। তাই আজ দেশের রঙ্গমঞ্চ ভদ্র-পরিত্যক্ত, পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য। সে না দেয় আনন্দ, না দেয় শিক্ষা। দেশের রক্তের সঙ্গে তাহার যোগ নাই, প্রাণের সঙ্গে পরিচয় নাই, দেশের আশা-ভরসায় সে কেহ নয়—সে যেন কোন্ অতীত যুগের মৃতদেহ। তাই পাঁচশত বছর পূর্ব্বে কবে কোন্ মোগল পাঠানকে জব্দ করিয়াছিল, এবং কখন্ কোন্ সুযোগে মারহাট্টা রাজপুতকে খোঁচা মারিয়াছিল, সে শুধু ইহারই সাক্ষী, এ-ছাড়া তাহার দেশের কাছে বলিবার আর কিছু নাই। দেশের নাট্যকারগণের বুকের মধ্য হইতে যদি কখন সত্য ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃঙ্খলার নামে, রাজসরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে; তাই সত্যবঞ্চিত নাট্যশালা আজ দেশের কাছে এমনই লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন। 'রুল ব্রিটানিয়া' গাহিতে ইংরাজের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু 'আমার দেশ' আমার দেশে নিষিদ্ধ। এই যে আজ আসমুদ্র-হিমাচল ব্যাপিয়া ভাবের বন্যা, কর্ম্ম ও উদ্যমের স্রোত বহিতেছে, নাট্যাগারে তাহার এতটুকু স্পন্দন এতটুকু সাড়া নাই। দেশের মাঝখানে বসিয়াও তাহার দরজা-জানালা ভয় ও মিথ্যার অর্গলে আজ এমনি অবরুদ্ধ যে, দেশ-জোড়া এতবড় দীপ্তির রশ্মিকণাটুকুও তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই। কিন্তু কোন্ দেশে এমন ঘটিতে পারিত? আজ মাতৃভূমির মহাযজ্ঞে বুকের রক্ত যাঁহারা এমনি করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, কোন্ দেশের

নাট্যশালা হইতে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আজ এমন করিয়া বাহির হইতে পারিত? অথচ সমস্তই দেশেরই কল্যাণের নিমিত্ত। দেশের কল্যাণের জন্যই আজ দেশের নাট্যকারগণের কলমের গাঁটে গাঁটে আইনের ফাঁস বাঁধা। এবং এমন কথাও আজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে যে, দেশের কবি, দেশের নাট্যকারগণের অন্তর ভেদিয়া যে বাক্য যে সঙ্গীত বাহির হইয়া আসে, দেশের তাহাতে কল্যাণ নাই, শান্তি নাই। বিদেশী রাজপুরুষের মুখ হইতে এ-কথাও আজ আমাদের মানিয়া চলিতে হইতেছে। কিন্তু এই নির্ব্বিচারে মানিয়া চলার লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশের আজ সময় আসিয়াছে। এবং ইহা কি শুধু একা আমাদেরই ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে? যে ইহা চালাইতেছে সে ছোট হয় নাই? আমরা দুঃখ পাইতেছি, কিন্তু মিথ্যাকে সত্য করিয়া দেখাইবার দুঃখ-ভোগ সে-ই কি চিরদিন এড়াইয়া যাইবে? ঋণ-পরিশোধের দুঃখ আছে;—আজ আমাদের ডাক পড়িয়াছে, কিন্তু দেনা শোধ করিবার তলব যেদিন তাহারও ভাগ্যে আসিবে, সেদিন তাহারই কি মুখে হাসি ধরিবে না!

ব্যাপারটা কাগজে-কলমে লোকের চোখে কি ঠেকিতেছে ঠিক জানি না। হয়ত এই বাঙলাদেশেই এমন মানুষও আছেন যাঁহাদের কাছে আগাগোড়া তুচ্ছ মনে হওয়াও বিচিত্র নয়; এবং যদি তাই হয়, তবুও আরও এমনি একটা তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এ প্রসঙ্গ এবারের মত বন্ধ করিব। University Instituteএ ছেলেদের মধ্যে কবিতা আবৃত্তির একটা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা ছিল। সর্ব্বদেশে পূজিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "এবার ফিরাও মোরে" শীর্ষক কবিতাটি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। যাহারা পরীক্ষা দিবে, তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই-একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল। তাহারই কাছে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম যে, এই সুদীর্ঘ কবিতাটির যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ,—এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দ্দশার কাহিনী যেথায় বিবৃত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কুকার্য্য কে করিল?

ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে, নির্ব্বাচনের ভার যাঁহাদের উপর ছিল তাঁহারা।

মনে করিলাম, রত্ন ইঁহারা চিনেন না, তাই, এও বুঝি সেই ছোবড়া-আঁটির ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু ছেলেটি দেখিলাম সব জানে, সে আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা সমস্তই জানেন, তবে কি-না ওতে দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা আছে, তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় না—ওটা 'সিডিশন'।

কহিলাম—কে বলিল?

ছেলেটি জবাব দিল—আমাদের কর্ত্তৃপক্ষরা।

যাক,—বাঁচা গেল। কর্ত্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্ব্বাচীন শিশুগুলার মঙ্গল-

চিন্তা করিতে এ-পক্ষেও পাকা মাথায় অভাব ঘটে নাই। প্রশ্ন করিলাম—আচ্ছা তোমরা এই কবিতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার না?

সে কহিল, পারি, কিন্তু তাঁরা বলেন, পারা উচিত নয়, ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।

আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল—স্বদেশের হিতার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় তাহার আবৃত্তি 'সিডিশন'—তাহা অপরাধের! এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে! এবং কর্ত্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই যে,—ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।

রস-সেবায়েত

শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আপনার ৩০শে ভাদ্রের 'আত্মশক্তি' কাগজে মুসাফির-লিখিত 'সাহিত্যের মামলা' পড়িলাম। একদিন বাঙলা সাহিত্যে সুনীতি-দুর্নীতি আলোচনায় কাগজে কাগজে অনেক কঠিন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, আর অকস্মাৎ আজ সাহিত্যের 'রসে'র আলোচনায় তিক্ত রসটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমনিই হয়। দেবতার মন্দিরে সেবকের পরিবর্ত্তে সেবায়েতের সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়ে না, কমিয়াই যায়, এবং মামলা ত থাকেই।

আধুনিক সাহিত্যসেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুবাক্য বর্ষিত হইয়াছে। বর্ষণ করার পুণ্য-কর্ম্মে যাঁহারা নিযুক্ত, আমিও তাঁহাদের একজন। 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।

মুসাফির-রচিত এই 'সাহিত্যের মামলা'র অধিকাংশ মন্তব্যের সহিতই আমি একমত, শুধু তাঁহার একটি কথায় যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ জানেন, কিন্তু আমার নিজের কথা যতটা জানি তাহাতে শরৎচন্দ্র 'কল্লোল', 'কালি-কলম' বা বাঙলার কোন কাগজই পড়েন না বা পড়িবার সময় পান না, মুসাফিরের এ অনুমানটি নির্ভুল নয়। তবে এ-কথা মানি যে, সব কথা পড়িয়াও বুঝি না, কিন্তু না-পড়িয়াও সব বুঝি, এ দাবী আমি করি না।

এ ত গেল আমার নিজের কথা। কিন্তু যা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে সে জিনিসটি যে কি, এবং যুদ্ধ করিয়া যে কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে সে আমার বুদ্ধির অতীত।

রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাহিত্যের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া, এবং নরেশ দিলেন সেই ধর্ম্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনিই যুক্তি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ব্যস, ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে, এবং সেই সীমানার চৌহদ্দি লইয়া এত লাঠি-ঠ্যাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে! আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় 'সীমানা বিচারে'র রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ব্যাপার। কত কথা, কত ভাব! যেমন গভীরতা, তেমনি বিস্তৃতি, তেমনি পাণ্ডিত্য। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বলনীলমণি, মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্য্যন্ত। বাপ্‌রে বাপ! মানুষে এত পড়েই বা কখন্, এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া!

ইহার পার্শ্বে 'লাল শালু-মণ্ডিত বংশখণ্ড-নির্ম্মিত ক্রীড়া-গাণ্ডীব-ধারী' নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপটাইয়া গিয়াছেন। আজ ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের অবৈতনিক নব-নাট্যসমাজের বড় অ্যাক্টর ছিলেন নরসিংহবাবু। রাম বল, রাবণ বল, হরিশ্চন্দ্র বল, তাঁহারাই ছিল একচেটে। হঠাৎ আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁর নাম রাম-নরসিংহবাবু। আরও বড় অ্যাক্টর! যেমন দরাজ গলায় হুঙ্কার, তেমনি হস্ত-পদ সঞ্চালনের অপ্রতিহত পরাক্রম। যেন মত্তহস্তী। এই নবাগত রাম-নরসিংহবাবুর দাপটে আমাদের শুধু নরসিংহবাবু একেবারে তৃতীয়ার শশিকলার ন্যায় পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। নরেশবাবুকে দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তিনি যুক্ত-হস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন, প্রভু! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভাল।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর তর্ক করিবার রীতিও যেমন জোরালো, দৃষ্টিও তেমনি ক্ষুরধার। রায়ের মুসাবিদায় কোথাও একটি অক্ষরও যেন ফাঁক না পড়ে এমনি সতর্কতা। যেন বেড়াজালে ঘেরিয়া রুই-কাতলা হইতে শামুক-গুগলি পর্য্যন্ত ছাঁকিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর।

হায় রে বিচার! হায় রে সাহিত্যের রস! মথিয়া মথিয়া আর তৃপ্তি নাই। ডাইনে ও বামে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রকে লইয়া অক্লান্তকর্ম্মী দ্বিজেন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমানে-তালে যেন তুলাধুনা করিয়াছেন।

কিন্তু ততঃ কিম?

এই কিম্‌টুকুই কিন্তু ঢের বেশী চিন্তার কথা। নরেশচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহারা সাহিত্যিক মানুষ। ইহাদের ভাব-বিনিময় ও প্রীতি-সম্ভাষণ বুঝা যায়। কিন্তু এইসকল

আদর-অপ্যায়নের সূত্র ধরিয়া এখন বাহিরের লোকে আসিয়া উৎসবে যোগ দেয়, তখন তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্য থামাইবে কে ?

একটা উদাহরণ দিই এই আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীব্রজদুর্ল্লভ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তি রস ও রুচির আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার আক্রমণের লক্ষ্য হইতেছে তরুণের দল। এবং নিজের রুচির পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এখন যেরূপ রাজনীতির চর্চ্চায় শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত", সেইরূপ অর্থোপার্জ্জনের জন্যই বেকার সাহিত্যিকের দল গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত। এবং তাহার ফল হইয়াছে এই যে, "হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।"

এই ব্যক্তি ডেপুটিগিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এবং আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেন্সনও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্যসেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে, দারিদ্র্য অপরাধ নয়, এবং সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়েছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব।

ব্রজদুর্ল্লভবাবু না জানিতে পারেন, কিন্তু 'প্রবাসী'র প্রবীণ ও সহৃদয় সম্পাদকের ত এ-কথা অজানা নয় যে, সাহিত্যের ভালো-মন্দর আলোচনা ও দরিদ্র সাহিত্যিকের হাঁড়ি-চড়া না-চড়ার আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয়। আমার বিশ্বাস, তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এতবড় কটূক্তি তাঁহার কাগজে ছাপা হইয়া গেছে। এবং এজন্য তিনি ব্যথাই অনুভব করিবেন। এবং হয়ত, তাঁহার লেখকটিকে ডাকিয়া কানে কানে বলিয়া দিবেন, বাপু, মানুষের দৈন্যকে খোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায় সেটা ভদ্র-সমাজের নয়, এবং ঘটি-চুরির বিচারে পরিপক্কতা অর্জ্জন করিলেই সাহিত্যের 'রসে'র বিচারে অধিকার জন্মায় না। এ দুটোর প্রভেদ আছে,—কিন্তু সে তুমি বুঝিবে না। ইতি ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

আসার আশায়

জীবনটাকে কি গানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না? ক্ষতি কি? গানের মত জীবনেরও একটা লয় থাকে। সেই লয় কোনটায় দ্রুত—কোনটায় ঢিমে। কেউ যুদ্ধের বাজনা বাজিয়ে দ্রুত-তালে চলে যাচ্ছে—আর কেউ-বা ঢিমে-তালে দীর্ঘদিন ধরে পিছনে পড়ে থাকছে।

যারা একসঙ্গে পা ফেলে যেতে পারে, তাদের ভাগ্য ভাল। আমার ভাগ্যে তা হ'ল না। তিনি বিজয়-গর্ব্বে কবে চলে গেছেন—আর আমি! পোড়া কপাল আমার!

আমাকে দেখে তোমরা নিশ্চয় পাগল মনে করছ? তা করতে পার। আমার সাজের সঙ্গে জীবনের যে বিষম গরমিল রয়েছে। আমার হাতে চুড়ি ঝক্‌ঝক্ করছে। আমার সিঁথের সিঁদুর ডগ্‌ডগ্ করছে? আমার পরণে কস্তাপেড়ে শাড়ি। কিন্তু যার জন্যে এই-সব—তিনিই ত নেই।

সত্যি বলছি—ওগো তোমরা অমন করে হেসো না। গা-টেপাটিপি করে ব'লো না, আমি পাগল। সত্যি বলছি—আমি পাগল নই। তবে আমি কি? ওগো! ও কথা বলতেও যে আমি বড় ভয় পাই! বাস্তবিক তিনি কি নেই?

আমি কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি,—কত সাধুসন্ন্যাসীর পায়ে মাথা খুঁড়েছি—কিন্তু কেউ কি আমার কথার জবাব দেবে না! তবে বুঝি এ-কথার জবাব নেই।

তোমরা যদি কেউ বলতে পার ত এই অভাগিনীর বড় উপকার হবে। বলতে পারবে? আঃ—ভগবান তোমাদের সুখী করুন—আর কি বলব—দীর্ঘজীবী হও বলতে যে ভয় করে—ভয় হয়, আশীর্ব্বাদ করতে না শাপ দিয়ে বসি।

তবে বলি, শোনো—

বোশেখ মাসে বেলের গাছ দেখেছ? কত পাতার আবরণে ঘন দলের বুকের মধ্যে কুঁড়িটি ঘুমিয়ে থাকে। বসন্তের কোকিলের ডাক তাকে জাগাতে পারে না। মলয়-বাতাসের সব আরাধনাকে সে তুচ্ছ করে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

তার পর, বসন্ত যখন হায় হায় করতে করতে চলে যায়—তখন অভাগী কুঁড়ি ধড়-ফড় করে তিনদিনের মধ্যে ফুটে উঠে—তখন তার সাত-শ খোয়ার। কড়া সূর্য্যির তাত

তার উপর কি নির্দ্দয়ভাবে পড়ে বিদ্রূপ করতে থাকে! দাঁড়কাকের হাহাকার শুনতে শুনতে দিনশেষে সে ডালের নীচে এলিয়ে পড়ে!

আমি ফুল নই। তাই এলিয়ে পড়লুম না। ঝরে পড়লে ত সব চুকেই যেত।

খুব গরীবের ঘরে আমার জন্ম হয়নি। বাবা এমন ডাকসাইটে বড়লোকও কিছু ছিলেন না। কিন্তু কাল হ'ল আমার পোড়া রূপ।

শুনতে পাই—আমার দুধে-রঙে আলতার আভা ছিল। কালো চুল পা অবধি লুটিয়ে পড়ত। আরো কত-কি।

এ-সব আমার শোনা কথা। সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। তোমরা কি তার পরিচয় কিছু পাচ্ছ?

কি দেখছ? না, না—ও রং নয়—আমার ঠোঁট অমনিতরই। এটা? টিপ নয়—এটা একটা তিল। ওটা জন্ম থেকেই আছে।

তাই দেখেই ত সন্ন্যাসী মিন্‌সে বলেছিল যে, আমি হবো রাজরাণী। আহা! যদি না বলত! মিন্‌সে যা বললে তাই হ'ল গা!

আহা, যদি না সেদিন সকালে সাজি-হাতে বেরুতাম! গঙ্গাজলে কি শিব-পুজো হয় না? মা'র ছিল সবতাতেই বাড়াবাড়ি। ফুল তাঁর চাই-ই, নইলে শিব-পুজো হবে না। আর তিনিই বা জানবেন কি করে? আর রাজারই বা কি আক্কেল! দুনিয়ায় এত পথ থাকতে—তাঁর যাবার রাস্তা হ'ল সেই আমাদের পুকুরধারের সরু গলিটা দিয়ে!

শুনলাম, রাজা আসছেন। রাজা আসছেন, হাঁ করে রাজা দেখছি। মনে করলাম, বুঝি বা তাঁর চারটে হাত দেখব। হায় রে, তখন যদি ছুট মেরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ি!

রাজা ত বাপু কত লোক দেখেছিল। কপাল ত আর কারুর ধরল না!

সেদিন থেকে লোকের হাসি সইতে পারিনে। মনে হয়, ওই হাসির নীচে যেন ছুরির বাঁকা ধারটা ঝিক্‌ঝিক্ করছে।

রাজা হেসে বললেন, "মা, কি তোমার নাম?"—আমি ত লজ্জায় মরে গেলাম। ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলাম। নাম মনে এল না। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। নাকের উপর বিন্‌কি বিন্‌কি ঘাম দেখা দিলে।

রাজা বললেন, "কি শান্ত—কি লক্ষণ—কি শ্রী—এ যে শুধু আমার ঘরের উপযুক্ত!"

সেদিন থেকে চারিদিকে কানাঘুষো পড়ে গেল। আমার মনের মধ্যে ছট্‌ফটানি

ধরল। কৈ, রাজার খবর আসে না কেন? হায় পোড়াকপালী!—শেষে তোর সাধ মিটল!

যখন ডাক পড়ল, তখন একেবারে চুলের মুঠি ধরে। আর সবুর সইল না। জানিনে, কবে কোন্ ফাঁকে কুমার আমাকে দেখে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে বসলেন।

পাজি-পুঁথি ধরে গোণকার বিয়ের দিন ঠিক করলেন,—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমেতে।

কি জল, কি ঝড় সে-রাতে। সত্যি বলছি—সে বাতাসে বিয়ের মন্তরগুলো সব উড়ে গেল। শুধু আমরা দু'জনে দু'জনকে দেখলাম—মাত্র একটিবার! তার পর ঝড়ে সব বাতি নিবে গেল—আমাদের গলার যুঁইএর গোড়ে ছিঁড়ে-খুড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল।

আমি কুমারের বুকের কাছে জড়সড় হয়ে বললুম, "ওগো, আমার যে বড় ভয় করছে।" তিনি মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, "আরো সরে এস—আমার এই বুকের মধ্যে।"

আমি কাঁপতে কাঁপতে ঝড়ের মধ্যে—পাখীর ছানা যেমন তার নীড়ের মধ্যে ঘুমোয়,—তেমনি করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম-ভেঙে দেখি, কই রাজকুমার,—এ যে আমাদের বুড়ো ঝির বুকের মধ্যে রয়েছি!

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, দু'চোখ বেয়ে তার জল পড়ছে। কথা কইতে সাহস হল না।

দেখলাম, বাইরে মেঘ থেকে অজস্র জল পড়ছে—দেখলাম বাড়ির সকলের চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। গাছের মধ্য দিয়ে সোঁ-সোঁ করে বাতাস বইছে। আমার বুকের মধ্যে মনে হ'ল অনেকখানি বাতাস তেমনি করে গুমরে উঠছে। মনে হ'ল কাঁদি। কান্না এল না। অবাক্ হয়ে রইলাম। একরাতের মধ্যে আমার বুকের সব রক্ত—চোখের সব জল এমন নিঃশেষ করে কে শুষে নিলে।

তার পর আর কুমারের সঙ্গে দেখা হ'ল না। লজ্জায় কারুকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, তিনি কোথায়।

মস্তবড় বাড়ির মধ্যে খাঁচার পাখীর মত আট্‌কা পড়ে রইলুম। যে আমাকে দেখে সেই কাঁদে—আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকি।

শেষকালে একদিন রাজপুত্তুর দেখা দিলেন। সেদিন কি ঘুমেই না পেয়েছিল আমাকে! কত কথা তিনি বলেছিলেন; তার মানে তখন বুঝিনি। এখনই কি ছাই বুঝতে পারছি!

তিনি বললেন, আবার দেখা হবে; কবে তা বলেননি। বলেছেন, তিনি আমাকে

ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবেন না। তিনি মানা করেছেন—আমাকে সিঁথির সিঁদুর মুছতে—আমার হাতের চুড়ি খুলে ফেলতে। তাই এই সিঁদুর—তাই আজও এই পোড়া হাত-দুটোতে সোনার চুড়ি ঝক্‌ঝক্ করে।

এখন তোমরা কি কেউ দয়া করে আমাকে বলতে পার, কবে তিনি আসছেন?

ও কি! তোমরাও যে অবাক হয়ে চেয়ে রইলে! চোখের অমন উদাস চাহনি যে আমি সইতে পারিনে!

ওগো, তোমরা কি সব ছবি? কথা কও না? হায় হায়—এ কোন্ দেশে তুমি আমায় রেখে গেছ, কুমার? ওমা! চোখের কোণে তোমাদের ও কি গা? জল নয় ত? সে কি, তোমরাও কথা কইবে না? তবে কে আমায় বলে দেবে--কবে তুমি আসবে কুমার?

রসচক্র

রাজসাহী শহরের ক্রোশ-কয়েক দূরে বিরজাপুর গ্রাম। গ্রামটি বড়,—বহু ঘর ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের বাস। কিন্তু মৈত্র-বংশের সততা, সাধুতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠার খ্যাতি গ্রাম উপচাইয়া শহর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহাতে মোটা ভাত-কাপড়টাই কোনমতে চলিতে পারিত, কিন্তু তাহার অধিক নয়। অথচ ক্রিয়া-কলাপ কোনটাই বাদ পড়িবার জো ছিল না। অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া ভদ্রাসন, অনেকগুলি মেটে খোড়ো ঘর, মস্তবড় চণ্ডীমণ্ডপ;—ইহার সকলগুলিই সকল সময়েই পরিপূর্ণ।

কিন্তু এ-সব হইত কি করিয়া? হইত, উপস্থিত তিন ভাই-ই উপার্জ্জন করিতেন বলিয়া। বড় শিবরতন গ্রামেই জমিদারী-রাজসরকারে ভাল চাকরি করিতেন; সেজ শম্ভুরতন শেয়ারের গাড়িতে আদালতে পেস্কারী করিতে যাইতেন, কেবল ন' বিভূতিরতন ধনী শ্বশুরের কৃপায় কলিকাতায় থাকিয়া কোন একটা বড় সওদাগরী অফিসে বড় কাজ পাইয়াছিলেন। মেজ এবং ছোট ভাই শিশুকালেই মারা পড়িয়াছিল, তালিকায় ওই দুটো শূন্যস্থান ব্যতীত আর তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

দিন-দুই হইল দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গেছে; প্রতিমার কাঠামোটা উঠানের একধারে আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে,—সহসা চোখ না পড়ে; কেবল তাঁহার

মঙ্গলঘটটি আজিও বেদীর পার্শ্বে তেমনি বসানো আছে। তাহার আম্রপল্লব আজিও তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি সজীব রহিয়াছে,—এখনও একবিন্দু মলিনতা কোথাও স্পর্শ করে নাই।

সকালে ইহারই অদূরে একটা বড় সতরঞ্চের উপর বসিয়া তিন ভাইয়ের মধ্যে বোধ হয় খরচপত্রের আলোচনাটাই এইমাত্র শেষ হইয়া একটু বিরাম পড়িয়াছিল, বিভূতিরতন একটু ইতস্ততঃ করিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত মুখখানা হাসির মত করিয়া কহিল, সেদিন শাশুড়ী-ঠাকুরুণ' আশ্চর্য্য হয়ে বলছিলেন, তোমার মাইনের সমস্ত টাকাটা এক-দফা বাড়িতে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়। তিনি আবার দরকার-মত কিছু নিয়ে বাকীটা ফিরে পাঠিয়ে দেন, এতে মাসে মাসে অনেকগুলো টাকা পোস্টাফিসকে দিতে হয়।

সংসার-খরচের খাত্তাখানা তখনও শিবরতনের সম্মুখে খোলা ছিল,—এবং চক্ষুও তাঁহার তাহাতেই আবদ্ধ ছিল, অনেকটা অন্যমনস্কের মত বলিলেন, পোস্টাফিস মনি-অর্ডারের টাকা ছাড়বে কেন হে? এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

বিভূতির ধনী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর যে কিছুদিন হইতেই কন্যা-জামাতার সাংসারিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ সংশয় শিবরতনের জন্মিয়াছিল। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

বিভূতি মনে করিল, দাদা ঠিকমত কথাটাতে কান দেন নাই, তাই আরও একটু স্পষ্ট করিয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তা ত বটেই। তাই তিনি বলেন, আপনার আবশ্যক-মত টাকাটাই যদি শুধু—

শিবরতন চোখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন, আমার আবশ্যক তোমরা জানবে কি করে?

তাঁহার মুখের উপর তেমনি সহজ ও শান্ত ভাব দেখিয়া বিভূতির সাহস বাড়িল, সে প্রফুল্ল হইয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তাই তিনি বলছিলেন, আপনার চিঠিপত্রের মধ্যে তার একটুখানি আভাস থাকলেও এই বাজে-খরচটা আর হতে পারত না।

শিবরতন তাঁহার হিসাবের খাতার প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আনত করিয়া জবাব দিলেন, তাঁকে ব'লো, দাদা একে বাজে খরচ বলেও মনে করেন না, চিঠিপত্রে আভাস দেওয়াও দরকার ভাবেন না। যোগীন, তামাক দিয়ে যা।

বিভূতি পাংশু-মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল এবং শম্ভু দাদার আনত মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া হাতের খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারো মুখেই কথা রহিল না—একটা অবাঞ্ছিত নীরবতায় ঘর ভরিয়া রহিল। কিন্তু ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে এই মৈত্রেয়-বংশের ইতিবৃত্তটাকে আরও একটু পরিস্ফুট করা প্রয়োজন।

এই বিরাজপুরে ইঁহাদের সাত-আট পুরুষেরও অধিককাল বাস হইয়া গেছে, অনেক ঘর-দ্বার ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, অনেক ঘর-দ্বার আবশ্যক-মত বাড়ানো কমানো হইয়াছে। কিন্তু সাবেক-দিনের সেই রন্ধনশালাটি আজও তেমনি একমাত্র ও অদ্বিতীয় হইয়াই রহিয়াছে। কখনো তাহাকে বিভক্ত করা হয় নাই, কখনো তাহাতে আর একটা সংযুক্ত করিবার কল্পনা পর্য্যন্ত হয় নাই। এই পরিবার চিরদিন একান্নবর্ত্তী, চিরদিনই যিনি বড়, তিনি বড় থাকিয়াই জীবনপাত করিয়া গেছেন,—পরে জন্মিয়া অগ্রজের সর্ব্বময় কর্তৃত্বকে কেহ কোনদিন প্রশ্ন করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় নাই।

সেই বংশের আজ যিনি বড়, সেই শিবরতন যখন ছোট ভায়ের অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার শুধু কেবল একটা 'প্রয়োজন' নাই বলিয়াই নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন, তখন বড়মানুষ শ্বশুর-শাশুড়ীর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ মুখ মনে করিয়াও বিভূতির এমন সাহস হইল না যে, এই বিতর্কের একটুও জের টানিয়া চলে।

চাকর তামাক দিয়া গেল, শিবরতন খাতা বন্ধ করিয়া তাহা হাত-বাক্সে বন্ধ করিয়া অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, তোমার ছুটি আর ক'দিন রইল বিভূতি?

আজ্ঞে ছ'দিন।

শিবরতন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, তা হলে শুক্রবারেই তোমাকে রওনা হতে হবে দেখছি।

বিভূতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এই সময়টায় বড় বেশী কাজকর্ম্ম, তাই—

শিবরতন কহিলেন, তা বেশ। না হয়, দু'দিন পূর্ব্বেই যাও। দেবীপক্ষ—দিন-ক্ষণ দেখার আর আবশ্যক নেই,—সবই সুদিন। তা হলে পরশু বুধবারেই রওনা হয়ে পড়, কি বল?

বিভূতি কহিল, যে আজ্ঞে, তাই যাবো।

শিবরতন আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, ন'বৌমার কাছে বড় অপ্রতিভ হয়ে আছি। গত বৎসর তাঁকে একপ্রকার কথাই দিয়েছিলাম যে, এ-বৎসর তাঁর ছুটি,—এ-বৎসর বাপের বাড়িতে তিনি পূজো দেখবেন। কিন্তু দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই ভয় হতে লাগল, তিনি না থাকলে ক্রিয়া-কর্ম্ম যেন সমস্ত বিশৃঙ্খল, সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। আদর-অভ্যর্থনা করতে, সকল দিকে দৃষ্টি রাখতে তাঁর ত আর জোড়া নেই কি না! এত কাজ, এত গণ্ডগোল, এত হাঙ্গামা, কিন্তু কখনো মাকে বলতে শুনলাম না—এটা দেখিনি, কিংবা এটা ভুলে গেছি। অন্য সময়ে সংসার চলে,—বড়বৌ ও সেজবৌমাই দেখতে পারেন, কিন্তু বৃহৎ

কাজকর্মের মধ্যে আমার ন'বৌমা নেই মনে করলেই ভয়ে যেন আমার হাত-পা গুটিয়ে আসে,—কিছুতে সাহস পাইনে। এই বলিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায় মুখখানি দীপ্ত করিয়া তিনি পুনরায় নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

বড়কর্ত্তার ন'বৌমার প্রতি বিশেষ একটু পক্ষপাতিত্ব আছে, ইহা লইয়া বাটীর মধ্যে আলোচনা ত হইতই, এমন কি একটা ঈর্ষার ভাবও ছিল। বড়-বধূ রাগ করিয়া মাঝে মাঝে ত স্পষ্ট করিয়াই স্বামীকে শুনাইয়া দিতেন; এবং সেজ-বধূ আড়ালে অসাক্ষাতে এরূপ কথাও প্রচার করিতে বিরত হইতেন না যে, ন'বৌ শুধু বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই এই খোসামোদ করা। নইলে আমরা দু'জায়ে এগারো মাসই যদি গৃহস্থালী ভার টানতে পারি ত পূজার মাসটা আর পারি না! বড়মানুষের মেয়ে না এলেই কি মায়ের পূজো আটকে যাবে?

এই-সকল প্রচ্ছন্ন শব্দভেদী বাণ যথাকালে যথাস্থানে আসিয়াই পৌছিত, কিন্তু শিবরতন না হইতেন বিচলিত, না করিতেন প্রতিবাদ। হয়ত-বা কেবল একটুখানি মুচকিয়া হাসিতেন মাত্র। বিভূতি অধিক উপার্জ্জন করে, তাহাকে বারোমাস বাসা করিয়া কলিকাতাতেই থাকিতে হয়, সুতরাং ন'বধূমাতার তথায় না থাকিলে নয়। এ-কথা তিনি বেশ বুঝিতেন, কিন্তু অবুঝের দল কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহিত না। তাহাদের একজনকে সংসারে মামুলি এবং মোটা কাজগুলা সারা বৎসর ধরিয়াই করিতে হয় না। কেবল মহামায়ার পূজা-উপলক্ষে হঠাৎ একসময়ে আসিয়া সমস্ত দায়িত্ব, সকল কর্ত্তৃত্ব, নিজের হাতে লইয়া তাহা নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিয়া দিয়া, ঘরের এবং পরের সমস্ত সুখ্যাতি আহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া যায়,—সে না থাকিলে এ-সব যেন কিছু হইতে পারিত না, সমস্তই যেন এলোমেলো হইয়া উঠিত, লোকের মুখের ও চোখের এইসকল ইঙ্গিতে মেয়েদের চিত্ত একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইত। কাজকর্ম্ম অন্তে এই লইয়া প্রতি বৎসরেই কিছু-না-কিছু কলহ-বিবাদ হইতই। বিশেষ করিয়া মা আজও জীবিত আছেন এবং আজও তিনি গৃহিণী। কিন্তু বয়স অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ায় অপরের দোষ-ত্রুটী দেখাইয়া তিরস্কার ও গালি-গালাজ করার কাজটুকু মাত্র হাতে রাখিয়া গৃহিণীপনার বাকী সমস্ত দায়িত্বই তিনি স্বেচ্ছায় বড় ও সেজ-বধূমাতার হাতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তিনি ন'বৌকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। সে সুন্দরী, সে বড়লোকের মেয়ে, তাহার কাপড়-গহনা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহাকে সংসার করিতে হয় না, সে চিঠি লিখিতে পারে, অহঙ্কারে তাহার মাটিতে পা পড়ে না, ইত্যাদি নালিশ এগারো মাস-কাল নিয়ত শুনিতে শুনিতে এই বধূটির বিরুদ্ধে মন তাঁহার তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত; এবং এই দীর্ঘকাল পরে সে যখন গৃহে প্রবেশ করিত, তখন তাহা অনধিকার-প্রবেশের মতই তাহার ঠেকিত।

কাল হইতে একটা কথা উঠিয়াছে যে, ধরণী সাণ্ডেলদের বাড়ির মেয়েদের সরার সন্দেশ দুটা করিয়া কম পড়িয়াছে, এবং কম পড়িয়াছিল কেবল তাহারা গরীব বলিয়াই। এই দুর্নাম শুধু গ্রামে নয়, তাহা শহর ছাড়াইয়া না-কি বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিবার উপক্রম করিয়াছে,—এই দুঃসংবাদ গৃহিণীর কানে গেল যখন তিনি আহ্নিকে বসিতেছিলেন। তখন হইতে ছত্রিশ ঘণ্টা কাটিয়া গেছে,—মালা-আহ্নিকের যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কিন্তু আলোচনার শেষ হইতে পায় নাই। দোষ শুধু ন'বৌমার এ-বিষয়েও যেমন কাহারও সংশয় ছিল না, এবং নিজে সে বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই ইচ্ছা করিয়া দরিদ্র-পরিবারের অপমান করিয়াছে, ইহাতেও তেমনি কাহারও সন্দেহ ছিল না। ন'বৌ যে সকল কথাই নীরবে সহ্য করিয়া যাইত তাহা নয়,- মাঝে মাঝে সেও উত্তর দিত, কিন্তু তাহার কোন উত্তরটাই সোজা শাশুড়ীর কানে পৌঁছিত না, পৌঁছিত প্রতিধ্বনিত হইয়া। তাই তার বক্তব্যটা লোকের মুখে মুখে ঘা খাইয়া কেবল বিকৃতই হইত না, তাহার রেশটাও সহজে মিলাইতে চাহিত না। সকালে আজ বাটীর মধ্যে যখন এই অবস্থা—সান্যাল-পরিবারের মিষ্টান্নের ন্যূনতা লইয়া ন'বধূর সম্বন্ধে আলোচনা যখন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরে তখন শিবরতন সেই ন'বধূমাতারই প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শিবরতন কহিলেন, বুধবার ন'বৌমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। মা আমার আরও কিছুদিন এখানে থেকে যেতে পারলে—যেখানের যা—সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে সারা বছরের জন্যে আমাকে নিশ্চিন্ত করে যেতে পারতেন, কেন না, এ-সকল কাজ আর কোন বৌয়ের দ্বারাই অমন শৃঙ্খলায় হয় না,—কিন্তু কি আর করা যাবে! নিয়ে গিয়ে দু'দশদিন তাঁর মায়ের কাছে দিয়ো, তবু বোনদের সঙ্গে দিন-কতক আনন্দে কাটাতে পারবেন। বিভূতি, তোমার বাসায় ত বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না?

বিভূতি কহিল, আজ্ঞে না, অসুবিধা কিছুই হবে না।

শিবরতন বলিলেন, বেশ তাই ক'রো। ন'বৌমা বাড়ি ছেড়ে যাবেন মনে হলেও আমার বিজয়ার দুঃখ যেন বেশী করে উথলে ওঠে,—কিন্তু কি আর করা যাবে। সবই মহামায়ার ইচ্ছা। সারা বছর সবাইকে নিয়ে সংসার করা—বলিয়া তিনি একটা-দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া বোধ করি আরও কি একটু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ উপস্থিত সকলেই একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধা জননী কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শিবরতন শশব্যস্তে হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শম্ভু এবং বিভূতি তাহারাও অগ্রজের সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল, মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—শিবু, আমার গুরুর দিব্বি রইল, তোদের বাড়িতে আর আমি জল গ্রহণ করব না,

যদি না এর বিচার করিস্‌। ন'বৌ বড়লোকের বেটী, আজ আমাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছে!

সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি ভায়েরা অধিক চমকিত হইতেন না। বিভূতি ভয়ে পাংশু হইয়া উঠিল, শিবরতন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া উঠিলেন, ন'বৌমা! এ কি কখনো হতে পারে মা?

মা তেমনি রোদন-বিকৃত-কণ্ঠে কহিলেন, হয়েও কাজ নেই বাবা, ও যে ন'বৌ! বড়লোকের মেয়ে! তা যাই হোক, যখন গুরুর নাম নিয়ে দিব্বি করেচি, তখন বাড়িতে রেখে বুড়ো মাকে আর মেরো না বাবা, আজই কাশী পাঠিয়ে দাও। যাই তাঁদের চরণেই আশ্রয় নিই গে।

দেখিতে দেখিতে ছেলে-মেয়ে দাসী-চাকরে প্রায় ভীড় হইয়া উঠিয়াছিল, শিবরতন তাঁর ছোট মেয়ে গিরিবালার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি হয়েচে রে গিরি, তুই জানিস?

গিরিবালা মাথা নাড়িয়া বলিল, জানি বাবা।—এই বলিয়া সে সাণ্ডেলদের সরায় সন্দেশ কম হইবার বিবরণ সবিস্তারে বিবৃত করিয়া কহিল, ঠাকুরমা ন'খুড়ীমাকে বড্ড গালাগালি দিচ্ছিলেন, বাবা!

শিবরতন কহিলেন, তারপর?

মেয়ে বলিল, ন'খুড়িমা মুখ বুজে ঝাঁট দিচ্ছিলেন, সুমুখে ন'কাকার জুতাজোড়াটা ছিল, তাই পা দিয়ে শুধু ফেলে দিয়েছিলেন।

শিবরতন প্রশ্ন করিলেন, তার পরে?

গিরি কহিল, এক পাটি জুতো ছিটকে এসে ঠাকুরমার পায়ের কাছে পড়েছিল।

শিবরতন শুধু কহিলেন, হু! মায়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ভেতরে যাও মা! এর বিচার যদি না হয় ত তখন কাশীতেই চলে যেয়ো।

একে একে ধীরে ধীরে সবাই প্রস্থান করিল, শুধু কেবল তিনভাই সেইখানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, কিন্তু সে শুধু পুড়িতেই লাগিল, শিবরতন স্পর্শ করিলেন না। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল এইভাবে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে মুখ তুলিয়া বলিলেন, বিভূতি?

বিভূতি সসম্ভ্রমে কহিল, আজ্ঞে?

শিবরতন বলিলেন, তোমার স্ত্রীর শাস্তি তুমি ছাড়া আর কারও দেবার অধিকার নেই।

বিভূতি আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞা করুন।

শিবরতন বলিলেন, ঐ জুতো তোমার স্ত্রীর মাথায় তুমি তুলে দেবে। উঠানের

মাঝখানে তিনি মাথায় নিয়ে সমস্ত বেলা দাঁড়িয়ে থাকবেন। তোমার উপর এই আমার আদেশ।

আদেশ শুনিয়া বিভূতির মাথার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখ, শালী-শালাজদের মুখ, চাকরির মুখ, স্ত্রীর মুখ, সমস্ত একই সঙ্গে মনে পড়িয়া মুখখানা ভয়ে ভাবনায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল; সে জড়িত-কণ্ঠে কহিতে চাহিল,—কিন্তু দাদা, দোষের বিচার না করেই—

শিবরতন শান্ত-স্বরে কহিলেন, মা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেচেন, এ তোমরাও দেখলে। তাঁর কি দোষ, কতখানি দোষ, এ বিচারের ভার আমার ওপর নেই। যাঁদের বিচার করতে পারি তাঁদের প্রতি আমার এই আদেশ রইল। এখন কি করবে সে তুমি জানো।

বিভূতি কহিল, আপনার হুকুম চিরদিন মাথায় বয়ে এসেচি দাদা, কোনদিন কোন স্বাধীনতা পাইনি। আজও তাই হবে, কিন্তু—

এই কিন্তুটা সেও শেষ করিতে পারিল না, শিবরতনও নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

বিভূতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বোধ করি বা দাদার কাছে কিছু প্রত্যাশা করিল। কিন্তু কিছুই না পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দাদা, আমি চললুম—এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

শিবরতন কোন কথা কহিলেন না, তেমনি অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। পূজার বাড়ি, আজও আত্মীয়, অনাত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবেশী ছেলেমেয়ে, চাকর-দাসীতে পরিপূর্ণ। এই-সকলের মাঝখানে যে ন'বউমা তাঁহার প্রাণাধিক স্নেহের পাত্রী, তাঁহারই এতবড় অপমান, এতবড় শাস্তি যে কি করিয়া অনুষ্ঠিত হইবে তাহা তিনি নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার নত নেত্র হইতে বড় বড় তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা টপ্‌টপ্‌ করিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল,—কিন্তু 'বিভূতি' বলিয়া একবার ফিরিয়া ডাকিতে পারিলেন না। কেবল মনে মনে প্রাণপণ-বলে বলিতে লাগিলেন—কিন্তু, কিন্তু মা যে! মা যে! তাঁর যে অপমান হয়েচে!*

* 'রসচক্র' নামে বারোয়ারী উপন্যাসের সূচনা-স্বরূপ শরৎচন্দ্র-রচিত অংশ।

সধবার একাদশী

এই সুপরিচিত গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিতে যাওয়াই বোধ করি একটা বাড়াবাড়ি। অথচ এই কাজের জন্যই আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। খুব সম্ভব আমাকেই ইঁহারা যোগ্য ব্যক্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।

যে-বইয়ের দোষ-গুণ আজ অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া যাচাই হইতেছে,—বিশেষতঃ, যে মারাত্মক উৎপাত কাটাইয়া সম্প্রতি ইহা খাড়া হইয়া উঠিল, তাহাতে মূল্য লইয়া ইহার আর দরদস্তুর করা সাজে না। বাঙলা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ একখানি জাতীয় সম্পত্তি—এ সত্য মানিয়া লওয়াই ভাল।

অতএব গ্রন্থ-সম্বন্ধে নয়, আমি ইহার সংস্করণ সম্বন্ধেই দুই-একটা কথা বলিব।

অত্যন্ত দুর্দ্দিনে দেশের অনেক বহুমূল্য বস্তুই বটতলার সংস্করণ সঞ্জীবিত রাখিয়াছে,—তাই আজ তাহাদের অনেকেরই ভদ্র সাজ-সজ্জা সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে, এবং বাঙালীর সম্পত্তি বলিয়াও গণ্য হইয়াছে।

জানি না, ইহারও কোনদিন বটতলার ছায়ায় মাথা বাঁচাইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে কি না, কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু এই যে, যে-কোন সংস্করণই এতদিন যাবৎ ইহার প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছে, তাহার যত দোষ যত ত্রুটিই থাক্, সে কেবল আমাদের কৃতজ্ঞতা নয়, ভক্তিরও পাত্র।

অথচ শুনিতেছি, বাঙলা-সাহিত্যের সে দুঃসময় আর নাই। তাই, দুঃখ যদি আজ সত্যই ঘুচিয়া থাকে ত, যে-সকল গ্রন্থ আমাদের ঐশ্বর্য্য, আমাদের গৌরব, তাহাদের মলিন জীর্ণ বাস ঘুচাইবারও প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রকাশক বলিতেছেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই নির্ভুল সুন্দর সংস্করণ, এবং একখানি মাত্র বই-ই তাঁহাদের প্রথম ও শেষ উদ্যম নয়।

উদ্দেশ্য সাধু, এবং প্রার্থনা করি, ইহা জয়যুক্ত হউক; কিন্তু ইহাও জানি, প্রকাশক কেবল সংকল্প করিতেই পারেন, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ও সিদ্ধি যাঁহাদের হাতে, সেই দেশের পাঠক-পাঠিকা যদি না চোখ মেলিয়া চান ত, কিছুতেই কিছু হইবে না। কিন্তু এতবড় কলঙ্কের কথাও আমার ভাবিতে ইচ্ছা করে না।

বিলাত প্রভৃতি অঞ্চলে Oxford Press 'World's Classics' নাম দিয়া একটির পর একটি যে-সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিতেছেন, তাহারই সহিত এই নব-সংস্করণের একটা তুলনা করিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি বলি—আজ নয়।

হয়ত অনতিকাল মধ্যেই একদিন তাহার সময় আসিবে, কিন্তু তখন বাঙলা দেশকে সে শুভ-সংবাদ নিবেদন করিতে যোগ্যতর ব্যক্তিরও অভাব হইবে না।*

শিবপুর, ৬ই ফাল্গুন, ১৩২৬।

---

* দীনবন্ধু মিত্র-লিখিত 'সধবার একাদশী' গ্রন্থের ভূমিকা।

গ্রন্থ-পরিচয়

শেষ প্রশ্ন

প্রথম প্রকাশ—'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ কার্ত্তিক, মাঘ—চৈত্র ; ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন ; ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র ; ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ।

পুস্তকাকারে প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ (২রা মে, ১৯৩১)। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পরিমার্জ্জিত ও বিশেষভাবে প্রথমাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত।

স্বামী

প্রথম প্রকাশ—১৩২৪ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা 'নারায়ণ' মাসিক পত্রে।

পুস্তকাকারে প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮)। 'একাদশী বৈরাগী' নামক গল্পটিও ইহার সহিত সন্নিবেশিত হয়।

একাদশী বৈরাগী

প্রথম প্রকাশ—১৩২৪ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে।

পুস্তকাকারে প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, 'স্বামী' গল্পের সহিত একত্র প্রকাশিত হয়।

নারীর মূল্য

প্রথম প্রকাশ—১৩২০ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ—আষাঢ় ও ভাদ্র—আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা' মাসিক পত্রিকায়। এই ধারাবাহিক অংশগুলি 'শ্রীমতী অনিলা দেবী' ছদ্মনামে প্রকাশিত।

পুস্তকাকারে প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ (১৮ই মার্চ, ১৯২৪)।

অপ্রকাশিত রচনাবলী (গ্রন্থাকারে)

ক্ষুদ্রের গৌরব—শ্রাবণ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে রচিত এবং ১৩২০ বঙ্গাব্দ, মাঘ সংখ্যা 'যমুনা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত।

সত্য ও মিথ্যা—১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২, 'বাংলার কথায়' প্রকাশিত।

রস-সেবায়েত—১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত।

আসার আশায়—রূপকথা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে প্রকাশিত।

রসচক্র—১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'উত্তরা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত।

সধবার একাদশী—১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'কর মজুমদার এণ্ড কোং' প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্র-লিখিত 'সধবার একাদশী' নামক গ্রন্থের ভূমিকা।